সাত সমুদ্র
তেরো নদী
বিমল মিত্র

সাত সমুদ্র তেরো নদী

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির * কলিকাতা

SAAT SAMUDRA TERO NADI
by BIMAL MITRA
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College St. Mkt. Cal-7.

পারিবেশক
উজ্জ্বল বুক স্টোরস
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
ঁশরৎচন্দ্র পাল
ঁকিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭

বর্ণব্যবস্থা
কসমিক
কলকাতা

মুদ্রাকর
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২, রামমোহন সরণী
কলকাতা—৯

ISBN NO—81—7334—037—4

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

পাঠক-পাঠিকাদের

এই লেখকের সেরা কয়েকটি বই

উপন্যাস

এই নরদেহ ১/২
পতি পরম গুরু ১/২
বিশ্বরূপ দর্শন
চারপ্রহর
বিবাহিতা
শুভযোগ
হে নূতন
সরস্বতীয়া
টাকার মুকুট
সুখের অসুখ
সাহেব বিবি গোলাম
এর নাম সংসার
প্রথম অঙ্ক শেষ দৃশ্য
মনের আয়নায়
ছাই
রাজরাণী হও
গুলমোহর
মনে রইলো
রানীসাহেবা

ছোট-বড় সবার জন্য

টক-ঝাল-মিষ্টি
লাল-নীল-হলদে
কিশোর অমনিবাস

এই লেখকের সব বই 'উজ্জ্বল বুক স্টোরস' ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩-এ পাবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ, আমার নাম জাল করে প্রায় তিন শতাধিক গল্প-উপন্যাস আছে। ও নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। আমার লেখা প্রত্যেকটি বইয়েই এই 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' এবং প্রথম পাতায় মুদ্রিত স্বাক্ষর আছে। যাঁরা কিনবেন, এটা যেন দেখে নিতে ভুলবেন না।

বিমল মিত্র

নিবেদন

সেদিন হঠাৎ রামায়ণের সেই রত্নাকর দস্যুর গল্পটা মনে পড়ে গেল। সংসারে তোমার পাপের ভাগ নেবার কেউ নেই, কিন্তু তোমার পুণ্য যদি কিছু থাকে, তো তার ভাগ নেবার দাবীদার আমরা সবাই।

লেখক-জীবনের চারভাগের তিনভাগ বললে কম বলা হয়, বোধহয় সবটাই শুধু যন্ত্রণার ইতিহাস। তোমার নাম ভাঙিয়ে সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি আত্মীয়-স্বজনেরাও তোমার গৌরবের অংশ ভোগ করবার বা খ্যাতির হক্‌দার হবার জন্যে তৈরি, কিন্তু যন্ত্রণা? ওটা তোমার একলা ভোগ করবার জিনিস। মনে আছে, সেদিন তোমার কেউ-ই ছিল না, যেদিন তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে তুমি রাত জেগেছ, রক্তপাত করেছ, বোধকরি বা একটা গল্পের জন্যে মাথা খুঁড়েছই শুধু নয়, অতি গোপনে কেঁদেছও! সেদিন কোথায় ছিলেন তাঁরা, যাঁরা আজকে তোমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছেন? সেদিন এঁদের অনেকে তোমাকে সযত্নে নিরুৎসাহ করেছিলেন, সেটা কি তোমার মনে নেই?

দু'টো ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি, তাহলেই বিড়ম্বনার কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, বিড়ম্বনাই বটে।

লালগোলার মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় একদিন টেলিফোন করলেন। জানালেন —তাঁর পুত্রের বিয়ে, আমাকে সেই তারিখে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হলো। যথাসময়ে ছাপানো চিঠিও ডাকে এসে পৌঁছলো আমার নামে। যথানির্দিষ্ট তারিখে গিয়ে পৌঁছোলাম বিবাহ-বাসরে। মহারাজা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। বললেন—একটা মজা দেখাবো বিমল—

বললাম—কি রকম?

মহারাজা বললেন—তোমার টেলিফোন নম্বরটা জানতাম না, তাই ভুল করে প্রথমে অন্য এক বিমল মিত্রের নম্বরে টেলিফোন করেছিলাম। এক মহিলা ধরলেন। জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি বিমল মিত্রের বাড়ী?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ—

—সাহিত্যিক বিমল মিত্র?

—হ্যাঁ, আমার শ্বশুর লেখক।

বললাম—ঠিক আছে, আমার ছেলের বিয়ে অমুক তারিখে, সেদিন তাঁকে আসতে বলবেন, আমি চিঠি পাঠাচ্ছি—

চিঠি তো পাঠানো হলো। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হলো যে, বিমলের কি এত বড় ছেলে যে তার আবার বিয়ে হয়ে গেলো! চিঠি পাঠাবার পর আমার টেলিফোন গাইড্ খুলে আবার ফোন করলাম তোমার নম্বরে। তখন তোমাকে পেলাম। কিন্তু তখন আগের বিমল মিত্রের চিঠিটা আর ক্যানসেল্ করলাম না। শুধু নতুন করে তোমাকেও আবার নেমন্তন্নের চিঠি পাঠালাম। তার মানে দাঁড়ালো দু'জন বিমল মিত্তিরকে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠানো হলো।

বললাম—তা তিনি কি এসেছেন?

মহারাজা বললেন—হ্যাঁ—

—কোথায়?

—পরে দেখতে পাবে।

ইতিমধ্যে একজন তদারককারী আমাকে খাবার টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। আমি অন্যান্যদের সঙ্গে খেতে বসেছি। অসংখ্য লোক। বিরাট প্যাণ্ডেল ভর্তি অভ্যাগতদের সমারোহ। রাজবাড়ির খাওয়া, সুতরাং এলাহি কাণ্ড।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন—এই হলেন আসল বিমল মিত্র, আর এই হলেন নকল বিমল মিত্র—

বলে আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোকের দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমিও সেদিকে চেয়ে দেখলাম। প্রায় আমারই বয়েসী লোক। আমার লজ্জা হতে লাগলো তাঁর লজ্জাকর অবস্থা দেখে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর কোন লজ্জা নেই। তিনি মহারাজের নিষ্ঠুর মন্তব্যটাকে হজম করবার চেষ্টায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এক হাসির ঘটনা ঘটেছে, এমনি ভাব।

এই হলো প্রথমবার। এটা কয়েক বছর আগেকার ঘটনা।

এরপর গত বছরে আবার একটা ঘটনা ঘটলো। রাইটার্স বিল্‌ডিং থেকে জনৈক অফিসার টেলিফোন করলেন—আমি কি সাহিত্যিক বিমল মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

কি আর বলবো! বললাম—সাহিত্যিক নয়, আমি লেখক বিমল মিত্র।

—আমি স্টেট লটারি ডিপার্টমেন্ট্ থেকে মিস্টার মুখার্জী বলছি। এ-বছর লটারির বিচারকের মধ্যে আপনাকে পেতে চাই। আপনি যদি রাজি হন্ তো খুশি হবো—

প্রথমতঃ আমি নিঃসঙ্গ মানুষ, তারপরে আমি লটারির টিকিট বেচাকেনার বিরোধী। জীবনে কখনও নিজে লটারির টিকিট কিনিনি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত অনেক টাল-বাহানার পর রাজি হলাম। যথাদিনে নিমন্ত্রণ পত্র এলো। আমি নির্দিষ্ট দিনে কলামন্দিরে গিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে সেখানে হাজির ছিলেন একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, একজন বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, আর একজন সুবিখ্যাত স্পোর্টসম্যান।

কর্মকর্তা মিস্টার মুখার্জী আমাকে বললেন, আপনাকে নিয়েই বড় মুশকিলে পড়েছিলাম মিস্টার মিত্র, আর কাউকে নিয়ে কিছু হয়নি—

আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

মিঃ মুখার্জী বললেন—টেলিফোন-গাইড্ দেখে একজন বিমল মিত্রকে টেলিফোন করে আমার আর্জি জানাতেই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হলেন। মনে কেমন সন্দেহ হলো। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হওয়া তো অস্বাভাবিক ঘটনা। আর একটা নম্বরে টেলিফোন করতে তখন আপনাকে পেলাম। আপনি প্রথমে আপত্তি করতেই আমার মনে হলো এবার ঠিক লোককে পেয়েছি—

এ তো গেল দ্বিতীয় ঘটনা। এবার তৃতীয় ঘটনার কথা বলি।

মাদ্রাজে ভেনাস-পিকচার্স স্টুডিওতে আছি একটি সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে। একদিন ওখানকার নানু চন্দ্র একটা অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন—আপনি সিনেমা করবার জন্য যে-বই আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা আমাদের পছন্দ হয়নি মশাইও, ওটা রাবিশ।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম—আমি আপনাদের সিনেমা করবার জন্যে বই পাঠিয়েছি! এ রকম ঘটনা আমি যে কল্পনাও করতে পারি না—

নানু চন্দ্র বললেন—কিন্তু আপনি যে লিখেছেন আমি 'সাহেব বিবি গোলামে'র লেখক, আমার নতুন বই 'কড়ির চেয়ে দামী' সিনেমা করবার জন্যে পাঠাচ্ছি—

এর পরে আমার কিছু আর বলার রইল না। সিনেমা করার দরখাস্ত করা দূরের কথা, জীবনে কোনও কিছুর জন্যেই আমি কখনো দরখাস্ত করেছি, এমন ঘটনা মনে পড়ে না। বই ছাপাবার জন্যে কখনও কোন প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েছি, এমন ঘটনাও কোনও প্রকাশক

বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। আমি কিনা করবো সিনেমার জন্যে দরখাস্ত!

আমার এক বন্ধু ফিলাডেলফিয়াতে আছেন। তাঁর নাম দিলীপ ঘোষ। তিনি সেখানকার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে আমার কি-কি বই আছে তার তালিকা পাঠিয়ে লিখলেন, তিনি আমার সব বই পড়ছেন, কিন্তু কয়েকটা বই তাঁর কাছে অ-পাঠ্য লেগেছে বলে সেই অ-পাঠ্য বই এর তালিকাও পাঠালেন। যেমন 'কড়ির চেয়ে দামী', 'মানস সুন্দরী', 'বসন্ত মালতী' প্রভৃতি। সে-সব যে আমার নামে প্রকাশিত জাল বই, দুঃখের সঙ্গে সে-কথা তাঁকে জানাতেও আমার ঘৃণাবোধ হলো।

সম্প্রতি কলকাতার কাছেই মফঃস্বলের একটি সমৃদ্ধ গ্রামে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, একটি নব-নির্মিত গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ভার আমার ওপর অর্পিত ছিল। যথাবিধি আড়ম্বর-অনুষ্ঠানের শেষে যখন কাঁচি দিয়ে সিল্কের ফিতে কেটে গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলাম, তখন ভেতরে প্রবেশ করে দেখি যে, 'বিমল মিত্র' নামাঙ্কিত যতগুলি বই আলমারিতে সযত্নে সজ্জিত রয়েছে, তা সব ক'টিই জাল। তার একটিও আমার লেখা নয়। গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ আমার সম্মানার্থে নব-নির্মিত গ্রন্থাগার-ভবনের চূড়ায় শ্বেত-পাথরের ফলকে খোদাই করে লিখে দিয়েছিলেন—"শ্রীবিমল মিত্র কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত" এবং পাশে তারিখ। বাইরে সম্মান এবং অন্দরে এই অপমানে আমি মর্মাহত হলাম এবং দুর্ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনায় তাঁরা যথেষ্ট লজ্জিত হলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন যে, তাঁরা ভবিষ্যতে এ-ব্যাপারে সতর্ক হবেন।

আর আমি? অধোঃবদন অবস্থায় অস্বস্তিতে কাটালাম সারাক্ষণ। অজ্ঞতার কি কোনও শাস্তি আছে? অন্ততঃ আমার তো তা জানা নেই।

এমনি আরো অনেক ঘটনা আছে। সব বলবার জায়গা নেই এখানে। কিন্তু মোটামুটি এই হচ্ছে আমার লেখক-জীবনে ট্র্যাজেডি।

তাই বলছিলাম, আমার পাপের ভাগীদার নগণ্য, কিন্তু পুণ্য যদি এক কণাও থাকে তো তার দাবীদার অসংখ্য! রামায়ণের রত্নাকর তবু একদিন বাল্মীকি হতে পেরেছিলেন, আমার বেলায় এত চেষ্টার পরও আমার রত্নাকরত্ব কিছুতেই ঘুচলো না।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা দরকার বলে মনে করি। অবশ্য বলা দরকার হতো না, যদি গল্প-উপন্যাস শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের উপকরণ হতো। পৃথিবীতে নানা-ধরনের গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে, রচিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেই রচিত হবে। তার মধ্যে কিছু বই থাকবার জন্যে লেখা, আর কিছু বই কালের স্রোতে ভেসে যাবার জন্যে লেখা। আজ যে বই পড়ে আনন্দ পেলাম, কালও যে সে বই পড়ে সেই আনন্দই পাবো, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অল্প বয়সে যা খেতে আমাদের ভালো লাগে, পরিণত বয়সে তা অনেক সময়ে আমাদের অরুচিকর ঠেকে। গ্রন্থের ব্যাপারও অনেকটা তাই। যে সব লেখক সব বয়েসের, সব রুচির পাঠকদের তৃপ্তি দিতে পেরেছেন, তাঁরাই স্মরণীয়।

আমার সে অহঙ্কার নেই। সংসারে একজন মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে যত রকমের সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ, তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল আর কুটিল সম্পর্ক হলো 'স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক। এর বিষয়-বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে কোটি-কোটি উপন্যাস লেখা হয়েছে, তবু এ সম্পর্কের জট এখনও যে খুলেছে তা বলা যায় না। তাই এর বিষয়বস্তু যত পুরনোই হোক, বিবাহ ব্যবস্থা শুরু হবার পর থেকে এ মানব-সমাজের চিরন্তন সমস্যা বলেই গ্রাহ্য। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, এই রচনাগুলির মধ্যে কোথাও আমার পরিশ্রম বিমুখতার নজির নেই। জীবনে আমি নানা ধরনের নানা রসের গল্প উপন্যাস লিখেছি। কখনও এপিক, কখনও ক্লাসিক আবার কখনও বা

হাল্কা রসের। কিন্তু সব রচনাতেই ইঙ্গিত দিয়েছি সেই ধ্রুবর দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে, যা মনকে পবিত্র করে, যা মনকে পরিশুদ্ধ করে। একটা কথা আমি বরাবর বিশ্বাস করি যে, লেখক যদি তার রচনায় মনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ না করে, তো তা কখনও চিরকালের সমস্ত মানুষের অন্তর আকর্ষণ করতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে আমি আমার রচনায় মনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করেছি কি না, তা বিচার করবেন পাঠক-সম্প্রদায়, আমি নয়।

এখন পর্যন্ত বাজারে আমার নামযুক্ত হয়ে প্রায় তিনশো'টা জাল বই প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র, সব শহরে-গ্রামে-গঞ্জে-বাজারে-হাটে আর কলকাতার ছোট-বড় সব দোকানে, এমন কি পান-বিড়ির দোকানে পর্যন্ত যেখানেই বাংলা বই বিক্রি হয়, সেখানেই 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে গাদা-গাদা বই সাজানো থাকতে দেখেছি। কিন্তু সব পাঠকদের কেমন করে বোঝাই, যে ওর একটাও আমার লেখা নয়। আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ, আমি ভাল লেখক কি মন্দ লেখক তা নয়, বড় অপরাধ আমার এই যে, আমার বই লোকের পড়তে ভাল লাগে, এবং তা বিক্রি হয়। সেই অপরাধেই অত জাল বইয়ের প্রাদুর্ভাব। ওগুলো বিক্রি করে পুস্তক বিক্রেতারা শতকরা ৬০ ভাগ কমিশন পান বলে তাঁরা ও'গুলোকে আসল বিমল মিত্রের বলে চালাবার চেষ্টা করেন, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলকামও হন। মনে আছে, একবার রাসবিহারী এ্যাভিনিউ'র এক বিখ্যাত দোকানদার আমাকেই ওই জাল বই আসল বিমল মিত্রের বই বলে গছাবার চেষ্টা করেছিলেন। বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহার দেবার জন্য যারা বই কেনেন তাঁদের কথা আলাদা। কারণ তাঁরা নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে সস্তা দামের বই উপহার দিয়ে চক্ষুলজ্জাকে বাঁচাতে চান। সে-সব ক্রেতাদের কাছে সব বই-ই বই—তা সে রবীন্দ্রনাথের লেখাই হোক, আর কোনও ডিটেক্‌টিভ গল্পই হোক। তাঁদের বোঝাবার উপায় নেই, কোন্‌টা সাহিত্য কোন্‌টা অসাহিত্য। বাজে ছাপা, বাজে কাগজ হলেও সুদৃশ্য মলাট থাকলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। লেখা কেমন সেটা তাঁদের কাছে গৌণ। কিন্তু এমন পাঠক-ক্রেতাও তো আছেন যাঁর কাছে তাঁর প্রিয় লেখকের বই একটি সম্পদ বিশেষ। সেই জাতীয় পাঠকদের জন্য আমাদের এত যত্ন, এত কষ্ট-স্বীকার। তাঁদের অবগতির জন্যেই জানাচ্ছি যে 'বিমল মিত্র' নামে অনেক ব্যক্তি আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। ওই নামের আড়ালে নাকি একজন পুরোনো দাগী আসামী ফুটপাত থেকে পুরোনো বই কিনে নিয়ে তাই-ই সামান্য অদল-বদল করে সুদৃশ্য মলাট দিয়ে বাজারে প্রকাশ করে এবং শতকরা ৬০ ভাগ কমিশন দেবার লোভ দেখিয়ে পুস্তক বিক্রেতাদের তা বিক্রি করতে প্ররোচিত করে। তাতে সেই সব তথাকথিত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের লাভ হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু যাঁদের জন্যে আমার বই লেখা হয়, তাঁদের লোকসান হয় পুরোপুরি। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের জালিয়াতি এই-ই প্রথম। অন্য কোনও দিক দিয়ে না হোক, এদিক দিয়ে অন্ততঃ আমি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি—

* * *

এই ছিল লেখক বিমল মিত্রের নিবেদন। আজ তিনি নেই। তার এই বৃহৎ বইটি প্রকাশ করে আমরা ধন্য। এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা জানাই আভা মিত্র ও পরিবার-বর্গকে। বইটি পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদৃত হলে তবেই আনন্দ। বিনীত—

প্রকাশিকা

প্রথমা

একবার একটা ফিল্‌ম-স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। জীবনে যে-সব জায়গায় খুব কম গিয়েছি, তার মধ্যে ফিল্‌ম-স্টুডিও একটা। ফিল্‌ম দেখতে যেমন, ফিল্‌ম যেখানে তৈরি হয়, সে-জায়গাটা দেখতে কিন্তু তেমন নয়। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর-ড্রয়িংরুম কিছুই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। সব নোংরা, ধুলো-ময়লায় ভর্তি। শুধু যে জায়গাটার ছবি তোলা হবে, সেই জায়গাটুকু সাজানো-গোজানো থাকে।

তা আমার পক্ষে স্টুডিও-জিনিসটা নেহাৎই খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়। স্বাস্থ্যকর নয় তার কারণ, সেখানে বড় গোলমাল চারিদিকে। মাথার ওপর থেকে ঘরের মেঝে পর্যন্ত সবাই হৈ-চৈ করছে সব সময়। ছবি তোলার সময়টুকু ছাড়া সেখানে চুপ করে বসে থাকাও এক পাপ। অবশ্য আর্টিষ্টদের কথা জানি নে। তাঁদের জন্যে নিশ্চয়ই নানারকম আরামদায়ক বন্দোবস্ত থাকে। তাঁরা সেখানে যাবেন, অবসরের সময়ে তাঁরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকে। নইলে তাঁরা কাজই বা করবেন কেমন করে?

এমনি অবস্থার মধ্যে একবার যখন কাউকে পড়তে হয়, তখন হাসিমুখে সব সহ্য করাটাই নিয়ম। অর্থাৎ আপনার ভাল লাগছে না, এ-কথাটা চেপে রেখে আপনার যে ভাল লাগছে, সেইটেই প্রকাশ করার নামই 'আধুনিক সভ্যতা'। মুখে-চোখে একটা মিহি ঝাপ্‌সা হাসি নিয়ে সকলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করতে হয়; ঘাড় নাড়তে হয়। ভাঙা চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসতেও হয়। এবং তেতো চা খেয়েও ঠোঁটে পরিতৃপ্তির ছাপ মাখিয়ে রাখতে হয়। আমিও সেই অভিনয় করছিলাম। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো।

একজন অভিনেত্রী মেক্‌-আপ্‌ করা অবস্থায় আমাকে এসে নমস্কার করলে। অভিনেত্রীটির বয়েস কম। আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। মেক-আপ্‌ অবস্থায় যদি চিনতেই পারবো, তবে মেক-আপ্‌-এর সার্থকতা কী?

অভিনেত্রীটি বললে, আমায় চিনতে পারছেন না, আমি নীতা।

নীতাকে মনে পড়লো। বহুদিন আগে 'রঙমহলে' আমার একটা উপন্যাসের নাটক হয়েছিল, তাতে সে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, মনে আছে।

বললাম, কেমন আছো?

নীতা বললে, ভালো, আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আপনার কথা কালই হচ্ছিল—

—আমার কথা? হঠাৎ?

—আপনার একটা গল্প বেরিয়েছে। সেইটে পড়েছে মা।

বললাম, কোন্‌ গল্পটা?

—আপনার গল্পটার নাম 'স্ত্রী'। গল্পটায় ওই যে ফড়েপুকুর স্ট্রীটের মাধব দত্ত'র কথা লিখেছেন? মাধব দত্ত, তার মোসায়েবের দল-বল, তারপর গীতাপতিবাবু। মা বলছিল, আপনি নাকি আমাদের কথা নিয়েই লিখেছেন।

বললাম, কিন্তু তোমার মা'কে তো আমি চিনলাম না ঠিক। তোমার মা'ও কি এই লাইনে আছেন নাকি?

নীতা বললে, না!

—তাহ'লে আমার মনে হয় বোধহয় কিছু ভুল করেছেন তোমার মা। আমি বানিয়ে গল্প লিখি, অনেকে মনে করে সত্যি-ঘটনা।

খানিক পরেই শুটিং-এ নীতার ডাক পড়লো। নীতা বললে, একদিন আমাদের বাড়িতে দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন—

বললাম, তোমাদের বাড়িতে?

নীতা বললে, আমার মা বলছিল, আপনি আমার মা'কে চেনেন। চেনেন বলেই আপনি আমাদের নিয়ে লিখেছেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোনও অভিনেত্রীর মা'কে আমি চিনি, এটা আমার নিজের কাছেই একটা সংবাদ বিশেষ। তা ছাড়া কোনও মহিলার সঙ্গে কখনও কোথাও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এমন ঘটনাও কই আমার তো মনে পড়ে না। তাই নীতার কথায় একটু অবাকই হয়ে গেলাম। ভাবলাম—তো হবে। কেউ যদি আমার আলাপ-পরিচয়ের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে তো তাতে আমি কেন বাদ সাধি!

ভেবেছিলাম, অনুরোধটা রাখবো না। এমন অনুরোধ বহুবার শুনতে হয়, এবং এ-অনুরোধ পালন করার সম্বন্ধে অনবধানতা অপরাধ হিসেবেও গণ্য হয় না। এমন তো কতই হচ্ছে। ভদ্রতা আর আন্তরিকতার ব্যবধান ঘুচিয়ে কে আর রোজ-রোজ এক-কথাতেই মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে?

সেদিন আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ছবির কারিগর থেকে শিল্পী সবাই তখন থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। তাদের কাজ তখনও শেষ হয়নি, আরো অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকবে তারা। আমি এক ফাঁকে নিঃশব্দে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম।

*

এ হলো আদিকথা। কিন্তু আদিকথার আগেও যে অনাদি-অতীত কথা আছে, তা জানতে পারলাম ওদের ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে। তাও ওই ঘটনার অনেক পরে। তখন ছবি-টবি শেষ হয়ে গেছে। হাউস থেকে উঠেও গেছে সে-ছবি। প্রথম-প্রথম নীতা কয়েকটা ছবিতে নেমেছিল, তাতে নাম-টাম না-হওয়াতে সিনেমাতে নামাও ছেড়ে দিয়েছিল সে।

মোটমাট পৃথিবীর আর দশটা ঘটনার চাপে তখন অন্য সব ছোটখাটো ঘটনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। যেমন চীনের যুদ্ধ, কাশ্মীরের হাঙ্গামা, কংগ্রেসের পতন! পৃথিবীর ঘটনার কি শেষ আছে?

মনে আছে সেই মাধব দত্তে'র কথা। মাধব দত্ত বলতেন, চাটুজ্জে, কারোর বিপদের কথা শুনলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না, জানো তো এও আমার একটা রোগ!

চাটুজ্জে বলতো, আজ্ঞে রোগ কেন বলছেন, এ তো আপনার মহানুভবতা!

মাধব দত্ত বলতেন, দূর, তোমাদের ওই খোশামুদে কথা আমার ভাল্লাগে না; খোশামোদ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। যে খোশামোদ করে তাকেও দেখতে পারি নে।

চাটুজ্জে বলতো, আজ্ঞে সে কি আর আমি জানি নে কর্তামশাই, জানি বলেই তো আমি খোশামোদ-টোদ্ করি নে।

চাটুজ্জের পাশে নন্দকিশোরও বসে থাকতো। নন্দকিশোর বলতো, খোশামোদে আর যে-কেউই ভুলুক, আমাদের কর্তামশাইকে কখনও খোশামোদে ভোলানো যাবে না।

মাধব দত্ত'র কথা সে-গল্পে খুব খুঁটি-নাটি দিয়ে লিখেছিলাম। মাধব দত্ত সে-কালের বর্ধিষ্ণু লোক। এলাহি খান-দানি মেজাজের বাবুসমাজের প্রতিনিধি করেছিলাম তাঁকে। সে-কালের বাবুসমাজে তাঁর প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে তাঁর যেমন দান-ধ্যান দেখিয়েছি, মহানুভবতা দেখিয়েছি, তেমনি তাঁর নানা নৈশ-কীর্তিকলাপও দেখিয়েছিলাম। শুধু যে তিনি মেয়েমানুষ পুষতেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে তাঁর উদারতার উদাহরণও দিয়েছিলাম।

আসলে সে-গল্প লেখার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের ক্রম-বিবর্তন দেখানো। আজকের কলকাতা শহরে যে-সমাজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এর পেছনে যে ইতিহাসটা আছে, সেইটে বলাই ছিল আমার সে-গল্পের প্রধান বক্তব্য।

কিন্তু আসলে সে-গল্পটা ছিল আমার সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কল্পনাটাও বাস্তবধর্মী করে লেখা যায়। এমন গল্প লেখা যায় যে তা পড়ে পাঠকের মনে হবে এ ঘটনা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। তেমন ধারণা করাবার জন্যে অনেক মার-প্যাঁচ আছে। আসলে মার-প্যাঁচটাই সব। পড়তে-পড়তে যেন মনে না হয় যে এ গল্প, লেখকের মাথা ঘামিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লেখা। কিন্তু সেই বানানো গল্পই যে একদিন নীতাদের বংশের গল্প হয়ে যাবে, সেই গল্পকে সত্যি মনে করে যে কেউ তা নিয়ে আলোচনা করবে, তা আমি কল্পনা করতে পারিনি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই, যে নীতা, যাকে আমি বলতে গেলে ভালো করে চিনি না, যার মা'কে জীবনে কখনও দেখিনি, তাদের ধন-মান-কুল-শীল সম্বন্ধে কিছু জানি না, তারাই কিনা বললে, সে-গল্প তাদের নিয়েই লেখা?

মাধব দত্ত বড়লোক।

তা কলকাতায় মাধব দত্ত'র মতন বড়লোক কি আর দশটা নেই?

আরো একটা কথা। বড়লোকদের সঙ্গে বড়লোকদের কোনও তফাৎই নেই। আসলে তো সব বড়লোকরাই এক। বড়লোকদের মধ্যে কোনও রকমফের নেই বলেই কোনও বৈচিত্র্যও নেই। বড়লোক হলেই যেমন বাবুয়ানি করতে হয়, বাবুয়ানি না করলে যেমন বড়লোক হওয়া যায় না, তেমনি গরীব হলে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। গরীব হলেও বড়লোকিপনা করতে কোনও বাধা নেই। গরীবলোকদের দেখে সব-সময় বোঝবারও উপায় নেই যে লোকটা গরীব কি বড়লোক। আসলে এক-কথায় গরীবরা একজাতীয় হলেও কোন জাত নেই তাদের।

বহুদিন আগের লেখা সে-গল্পটা! সবটা মনেও নেই আমার। আর হাতের কাছে তার কোনও কপিও নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে, যে তিনি সকালবেলা ঘুমোতে যেতেন, আর বিকেল চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতেন।

আশ্রিত-অনাশ্রিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মোসাহেব, উকীল-অ্যাটর্নী সবাই-ই জানতো সে কথা। তাই অন্য সবাইও জানতো সে-কথা। তাই সবাই-ই প্রয়োজন হলে কিংবা বিনা-প্রয়োজনেও সেই সময়েই এসে হাজির হতো তাঁর নাচ-দরবারে। এসে নাচ-দরবারে বসে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধর্না দিত।

তারা জানতো যে দত্তমশাই ওই সময়ে ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া খেতেন। সারা রাত জাগরণের পর বেলা করে ঘুম থেকে ওঠাই স্বাভাবিক। চাটুজ্জেও তার নিজের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোত, নন্দকিশোরও তাই।

আর ছিল সীতাপতি। সীতাপতি রায়—ফটোগ্রাফার।

বলতে গেলে মাধব দত্ত সে-গল্পের প্রধান নায়ক হলেও সীতাপতিবাবুই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। গল্পটা সীতাপতিবাবুকে নিয়েই ঘটেছিল।

অ্যাটর্নী হরনাথবাবুও কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির থাকতো সেই নাচ-দরবারে। হরনাথবাবুর দায়িত্বটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

কারণ মাধব দত্ত'র এস্টেটের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান দেখার পুরোপুরি দায়িত্ব হরনাথবাবুর ওপরে হস্তান্তরিত করে মাধব দত্ত নিশ্চিন্ত থাকতেন। কোন্ নীলেমে কোন্ বাড়িটা কিনলে কত পার্সেন্ট প্রফিট হবে, তা হিসেব করবার সময় বা বুদ্ধি, কিছুই মাধব দত্ত'র ছিল না।

মাধব দত্ত বলতেন, খুব বুঝে শুনে চলবে হরনাথ, তুমি যেখানে বলছো আমি সেখানেই সই দিয়ে দিচ্ছি, লোকসান হলে কিন্তু তোমার দায়িত্ব—বুঝলে তো ?

হরনাথ কাগজ-পত্রগুলো ভয়ে-ভয়ে সামনে এগিয়ে দিত, আর মাধব দত্ত চোখ বুঁজে তাতে একটার পর একটা সই দিয়ে দিতেন।

হরনাথ বলতো, আজকে হাইকোর্টে একটা মামলার দিন পড়েছে দত্তমশাই।

কথাটা শুনে আঁতকে উঠতেন মাধব দত্ত।

বলতেন, সর্বনাশ, আমাকে কোর্টে যেতে হবে নাকি ?

অ্যাটর্নী হরনাথ সান্ত্বনা দিত। বলতো, না-না, কী যে বলেন, আপনাকে কেন হাইকোর্টে যেতে হবে ? আমি শুধু কথাটা বলে রাখলুম আপনাকে।

—তাই বলো—বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তেন মাধব দত্ত!

মোসায়েব চাটুজ্জ্যে পাশ থেকে ফুট কাটতো। বলতো, কোর্টে যাওয়ার মত পাপ আর নেই দত্তমশাই।

নন্দকিশোর বলতো, কোর্টে যাওয়ার চেয়ে নরকে যাওয়া ঢের ভালো।

মাধব দত্ত বলতেন, তোমরা কিচ্ছু জানো না।

আশে-পাশের সবাই জানতো দত্তমশাই যে-কথা বলবেন সে তো শুধু কথা নয়, বাণী। মহাপুরুষের বাণীও অত মন দিয়ে কেউ শোনে না। মাধব দত্ত তখন জমিয়ে বসতেন।

আদালত আলি ছিল মাধব দত্ত'র খাস-খানসামা। সে আলবোলাটা এগিয়ে দিত মাধব দত্ত'র দিকে। মাধব দত্ত সেটা নিয়ে মুখে পুরতেন। তারপর ভালো করে ধোঁয়া টেনে সেটা আবার সামনের দিকে ছাড়তেন।

প্রথম টানেই যদি গল্-গল্ করে ধোঁয়া না বেরোতো তো তিনি রেগেমেগে নলটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, বেরো তুই, বেরো এখান থেকে—অকম্মার পাড়ি, এতদিন ধরে তামাক সাজছিস, এখনো ধোঁয়া বার করাতে শিখলি না ?

কিন্তু সে ওই একদিনই। একদিনই ওইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল আদালত আলির জীবনে। একদিনই আদালত আলি বরখাস্ত হয়ে গিয়েছিল মাধব দত্ত'র দফতর থেকে। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে।

ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িটাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনীদের প্রতিনিধিস্থানীয়। ওটা নিছক কল্পনা। ও বাড়ীখানাই আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম অতীত ইতিহাসের বই পড়ার পর। সমাজ-ব্যবস্থা কেমন করে যুগে-যুগে কী রূপ গ্রহণ করে, তারই প্রতীক ছিল ওই মাধব দত্ত।

কিন্তু মাধব দত্ত'রা তো শুধু একলা ওঠে না! একলা যেমন ওঠে না তেমনি আবার একলা পড়েও না। যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তাদের সঙ্গে চাটুজ্জে- নন্দকিশোর-হরনাথ-সীতাপতিরা সবাই ওঠে। তাদের সঙ্গে তাদের আশ্রিত-অনাশ্রিত-আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মোসায়েব, চাকর-দাসী-ঝি সবাই-ই ওঠে। আবার মাধব দত্ত'রা যখন পড়ে তখন তাদের নিয়েই পড়ে। মাধব দত্ত বলতেন, সব মিথ্যে, জানো নন্দকিশোর, এ সংসারে সব মিথ্যে। মানে সব ঝুটো মাল।

নন্দকিশোর বলতো, আজ্ঞে দত্তমশাই, পরমহংসদেবও ঠিক ওই কথাই বলে গেছেন।

—আরে, রাখো তোমার পরমহংসদেব! পরমহংসদেবের কি আমার মত এত টাকা ছিল ?

নন্দকিশোর বলতো, আপনি হাসালেন দত্তমশাই, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা। আপনার সঙ্গে যদি কেউ কারো তুলনা করে তো সে আস্ত আহাম্মক।

—তুমি একটা আস্ত আহাম্মক নন্দকিশোর, একটা আস্ত আহাম্মক তুমি।

নন্দকিশোর বেকুবের মত হাসতে লাগলো। হেসেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিলে যে সে আহাম্মক। দত্তমশাইয়ের কাছে আহাম্মক হয়ে থাকাও আনন্দের। দত্তমশাই যদি আহাম্মক না বলে হারামজাদাও বলতেন, তাহ'লেও তা মাথা পেতে স্বীকার করাই রীতি।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হতো মাধব দত্ত'র। . বলতেন, কই, সীতাপতিকে তো দেখছিনে, সীতাপতিকে তো দেখছিনে—

সঙ্গে-সঙ্গে লোক ছুটতো সীতাপতিবাবুকে ডাকতে। সীতাপতিও একজন মোসায়েব। ওই চাটুজ্জে, নন্দকিশোর আর সীতাপতি এই তিনজনই বলতে গেলে ছিল মাধব দত্ত'র আদি এবং অকৃত্রিম মোসায়েব।

সেই বিকেল চারটের সময় মাধব দত্ত ঘুম থেকে উঠেই যেতেন ঠাকুরঘরে। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে পূজো করতেই তাঁর দু'ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর যখন পূজোর ঘর থেকে বেরোতেন তখন মাধব দত্ত'র সে কী সৌম্য মূর্তি! কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, পরনে গরদের ধুতি, ধপ, ধপে ফরসা খালি গা—

আর তারপর আদালত আলি তাঁর শান্তিপুরী ধুতি, মখ্মলের পাঞ্জাবী, সিল্কের গেঞ্জি নিয়ে তাঁকে পরিয়ে দিত। আঙুলে আংটি, হাতে রিস্ট্-ওয়াচ, গলায় সোনার চিক্ হার।

আর ওদিকে অ্যাটর্নী হরনাথবাবু নীলমের নথিপত্র নিয়ে হাজির থাকতো নাচ-দরবারে। হরনাথের সঙ্গে হাজির থাকতো চাটুজ্জে, নন্দকিশোর। আর এককোণে বসে থাকতো সীতাপতি। সকলে হাজির না থাকলে মাধব দত্ত'র খারাপ লাগতো। সকলে সশরীরে হাজির না থাকলে মাধব দত্ত'র ঘুমের ব্যাঘাত হতো।

বলতেন, নাঃ, সবাই আল্সে হয়ে গেছে, কেউ আর কাজ করে না।

*

এ গল্প বহুদিন আগের লেখা। যেমন আমার সব লেখাই তাগাদায় পড়ে লেখা, এ লেখাও তাই। যে গল্প একবার লেখা হয়ে যায়, তারপর আর সে-লেখার কথা মাথায় থাকে না। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের নামও ভুলে যাই। অনেক সময়ে লেখাটাও হারিয়ে যায়। তারপর যখন প্রকাশকের তাগিদে ত বার কপির সন্ধান করতে যাই, তখন কোনটাই খুঁজে পাই না। তখন কাউকে ধরে পত্রিকার অফিসে পাঠাতে হয় লেখাটার নকল করিয়ে আনতে! লেখা এক জিনিস। সেটা মনের আনন্দে কিংবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একদিন শেষ করা চলে। কিন্তু সেই লেখার হিসেব রাখাটা অন্য জিনিস। সেইটেই বড় কঠিন কাজ মনে হয় আমার কাছে। 'আর সঙ্গে-সঙ্গে আছে সেই লেখা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঠকদের চিঠি লেখালেখি। সেটা আরো শক্ত কাজ।

চিঠি পেতে যে ভালো লাগে না, তা নয়। খুবই ভালো লাগে। যাঁরা চিঠি লেখেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু উত্তর দেওয়া?

উত্তরটা তো নিজের হাতেই দিতে হবে! নিজের হাতে উত্তর না দিলে তো কেউ খুশি হবে না। তাই উত্তর দেব-দেব করে যখন অনেক দিন কেটে যায়, তখন বাসি হয়ে যায় জিনিসটা। তখন উত্তর দেওয়াও যা, আর না-দেওয়াও তাই। আর ততদিনে অন্য চিঠির ভিড়ে সে-চিঠি হয়ত হারিয়েই গেছে।

এবার আর তা নয়। এবার একেবারে সরাসরি অন্য অভিযোগ। কবে একদিন কোন্ গল্প লিখেছিলাম কোন্ পত্রিকার কোন্ সম্পাদকের তাগিদে, সেই গল্পকেই আবার স্মৃতির সিন্দুক খুলে উদ্ধার করতে হচ্ছে। এ যেন সেই পূর্বপুরুষের শাল-দোশালা গায়ে

দেওয়ার মতন। তার ভাঁজে-ভাঁজে বনেদীয়ানা, কিন্তু ভাঁজ খুললেই সর্বনাশ। একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে এক্‌শা হয়ে যাবে।

এবার মেয়েটার কথা শুনে বড় অস্বস্তিতে পড়লাম। সেই ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের দত্ত-বাড়ির মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে যন্ত্রণাটা মেশানো থাকে, সেই যন্ত্রণার কথাই তো আমি বরাবর লিখে চলেছি। যন্ত্রণা না থাকলে তো মানুষ নিশ্চিন্ত। যন্ত্রণা না থাকলে তো এ-পৃথিবী নরক হয়ে উঠতো। এই নরকের মধ্যেই আমি বরাবর শিল্পের খোরাক খুঁজে বেড়িয়েছি। আর মানুষকে আমার সাধ্যমত অমৃত পরিবেশন করতে চেয়েছি। যেমন সীতাপতিবাবু!

মাধব দত্ত'র নাচ-দরবারে চাটুজ্জে, নন্দকিশোর আর হরনাথবাবুর সঙ্গে সীতাপতি তো নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করছে। কিন্তু সেই নরকের মধ্যেও সীতাপতি কেমন করে পরমার্থের সন্ধান পেয়েছিল, সেইটেই ছিল আমার সে-গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাধব দত্ত কিন্তু সীতাপতিকেই খুঁজতেন।

বলতেন, কই হে, সীতাপতিকে তো দেখছি নে—

লোক ছুটতো সীতাপতির কাছে। সীতাপতির কাছে মানে মাধব দত্ত'র আস্তাবল-বাড়িতে। মাধব দত্তে'র বিরাট বাড়ি। ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। যেমন আর পাঁচটা বাড়ি হয়, তেমনি। কিন্তু সদর গেট পেরিয়ে একটু ঢুকলেই দেউড়ি। সেখানে মাধব দত্তে'র দারোয়ান বসে থাকতো। দারোয়ানের কাজ দাঁড়িয়ে সদর গেটে পাহারা দেওয়া। যেমন আর পাঁচটা বড়লোকের বাড়ির দারোয়ান পাহারা দেয়। কিন্তু মাধব দত্ত'র দারোয়ান বসে থাকতো। শুধু বসে থাকতো নয়। বসে থাকতো আর আড্ডা জমাতো। তারপর দেউড়ি পেরিয়ে ডানদিকে-বরাবর লম্বা উঁচু পাঁচিল। একেবারে মাধব দত্ত'র বাগানের শেষ পর্যন্ত গিয়ে সীমানা তৈরী করেছে।

আর বাঁদিকটায় বৈঠকখানা। বৈঠকখানার ভেতর গোটাকতক হেলান দেওয়ার বেঞ্চি আছে। একটা ফরাস। ফরাসের ওপর খেরো-তাকিয়া গোটাকতক এদিক-ওদিক পড়ে আছে। দেয়ালের গায়ে খানকয়েক ছবি। কার ছবি কে জানে? পুরনো আমলের কর্তামশাইদের কারো-কারো হবে হয়ত।

সে-ঘরের উত্তর দিকে বাগানের মুখ-বরাবর ইঁট-বাঁধানো রাস্তা পেরিয়ে—পড়বে বার-মহল। বার-মহলে ঢুকতে দু'পাশে সিমেন্ট-বাঁধানো বসবার বেঞ্চি, সেখানে শুতেও পারো। একেবারে লম্বা টান হয়ে চিৎপাত শুয়ে পড়ো। অনেক জায়গা পড়ে আছে।

আর তারই ভেতরে চিক্‌মিলান বার-বাড়ির উঠোন। চারপাশে সবুজ রং-এর জানালা-দরজা। ওগুলো আসলে জানালা-দরজা নয়। আঁকা জানালা-দরজা। আর সমস্ত উঠোনটা ঘিরে দেয়াল-লাগোয়া উঁচু রোয়াক। দু-তিনটে সিঁড়ি দিয়ে সেই রোয়াকে উঠে হেঁটে গিয়ে ডানদিকের কোণে পড়বে দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই বাঁদিকে পড়বে মাধব দত্ত'র নাচ-দরবার।

তা সেই সেখান থেকে তলব পেয়ে সীতাপতিকে ডাকতে গেলে ওই সিঁড়ি, ওই রোয়াকে, ওই দেউড়ি, ওই বার-মহল, ওই বাগান মাড়িয়ে তবে যেতে হয়।

একেবারে বাগানের পশ্চিম কোণে মাধব দত্ত'র আস্তাবল-বাড়ি। সেখানে আস্তাবল-বাড়ির লাগোয়া একখানা ভাঙা ঘরের ভেতরে তক্তপোষের ওপর সীতাপতিবাবুর রাজ্যপাট। রাজ্যপাট ওই নামেই। ওটা শ্লেষার্থে বললাম।

দেয়ালের ওপর কুলুঙ্গিতে একটা কাঁচের শিশিতে একটু সরষের তেল থাকে। থাকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দড়িতে গামছা ঝোলে। ভিজে চিট-ময়লা গামছা। কাছে গেলে নাকে গন্ধ লাগে। তবু তারই মধ্যে বেশ দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় সীতাপতিবাবু।

মাধব দত্ত যখন রাত্তিরে গাড়ি হাঁকিয়ে মোসায়েব নিয়ে নৈশ-বিহারে যান, তখন

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সীতাপতিবাবু নাক ডাকায়। বাজ পড়লেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তারপর শেষ রাত্রের দিকে কখন মাধব দত্ত অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে বাড়িতে ফেরেন, তার খেয়াল থাকে না।

হুসেন মিয়া মাধব দত্তের কচোয়ান। শেষ রাত্রের দিকে বাড়ি ফিরে হুসেন মিয়া আস্তাবলের সামনেই খাটিয়াটা নিয়ে শুয়ে থাকে।

সীতাপতিবাবু ডাকে—ও হুসেন, হুসেন মিয়া—

ঘুম জড়ানো চোখে হুসেন মিয়া ওঠে। বলে, কী হুজুর ?

সীতাপতিবাবু বলে, কাল কত রাত্তিরে বাড়িতে ফিরলে গো ?

হুসেন মিয়া বলে, কাল রাত্তিরে তো নয়, আজ সবেরে।

—আহা !

সীতাপতিবাবুর মুখ দিয়ে একটা মৃদু 'আহা' শব্দ বেরিয়ে যায় অজান্তেই। সে-'আহা'টা যে আসলে কার জন্যে তা কেউ বুঝতে পারে না।

রহিম বোঝে। রহিম মাধব দত্ত'র সহিস। কচোয়ানের সাগরেদ। বলে, সীতাপতিবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে হুসেন ভাইয়া।

তা অন্যলোকের চোখে তার মাথাটা খারাপই হয়ে গেছে বলতে হবে। তারা সবাই ভাবে সীতাপতিবাবু আস্ত পাগল মানুষ। নইলে ঘোড়ার জন্যে কেউ মাথা ঘামায় ?

মাধব দত্ত পড়ে রইল, চাটুজ্জে পড়ে রইল, নন্দকিশোর পড়ে রইল, হুসেন মিয়া, রহিম, সবাই-ই পড়ে রইল, যত মায়া ঘোড়াটার ওপর।

মাঝে-মাঝে সীতাপতিবাবু ঘোড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখের দু'পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা। চানা চিবোয়। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে ফোঁটা ফোঁটা মাটিতেই পড়ে। তার মত অবলা জীবের সঙ্গে কিসের এত ভাব সীতাপতিবাবুর কে জানে! ঘোড়াটা যেন সীতাপতিবাবুর আপন কেউ।

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সীতাপতিবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নাকে হাত বুলিয়ে দেয়। ঠোঁটেও হাত বুলিয়ে দেয়। যেমন করে মানুষ আপন ছেলেকে আদর করে, ঠিক তেমনি। আবার কাছাকাছি কেউ না থাকলে তার সঙ্গে কথাও বলে।

বলে, কী রে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

ঘোড়াটা বোবার মত চেয়ে থাকে সীতাপতিবাবুর দিকে।

সীতাপতিবাবু বলে, ওরে, সকলেরই কষ্ট হয়, এ-সংসারে যারা গরীব হয়ে জন্মেছে, তাদের সকলেরই তোর মত কষ্ট হয়। তুই অবলা জীব তো, তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিস না।

তারপর আবার একটু থামে। বলে, আমিও তোর মতন রে, আমিও তোর মতন। তুইও কিছু বলতে পারিস না। আমিও না।

তারপর আবার একটু থেমে বলে, যাক্‌গে, একদিন এর কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব-নিকেশ হবেই, একদিন সব বোঝাপড়া হবেই—তখন ?

তারপর হুসেন মিয়ার পায়ের শব্দ পেয়ে নিঃশব্দে সরে আসে। কেউ দেখতে পাবে তাই বুঝি লজ্জা হয় সীতাপতিবাবুর! ওরা তো বুঝবে না। জানোয়ারও যে মানুষ, জানোয়ারেরও যে মানুষের মত প্রাণ আছে, তা হুসেন মিয়া বুঝবে না।

হুসেন মিয়া বলে, সীতাপতিবাবু, আপনি কি ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলেন নাকি ?

সীতাপতিবাবু লজ্জায় পড়ে। বলে, না, কী যে বলো তুমি। ঘোড়া কি আর কথা বলে! আমি নিজের মনেই কথা বলছি—বলে হাসে। তারপর বলে, তবে কী জানো...

বলে কাছে সরে আসে। বলে, অবলা জীব তো, বোঝে সব! এই যে আমি ওর কাছে গিয়ে কথা বললাম, ওর ঘাড়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিলাম।

—কী বুঝতে পেরেছে ?

সীতাপতিবাবু বলে, বুঝতে পেরেছে যে আমি ওকে ভালবাসি। ভালবাসা কখনও চাপা থাকে না গো। আমি ওকে ভালবাসি এটা ও বুঝতে পারে। দেখছো না, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সত্যিই সীতাপতিবাবু কাছে গেলে, কাছে গিয়ে আদর করলেই ঘোড়াটার চোখ দিয়ে জল পড়তো। অবলা জীব হলেও বুঝতে পারতো—এই বুড়ো লোকটা ওকে ভালবাসে। বড়লোকের বাড়ির ঘোড়া। ওই ঘোড়াই অনেক দেখেছে। মাধব দত্তকে ঘোড়াটা অনেক দিন ধরেই দেখে আসছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চাটুজ্জে এসে জোটে, নন্দকিশোর এসে জোটে, তেমনি হরনাথ এ্যাটর্নীও এসে জোটে।

চাটুজ্জে বলে, আপনি আবার আজকে কেন এলেন এ্যাটর্নীবাবু ?

হরনাথবাবু বলে, কালকে একটা নীলেম আছে হাইকোর্টে।

—নীলেম ? ঠিক এই সময়ে নীলেমের কথাটা শোনাবেন কর্তামশাইকে ? আর সময় পেলেন না ?

হরনাথবাবু বলে, কী করবো চাটুজ্জেমশাই, দত্তমশাই তো কিছু দেখেন না, আমার ওপর ভার ছেড়ে দিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তা বলে আমি তো আর ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। আমার তো একটা দায়িত্ব আছে।

তা সত্যিই, সম্পত্তির ব্যাপারে মাধব দত্ত একেবারে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতেন। চাটুজ্জে বলতো, আজ্ঞে, আজকে একটা সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে গেছে !

—সর্বনাশ ? কীসের সর্বনাশ ?

চাটুজ্জে বলতো, আজ্ঞে, আজকে আমাদের পাড়ার একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে এক ব্যাটা লোফার কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

—উধাও হয়ে গেছে মানে ?

মাধব দত্ত নলটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসতেন।

বলতেন, যুবতী মেয়ে ? তোমাদের পাড়া থেকে উধাও হয়ে গেল ?

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে, তা গেল।

—গেল মানে গেল ? আর তোমরাও চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে ! তোমাদের পাড়ার কি মানুষ নেই কেউ ?

চাটুজ্জে বলতো, আজ্ঞে মানুষ থাকলে কী হবে, কারোর জন্যে কারোর অত মাথাব্যথা নেই।

মাধব দত্ত বলতেন, তাহলে পাড়ায় ভদ্দরলোক কেউ নেই বলো ?

চাটুজ্জে বলতো, এ সংসারে, পরের জন্যে কে ভাবে বলুন তো ? এক আপনি ছাড়া, আর তো কাউকে দেখলাম না তেমন, যে পরের কথা ভাবে।

মাধব দত্ত বলতেন, তুমি তোমার ওই খোশামুদে কথাগুলো ছাড়ো তো, আমি খোশামুদে কথা শুনতে মোটে ভালবাসি না। এখন কী বিহিত করবে তাই বলো। মেয়েটার বাপ-মা-ভাই কেউ আছে ?

—কেউ নেই স্যার, কেউ নেই, একজন বিধবা মা আছে, তাও সে না-থাকারই মত।

—তা কোথায় আছে মেয়েটা, কিছু খোঁজ-টোঁজ পেয়েছো ?

চাটুজ্জে বলতো, খোঁজ-টোঁজ আর কে-ই বা নেবে, আমরা দু'চারজন ছেলেছোকরার দল শুনলুম, মেয়েটা খড়দায় আছে। খড়দায় এক গোঁসাই-এর বাড়ি নিয়ে গিয়ে কে রেখে দিয়েছে তাকে।

মাধব দত্ত দু'একবার নলটায় ঘন-ঘন টান দিতেন।

তারপর বলতেন, খড়দায় যেতে হয় তাহলে একবার, এ শুনে তো আর চুপ করে থাকা যায় না। অনাথা বিধবার একমাত্র যুবতী মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক থাকতে সব চুপ করে বসে থাকবো? চলো চলো—সবাই চলো।

তা সেই সন্ধ্যেবেলাই তোড়-জোড় শুরু হয়ে যেত। মাধব দত্ত খড়দায় যাবেন রুক্মিণী উদ্ধার করতে। সঙ্গে চাটুজ্জে যাবে, নন্দকিশোর যাবে, সীতাপতি যাবে, আদালত আলি যাবে, আর যাবে হুসেন মিয়া আর রহিম। এতগুলো লোকের খাবার-দাবার সঙ্গে যাবে। লুচি-পরোটা আর মাংস, আলুর দম, সব সঙ্গে যাবে। আর ....

আদালত আলি সঙ্গে কিছু বোতলও নিয়ে যাবে। লালপানি আর সোডার বোতল।

তারপর হৈ-হৈ করে ফড়েপুকুর থেকে বেরোবে মাধব দত্ত'র গাড়ি। পাড়ার লোক দেখবে বাবুরা নৈশ-বিহারে চলেছে। প্রথমে মাধব দত্ত উঠবেন, চারপর চাটুজ্জে, তারপর নন্দকিশোর। আর তারপর সীতাপতিবাবু। আর পেছনে আদালত আলি লুচি-পরোটা, মাংসের চাঙারি নিয়ে উঠবে গাড়ির ছাদে। ভেতরে বসে মাধব দত্ত গড়গড়ায় নল টানবেন। নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে, তবে আদালত আলি নিশ্চিন্ত হবে। তারপর হুসেন মিয়া গাড়ি ছেড়ে দেবে।

তারপর দূর্গা-দূর্গা বলে যাত্রা শুরু হবে, রুক্মিণী উদ্ধার পালা আরম্ভ হবে।

এমনি প্রায় রোজ। প্রায় রোজই রাত্রে এমনি চলবে মাধব দত্ত'র নৈশ অভিযান। কোনও দিন খড়দা, কোনও দিন শ্রীরামপুর, কোনও দিন কলকাতার বস্তি আবার কোনোদিন একেবারে খাস-কলকাতা। একদিন না একদিন কোনও যুবতী মেয়ের সর্বনাশের খবর দেবে চাটুজ্জে, আর মাধব দত্ত'র বনেদী রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে পরোপকারে তাগিদে, আর সঙ্গে সঙ্গে লুচি-পরোটা-মাংস-আলুরদমের সঙ্গে লালপানি আর সোডার বোতলের চাঙারি সঙ্গে যাবে!

আর যখন বাবুরা রুক্মিণী উদ্ধার করে ফিরবে তখন ফড়েপুকুরের রাত ভোর হয়ে এসেছে। সে-দৃশ্য আর কারো নজরে পড়ে না। তখন ফড়েপুকুরের পাড়ায় সবাই ঘুমে অচেতন। মাধব দত্ত'কে তখন ধরে নামিয়ে নিতে হয়। আদালত আলি গাড়ি থেকে নেমে মাধব দত্ত'কে ধরে। ধরে আস্তে আস্তে সদর গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর-মহলে নিয়ে যায়। ভেতর-মহল মানে একেবারে বার-মহল পেরিয়ে অন্দরের শোবার ঘরে।

প্রথম প্রথম অন্দর-মহলে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতো মাধব দত্ত'র।

কিন্তু শেষের দিকে নেশা হলে মাধব দত্ত'র মাতলামি যেন বেড়ে যেত।

হাত-পা ছুঁড়তেন। চিৎকার করতেন। আদালত আলিকে মারধোর করতেন।

বলতেন, নিকাল যাও হিয়াসে, শালা শয়ার কা বাচ্ছা—নিকালো।

আদালত আলিকে মাধব দত্ত গালাগালিই দিন আর মারধোরই করুন, তাতে আদালত আলির কিছু এসে যেত না। শুধু বলতো, জী, হাঁ।

আর তারপর মাধব দত্ত অঘোরে বিছানার ওপর টলে পড়তেন। একবার শুয়ে পড়লে তাঁকে নড়ায় এমন সাধ্য ছিল না কারো। তখন তিনিই বা কে আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই বা কে!

*

এ গল্প আমি আগে বলেছি। এ গল্প যাঁরা আগে পড়েছেন তাঁরা জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলে এসেছিল, এ তারই বিকৃত রূপ। তারপর আমরা যখন শ্যামবাজারের দিকে কলেজে পড়বার সময় যাতায়াত করেছি, তখনও তার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখেছি।

মাধব দত্ত'র সেই লাল বাড়িখানা তখনও সেই রকম অটুটই ছিল। সেই লাল রং।

সেই সদর-ফটক, সেই দেউড়ি, সেই বার-মহল। সেই পেছন দিককার বাগান।

যে নাচ-দরবারে মাধব দত্ত বসাতেন, তার মেঝের ওপর সেই লম্বা-চওড়া ফরাস তখনও ছিল। আগে নাকি ফরাসটার ওপর ফরসা চাদর পাতা থাকতো। চারপাশে লম্বা-লম্বা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না ঝোলানো থাকতো। ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলতো মাথার ওপর। আর গোটা দশ তাকিয়া ছড়ানো থাকতো ফরাসটার ওপর। আর ফরাসের সামনে অনেকখানি জায়গা শ্বেত-পাথরে ঢাকা ছিল। শ্বেত-পাথরের মেঝো, কিন্তু তার ওপর রং-বেরঙের পাথর দিয়ে একটা মস্ত পদ্মফুল আঁকা ছিল।

মাধব দত্ত'র পূর্ব পুরুষের আমলে ওখানে নাচ হতো। বেনারস-লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী-সাহেবারা আসতো মুজরো নিয়ে। যাবার সময় ইনাম নিয়ে যেত। আবার পরের বছর আসবার বরাত নিয়ে যে-যার দেশে ফিরে যেত।

কিন্তু মাধব দত্ত'র আমলে সে-নিয়ম উঠে গিয়েছিল।

মাধব দত্ত বাড়িতে নাচ-গানের পক্ষপাতী ছিলেন না। বাড়িতে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ফুর্তি করা তাঁর ধাতে সইত না।

মাধব দত্ত বলতেন, বাড়িতে ও-সব বেলেল্লাগিরি ভাল্লাগে না।

চাটুজ্জে বলতো, বেলেল্লাগিরি আপনার ধাতে সইবে না স্যার, আপনি হলেন অন্য পাঁচের।

মাধব দত্ত খুশি হতেন শুনে। বলতেন, জানো চাটুজ্জে, সে-কালে কর্তাদের তো কাজকর্ম করতে হতো না, কেবল ফুর্তি করে গেছে, টাকা উড়িয়ে গেছে। আমরা হলুম খেটে-খাওয়া মানুষ, আমাদের ও-সব পোষাবে কেন হে!

নন্দকিশোর বলতো, সে-যুগে স্যার কর্তাদের দায়িত্বজ্ঞান ছিল না তো।

মাধব দত্ত বলতেন, এই দেখো না কলুটোলার মোড়ে যে মস্ত বাড়িখানা, ওখানা তো আমার কর্তাবাবারই ছিল। ছোটবেলায় আমরা ও বাড়িতে অনেকবাব গিয়েছি।

—ওটা তো এখন মল্লিকদের স্যার। ছুঁচো মল্লিকের।

মাধব দত্ত বলতেন, আরে এখন তো ছুঁচো মল্লিকের, কিন্তু ছুঁচো মল্লিকের সম্পত্তি হলো কি করে, তাই তো বলছি।

চাটুজ্জে বলতো, তাই নাকি স্যার . কি করে হলো বলুন।

—কি করে হলো শোন, আজমীরের বাঈজী, বুঝলে চাটুজ্জে, আজমীরের বাঈজী কুন্দনবাঈ কর্তাবাবুর ডাক পেয়ে কলকাতায় গান গাইতে এসেছে। কুন্দনবাঈ-এর নাম শুনেছ তো?

নন্দকিশোর বললে, আজ্ঞে কি যে বলেন স্যার, কুন্দনবাঈ-এর নাম শুনিনি? রেকর্ডে কুন্দনবাঈ-এর নাম শুনেছি ছোটবেলায়।

—সেই কুন্দনবাঈ-এর কথাই বলছি....

হঠাৎ ধোঁয়া টানতে টানতে নল দিয়ে আর ধোঁয়া বেরোয় না। মাধব দত্ত'র মেজাজ গরম হয়ে গেল। লক্ষ্য করেছে চাটুজ্জে। চাটুজ্জে ডাকল, আদালত-আদালত—

মাধব দত্ত নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রাগে তখন মেজাজ সপ্তমে উঠেছে তাঁর। আদালত আলি সর্বনাশের গন্ধ আগেই পেয়েছিল। একটুকু গাফিলতির জন্যই এমন হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা সাজা কলকে এনে নলচের ওপর বসিয়ে দিলো।

—কোথায় থাকিস উল্লুক?

আদালত আলির ওই একই উত্তর—জী, হাঁ।

—ফের যদি গাফিলতি দেখি তো তোকে চাবুক মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেব, হারামজাদা কোথাকার।

ধোঁয়া বেরোল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্ত'র মুখেও হাসি বেরোল।

বললেন, তারপর শোন চাটুজ্জে, সেই কলুটোলার বাড়িটার কথা বলি।

কিন্তু তার আগেই এ্যাটর্নী হরনাথ সামনে এগিয়ে এসে কাগজটা মেলে ধরে। বলে, এইখানটায় একটু সই করে দেবেন কর্তামশাই।

মাধব দত্ত বিরক্ত হন। বলেন, তুমি আবার কাজের সময়ে বিরক্ত করতে এলে কেন বল দিকিনি?

হরনাথ বলে, আজ্ঞে, এই প্রপার্টিটার প্রোবেট হবে।

—তুমি এখন প্রোবেট-টোবেট রাখো দিকিনি হরনাথ। আমি বরাবর দেখেছি কাজের সময় তোমার যত তাড়া! দেখছো এখন একটা কাজ করছি।

হরনাথ কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে পিছিয়ে আসে।

মাধব দত্ত বলেন, এই তোমাকে বলে রাখছি, কাজের সময় কখ্খনো আমাকে বিরক্ত করবে না। কাজের সময় বিরক্ত করলে আমার মাথা-গরম হয়ে যায়।

হরনাথ আর দাঁড়ালো না। অনেকক্ষণ ধরে বসেছিল হরনাথ এই সামান্য কাজটার জন্যে। কিন্তু হলো না। মাধব দত্ত যখন গল্প করতে বসতেন তখন কারো সাধ্যি নেই তাঁকে বিরক্ত করে। চাটুজ্জে বললে, হ্যাঁ দত্তমশাই, ঠিক বলেছেন, যত সব বাজে ঝামেলা। তারপর বলুন আপনার গল্পটা।

মাধব দত্ত বললেন, তবে শোনো।

বলে গড়গড়ায় নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন। বললেন, জানো, কুন্দনবাঈ তো গান গাইতে এল আমার কর্তাবাবার মুজরো নিয়ে। এসে উঠলো ওই কলুটোলার বাড়িতে। সে কী রূপ কুন্দনবাঈ-এর, একেবারে সারা গা-ভরা রূপ।

নন্দকিশোর বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, গা-ভরা রূপ মানে?

—দেখছো চাটুজ্জে, নন্দকিশোর কেমন বেরসিকের মত কথা বলে। এই জন্যেই তো আমি বেরসিকদের দেখতে পারি নে। গা-ভরা রূপ মানে বোঝ না? গা-ভরা রূপ মানে ভরা-যৌবন। এবার বুঝলে?

নন্দকিশোর লজ্জায় পড়লো বড়। বললে, আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারিনি।

—বুঝতে পারবে কী করে? তোমার কী রস-জ্ঞান-ট্যান কিছু আছে! এতদিন আমার দরবারে আছো, এখনো একটু রস-জ্ঞান হলো না। লোকে বলবে কী বলো তো?

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে গুলি মেরে দিন, গুলি মেরে দিন ওর কথায়।

মাধব দত্ত বললেন, গুলি আপনি মারলেই হলো? সোজা কথাটা বুঝতে পারবে না? সোজা কথা যদি বুঝতেই না পারবে তো কথা বলে লাভ কী, বলো? কথা বলে আমার লাভটা কী শুনি? কথা বলতে কষ্ট হয় না?

চাটুজ্জে বললে, তা তো হবেই। কথা বললেই তো শক্তির অপচয় হয়।

—তাহলেই বোঝ? আমি যে-কথাগুলো বলি সেটা তো সোজা কথা নয়, যে ভাবলুম আর মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল। আমি অনেক ভেবেচিন্তে তবে কথা বলি, তা জানো?

চাটুজ্জে বললে, তারপর দত্তমশাই, তারপর?

মাধব দত্ত বললেন, হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল চাটুজ্জে, তোমাদের পাড়ায় সেদিন বলছিলে একজন মহিলার স্বামী মারা গেল—এখন কেমন অবস্থা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো আমি বলেছি আপনাকে। অবস্থা কী করে ভাল হবে?

মাধব দত্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বললেন, তা অবস্থা ভালো না হলে চলছে কী করে?

—আজ্ঞে চলছে না।

—চলছে না মানে?

চাটুজ্জে বললে, তার দুঃখের কথা আর বলবেন না স্যার, বড় কষ্টে চলছে—সে

অচল অবস্থাই বলতে পারেন।

—কত বয়েস?

—আজ্ঞে আঠারো। খুব সুন্দরীও বটে।

চমকে উঠলেন মাধব দত্ত। চমকে উঠলেন আবার রেগেও গেলেন। রেগে গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, তোমরা তো বড় আহাম্মক হে। একজন সুন্দরী আঠারো বছরের মহিলা অনাথ হলো, আর তোমরা কিনা চুপ করে কোলে হাত রেখে বসে আছো?

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে কী করব বলুন? আমাদের কি টাকা আছে না সময় আছে। তাকে সাহায্য করতে গেলে টাকার দরকার যে।

—তা টাকার যদি দরকার, আমি তো এখনও বেঁচে আছি, আমি তো মরিনি।

চাটুজ্জে চুক্-চুক্ করে উঠল। বললে, ছি-ছি, কী যে বলেন আপনি, আপনার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না—আপনি রাগ করবেন না স্যার।

—রাগ করবো না? তুমি বলছ কী! তোমায় খুন করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার এত রাগ হচ্ছে মনে।

চাটুজ্জে বললে, সে তো জানি, আপনাকে বলতেও ভয় হয়, আপনি একলা মানুষ। আপনি কত দিকে দেখবেন?

—কত দিকে দেখবো মানে? লোকে কষ্ট পাবে আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি তোমাদের মত?

বলে ঘন-ঘন ধোঁয়া টানতে লাগলেন। বললেন, তোমরা সব এক-একটা আহাম্মক, কেউ পরের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে না। যেন নিজে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। আরে আহাম্মক, বনের বাঘ-সিংহও তো নিজের খাবারটা জোগাড় করতে পারে, তাতে আর তোমার বাহাদুরিটা কী?

এরপর আর কারো কথা বলবার কিছু থাকে না। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ মাধব দত্ত বলে ওঠেন—তা হলে কি চুপ করে থাকলেই তোমাদের চলবে? চুপ করে থাকলেই সুন্দরী অনাথ বিধবা মেয়েটার সুরাহা হবে?

নন্দকিশোর বলে, আজ্ঞে, আপনার কষ্টের কথা ভেবেই চুপ করে আছি।

মাধব দত্ত রেগে যান। বলেন, এই তোমাদের বুদ্ধি? আমার কষ্টটাই বড় হলো? আর সেই যে রূপসী অনাথ বিধবা মেয়েটা নিরাশ্রয় হলো, একটা লোক নেই তাকে দেখবার, তার কষ্টটা বুঝি কিছু নয়? তোমরা গরু, না ভেড়া? তোমাদের ঘটে একটু বুদ্ধি নেই কেন?

তারপর একটু থেমে ডাকেন—আদালত, ও আদালত।

আদালত সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

মাধব দত্ত বলেন, চল, তৈরি হ', এই সব আহাম্মকদের জ্বালায় অস্থির।

আদালতের এসব জানা আছে। এ'রকম অস্থির হওয়ার ঘটনা রোজই ঘটে। আর আদালতের তৈরী হওয়া মানে হুসেন মিয়া আর রহিমের তৈরি হওয়া। অন্দর-মহলের ঠাকুর-ঝি'র তৈরি হওয়া। তখন লুচি ভাজা আরম্ভ হয়ে যাবে রান্না বাড়িতে, আলুর দম হবে, বেগুন ভাজা হবে। তারপর ডিম, মাংস, মাছ তো আছেই। আর তারপর আছে সোডার বোতল আর—

—[illegible]জ্জে।

—আজ্ঞে স্যার।

—দেখো তো, আদালত ওগুলো নিতে ভোলেনি তো।

চাটুজ্জে দেখবার আগেই আদালত তার ব্যবস্থা করে ফেলে। দেউড়িতে গাড়ি জুড়ো হয়, ঘোড়ার পিঠে লাগাম চড়ে। গাড়ির ছাদে খাবারের চ্যাঙারি ওঠে। আর আসল মাল থাকে আদালতের জিম্মায়। বোতল-টোতল নিয়ে সে তৈরী।

তখন মাধব দত্ত সাজ-গোজ করে বেরোবে। গায়ে মখমলের ফিনফিনে পাঞ্জাবী, গিলে করা হাতা। গলায় সোনার মফ্‌চেন, বুকপকেটে ঘড়ি—ঘড়ির চেন। পায়ে বো-আঁটা পাম্পশু আর হাতে কুকুর-মুখো পাকানো ছড়ি।

গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াবে রহিম বক্স। মাধব দত্ত ওঠবার সময়ে পাছে কোঁচানো-ধুতির কোঁচা আটকে যায়, তাই নন্দকিশোর তা ধরে ধরে সঙ্গে-সঙ্গে চলবে। আগে উঠবে মাধব দত্ত, তারপর নন্দকিশোর, তারপর চাটুজ্জে। মাধব দত্ত অনুমতি না দিলে গাড়ি ছাড়তে পারে না কচোয়ান হুসেন মিয়া। সে তখনও লাগাম ধরে তৈরী হয়ে আছে। মাধব দত্ত গাড়িতে উঠে যুৎ হয়ে বসে বললে, কী, সবাই উঠেছে তো ঠিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—চাটুজ্জে, তুমি উঠেছ? নন্দকিশোর?

নন্দকিশোর বললে, হ্যাঁ, এই তো আমি উঠেছি স্যার।

—ঠিক আছে। আর সীতাপতি? সীতাপতি কই? সীতাপতি আসেনি?

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে, সীতাপতির শরীরটা একটু ম্যাজ-ম্যাজ করছে।

মাধব দত্ত হো-হো করে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে বললেন, সীতাপতিকে মানুষ করতে পারলাম না চাটুজ্জে, সে চিরকাল অমানুষ রয়ে গেল হে।

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে যা বলেছেন।

মাধব দত্ত বললেন, সীতাপতি বড় বেরসিক হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।

নন্দকিশোর বললে, শুধু বেরসিক নয় স্যার, যাকে বলে বেরসিকের বেহদ্দ।

—চলো-চলো, আদালত, হুসেন মিয়াকে গাড়ি ছাড়তে বল্।

হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে হুসেন মিয়া চাবুক ঘোরালো আর মাধব দত্ত'র গাড়ি ফড়েপুকুর স্ট্রীট পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশে গেল।

*

এও আমি লিখেছি সেই গল্পে। তখনকার আমলে মাধব দত্ত আর পাঁচটা বড়লোকের মত কী-রকম জীবন যাপন করত, এইটে দেখানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অনর্জিত অর্থের অপচয়ের আনন্দে তখনকার সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষদের এই-ই ছিল দৈনন্দিন রুটিন।

কিন্তু এ-গল্প যে কখনও কারোর জীবনে সত্যি-ঘটনা হয়ে উঠবে, তা তখন ভাবতেই পারিনি। ভেবেছিলাম, সমাজ-বিবর্তনের চেহারাটা দেখিয়ে আজকালের সমাজের মানুষদের একটু সচেতন করে দেব।

নীতা বলেছিল, আপনি তো ওদিকে যান মাঝে-মাঝে?

বুঝতে পারলুম না। বললাম, কোন্ দিকে?

ওই আমাদের ফড়েপুকুরের স্ট্রীটের দিকে?

এখন আর যাওয়ার দরকার হয় না ওদিকে। আগে যেতাম। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় ওই পাড়ায় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল, ওই লাহা-বাড়ি, মল্লিক-বাড়ি, দত্ত-বাড়ি, শীল-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাড়ি যেতাম, নানা রকম কাহিনী শুনতাম।

নীতা বললে, মা বলেছে যদি আপনার সময় হয় তো যেদিন ইচ্ছে যাবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা কি ওই বাড়ির মেয়ে?

নীতা বললে, হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে বললে, সেকালের অনেক গল্প মা'র কাছে শুনেছি। মা'র

অনেক বয়েস হয়েছে তো, মা কেবল আমাদের বাড়ির সেকালের কথা শোনাতে চায়। আমরা শুনতে চাই না বলে মা'র মন খারাপ হয়ে যায়।

নীতা যা-ই বলুক, আসলে আমার গল্পটা ওই মাধব দত্ত'র বাড়ির সীতাপতিকে নিয়ে।

*

সীতাপতিবাবু। চাটুজ্জে মাঝে-মাঝে সীতাপতির কাছে যেত। আস্তাবল-বাড়ির ছোট ঘরখানার মধ্যে গিয়ে ডাকতো। বলতো, ও সীতাপতি, সীতাপতি।

সীতাপতি তখন তক্তপোষটার ওপর একটা আধ-ময়লা গামছা পরে হয়তো শুয়ে আছে। সীতাপতি উঠে পড়তো—কী চাটুজ্জে? কী খবর?

—তুমি যাবে না?

—কোথায়?

—আরে, আজকে যে খড়দা'য় যাচ্ছি আমরা।

—খড়দা'য় কোথায়?

—আরে, খড়দা'র গোঁসাই পাড়ায়। একটা ভাল খবর আছে। খুব ভাল জিনিস, মানে যাকে বলে জবরদস্ত!

সীতাপতি বলতো, তোমরা যাও ভাই, আমি যাবো না, শরীরটার তেমন যুৎ নেই।

—আরে তুমি দেখছি যৌবনে যোগী হয়ে যাচ্ছো! এই ভরা-যৌবনেই এমন বুড়িয়ে গেলে হে! চল্লিশ পেরোলে তখন কী করবে?

—আর ভাই, আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কর্তা যে তোমার কথা বলছিলেন। বলছিলেন সীতাপতিটা দিন-দিন বড় বেরসিক হয়ে যাচ্ছে। একেবারে বেরসিকের বেহদ্দ! আরে, ভগবান রাতগুলি তৈরী করেছিল ফুর্তি করার জন্যে, আর তুমি কিনা সেই ভগবানের দেওয়া রাতগুলো এই ঘরে ঘুমিয়ে কাবার করে দিলে?

দুঃখ কোরতো সীতাপতি। বলতো, আমার কথা বলো না ভাই, আমি একে... মানুষের বার হয়ে গেছি।

এরপর আর সময় নষ্ট করতো না চাটুজ্জে। সীতাপতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলাটাও সময় নষ্ট করা মনে হতো চাটুজ্জের।

অথচ এমন ছিল না আগে। সে বহুদিন আগেকার কথা। তখন ওই হাতীবাগানের মোড়ে ফোটোগ্রাফির দোকান করেছিল সীতাপতি। জোয়ান বয়েস তখন তার। সুন্দর লাল টুকটুকে ছেলেটা। ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো ছোটবেলা থেকে। ক্যামেরা দামী জিনিস। কেউ সহজে হাত দিতে দিত না। কিন্তু কারো কাছে ক্যামেরার সন্ধান পেলেই সে নেড়েচেড়ে দেখতো। ছবি তোলার সময় পেছন-পেছন ঘুরতো।

তারপর বড়ো হলে কাকা একদিন একটা দোকান করে দিলে।

সেই সময়েই মাধব দত্ত'র সঙ্গে তার পরিচয়। মাধব দত্ত একদিন বললেন, ওহে চাটুজ্জে, ভালো ছবি তুলতে পারে এমন কেউ আছে?

নন্দকিশোর বললে, আছে স্যার ডেকে আনবো?

—ডাকো তো একবার দেখি কেমন ছবি তুলতে পারে।

তা তখন ছবি তোলায় বেশ নাম হয়েছে সীতাপতির। তখন পর্দার যুগ। মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় না। রাস্তায় যদিও বেরোয় তো গাড়িতে করে।

তাও আবার ঘোড়ার-গাড়ির জানালা-খড়খড়ি সব বন্ধ করে। রাস্তায় যদি কেউ মেয়েমানুষ দেখতে পেলে তো হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ওপর। থিয়েটারে গেরস্থের মেয়েদের দোতলার ওপর বসবার আলাদা ব্যবস্থা। যাত্রার আসরে মেয়েদের দিকটা চিক্

দিয়ে ঢাকা। কিন্তু ফটোগ্রাফারের কাছে লজ্জার বালাই থাকলে তো চলবে না।

সুন্দরী-সুন্দরী গেরস্থ মেয়েদের কর্তারা বাড়িতে ডেকে পাঠাতো সীতাপতিকে। তাদের বাড়িতে মেয়েদের ছবি তুলতে হবে। একেবারে বাড়ির অন্দরমহলের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হতো। যে-বাড়িতে পুরুষ মাছির পর্যন্ত ভেতরে ঢোকা নিষেধ, সেখানেও সীতাপতির অবাধ গতি।

একেবারে মেয়েদের কাছা-কাছি, মুখো-মুখি, ঘেঁষা-ঘেঁষি। সুন্দরী বউ সব। বলতে গেলে সূর্যও কখনও তাদের মুখ দেখতে পায়নি। সেই সব মেয়ে-বউদের কাছাকাছি, মুখোমুখি, ঘেঁষাঘেষি হওয়া।

সীতাপতি বলতো, ফুর্তি যা করবার তা তখন সব করে নিয়েছি ভাই।

চাটুজ্জে, নন্দকিশোর জিজ্ঞেস করতো, কী রকম? কী রকম?

সীতাপতি বলতো, কারো গালে হাত দিতে ইচ্ছে হলে গালটা ধরে বাঁদিকে সরিয়ে দিয়ে বলতুম, একটু বাঁদিকে মুখটা ফেরান—আর একটু, আর একটু বাঁদিকে।

সীতাপতি আবার বলতো, ওসব তোমরা দেখ ভাই, আমার ওসব পর্ব শেষ।

তা যখন সীতাপতির বেশ নাম হয়েছে চারদিকে তখন একদিন চাটুজ্জে আর নন্দকিশোর গিয়ে হাজির হলো সীতাপতির দোকানে।

চাটুজ্জে বললে, ছবি তুলতে পারবেন আপনি?

—কার ছবি?

নন্দকিশোর বললে, আমাদের কর্তার ইচ্ছে যে তাঁর মেয়েমানুষের ছবি তুলে রাখেন।

—মেয়েমানুষদের? তার মানে?

—বলি, মাধব দত্ত'র নাম শুনেছেন? ফড়েপুকুরের বিখ্যাত দত্তবংশের মাধব দত্ত?

সীতাপতি বললে, খুব নাম শুনেছি।

—আজ্ঞে তাঁরই মেয়েমানুষদের।

—কোথায় গিয়ে ছবি তুলতে হবে?

চাটুজ্জে বললে, তা কি ঠিক আছে মশাই? আজ হয়তো খড়দা'য় যেতে হলো, কাল হয়তো আবার চন্দননগরে। কিম্বা আজ গেলেন চন্দননগরে, কাল হয়তো কলুটোলায়। কোনও ঠিকঠাক নেই। কর্তার মেজাজের যেমন ঠিক নেই, তেমনি কর্তার মেয়েমানুষেরও কোনও ঠিক নেই। মেজাজ বুঝে কাজ করতে পারবেন?

সীতাপতি বললে, তা পারবো না কেন? টাকা দিলে সবই পারবো। আমার তো এই-ই কাজ।

—এক একদিন রাত্তিরে কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবেন না। চাই কি, পর পর সাতদিন সারারাত মহেশের মেলায় বজরায় কাটিয়ে দিলেন।

সীতাপতি বললে, এ আর নতুন কথা কী! এ তো কলকাতায় হামেশাই করছি! টাকা দিলে না করতে কী!

চাটুজ্জে বললে, আরে, এখানে শুধু টাকা নয়, এখানে টাকার সঙ্গে পেসাদও পাবেন।

—পেসাদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পুজোর যেমন পেসাদ থাকে, পেসাদ না হলে তো পুজো হয় না। তেমনি এখানেও আবার পেসাদ আছে। পুজোটা তো ফাউ, পেসাদটাই হলো আসল!

ইঙ্গিতটা বুঝলো সীতাপতি। তখন বয়েস কম। পেসাদের লোভও তখন কম নেই। বললে—চলুন।

এসব সেই আদিকালের কথা। সেইখান থেকে এই গল্পের শুরু করেছিলাম। সেই-ই

প্রথম সীতাপতি এসেছিল এ বাড়িতে এই ফড়েপুকুর স্ট্রীটে। তখন থেকেই সেই গল্পের আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরে সে গল্প যে কেউ মনে রেখেছে, তা কল্পনা করতে পারিনি। বলতে গেলে আমার নিজেরও গল্পটা স্পষ্ট মনে নেই।

সেদিন আবার ওই পাড়ার দিকে গিয়েছিলাম। শ্যামবাজারের দিকের পাড়াগুলোর একটা মেজাজ আছে। সে মেজাজ দক্ষিণ কলকাতায় নেই। এদিকে কেমন যেন সব কিছু ছাড়া-ছাড়া। কারোর সঙ্গে কারোর মেলামেশি নেই। আর ওদিকটায় সবকিছু ঘেঁষাঘেষি, সবকিছুই মাখামাখি। ওই মাখামাখি আবহাওয়াটাই আমার ভাল লাগে।

ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কে একজন দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই?

বললাম, নীতা আছে?

ভেতর থেকে একজন মহিলার গলার আওয়াজ পেলাম—কে রে ভূতো?

আমি আমার নিজের পরিচয় দিলাম। পরিচয় দিতে এক বৃদ্ধা মহিলা থপাস-থপাস করতে করতে এগিয়ে এলেন।

বললেন, আসুন-আসুন। নীতা কোন্ স্টুডিওতে গেছে, এখুনি আসবে, ও আপনার কথা বলছিল। বলছিল, আপনি একদিন আসবেন বলেছেন—

বললাম, এদিকে এসেছিলাম, তাই মনে পড়লো আপনার কথা।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে গিয়ে একটা ঘরে বসলাম। মাধব দত্ত'র বাড়ীতে যে ধরনের ছবি টাঙানো থাকে, সেই ধরনের ছবিই সব টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। নীচু-নীচু চেয়ার। যেসব ছবি এদিকে ওদিকে ছোট-ছোট ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে তা সবই নীতার, নীতার মায়ের। নীতা যেসব থিয়েটারে-সিনেমায় ভূমিকায় নেমেছে, তারই সব স্যাম্পল।

ভদ্রমহিলা বললেন, নীতা তো সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্টুডিওর-স্টুডিওয় ঘুরে বেড়ায়। ওসব অভিনয় করে কী যে হবে, বুঝতে পারি না ওকে কত করে বলি বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে, তা ও রাজি হয় না।

বললাম, আজকাল তো অনেকেই দেখছি বিয়ে করতে রাজি নয়।

ভদ্রমহিলা বললেন, কোন্টা ভালো, আর কোনটি মন্দ তাও বুঝতে পারি না। সেকালও দেখলুম, আবার একালও দেখছি, কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হয় যেন সেই সেকালেই রয়েছে, কোনও কিছুই বদলায় নি। আপনি তো আপনার গল্পে সবই লিখে গেছেন।

বললাম, আমি যা কিছু লিখেছি সবই কিন্তু কল্পনা করে-করে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু আমি বলছি, আপনি যা লিখেছেন সবই সত্যি।

—সবই সত্যি?

ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ সব সত্যি, ওই মাধব দত্তও সত্যি, ওই চাটুজ্জে, নন্দকিশোর, ওরাও সত্যি, ওই হরনাথ এ্যাটর্নীও খাঁটি সত্যি। আর মাধব দত্ত ঠিক অমনি করেই প্রতি রাত্রে ফুর্তি করতে বেরোতেন, আর বাড়িতে তাঁর স্ত্রী শোবার ঘরে একলা রাত কাটাতেন। কোনোদিন তাঁর ঘুম হতো না।

আমি বললাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও সবই আমার কল্পনা—

—তা হবে, হয়তো আপনার কল্পনাই হবে। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে মিলে গেছে আমার দেখা জীবনের সঙ্গে। শুধু নামগুলো আপনি বদলে দিয়েছেন।

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, এ বাড়িটা সেই মাধব দত্তেরই, এই সেই নাচ-দরবার। এখন এ ঘরটাকে দেয়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করতে হয়েছে। অর্ধেকের বেশি বিক্রী করেও দিয়েছি।

আমি অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম। তিনি বলতে লাগলেন,

এরই উত্তরে সেই বাগানটা ছিল। আর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল সেই আস্তাবল-বাড়িটা. সেখানেই একটা ঝুপড়ি ঘরে থাকতো আমার মামা. যাকে আপনি নাম দিয়েছেন সীতাপতিবাবু।

—আপনার মামা? তার মানে আপনি সীতাপতিবাবুর বোনের মেয়ে? কিন্তু তার বোনের কথা তো আমি কিছু লিখি নি।

—আপনি লেখেনি নি. কিন্তু তাঁর এক বোন ছিল। আমি তারই মেয়ে!

কী বিচিত্র ব্যাপার সব জীবনে ঘটে! আমি এতদিন সংসারে বেঁচে থেকে এ বৈচিত্র্যের কোন কুল-কিনারা আজ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে পারি নি। বললাম. এ'রকম ঘটনা আমার জীবনে আর একবার ঘটেছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন. কী রকম?

বললাম. জানেন. অনেকদিন আগে 'সাহেব বিবি গোলাম' বলে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। সেটা বাংলা সিনেমা হয়েছিল। হিন্দী সিনেমাও হয়েছিল। হিন্দী সিনেমাওয়ালারা কলকাতায় এসে উত্তর-কলকাতার এক জমিদারবাড়ির ভেতর ছবিটার শ্যুটিং তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা শ্যুটিং তুলতে দেন নি।

—কেন?

—তাঁরা বললেন. ও গল্প আমাদের পরিবারকে নিয়ে লেখা. আমাদের বাড়ির ভেতরে ও ছবি তুলতে দেব না।

ভদ্রমহিলা বললেন. সে তো আমরাও জানি। আমরা বনমালী সরকার লেন খুঁজতে গিয়েছিলাম বৌবাজারে. ভেবেছিলাম বড়-বাড়িটার চেহারা দেখতে পাবো. কিন্তু এ তা নয়. এক একেবারে সত্যি। ওই সীতাপতিবাবুকে সত্যি-সত্যিই আপনার মাধব দত্ত খুন করেছিলেন।

বললাম. সত্যিই আজব ঘটনা। তাহ'লে অলৌকিক ঘটনা এখনও ঘটে দেখছি।

শেষটা অলৌকিকই বটে তো! এমন অলৌকিক ব্যাপার যে ঘটবে. তা কে-ই বা কল্পনা করতে পেরেছিল? মাধব দত্তও কল্পনা করতে পারেন নি. সীতাপতি বাবুও কল্পনা করতে পারে নি। আর মাধব দত্ত'র ছেলে?

যতদূর মনে পড়ে তার নাম দিয়েছিলাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবন দত্ত।

সেই ছেলেই শেষকালে কিনা ..

কিন্তু সে সব কথা পরে বলবো।

সীতাপতি প্রথম যখন এ বাড়িতে এলো. ফুটফুটে চেহারা। মাথায় বাবরি চুল. গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবী। পায়ে ল'পেটা জুতো। চেহারা দেখেই মাধব দত্ত মঞ্জুর করে ফেললেন। বললেন. কী রকম ছবি তোল. স্যাম্পল আছে কিছু?

স্যাম্পল দেখালে সীতাপতি। মাধব দত্ত'র পছন্দ হয়ে গেল। বললেন, আজ আমাদের সঙ্গে খড়দা'য় যেতে পারবে? সেখানে গিয়ে ছবি তুলতে হবে।

—পারব না কেন? আমার তো তাই-ই পেশা!

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত। দলের সঙ্গে সীতাপতি চললো খড়দা'য়। সেখানে গোঁসাই পাড়ায় গিয়ে রাত কাবার হয়ে গেল বাবুর সঙ্গে। খানাপিনা হলো. নাচ হলো. গান হলো। তারপর পরের দিন ফিরে এলো দলের সঙ্গে কলকাতা। আর সেই যে দলে এসে জুটলো. আর তখন থেকে আর ফিরে যাবার কথা মনে উঠলো না। সীতাপতিও রয়ে গেল চাটুজ্জের সঙ্গে।

প্রথম-প্রথম দোকানটা চালিয়েছিল সীতাপতি। তারপর কোন রকম ভাবে

চালানো—সে প্রায় না চালানোরই মত। কোনওদিন দোকান খোলে, কোনওদিন খোলে না। খদ্দেররা দোকানে এসে ফিরে যায়। কাজ দিলে সময়মত ছবি পাওয়া যায় না।

কাকা ছিল মাথার ওপর। একদিন কাকা বেদম বকুনি দিলে বললে, টাকা দিয়ে দোকান করিয়ে দিয়েছি তোমার ফুর্তি মারার জন্যে?

ব্যাস, সেই-ই শেষ। মাধব দত্ত বললে, কুছ্‌ পরোয়া নেই, আমার এখানে থাকো। আমার এখানে থাকবে, খাবে ফুর্তি করবে। ফুর্তি করলে এখানে কেউ বেজার হবে না। দম মেরে কেবল ছবি তুলে যাও।

এ সব সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সেই তখন থেকেই সুরু হয়েছিল মাধব দত্ত'র নৈশ বিহার। সেই নৈশ বিহারের সুরু থেকেই বলতে গেলে জুটে গিয়েছিল সীতাপতি।

তা সেই সময়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো। সেদিন মাধব দত্ত সদলবলে নৈহাটিতে যাচ্ছেন। মাধব দত্ত'র অষ্টম পক্ষের মেয়েমানুষ তখন নৈহাটিতে সংসার পেতেছে।

মাধব দত্ত'র হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাতটা নৈহাটিতে তাঁর অষ্টম পক্ষের সংসারে গিয়েই রাত কাটাবেন। তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল। আদালত আলি ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিলে। লুচিভাজা, মাংস, আলুর দম, সোডার বোতল আর লালপানি যাবে সঙ্গে। প্রতিদিনের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

গাড়িতে উঠে মাধব দত্ত গড়গড়ার নলটা মুখে দিলেন। বললেন, সব উঠেছে তো?

চাটুজ্জে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সব উঠেছে।

—নন্দকিশোর, তুমি উঠেছ?

নন্দকিশোর বললে, হ্যাঁ, এই তো উঠেছি স্যার।

—বোতলগুলো উঠেছে?

আদালত আলি ওপর থেকে বললে, জী, হ্যাঁ।

চাটুজ্জে বললে, সীতাপতি এলো না স্যার, সীতাপতির শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, সে শুয়ে আছে।

মাধব দত্ত বললেন, সীতাপতিটা দিন-দিন একেবারে বেরসিক হয়ে পড়েছে।

নন্দকিশোর বললে, হ্যাঁ স্যার, একেবারে যাকে বলে বেরসিক, বেরসিকের বেহদ্দ।

মাধব দত্ত বললেন, ঠিক আছে, এবার হুসেন মিয়াকে গাড়ি ছাড়তে বলো।

*

সেদিন সীতাপতি তার খুপড়ির মধ্যে একা-একা শুয়েছিল। হঠাৎ মনে হলো কে যে দরজায় টোকা দিলে। এত রাত্রে কে টোকা দেয় দরজায়? শুয়ে-শুয়েই সীতাপতি বললে, কে?

কোনও উত্তর নেই। সীতাপতি আবার একবার জিজ্ঞেস করলে কে? কে গা তুমি? কে দরজায় টোকা দিচ্ছ?

কেউই না। কেউই সাড়া দিলে না। সীতাপতি একবার উঠলো। দরজাটা খুলে বাইরে দাঁড়াল। আস্তাবল-বাড়িটা ফাঁকা। বাইরের বাগানের করবী গাছটার পাতায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সীতাপতি আশে-পাশে চারদিকে চেয়ে দেখলে। সমস্ত বারমহলটা খাঁ-খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সীতাপতি। তারপর আবার ঘরের তক্তপোষের ওপর উঠে শুয়ে পড়লো।

মনের ভুল। হয়তো মনের ভুল। তাকে কে ডাকতে যাবে? কার এমন মাথা ব্যাথা পড়েছে? তাকে মনে করে কেউ ডাকবে, এমন কেউ নেই তার। একটা মাত্র বোন আছে বরাহনগরে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। আর তারা তো পাগল নয়। পাগল

ছাড়া এত রাত্তিরে কে আর দরজায় টোকা দেবে?

পরের দিন সকাল-বেলা সীতাপতি ঘুম থেকে যথারীতি বিছানা ছেড়ে উঠলো। কলের কাছে চান করতে গিয়ে সরলার সঙ্গে দেখা। সরলা বালতি নিয়ে বার-বাড়ির দিকে আসছিল। সীতাপতিবাবু ডাকলে, সরলা, ওগো ও সরলা, শুনছো?

সরলা সীতাপতিবাবুকে দেখে ঘোমটা দিয়ে সরে গেল।

—বলি ও সরলা, শুনতে পাচ্ছো?

সীতাপতিবাবু তখন গামছা পরেছে, গায়ে তেল মেখেছে। চান করতে যাবে। বললে, হ্যাঁ-গা সরলা, কাল রাত্তিরে তুমি আমার ঘরে টোকা মেরেছিলে নাকি?

সরলা থমকে দাঁড়ালো। বললে, আমি? আমি তোমার ঘরে টোকা দিয়েছি? তুমি কী বলছো গো? আমি কখন টোকা মারতে গেলুম তোমার ঘরে?

সরলা অন্দরমহলের অনেককালের খাস-ঝি। অন্দরমহলের কাজকর্মই করে। কচিৎ-কদাচিৎ বার-বাড়িতে আসে।

সীতাপতিবাবু বললে, এই কাল রাত্তিরে কর্তাবাবু বেরিয়ে যাবার পর বনমালী আমায় ভেতরে খেতে ডাকতে এল। আমি রান্নাবাড়ির দাওয়ায় বসে খেয়ে নিয়ে বাইরে চলে এলুম। তারপর পেটটা খুব ভরে গিয়েছিল, তাই শুলুম আর ঘুমিয়ে পড়লুম। তখন আমার মনে হলো কে যেন আমার দরজায় টোকা মারলে।

সরলা বললে, না বাবু, আমার অমন ভীমরতি ধরে নি যে ভদ্দরলোকের ঘরের দরজায় আমি টোকা মেরে ঘুম ভাঙাবো। আমার অমন স্বভাবচরিত্তির নয়।

সীতাপতিবাবু বললে, না, আমি তাই ভাবছিলাম—যে সরলা তো ভালমানুষের মেয়ে, সরলাকে তো আমি চিনি, সরলা তো এমন নয়।

—তাহ'লে হয়তো সৌরভী-মাগীর কাণ্ড।

—তাই নাকি? তা হতে পারে। তাহলে তুমি নও, সৌরভীরই কাণ্ড।

সেদিন ওই পর্যন্তই। সরলা ভালমানুষের মত নিজের কাজে চলে গেল।

মাধব দত্ত'র অন্দর-মহলে একটা ঝি নয়, ঝি'য়ের যেন মেলা বসে গেছে। বহুকাল থেকে বহু যুগ থেকে পূর্ব-পুরুষের আমলের সব ঝি-রা এ বাড়িতে কাজ করে আসছে। এ-বাড়িতে এলে সে থেকেই যায়। তারপর তার নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে দেশের লোক, পাড়া-পড়শী সবাইকে এনে ঢোকায়। যখন তাদের ঝগড়া বাধে, তখন সে দেখবার মত।

বনমালী এসে ডাকতো সীতাপতিবাবুকে। বলতো, চলুন খাবার দেওয়া হয়েছে।

আগে বেশ সময় মত এসে খেতে ডাকতো বনমালী। আগে চাকর-ঝি-দারোয়ান বেশ খাতিরও করতো। সীতাপতিবাবু চান-টান করে তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে ডাকতে আসতো। বাড়ির ভেতরে গেলে ঝি-বউরাও গলার সুর নামাত। মোট-মাট একটু সমীহ করতো।

কিন্তু অনেকদিন থাকলে যা হয়, শেষে আর তারা তাকে মানতে চাইতো না। সীতাপতিবাবু আস্তাবলের-বাড়িতে তৈরি হয়ে বসে বসে শেষকালে হাই তুলতে আরম্ভ করতো। হুসেন মিয়া আর রহিম বক্স তখন রান্নাবান্না সেরে খেয়ে নিয়েছে।

সীতাপতিবাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতো।

বলতো, কী গো হুসেন তোমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা?

হুসেন মিয়া বলতো, হ্যাঁ বাবু, খাওয়া হয়েছে। আপনার?

—আমার কথা বোল না মিয়া সাহেব! আমাকে এখনও খেতে ডাকলে না। বনমালীর কাণ্ডটা একবার ভেবে দেখ দিকিনি। বুড়োমানুষ হতে চললাম, ক্ষিধে পায় না? তোমরাই বলো না, ক্ষিধে পায় না?

হুসেন মিয়া বলে, তা-তো পাবেই, ক্ষিধে তো পাবেই!

—অবেই বোঝ, তোমরা তো বেশ আরামেই আছো মিয়া সাহেব। তোমরা নিজের হাতে রান্না করছো, আর খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছ। আর এ যে কী বাড়ি হয়েছে, এদের একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে ক্ষিধের জ্বালায়, অথচ এদের কারো সেদিকে হুঁশ নেই।

হুসেন মিয়া রহিম বক্স, তারা কী আর বলবে? তারা চুপ করে থাকে। তারা তো এই সীতাপতিবাবুর এককালের খাতির দেখেছে। তারা তো দেখেছে বাড়ির ঝি-চাকর থেকে সুরু করে কর্তাবাবু পর্যন্ত কি তারিফ করেছেন এই সীতাপতিবাবুকে।

সেদিন হঠাৎ সৌরভী এল। বললে, হ্যাঁ বাবু, আপনি আমার নামে কী বলেছেন শুনি? আমি নাকি আপনার দরজায় রাত্তির বেলায় গিয়ে টোকা দিয়েছি?

—সে কি কথা?

সীতাপতিবাবু চমকে উঠলো। যেন ঘুণাক্ষরে এমন কথা বলতে পারে না সীতাপতিবাবু, এমনি মুখের ভাব।

বললে, তোমার নামে আমি বলেছি? ছি-ছি, এমন কথা কি আমি কখনও বলতে পারি সৌরভী? তুমি কত ভালো মেয়ে তা কি আমি জানি নে? কে বললে শুনি? কোন হারামজাদী বললে এ-কথা? সিন্ধুবালা বুঝি?

—সিন্ধুবালা কেন হবে? ওই সরলা হারামজাদী। সরলা হারামজাদী তো আমার ভালো দেখতে পারে না, আমার নামে গিয়ে লাগিয়েছে বউরাণীর কাছে।

বউরাণী? বউরাণীর কথা শুনেই সীতাপতিবাবু একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

বললে, বউরাণী শুনে কী বললে?

সৌরভী বললে, বউরাণী? বউরাণী তেমন কান-পাতলা মানুষ নয় গো, যে যে-যা বলবে তাই শুনবে।

সীতাপতির মুখে হাসি বেরোল।

জিজ্ঞেস করলে, তোমাদের বউরাণী খুব ভালোমানুষ, না গো সৌরভী?

—খুব ভালোমানুষ গো বাবু খুব ভালোমানুষ। বউরাণীর মত অমন ভালোমানুষ হয় না।

সীতাপতিবাবু বললে, আহা তোমার বউরাণীর বড় কষ্ট, না গো সৌরভী?

সৌরভী বললে, কেন, কিসের কষ্ট গা? কষ্ট হতে যাবে কেন?

সীতাপতিবাবু বললে, কর্তাবাবু তো বাড়িতে শোয় না, তাই বলছি।

—তা নাই বা শুলো, বউরাণীর গা-ভরা কত গয়না তা-তো জানেন না, অত সোনা-দানা পেলে সোয়ামীর দুঃখও ভোলা যায়!

সীতাপতিবাবু বলল, হাজার গয়না থাক্, তবু তো বাছা মেয়েমানুষের মন বলে কথা। মেয়েমানুষের মন কি গয়না পেলে ভরে গো?

সৌরভী বললে, খুব ভরে গো, খুব ভরে। গয়না এমন জিনিস, যে পেয়েছে সেই বোঝে, ও আপনি বুঝবেন না।

বলে হাসতে-হাসতে সৌরভী চলে গেল।

সেদিন সীতাপতিবাবু ভেতরে খেতে গেল। বনমালী এসে এক গেলাস জল দিয়ে চলে গেল। একপাল ঝি তার আগে ঝগড়া করছিল গলা চিরে।

মাধব দত্ত'র বাড়িতে ঝি-এর যত মেলা, তেমনি বেড়ালের পাল। এক-একটা বেড়ালের চেহারা যেন পশমের তৈরি। খাবার সময় পাতের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকে। একটু অসাবধান হলেই মাছের টুকরোটা ছোঁ মেরে তুলে নেবে তারা।

প্রথম-প্রথম সীতাপতিবাবু মেরেছিল একটা বিড়ালকে।

—বেরো, বেরো এখান থেকে, বেরো। বলে এক লাথি ছুঁড়েছিল। বেড়ালটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছিল একেবারে উঠানের নর্দমার ওপর।

হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এসেছিল সরলা।

বললে, ও কি করলেন বাবু, ও কি করলেন?

সীতাপতিবাবু বললে, দেখ না সরলা, দেখো না বেড়ালটার কাণ্ড, পাত থেকে আস্ত মাছটা তুলে নিয়ে গেল একেবারে।

সরলা বললে, ত বলে আপনি সুন্দরীকে লাথি মারবেন?

—সুন্দরী? সুন্দরী আবার কে?

সরলা বললে, ওর নাম তো সুন্দরী। সুন্দরী কত আদরের বেড়াল বউরাণীর, তাকে আপনি এমন হেনস্থা করলেন?

বলে তাড়াতাড়ি নর্দমার কাছে গিয়ে কোলে তুলে নিল সুন্দরীকে। আঁচল দিয়ে গায়ের কাদা মুছে নিলে।

বললে, আহা রে, কেন তুই অমন লোকের পাত থেকে মাছ তুলে খেতে গেলি? তোর কি মাছের অভাব রে?

বলে রান্নাঘরে গিয়ে বললে, ঠাকুর, সুন্দরীকে একটা ভাজা মাছ দাও তো গো, বড় মাছ খেতে চাইছে।

ঠাকুরও তেমনি। বউরাণীর আদরের বেড়ালের মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তো আপত্তি করবার সে কে?

সীতাপতিবাবু দেখলে ঠাকুর রান্নাঘরের ভেতর থেকে একটা বড় পোনা মাছের টুকরো এনে সরলার হাতে দিলে। সরলা সেখানা আদর করে করে খাওয়াতে লাগলো সুন্দরীকে।

তারপর সীতাপতিবাবুর দিকে চেয়ে বললে, মাছ কম পড়েছে তো একখানা ঠাকুরের কাছে চাইলেই পারতেন, তা কি-রকম ধারার মানুষ গা আপনি?

এর পর আর সীতাপতিবাবু সেদিন বেশি কথা বলেনি ও নিয়ে।

দরকার কি বাড়ির মেয়েদের সংগে কথা বলে! কথা বললেই কথা বাড়ে। তারপর যদি একদিন কথাটা মাধব দত্ত'র কানে যায় তো হয়তো তখন খাওয়া-পরা আশ্রয় সব-কিছুই উঠে যাবে এ-বাড়ি থেকে।

বেড়াল বলে বেড়াল! বেড়াল দু'চক্ষে দেখতে পারতো না সীতাপতিবাবু কোনোকালে। কিন্তু সেদিন থেকে তাও সহ্য করতে লাগলো।

সহ্য না করে উপায়ও ছিল না। যার খায়, তার বেড়ালকেও খাতির করতে হবে। দোকান উঠে গেছে। মামলা-মকদ্দমা হয়েছে জ্ঞাতিদের সঙ্গে। খাওয়া-পরার কোনও সংস্থানও তখন আর নেই সীতাপতির।

শুধু বনমালীকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সীতাপতি, হ্যাঁ গো বনমালী, তোমাদের বউরাণী কিছু বলে না?

—কাদের কী বলবে, দাদাবাবু?

—এই যে এতগুলো ঝি-ঝিউড়ি দিনরাত ঝগড়া করে, এদেরকে কিছু বলে না বউরাণী? সারাদিন তো কেবল চুলোচুলি করে এ-ওর সঙ্গে।

বনমালী বলতো, আজ্ঞে বউরাণীর আস্কারা পেয়েই তো এই রকম হয়েছে এদের। আগা-পাস্তালা চাবুক মারলে তবে যদি এরা শায়েস্তা হয়।

*

কিন্তু সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। বড় অভাবনীয় কাণ্ড।

মাধব দত্তবাবু সেদিনও সদলবলে বাইরে গেছে। সীতাপতি একা চিৎপাত হয়ে

তক্তপোষের ওপর শুয়ে ছিল, হঠাৎ ঝড়ের বেগে সৌরভী ঝি ঘরে ঢুকলো। বললে, হ্যাঁ গা বাবু, আমি নাকি কাল রাত্তিরে আপনার ঘরে ঢুকে আপনার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছি?

সীতাপতি তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলো।

বললে, সে কি? তুমি আমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছ? তুমি আর কারো বুক পেলে না, আমার বুকে সুড়সুড়ি দিতে যাবে কেন?

সৌরভীর তখন মার মূর্তি। বললে, হ্যাঁ, তাই তো মাগী বললে। কী ঘেন্নার কথা মা!

সীতাপতি বললে, সত্যিই তো ঘেন্নার কথা! আমারই তো লজ্জা করছে শুনে, ছি, ছি, ছি।

সৌরভী বললে, ভাতারখাকি সর্বোনেশে মাগী, আমার হয়ে নালিশ করে বউরাণীর কাছে। আমি পোতখালির নস্কর বাড়ির মেয়ে, পেটের দায়ে পড়ে পরের বাড়ি গতর খাটাতে এসেছি।

তারপর সীতাপতিবাবুর হাত ধরে টানতে লাগলো।

বললে, চলো তো বাবু, একবার চলো তো আমার সঙ্গে।

বলে সেই আস্তাবল-বাড়ি থেকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একেবারে অন্দর-মহলের দিকে নিয়ে চললো। সীতাপতি বললে, এ কি কাণ্ড দেখ দিকিনি।

অন্দরমহলে সদর-দেউড়ি পেরিয়ে একেবারে বারান্দায় গিয়ে পড়লো। তারপর সেখানেও পার নেই। একেবারে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কোথা দিয়ে ঢুকে, কোথা দিয়ে বেঁকে যে কোথায় নিয়ে চললো টানতে-টানতে তার ঠিক নেই। সীতাপতিবাবু বলে, ওগো সৌরভী, ছাড়ো-ছাড়ো....

কিন্তু সেদিকে সৌরভীর খেয়াল নেই। সে তখন এক-নাগাড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে সরলাকে। অথচ সরলাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

চলতে চলতে একজন বউ একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। সামনে সীতাপতিকে দেখেই টপ্ করে মুখে ঘোমটা টেনে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর সীতাপতি অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্যে শুধু সেই মুখখানা দেখতে পেলে। মানুষ যে এত সুন্দর হয়, তা যেন কল্পনা করা যায় না।

ফটোগ্রাফার সীতাপতি রায় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, তারপর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সব কিছু যেন তখন ভুলে গেল।

নীতার মা এতক্ষণ বসে বসে শুনছিলেন। বললেন, ঠিক যেমন লিখেছেন, তেমনি সব ঘটেছিল, একটুকু বাড়িয়ে লেখেননি আপনি।

আমি বললাম, এ-সমস্ত কিন্তু আমার কল্পনা।

ভদ্রমহিলা বললেন, হয়তো আপনার নিছক কল্পনা, কিন্তু আমার কাছে একেবারে খাঁটি সত্যি ঘটনা। আমি মা'র কাছ থেকে এ সমস্তই শুনেছি।

—আপনার মা এ-বাড়ির ব্যাপার জানলেন কী করে?

ভদ্রমহিলা বললেন, বহুদিন পরে তো ওই মাধব দত্ত তাঁর বাড়ি থেকে মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, মামা তখন সব গল্প বলেছিলেন মা'কে। মা ছিল বলেই শেষ জীবনে সীতাপতিবাবু আশ্রয় পেয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে।

বললাম, সে তো আমি লিখেইছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি যা লিখেছেন তার পরেও অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা আপনি জানেন না। সেইটি বলতেই তো আপনাকে ডেকেছি—

বললাম, বলুন না, শুনি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমার মায়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট ভাইয়ের জন্যে খুব কষ্ট হলো মা'র মনে। কাকা-জ্যাঠারা মামলা-মকর্দমা করে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এটা খুব কষ্টের।

একদিন সীতাপতিবাবু বসে আছে তার নিজের ঘরখানায়।

হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খুঁজে-খুঁজে এলেন দেখা করতে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে সীতাপতিবাবু বলে কেউ থাকেন?

দারোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে এল ভদ্রলোককে।

সীতাপতি চিনতে পারলে না। দিদির বিয়ের দিন শুধু একবার দেখেছিলেন ভগ্নীপতিকে। তারপর আর সময়ই পায়নি দেখা করবার।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার দিদি মনোরমার স্বামী।

—ও, আপনি আমার ভগ্নীপতি বলরাম মুখোপাধ্যায়?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে নিতে এসেছি। আপনার দিদিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

সীতাপতি বললে, কিন্তু আমার তো এখানে কোন অসুবিধে নেই।

—কিন্তু পরের বাড়িতে কেনই বা আপনি পড়ে থাকবেন? বরানগরে আমার নিজের বাড়ি। অনেক ঘর পড়ে রয়েছে। দরকার হলে আবার ফটোগ্রাফির দোকান করুন।

সীতাপতির একবার কী যেন মনে হলো। কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বললে, কিন্তু আমি তো এখানে ভালই আছি, এখানে তো আমার কোন অসুবিধেই নেই।

ভদ্রলোক বললেন, হাজার হলেও আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে সম্পর্ক, এদের সঙ্গে তো আপনার সে-সম্পর্ক নয়। হাজার হলেও এঁরা পর।

সীতাপতির তখন বড় অভিমান হয়েছিল নিজের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। তখন আর কারো সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

বললে, দিদিকে বলবেন তেমন দিন যদি কখনও আসে তো নিশ্চয়ই যাবো তার কাছে। দিদি ছাড়া তো সংসারে আমার আপনা বলতে কেউ নেই।

অগত্যা বলরামবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনার দিদিকে তা'হলে তাই-ই বলি গিয়ে?

সীতাপতি বললে, হ্যাঁ, দিদিকে গিয়ে বলবেন, দিদি আমার কথা যেন ভুলে যায়। দিদি যেন মনে করে আমি মারা গেছি।

কথাটা রূঢ় শোনাল বড়। বললে, বলবেন, আমি একবার যাবো দিদিকে দেখতে, একটু সময়ে করে নিয়ে যাবো।

ভদ্রলোক বললেন, তাহ'লে তো ভালোই হয়, আমার ঠিকানাটা তাহলে দিয়ে যাই আপনাকে।

বলে নিজের ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন, তাহ'লে যাবেন কিন্তু, আপনার দিদি খুব খুশি হবেন।

ভদ্রলোক চলে গেলন। কিন্তু সীতাপতিবাবু তখন ওই মাধব দত্ত'র বাড়িতে পুরোপুরি আটকে গেছেন। রোজ দুপুরবেলা চোব্য-চোষ্য আহার, দুপুরবেলা দিবানিদ্রা আর রাত্রে জাগরণ।

সীতাপতি নিজের ঘরের দরজাটা খুলে অন্দরমহলের রাস্তাটার দিকে চেয়ে বসে থাকে। অনেক রাত্রে সৌরভী একটা পান নিয়ে আসে।

সীতাপতি বলে, কি রে সৌরভী, যাবো? সব তৈরী?

সৌরভী বলে, হ্যাঁ সব তৈরী।

তারপর সেই অন্ধকারে টিপ-টিপ পায়ে সীতাপতির রুক্মিণী উদ্ধার পালা শুরু হয়। ওদিকে যখন মাধব দত্ত নৈহাটি, মাহেশ কিংবা খড়দা'য় গিয়ে ফুর্তিতে রাতগুলো জেগে কাটিয়ে দেয়, তখন তারই অন্দরমহলে সুরু হয় আর একজনের রাত্রি জাগরণ। মাধব দত্ত তখন তা টেরও পায় না।

অন্ধকার রাত্রে যখন ঘাসের বুকের মধ্যে অঙ্কুর গজায়, করবী গাছের ডালে ফুল ফোটে, তেমনি সীতাপতিও নতুন জীবন খুঁজে পায় মাধব দত্ত'র অন্দরমহলে, তারই শোবার ঘরের মধ্যে।

কিন্তু পরের দিন আসরে যখন সবাই গোল হয়ে বসে, তখন এক-একদিন সীতাপতিরও ডাক পড়ে। মাধব দত্ত বলেন, কি গো সীতাপতি, কেমন আছো?

সীতাপতি বলে, আজ্ঞে ভালো।

মাধব দত্ত বলেন, ছাই ভালো। ভালোটার তুমি কী বুঝলে শুনি? ভগবান রাত সৃষ্টি করেছে ফুর্তি করবার জন্যে, আর তুমি সেই রাতটা কিনা ঘুমিয়ে নষ্ট করছো? তোমার মত আহাম্মক তো আমি আমার জন্মে দেখি নি হে....

সীতাপতি সবিনয়ে মাথা নীচু করে থাকে।

মাধব দত্ত বলেন, ফুর্তি করে নাও হে, ফুর্তি করে নাও। যে ক'টা দিন যৌবন আছে সে-ক'টা দিন শুধু ফুর্তি করে নাও, কী বলো চাটুজ্জে, কালকে খড়দা'য় কেমন ফুর্তি হলো আমাদের, বলো তো সীতাপতিকে, বলো না। একটু শুনুক না সীতাপতি....

সীতাপতি মুখ নীচু করে সব অপমান সহ্য করে যেত।

নীতার মা বললেন, এ পর্যন্ত যা লিখেছেন সবই ঠিক আছে, কিন্তু তারপর যা লিখেছেন সেটাই মেলে নি।

বললাম, এর পরেই তো একদিন ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল সীতাপতি।

ভদ্রমহিলা বললেন, তা সেদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে মাঝপথ থেকে মাধব দত্ত গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল! আর খবর পেয়েই সীতাপতি বউরাণীর ঘর ছেড়ে চটিজোড়া সেখানে ফেলে রেখে চলে এলো, আর পরদিন কর্তা আসরে বসে সেই খুন।

মাধব দত্ত বললেন, জানো চাটুজ্জে, কাল শুতে গিয়ে কী দেখি জানো, দেখি আমার শোবার ঘরে সীতাপতির চটি-জোড়া।

চাটুজ্জে অবাক, নন্দকিশোরও অবাক, কিন্তু সীতাপতির মুখে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

—আচ্ছা সীতাপতি, বেড়ালে তোমার চটিজোড়া নিয়ে চলে গেল, আর তুমি কিছু জানতেও পারলে না? তোমার কী রকম ঘুম গো? শেষকালে দেখছি কোনদিন তোমাকেও বেড়ালে টেনে নিয়ে যাবে ঘর থেকে, তখনও বোধহয় নিজেও টের পাবে না।

কিন্তু মুশকিল হলো বৃন্দাবন হবার পর। মাধব দত্ত'র ছেলে। বৃন্দাবন দত্ত।

বৃন্দাবন হবার পর থেকেই মাধব দত্ত ছেলে বলতে অজ্ঞান। ছেলেকে নিয়েই আসরে বসে। ছেলের মুখে গড়গড়ার নল পুরে দেয়।

নীতার মা বললেন, ওইটেই ভুল হয়েছে আপনার।

বললাম, কেন, কিসের ভুল?

নীতার মা বললেন, আপনি দেখিয়েছেন, বৃন্দাবন সীতাপতিবাবুর ছেলে।

বললাম, আমি তো তাই-ই কল্পনা করে নিয়েছিলাম। তাই তো যখন বৃন্দাবনকে মজা করে তামাক খাওয়াতো মাধব দত্ত, তখন আপত্তি করতো সীতাপতি।

সীতাপতি বলতো, ওর মুখে গড়গড়ার নল দেবেন না কর্তাবাবু, ছোটবেলায় তামাক খাওয়া ভালো নয়।

মাধব দত্ত বলতেন, দেখছো, কেমন চালাক-চতুর হয়েছে আমার বেটা, এই বয়েসেই কেমন তামাক খেতে শিখেছে।

সীতাপতি আঁতকে উঠতো। বলতো, শরীর খারাপ হবে বৃন্দাবনের, তামাক খাওয়া ভাল নয় কর্তা।

মাধব দত্ত রেগে যেতেন। বলতেন, তামাক খাওয়া ভালো নয়? তুমি কী-সব যা-তা বলছ? তামাক তো আমিও খাই, আমি খারাপ হয়ে গিয়েছি? খবরদার আমার ছেলের ব্যাপারে তুমি আর কিছু বলতে এসো না.

নীতার মা বললেন, এখানটাও ঠিক লিখেছেন, কিন্তু ওই বৃন্দাবন তো সীতাপতির ছেলে নয়।

—সীতাপতির ছেলে নয়? তাহ'লে কি মাধব দত্ত'র ছেলে?

নীতার মা বললেন, না বাবা তাও নয়, তাও নয়. ওই বৃন্দাবন হলো বলরাম মুখুজ্জের ছেলে।

—বলরাম মুখুজ্জে? সীতাপতিবাবুর বোনের?

—হ্যাঁ, তবে শুনুন সবটা, বলে তিনি বাকিটা বলতে আরম্ভ করলেন।

*

মাধব দত্তে'র শেষ জীবনটা সত্যিই বড় কষ্টের। সারাজীবন পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়েছেন। সারাজীবন স্বাস্থ্যের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে গেছেন। রাতের পর রাত জেগেছেন। মোসায়েব-খোসামুদেরা সারাজীবন তাকে ঘিরে টাকা শুষে নিয়েছে। এ্যাটর্নী-উকিলরাও যা পেয়েছে, যেমনভাবে পেরেছে টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে। সমস্ত সম্পত্তি বেনামীতে কিনে নিয়েছে।

তখন সব গেছে মাধব দত্ত'র। গাড়ি গেছে, মোসায়েবরা গেছে, বাকি সম্পত্তিও গেছে। সেই হুসেন মিয়া, রহিম বক্স গেছে। চাটুজ্জে চলে গেছে, নন্দকিশোরও চলে গেছে। নৈহাটি, খড়দা, মাহেশ যেখানে যতকিছু ছিল, সবই শেষ হয়ে গেছে। শুধু ছিল সীতাপতিবাবু। সীতাপতি রায়। সীতাপতি রায় তখনও কোন রকমে টিঁকে ছিল আস্তাবল বাড়ির ঘরখানার মধ্যে। টিম-টিম করে টিঁকে ছিল তখনও।

এমন কি যে অন্দর-মহলের বউরাণী, সেও চলে গেছে একদিন। তাকে নিজে গিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছে মাধব দত্ত। শ্মশানে গিয়ে খুবই কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে মাধব দত্ত চোখে ফুলিয়ে ফেলেছে।

তখন একমাত্র ভরসা বৃন্দাবন. বৃন্দাবন দত্ত। মাধব দত্ত'র একমাত্র ছেলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু আসলে বৃন্দাবন মাধব দত্ত'র ছেলেই নয়।

বললাম, তার মানে?

ভদ্রমহিলা বললেন, মাধব দত্ত'র ছেলেই হয় নি মেয়ে হয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সে কী?

ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ, তাহ'লে শেষের সবটা শুনতে হবে, বলে তিনি শেষটা নিজেই বলতে লাগলেন। অত বড় বাড়ি, অত সম্পত্তি সব যখন গেছে তখন একমাত্র ভরসা ছিল বৃন্দাবন।

কিন্তু বৃন্দাবনও তখন মাধব দত্ত'র মত গোল্লায় গেছে। বৃন্দাবন বড় হয়ে ঠিক মাধব দত্ত'র মত মোসায়েব রাখলে! ঠিক মাধব দত্ত'র মতই মেয়েমানুষ পুষতে লাগলো! নৈহাটি, খড়দা, মাহেশ সব জায়গায় একটা করে সংসার পাতলে।

সীতাপতিবাবুর বড় কষ্ট হতে লাগলো। একদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতেই সীতাপতি ধমক দিলে খুব। সকলের সামনেই ধমক দিলে।

বললেন, এসব কী করছো বাবা, এসব করা কি ভালো? এসব ভালো নয়।

মাধব দত্তর কাছে খবরটা গেল। একদিন ডেকে পাঠালো মাধব দত্ত।

সীতাপতি কাঁপতে-কাঁপতে এসে হাজির। বললে, আমাকে ডেকেছেন দত্তমশাই ?

মাধব দত্ত বললে, তুমি বৃন্দাবনকে কী বলেছ ?

সীতাপতি বললে, আজকাল বৃন্দাবন বড় মদ খাচ্ছে, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে, তাই বলেছি। ওর ভালোর জন্যেই তো বলেছি।

ধমক দিয়ে উঠল মাধব দত্ত। বললে, তুমি ওর ভালো-মন্দ দেখবার কে ? আমি ওর বাপ, আমি বুঝবো ও ভালো করছে কি মন্দ করছে।

—আজ্ঞে, আপনার ছেলে হলেই বা, আমারও তো বয়েস হয়েছে, আমি তো ভালো-মন্দ বুঝতে পারি। এই বয়েসেই এত মদ খাওয়া কি ভালো ?

—থামো ! চিৎকার করে উঠলো মাধব দত্ত। বললে, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও, যাও বেরিয়ে, এখনি বেরিয়ে যাও।

আর সেইদিনই সীতাপতি দত্ত-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। এতদিনকার আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাবে সীতাপতি ? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে ? তখন অনেক বয়েস হয়ে গেছে তার। আর সামর্থ্য নেই শরীরে।

তবু চলে যেতে হবে। মাধব দত্ত'র হুকুম। মাধব দত্ত'র বাড়ি নিজের। সে-বাড়িতে থাকবার তখন তার আর কোনও অধিকার নেই। সেই সন্ধ্যেবেলা ফড়েপুকুর স্ট্রীটের মধ্যে এক-কাপড়ে সীতাপতি রায় আস্তে আস্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এক নিমেষে।

আমি বললাম, তারপর ?

ভদ্রমহিলা বললেন, তারপর আর কোথাও জায়গা না পেয়ে আমাদের বরানগরের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলে সীতাপতি।

একদিন বাইরে থেকে ডাক এল—দিদি, ও দিদি।

মা দৌড়ে গেল বাইরে। দেখে ছোট ভাই এসেছে। বললে—তুমি ?

সীতাপতি বললে, হ্যাঁ দিদি আমি।

আমি কাছে ছিলুম। আমাকে দেখেই সীতাপতিবাবু আদর করলে। কিন্তু স্বাস্থ্য তখন তার ভেঙে পড়েছে। একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর ভালো করে তখন আর দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। সেই যে শুয়ে পড়লো, আর তার ওঠবার ক্ষমতা ছিল না।

আমার মনে আছে মামা শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকতো সারাদিনে।

ওদিকে তখন বৃন্দাবনের বিয়ে। বৃন্দাবনের বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে।

সীতাপতির তখন শেষ অবস্থা একেবারে।

বললে, জানো দিদি, আজকে বৃন্দাবনের বিয়ে।

—তা হোক, তুমি এখন চুপ করে থাকো। ডাক্তার চপ করে শুয়ে থাকতে বলেছে।

সীতাপতি বলতো, কিন্তু দিদি, বৃন্দাবন তো কিছুই জানতে পারবে না। আমি মরে গেলে সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না।

—তা না বুঝুক, তুমি চুপ করে থাকো।

সীতাপতি তবু বলতো, জানো দিদি, মাধব দত্ত ওকে মদ খেতে বারণ করে না—অত মদ খাওয়া কি ভালো ? আমি ওই কথা বলেছিলুম বলেই আমার ওপর অত রাগ।

দিদি বলতো, তুমি ও-সব নিয়ে আর ভেবো না অত।

—ভাববো না ? সীতাপতির চোখ দু'টো ছল-ছল করে উঠতো।

—ভাববো না আমি ? তুমি বলছো কী ? বৃন্দাবন কি আমার পর ?

দিদি ধমক দিয়ে উঠতো। বলতো, আবার ওই সব কথা ?

সীতাপতি বলতো, কিন্তু সত্যি বলো না দিদি, বৃন্দাবন কি আমার পর ? আমি কেন বৃন্দাবনের এ সর্বনাশ করলুম ?

শুয়ে-শুয়ে বলতো আর কাঁদতো সীতাপতি। বলতো, আমার পাপের জন্যেই ও এই

রকম হলো, জানো দিদি। আমি নিজেও কষ্ট পেলুব, তোমাকেও কষ্ট দিলুম।

—আমার কষ্টের কথা থাক।

সীতাপতি বলতো, কিন্তু দিদি, আমি যে তোমার সর্বনাশ করেছি, তোমার যে কত বড় লোকসান করেছি! এ আমি কেন করতে গেলাম? আমার বোধহয় সম্পত্তির লোভ ছিল দিদি। সত্যি বলছি দিদি। সত্যি বলছি দিদি, আমার মনের ভেতরও বোধহয় সম্পত্তি পাবার লোভ ছিল, প্রতিশোধ নেবার লোভ ছিল।

বলতে-বলতে কখনও উত্তেজনায় সীতাপতি অজ্ঞান হয়ে পড়তো।

আর তখন ডাক্তার ডাকতে হতো। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে যেত।

*

কিন্তু ওদিকে মাধব দত্ত'র বাড়িতে তখন শেষবারের মত আবার নহবৎ বেজে উঠেছে। নিভে যাবার আগে শেষবারের দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত। মাধব দত্তের একমাত্র সন্তান বৃন্দাবনের বিয়ে।

আদালত তখনও আছে। মুখের কাছে গড়গড়াটা এগিয়ে ধরে! কিন্তু মাধব দত্ত'র আগেকার তেজ তখন আর নেই। কাজের খুঁত হলে আর তেমন রেগে ওঠেন না আগের মত। চারপাশে কেউ থাকে না। ফাঁকা নাচ দরবার। তবু সেই ভাল আছে। সেই সন্ধ্যেবেলা নাচ-দরবারে একবারের মত এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসাও আছে।

মাথায় টাক পড়ে গেছে। মুখের চামড়া ঝুলে কুঁচকে গেছে। সেই বাবরি চুল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাত কাঁপে, একটু অসাবধান হলেই গড়গড়ার নলটা হাত থেকে পড়ে যায়। একদিন তো পায়ের ঠেলা লেগে গড়গড়াটাই উল্টে গিয়েছিল। কলকের আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ফরাসটা। সেদিন যে মাধব দত্ত নিজে পুড়ে যায়নি তাও তার সৌভাগ্য বলতে হবে!

তা মাধব দত্ত নিজে পুড়ে গেলেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু কপালে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাবে। শেষকালে সেই অভাবনীয় কাণ্ডটাই ঘটলো।

ভুবন স্যাক্‌রা এসে হাজির হলো নাচ-দরবারে। এসে যথারীতি প্রণাম করে বসলো।

মাধব দত্ত জিজ্ঞেস করলে, হলো সব গয়না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তামশাই। সব তৈরি করে এনেছি।

—দেখি?

ভুবন স্যাক্‌রা একে-একে সব গয়না বার করে দেখাতে লাগলো।

দত্তবংশের একমাত্র কুলতিলকের বিয়ে। গয়না বড় কম নয়। হার, তাগা, বালা, চূড়, রুলি, কানপাশা, মাকড়ি, কত রকমের সব গয়না—গয়নার কি শেষ আছে? দত্তবাড়ির ছেলের বউ দেখে যেন কেউ না বলে যে মাধব দত্ত কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ঘরে তোলেনি।

—আর আপনি যে সেই গিন্নিমার কুড়ি ভরির নেকলেসটা দিয়েছিলেন, সেটার লকেটের ভেতরে এই কার যেন একটা ফটো ছিল, এইটে দিতে এলুম—এই নিন্।

মাধব দত্তর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়লো।

বললে, গিন্নিমার নেকলেসের লকেটের ভেতর থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি সেই নেকলেসটা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওটা ভেঙে বৌমার নতুন ডিজাইনের নেকলেস করে দিতে হবে।

—লকেটের ভেতরে ছবি ছিল কার?

—এই দেখুন না। কার ফোটো আমি তো বুঝতে পারছি না।

বলে লকেটটা এগিয়ে দিলে, ফোটোটাও দেখাল।

মাধব দত্ত সোজা হয়ে বসে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলো। এ-যে সীতাপতির ফোটোগ্রাফ। বউরাণীর নেকলেসের লকেটের ভেতরে সীতাপতির ছবি কেমন করে এল? কে দিয়েছে?

সঙ্গে-সঙ্গে যেন বাজ পড়লো মাথার ওপর। কিম্বা হয়তো বাজ পড়লেও অত চমকে উঠতো না কেউ। মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলো, সীতাপতিকে ডাকো।

আদালত আলি মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে, আজ্ঞে, সীতাপতিবাবু তো নেই।

মাধব দত্ত বললে, নেই তো যেখানে আছে, সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো।

কিন্তু তখন আর সীতাপতিকে কে খুঁজে পাবে? কোথায় আছে সীতাপতি, তা কে জানতে পারবে?

কিন্তু খোঁজ্ খোঁজ্ তাকে। খুঁজে বার করো। যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক্, জীবিত বা মৃত সীতাপতিকে খুঁজে বার করা চাই-ই চাই। কর্তামশাই-এর হুকুম।

মাধব দত্ত তখন পাগলের মত সারা বাড়িময় ঘুরছে। পাগলের মত বউরাণীর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে বেড়াচ্ছে, হুকুম দিলে-এই আদালত, নহবৎ থামাতে বল্।

বাড়ির মাথায় নহবতীরা বাজাতে আরম্ভ করেছিল বেহাগ। নিখাদে পৌঁছেই সুর হঠাৎ থেমে গেল। বৃন্দাবন দত্ত, যার বিয়ে, সে বাবার কাণ্ড দেখে অবাক। বাবার সামনে যেতেও সাহস পায় না। তবু জিজ্ঞেস করলে, কী হলো? কী হলো বাবা?

—হলো তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ড।

আত্মীয়স্বজন যারা বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে এসেছিল, তারাও হকচকিয়ে গেছে। এসব কী কাণ্ড! ভয়ে কেউ আর মাধব দত্ত'র মুখের সামনে আসতে সাহস পেলে না।

মাধব দত্ত চিৎকার করে বললে, আদালত, আমার বন্দুকটা দে...

বৃন্দাবন কী যেন বলতে গিয়েছিল মাধব দত্ত তাকে ধমক দিয়ে বললে, আমার কথার ওপর কথা? দে আদালত, আমার বন্দুকটা দে।

তারপর সেই বন্দুক নিয়ে মাধব দত্ত পাগলের মত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সবাই অস্থির। কাকে গুলি করে মারবে কে জানে?

হঠাৎ বনমালী এসে হাজির হলো হাঁপাতে-হাঁপাতে।

বললে, হুজুর সীতাপতিবাবুকে পাওয়া গেছে।

—ডেকে আন্ শয়তানকে, আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়।

বনমালি বললে, আজ্ঞে তিনি এখন মরো-মরো হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, উঠতে পারছেন না।

—কোথায়? কোন চুলোয় শুয়ে আছে?

—আজ্ঞে বরানগরে। তার ভগ্নিপতির বাড়ি। ভগ্নিপতি বলরাম মুখুজ্জের বাড়ি।

—তা চল্ সেখানে। আমি যাবো।

গাড়ি এলো। মাধব দত্ত তাতে উঠে বসলেন। ছাদের ওপর আদালত আলিও বসলো। বনমালী বসলো পাশে। মাধব দত্ত হুকুম দিলে, চালাও, জোরসে চালাও।

*

নীতার মা বললেন, তারপর তো আপনি সবই লিখে গেছেন।

ওদিকে সীতাপতিবাবুর তখন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার এসে বসে আছে। আর জ্ঞান নেই তখন। অঘোর অচৈতন্য অবস্থা। দিদি, ভগ্নিপতি বসে আছে। আমিও বসে আছি। হঠাৎ মাধব দত্ত এসে হাজির হলো।

বললাম, ও-ও তো আমি লিখেছি।

নীতার মা বললেন, আপনি লিখেছেন মাধব দত্ত বন্দুক তাগ্ করে গুলি করে মারলো সীতাপতিবাবুকে। কিন্তু সীতাপতিবাবু তার আগেই মারা গেছে। কিন্তু পরেরটা লিখলেন না কেন? তারপরেই তো আসল ঘটনা ঘটলো। সেই আসল ঘটনাটাই সেদিন বললেন নীতার মা।

বললেন, অনেক বছর ধরে এই খুনের মামলা চললো। মামলা চললো মাধব দত্ত আর বলরাম মুখুজ্জের মধ্যে। এককালের বনেদী বংশ, ফড়েপুকুরের দত্তবংশ। প্রথমে নীচের কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রীম কোর্ট। মোটকথা আমি অত সব কোর্টের ব্যাপার বুঝতুম না। কিন্তু জলের মত পয়সা খরচ হতো, তা মনে আছে।

শেষকালে একদিন আদালতের রায় বেরোল। রায় বেরোতে আমি মাধব দত্ত'র এ বাড়ী পেয়ে গেলাম। ততোদিনে মাধব দত্ত মারা গেছে। মাধব দত্ত'র ছেলে বৃন্দাবন দত্তও মারা গেছে। মাধব দত্তে'র বংশের তখন কেউই জীবিত নেই। বৃন্দাবন দত্ত একদিন আত্মহত্যা করে সব যন্ত্রণা জুড়োল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সব শুনে। বললাম, আপনি এ-সম্পত্তি পেলেন কেন?

নীতার মা বললেন আদালতের রায়ে প্রমাণ হলো বৃন্দাবন দত্ত আসলে মাধব দত্ত'র নিজের ছেলে নয়। মাধব দত্ত'র স্ত্রীর মেয়ে হয়েছিল। আর সেই দিনই সীতাপতিবাবুর দিদিরও একটা ছেলে হয়েছিল। সীতাপতিবাবু সেই ছেলেকে বদলি করে মাধব দত্তে'র আঁতুড় ঘরে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল দিদির কাছে।

—কেন?

—তখনকার দিনে মেয়েরা তো বাপের সম্পত্তি পেতো না, তাই।

জিজ্ঞেস করলাম, আর সেই মেয়ে?

নীতার মা বললেন, আমিই সেই মেয়ে বাবা! আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তাই এতদিন পরে এখনও বেঁচে আছি। আপনার গল্পটা পড়ে তাই নীতাকে বলেছিলাম আপনাকে ডাকতে। আগাগোড়াই ঠিক লিখলেন, শেষটায় আর কেন ভুল থাকে, তাই।

হঠাৎ বাইরে কড়া নড়ে উঠলো।

ভদ্রমহিলা বললেন, ওই বোধহয় নীতা এলো।

তারপর ডাকলেন, ওরে ভুতো, দরজা খুলে দে, দিদিমণি এসেছে।

*

দ্বিতীয়া

শংকরলাল! শংকরলালের কথা আমার শোনা। সেবার বোম্বাইয়ে গিয়ে সেই শংকরলালের সঙ্গে দেখা হলো। ভেবেছিলাম, শংকরলালকে নিয়ে উপন্যাস লিখবো। শংকরলালের ঘটনা নিয়ে তার সঙ্গে কিছু নতুন মালমশলা মিশিয়ে নিলে চলনসই একটা ছোটখাটো উপন্যাস হতে পারে।

অনেক দিন থেকে অনেক মাল-মশলাই তো কৃপণের মত সঞ্চয় করে আসছি। সঞ্চয়ের ভারে ভারি হয়ে উঠেছে জীবন। তার সঙ্গে জঞ্জালও যে কত জমেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। অথচ ভালো করেই জানি—একদিন এই সব কিছু সঞ্চয়ই এখানে ফেলে রেখে নিঃস্ব হয়ে দূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হবে। তখন কোথায় থাকবে এই মমতা, এই মোহ। কাজের মধ্যেই একদিন হঠাৎ ডাক আসবে, আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিষ্কাম হতে হবে। সেদিন কোনও পিছু টান সে সহ্য করবে না, কোনও পেছনের আকর্ষণ তাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে দেবে না।

তবু মাঝে-মাঝে সঞ্চয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তার যত্ন করি, তার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিই; তাকে সাজাই-গোছাই, আদর করি, আর আগেকার মত মনের আলমারির ভেতর তুলে রেখে দিই।

শংকরলাল আমার জীবনের ঠিক এমনই একটি সঞ্চয়।

এতদিন পরে সেই সঞ্চয়ের গায়ে হাত পড়লো হঠাৎ। তখন গুরু দত্ত বেঁচে। গুরু দত্ত সিনেমা জগতের লোক। নিজে অভিনয় করতো, ছবি তুলতো, আবার পরিচালনাও করতো। তা ছাড়া ভারতবর্ষের লোকের কাছে গুরু দত্ত'র নামটা অত্যন্ত চেনা।

আর আমি? আমি নিতান্তই অভাজন। গল্প লিখে খাই। কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না; কেউ প্রশংসা করে, কেউ করে না। প্রশংসার চেয়ে নিন্দেটাই কপালে জোটে বেশি। তবু ঘটনাচক্রে তখন দু'জনের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

গুরু দত্তই একদিন শংকরলালের কাছে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে সঙ্গে করে। গুরু দত্ত তখন যে ছবিটা করছিল, তার মিউজিক ডাইরেক্টর ছিল শংকরলাল।

মিউজিক ডাইরেক্টর যে কী বস্তু, তা তখন আমার জানা ছিল না। শুধু এইটুকু জানা ছিল যে, ছবিতে যে গান-বাজনা থাকে—সেগুলো তৈরী করে মিউজিক ডাইরেক্টর। কিন্তু শংকরলালের অফিসে গিয়ে দেখলাম সে একেবারে অন্য জিনিস। আমার কল্পনাতেও তা লেখা সম্ভব নয়।

বিরাট একটা বাড়ি। তার খোপে-খোপে অফিস। একটা বড় খোপ নিয়ে শংকরলাল তার মিউজিকের অফিস বানিয়েছে। সামনে একটা বসবার চেম্বার। সেখানে ভিজিটার্সদের জন্যে খান কয়েক চেয়ার আছে। তার পেছনে শংকরলালের নিজের আসল চেম্বার।

একটা বড় ঘর। ঘরের ভিতরে বিরাট একটা খাট। তার ওপর ডানলোপিলোর গদি। গদির ওপর মখমলে মোড়া ডানলোপিলোর তাকিয়া। আর তার ওপর দামী

হারমোনিয়াম রাখা। শংকরলাল ট্রাউজার-শার্ট পরে তখন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল। কয়েকটা খালি চায়ের কাপ এদিক-ওদিক ছড়ানো। বিছানার ওপর টেলিফোন।

যখন আমরা ঘরের ভেতর ঢুকলাম তখন শংকরলাল দরজার দিকে পেছন করে টেলিফোনে কথা বলছিল। গুরু দত্তকে দেখেই তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আইয়ে-আইয়ে গুরুজী'।

গুরু দত্তকে অনেকেই 'গুরুজী' বলে ডেকে খাতির করতো।

আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি শংকরলালকে। এই তো সেই। কলকাতার প্রভাংশু দত্ত তো এই শংকরলালের কথাই বলেছিল?

কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রভাংশু দত্ত বলেছিল, এই তো বোম্বাই যাচ্ছেন, দেখে আসবেন শংকরলালকে।

প্রভাংশু দত্ত'র মুখে শংকরলালের সমস্ত জীবনের কাহিনীটা শুনেছিলাম। প্রভাংশু দত্ত'র বাড়িতে শংকরলালের ফটোগ্রাফও দেখেছিলাম। তখনই দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল শংকরলালকে। ফরসা টকটক করছে গায়ের রং। ভারি হাসিখুশি মুখ, চঞ্চল স্বভাব।

গুরু দত্ত আলাপ করিয়ে দিলে, এই আমার বন্ধু বিমল মিত্র। এরই লেখা বই আমি ছবি করছি।

শংকরলাল আমার দিকে চাইলে। হাতটা বাড়িয়ে দিলে। আমিও হাত বাড়িয়ে তার হাতে হাত ঠেকালাম। বললাম, আপনার গানের আমি ভক্ত।

শংকরলাল হাসলো। ভারি মিষ্টি সে হাসি। বুঝলাম, এই হাসি দেখেই হয়ত ভুলেছিল ঊষা মৈত্র। কিন্তু শংকরলাল জানতেও পারলে না আমি আর তখন তাকে দেখছি না—ভাবছি ঊষা মৈত্রের কথা!

বেচারা মৈত্রমশাইয়ের অমন সাধের মেয়ে। কত সাধ ছিল তাঁর। কত আশা ছিল তাঁর! কত ইচ্ছে ছিল যে দিল্লীর কোন গেজেটেড অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। তা নয়, শংকরলাল, বোম্বাইয়ের এক মিউজিক ডাইরেক্টর।

আর তখন তো শংকরলালের নামও কেউ জানতো না। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও অফিসে একজন সামান্য আর্টিস্ট। মাস-মাইনের সেতার বাজায় অন্য ভোক্যাল আর্টিস্টের গানের সঙ্গে।

আশ্চর্য মানুষের মন। আর আরো আশ্চর্য মেয়েমানুষের মন।

গুরু বললেন, আমার ফিল্ম সংটা কদ্দুর হলো?

শংকরলাল বললে, হয়ে গেছে, শুনিয়ে।

বলে গান গাইতে শুরু করলে। হিন্দী গান, হিন্দী সুর, হিন্দী সিনেমার সুরের সঙ্গে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। তবু গান শুনতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ কার টেলিফোন এলো। শংকরলাল তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। অন্য কার ছবি। সেই ছবিরও মিউজিক ডাইরেক্টর শংকরলাল।

একটা টেলিফোন শেষ হলো তো আর একটা। এদিকে চা এল। গুরু একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে যখন কথা শেষ করলো, তখন তিন ঘণ্টা কেটে গেছে।

কিন্তু এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি যা কিছু দেখবার সব দেখে নিয়েছি। দেখলাম শংকরলাল সাকসেসফুল লোক। দেখলাম শংকরলালের চাহিদা আছে বোম্বাই-এর সিনেমা জগতে। দেখলাম, শংকরলাল ভারী লোক! অর্থাৎ প্রভাংশু দত্ত আমাকে যা-যা বলেছিল, তাই মিলে গেল। প্রভাংশু দত্ত আমাকে বলেছিল, ষাট টাকা মাইনে পেত তখন। রোগা-ঢ্যাঙা চেহারা। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আর্টিস্টদের গানের সঙ্গে মিউজিক বাজাতো। চোখ দু'টো ছিল টানা-টানা। দেখলাম সত্যিই চোখ দু'টো টানা-টানা।

আসবার সময় গুরু বললে, খুব নাম করেছে শংকরলাল এখন, এখন বোম্বাই-এর নামজাদা মিউজিক ডাইরেক্টরদের মধ্যে একজন।

তা-তো আমি জানিই। নইলে কি গুরু তার অফিসে যায়?

কিন্তু আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এই তো সেদিন। কত বছরই বা আগেকার কথা। হয়তো পনেরো বছর। তার আগে নয়। সেই কথাটা বলি।

শংকরলাল তখন ছোট।

প্রভাংশু দত্ত তখন এত বুড়ো হয়ে যায়নি। মাঝ-বয়েস। পেটের দায়ে দিল্লীর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে গিয়েছে চাকরি করতে। যে বাড়িতে থাকতো প্রভাংশু দত্ত—সেটা ফ্ল্যাট বাড়ি। ডিউটির পর সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় লুঙ্গি পরে হাওয়া খেত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

অবশ্য সেই দিল্লীও এখন আর তেমন নেই। মৈত্রমশাই-এরও আর তেমনি রাশভারি মেজাজ নেই। মৈত্রমশাই-এরও সেই বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে। আসলে মৈত্রমশাই-এরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু দিল্লীতে কে আর কার অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায়? মধ্যবিত্ত মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়, কিংবা মাস মাইনের চাকরি করে, তারা চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেক্রেটারিয়েট-পাড়ার কথা আলাদা। সেখানে তো মাইনে দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার। কিন্তু অন্য পাড়ায় তুমি কী খাচ্ছো, আমি তোমার রান্নাঘরে ঢুকে তা দেখতে যাচ্ছি না! তুমি থাকে তোমার বাড়িতে, আর আমি থাকবো আমার ঘরের চারটে দেয়ালের মধ্যে!

কিন্তু গরজ বড় বালাই। আর কার গরজ যে কখন বালাই হয়ে ওঠে, তা কেউ বলতে পারে না। এমনি গরজের দায়েই একদিন বোধহয় একটা মেয়ে এসে প্রভাংশু দত্তকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, আপনারা কি বাঙালী?

প্রভাংশু দত্ত একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত দিল্লীর সমাজে কেউ কাউকে ডেকে কথা বলে না। বিশেষ করে আবার মেয়ে।

মেয়ে মানে আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। মেয়েটার পরণে সালোয়ার পাঞ্জাবী। বেশ গোলগাল গড়ন। কিন্তু আলগা বাঁধন আছে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো। পাঞ্জাবী মেয়েদের স্টাইলে কথা বলে, সাজে। ওদের মতন চুলের মোটা বেণীটাও পিঠের দিকে লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। প্রভাংশু দত্ত বললে, তোমরা?

—আমরাও বাঙালী! আপনি বুঝি রেডিওতে চাকরি করেন?

প্রভাংশু দত্ত বললে, হ্যাঁ কেন?

মেয়েটি বললে, আমাকে একবার রেডিওতে গান গাইবার চান্স করে দিতে পারেন?

প্রভাংশু দত্ত একটু অবাক হয়ে গেল। এতদিন রেডিওতে চাকরি করছে প্রভাংশু দত্ত, বহু লোক রেডিওতে চান্স চেয়েছে। ছেলে কিংবা মেয়ে বহু। কিন্তু কোনও অচেনা মেয়ে কখনও সামনা-সামনি প্রথম আলাপে এমন করে যেচে প্রস্তাব করেনি।

প্রভাংশু দত্ত বললে, তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললে, ঊষা মৈত্র। আমাকে আপনি অনেকবার দেখেছেন।

—তোমাকে দেখেছি? কোথায়? কোথায় থাকো তোমরা?

মেয়েটি বললে, ওই তো, সামনের বাড়িটাই আমাদের।

সামনের বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে প্রভাংশু দত্ত। আগেও কত দিন ও-বাড়িটা দেখেছে। দেখে তো বড়লোকের বাড়ি বলেই মনে হয়েছে।

—বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

—আমার বাবা, মা আর আমি।

—তোমার বাবার নাম কী?

—শ্রী অম্বিকাভূষণ মৈত্র।

আশ্চর্য হবার মতই ব্যাপার বটে। এতদিন প্রভাংশু দত্ত দিল্লীতে আছে, কিন্তু বাড়ির সামনেই যে একজন বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন, তা জানা ছিল না।

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আপনি বাড়িতে লুঙ্গি পরে থাকেন, তাই ভেবেছিলাম হয়তো আপনি মুসলমান।

—কেন, মুসলমান হলে কথা বলতে না?

মেয়েটি বললে, না, তা নয়, আমার বাবা বুড়ো মানুষ তো, আমি কলেজে যাই, এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করি, বাবা খুব সাবধানে থাকতে বলেন। বাবার খুব ভয় করে।

বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে, এ সম্বন্ধে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।

—আপনি যেন বাবাকে এসব কথা বলবেন না।

—কী কথা?

ঊষা মৈত্র বললে, এই যে-যে কথা আপনাকে বললাম। বাবা সত্যিই মুসলমান-টান পছন্দ করেন না, সেকেলে মানুষ কিনা। আমার বাবা আমাকে কারোর সঙ্গেই মিশতে দিতে চান না। কিন্তু আমি কলেজে পড়ি তো, তাই কার সঙ্গে মেলামেশা করছি, উনি তা দেখতে পান না।

প্রভাংশু দত্ত'র কেমন যেন সন্দেহ হলো। বাবার কাছে লুকিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশাটা প্রভাংশু দত্ত'রও পছন্দ নয়। প্রভাংশু দত্ত জিজ্ঞেস করলে, তুমি যে গান-বাজনার চর্চা করো, তা তোমার বাবা-মা জানেন তো?

—তা জানেন। বাবা-মা তো গান-বাজনার ভক্ত।

—তোমাকে শেখায় কে?

—শেখায় একজন। তার তেমন নাম-টাম নেই। কারো সঙ্গে জানাশোনাও নেই তার।

—বরং সেই ভদ্রলোককেই আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

ঊষা মৈত্র যেন এতক্ষণে খুশি হলো। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করাটা যেন তার মনঃপুত নয়। বললে —তাহ'লে কবে তাকে পাঠাবো আপনার কাছে?

—কাল সকালে পাঠিয়ে দিও, অফিস যাবার আগে।

ঊষা মৈত্র একটু ভেবে নিয়ে বললে, তারও তো আবার অফিস আছে কি না। সেও অফিসে চাকরি করে।

—কোন্ অফিসে?

—সেক্রেটারিয়েটে। সন্ধ্যাবেলা হলে সুবিধে হয়। অফিস থেকে ফেরবার পর।

—তাই-ই ভালো। আমি অফিস থেকে ফিরি সাড়ে সাতটার পর। তার পরেই আসতে বলে দিও।

প্রভাংশু দত্ত'র তখন সংসার হয়নি। সুতরাং বাড়িতে একলাই কাটায় সারাক্ষণ। অফিস থেকে ফিরে সোজা বাড়িতেই আসে। সুতরাং রাত্রে কেউ বাড়িতে এলে অসুবিধে নেই। আর রেডিও অফিস মানে তো আর সাধারণ অফিসের মত নয়। লেখাপড়ার চেয়ে গান-বাজনা-হাসি-গল্প-অভিনয়ই সেখানে বেশি হয়। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেলেই নানা মজার খোরাক মেলে। আর শুধু শুকনো পুরুষের চেহারা দেখেও কাটাতে হবে না। প্রজাপতির মত সেজেগুজে মেয়েরাও বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যার রূপ আছে সেও সাজে, আবার যার রূপ নেই, সে আবার বেশি সাজে। সুতরাং অফিসে থেকে বেরিয়ে বাড়িতে আড্ডার দরকার হয় না।

তা সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বাইরে কে ডাকল। ছেলের গলা।

—কে?

দরজা খুলে প্রভাংশু দত্ত চিনতে পারলেন না।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি? কাকে চাই?

ছেলেটি বললে, প্রভাংশু দত্ত আছেন?

—হ্যাঁ আমিই।

ছেলেটি লাজুক খুব। কথা বলতে যেন তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বয়েস বেশি নয়। খুব জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রোগা-রোগা।

—ও, উষা মৈত্রকে আপনিই কি গান শেখান?

—হ্যাঁ।

ছেলেটা যেন আরও লজ্জায় পড়লো। বললে, গান ঠিক নয়, সেতারটা ভালো করে শেখাই।

আমার তক্তপোষের ওপর ছেলেটিকে বসতে বললাম। ছেলেটি জুতো জোড়ার ফিতে খুলে বাইরে রেখে খালি পায়ে ঢুকলো ভেতরে। তারপর তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?

ছেলেটি বললে, আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলবেন না, আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত।

বললাম, ঠিক আছে তোমার নামটা কী?

বললে, সুনির্মল রায়।

—দিল্লীতে কী ভাবে এসে পড়লে?

সুনির্মল বললে, আমার বাবা এখানে চাকরি করতেন। তিনি অফিসারকে বলে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বললাম, তুমি গান-বাজনা শিখলে কী করে?

সুনির্মল বললে, শুনে-শুনে।

—তা উষা মৈত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কী করে?

সুনির্মল বললে, আমার সঙ্গে মৈত্রমশাই-এর জানা-শোনা ছিল। আমার বাবা মারা যাবার পর মৈত্রমশাই আমাকে ডেকে উষাকে গান শেখাতে বলেন।

—কত মাইনে দেন?

মাইনের কথা শুনে সুনির্মল যেন লজ্জায় পড়লো। যেন গান শিখিয়ে মাইনে নেওয়াটা অপরাধ।

বললে, মাইনে কি সকলের কাছে নেওয়া যায়?

বললাম, বাঃ, তুমি গান-বাজনা শেখাবে, আর মাইনে নেবে না?

—আর যেখানেই নিই, উষার কাছে থেকে মাইনে নিতে পারি না।

—কেন?

—বাবার যে বন্ধু।

তা ভাল কথা। সুনির্মল সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে। মনে হলো মাইনের কথা ওঠাতে ওর ভালো লাগেনি। বললে, ও-কথা বরং থাক।

বললাম, কেন, অত লজ্জা কেন তোমার? ওদের বাড়িতে আসবার জন্যে তোমার বাস ভাড়াও তো পড়ে।

সুনির্মল বলল, হ্যাঁ, তা-তো পড়েই—আসা যাওয়ায় প্রায় এক টাকার কাছাকাছি।

—তাহ'লে?

—আপনি ও-কথা আর তুলবেন না! আপনি অন্য কথা বলুন।

বুঝলাম, ও-প্রসঙ্গ কিছুতেই সুনির্মল আর তুলতে দেবে না।

তারপর বললে, ওর গলাটা খুব ভালো, আমি যতটা সম্ভব ওকে ভাল করে গান শিখিয়েছি। কিন্তু ভাল গান গাইলেই তো হয় না। কারো সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে রেডিওতে চান্স পাওয়া শক্ত।

—আর কোথাও চেষ্টা করেছ?

—করেছি। একদিন আপনাদের রেডিও অফিসে গিয়েছিলাম।

—কী বলেছে ওরা?

—ওরা বলেছিল অডিশান্‌ দিতে।

—তারপর?

সুনির্মল বললে, হ্যাঁ, কিন্তু হয়নি।

—হয়নি মানে?

—একদিন জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম উষার গান কেমন লাগলো। ওরা বলেছে আর কিছুদিন তালিম দিতে।

বুঝলাম সমস্ত ব্যাপারটা।

সুনির্মল বললে, অথচ দেখুন, যারা রেডিওতে চান্স পায়, তাদের থেকে অনেক ভাল গান গায় উষা। একটা মালকোষ রাগের ঠুংরি তুলিয়ে দিয়েছিলাম ওর গলায়। আমি খুব খেটেছি ওই গান তোলাতে। শুধু কারো সঙ্গে জানাশোনা নেই বলেই হয়নি।

সুনির্মল যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছে ততক্ষণ লক্ষ্য করেছি আমার সঙ্গে কথা বলতে সে যেন লজ্জায় মারা যাচ্ছে। নেহাৎ উষা মৈত্রের কথা না বললে নয়, তাই বলা। উষার যাতে ভাল হয়, যাতে নাম হয়, উষার গানের যাতে আদর হয়, তাই-ই তার একমাত্র চিন্তা।

সুনির্মল বললে, আমি তো স্টেশন ডাইরেক্টরের কাছে যাইনি, যে বলেছে উষার গান রেডিওতে করিয়ে দিতে পারে, তাকেই ধরেছি গিয়ে!

—কাকে-কাকে ধরেছো?

সুনির্মল বললে, সকলের নাম তো জানি না। আর তা ছাড়া কাউকেই তো আমি চিনি না। শেষকালে বুঝতে পারলাম জানাশোনা না থাকলে কিছু হয় না ওখানে।

তারপর আমার দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে রইল।

বললে, এবার আপনি যদি কিছু করি দিতে পারেন।

বললাম, তুমি যাও, আমি চেষ্টা করবো করতে।

—তার আগে একদিন উষার গান শোনবার সময় আপনার হবে না?

—বেশ শুনবো।

—কবে শুনবেন বলুন। আমি তাহ'লে সেদিন থাকবো। মৈত্রমশাইকে বলে রাখবো, উষাকেও বলে রাখবো, ও-ও তৈরী হয়ে থাকবে।

সুনির্মল আস্তে-আস্তে উঠলো। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে জুতো পায়ে দিলে, জুতোর ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে, তাহ'লে আমি আসি। শনিবার আপনাকে আমি নিজে এসে তাহ'লে নিয়ে যাবো।

বললাম, তোমাকে এসে নিয়ে যেতে হবে কেন। সামনেই তো বাড়ি, আমি চিনে যেতে পারবো।

—না, তবু আমি আসবো। শনিবার, ভুলে যাবেন না যেন!

বলে সুনির্মল নমস্কার করে চলে গেল।

প্রভাংশু দত্ত বললে, যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হলো, সুনির্মল ছেলেটা ভাল। সচ্চরিত্র ছেলে-মেয়ে পাওয়াই তো আজকাল শক্ত। তারপর দিল্লীর এই সমাজে।

শনিবার অফিস থেকে সকাল-সকাল ফিরে এসেই দেখি সুনির্মল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, তুমি এত সকাল সকাল এসেছো যে? এখন ক'টা বেজেছে?

সুনির্মল বললে, অফিস থেকে বেরিয়েই একটা বাস পেয়ে গেলাম কি না, তাই আর দেরি হয়নি। আমি বেশিক্ষণ আসিনি, এই মিনিট পনেরো হবে বড় জোর।

বললাম, এসো, আমার ঘরে একটু বসো, জামা-কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিই।

সুনির্মল আমার বাইরের ঘরে বসে রইল। আমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে এলাম। আমাকে দেখে সুনির্মল বললে, এদিকে আবার একটা মুশকিল হয়েছে, কাল থেকে আবার উষার শরীরটা খারাপ।

—কেন, কী হলো? জ্বর নাকি?

—না জ্বর-টর নেই, বোধহয় দই খেয়েছিল।

—দই? দই খেলে কী হয়েছে? দই বুঝি খায় না? দই বুঝি সহ্য হয় না?

সুনির্মল বললে, না, দই—দই খাবে না কেন? দই তো ভালো জিনিষ। আমি বলে রেখেছিলাম গলাটার যত্ন নিতে, সকালে রাত্রে নুন জল দিয়ে গার্গেল করতে বলেছিলাম, সেটা করেছে। কিন্তু কোথা থেকে দই খেয়ে ফেললে, কে যে দই খাবার মতলব দিলে কে জানে! আমি অত করে বলা সত্ত্বেও কথাটা শুনলে না, কলেজে গিয়েছিল যেমন রোজ যায়, সেখানে পাঞ্জাবী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দহি-বড়া খেয়েছে।

সুনির্মল আবার বললে, দু'দিন পরে খেলে কী ক্ষতি হতো? দহি-বড়া খেলে-খেলে, কিন্তু ঠিক কালকেই না খেলে চলতো না?

বললাম, তাতে কী হয়েছে, গলাটা ধরে গেছে বুঝি?

সুনির্মল বললে, হ্যাঁ, আপনি আজকে গান শুনবেন কথা আছে, আর আজকেই কিনা গলাটা ধরিয়ে ফেললে।

বললাম, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না, আজকে তো আর ওর অডিশান নয়, আজকে গলা খারাপ হলে ক্ষতি কী?

আমার কথাতে কিন্তু সুনির্মল সান্ত্বনা পেলে না। তবুও যেন তার মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগলো।

মৈত্রমশাই লোকটি ভালো। দেখলাম মোটাসোটা মানুষটি। সেকালের মানুষ। এককালে পূর্বপুরুষ দিল্লীতে বড় চাকরি করে সম্পত্তি করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি এখন তারই সদ্ব্যবহার করছেন। বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম। আমি তো একলাই থাকি, মাঝে-মাঝে সময় পেলে আসবেন—

তারপর একটু থেমে বললেন, একটা বড় মুশকিল হয়ে গেছে, সুনির্মল আপনাকে বলেছে নিশ্চয়ই।

বললাম, দহি-বড়া খাওয়ার ব্যাপারটা তো? ওতে কিছু অসুবিধে হবে না।

উষা মৈত্র কিন্তু বিশেষ তার জন্যে সঙ্কুচিত নয় বলে মনে হলো। সালোয়ার পাঞ্জাবী ছেড়ে সে বেশ একটা শাড়ি পরেছে সেদিন। বেশ চটপটে ভাব। লজ্জা-কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ কিছুই নেই মুখে। বললে, কোন্ গান শুনবেন বলুন, খেয়াল না ঠুংরি?

সুনির্মল বললে, ধ্রুপদটাও জানে, যদি শুনতে চান তো তার ব্যবস্থাও করতে পারি। পাখোয়াজও আছে এখানে।

প্রভাংশু দত্ত ধ্রুপদও বোঝে না, খেয়ালও বোঝে না। মোট-মাট এক কথায় গানের কিছুই বোঝে না। তার কাছে ভালো লাগাটাই গানের একমাত্র মাপকাঠি।

সুনির্মল উষার দিকে চেয়ে বললে, তাহ'লে সেই মালকোষের খেয়ালটা গাও।

উষা বললে, ধ্যেৎ পরজ কেমন?

বাপ মৈত্রমশাই বললেন, ও সবই শিখেছে, জানেন দত্তমশাই, কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, মায় ভাটিয়ালি পর্যন্ত শেখানো হয়েছে ওকে। কোনও রাগ বাদ দেয়নি সুনির্মল।

দরজার আড়ালে মৈত্রমশাইয়ের গৃহিণী ছিলেন মনে হলো। কারণ পদটা একটু অসাবধানতায় নড়ছিল। একবার যেন ভেতর থেকে কী ইঙ্গিত এলো, আর সুনির্মল টপ

করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে আবার বাইরে এলো। বাইরে এসে বললে, কাকিমা বলছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতই গাইতে।

মৈত্রমশাই আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাইলেন।

আমি বললাম, তা রবীন্দ্র-সঙ্গীতই হোক না, ক্ষতি কী।

গান আরম্ভ করার আগে সুনির্মল ঊষার দিকে দু'টো লবঙ্গ এগিয়ে দিলে।

বললে, এগুলো চিবোতে-চিবোতে গাও।

মৈত্রমশাই রেগে গেলেন। বললেন, না-না, এখন চিবোলে কী হবে? জিভে ঝাল লাগলে কখনও গাইতে পারে কেউ? খুকু, লবঙ্গ এখন খাসনে।

ভেতর থেকে কী যেন ইঙ্গিত এলো। সুনির্মল আবার ভেতরে চলে গেল।

ঊষা তখন মুখ থেকে লবঙ্গ ফেলে দিয়েছে।

মৈত্রমশাই বললেন, হ্যাঁ, এইবার গাও, সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা গাও তো—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, জানেন দত্তমশাই, আপনাদের রবিঠাকুর গান লিখতে পারতেন বেশ। কথাগুলো ভালো করে শুনুন, বেশ মনে দাগ লাগে মশাই।

ঊষা মৈত্র গান আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে সুনির্মল এসে বললে, কাকিমা বলছিলেন লবঙ্গ চিবোতে-চিবোতে গান গাওয়াই ভালো। মৈত্রমশাই একটু যেন দমে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, তা হলে লবঙ্গ চিবোতে-চিবোতেই গাও মা। তোমার মা যখন বলছেন।

—তাই নাকি—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, জানেন খুকুর গর্ভধারিণীর বড় ইচ্ছে যে রেডিওতে খুকুর গান শোনেন। নইলে আমি মশাই মেয়েদের বাইরে মেলা-মেশাটা বিশেষ পছন্দ করি না।

সুনির্মল তখন তবলা নিয়ে তৈরী। তবলাটা বোধহয় আগে থেকেই সুর মিলিয়ে বাঁধা ছিল। আমি গান শুনতে লাগলাম। আর সবাই মিলে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। সুনির্মলেরই যেন বেশি লজ্জা। এর আগে সুনির্মলই এই যজ্ঞের যেন হোতা ছিল। সে যেন এই ঘটনায় আমার সামনে বড়-ছোট হয়ে গেল।

কিন্তু আমিও কোন দিকে চোখ না দিয়ে আপন মনে গান শুনতে লাগলাম।

সেদিন সেই পর্যন্ত। একটা স্তোত্র-বাক্য দিয়ে আমি কোনও রকমে বাড়িতে চলে এসেছিলাম। মনে আছে, আমার আসবার সময় মৈত্রমশাই এমনিতে ছাড়েননি। সিঙাড়া আর চা খাইয়ে দিয়েছিলেন জোর জবরদস্তি করে। শেষকালে আসার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন লাগলো খুকুর গান?

বললাম, ভালোই-তো।

তারপর মৈত্রমশাই আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাদের রেডিওতে চলবে তো খুকুর গান?

বললাম, আমি চেষ্টা করে দেখি! আপনাকে জানাবো।

এই পর্যন্ত বলেই সেদিন রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর থেকেই আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই দেখি সুনির্মল আমার ঘরে বসে আছে। আবার রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেও দেখি সুনির্মল বসে আছে।

আমাকে দেখেই মুখ কাঁচু-মাচু করে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়াতো।

বলতো, কেমন আছেন?

বলতাম, না ভাই, কিছু ব্যবস্থা হয়নি এখনও।

কথাটা শুনে কিছু বলতো না সে। আস্তে-আস্তে মুখ নীচু করে চলে যেত, কিন্তু তার পরদিনই আবার আসতো, এসে চুপ করে বসে থাকতো।

সেই আগের দিনের মত জিজ্ঞেস করতো, কেমন আছেন?

শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। যে রকম গান শুনেছি মেয়েটার, সেরকম গান জানাশোনা না থাকলে ব্রডকাস্ট করানো শক্ত।

কিন্তু হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে আমাদের বন্ধু ভট্টাচার্যি এসেছিল মিউজিক সেকশানে এ্যাকটিং করতে। দিল্লী-রেডিওর পার্মানেণ্ট প্রোগ্রাম এক্জিকিউটিভ ছিল ভার্মা। সে ছুটিতে চলে যেতে তার জায়গায় ভট্টাচার্যি এসেছিল।

একদিন ভট্টাচার্যিকে আমার আস্থাটার কথা বললাম।

সব শুনে ভট্টাচার্যি বললে, মেয়েটা দেখতে কেমন?

বললাম, দেখতে যাই হোক গানটা মন্দ গায় না, যেসব আর্টিস্ট গান গায় আমাদের স্টেশনে, তাদের মতই।

ভট্টাচার্যি বললে, তাহ'লে নিয়ে এসো একদিন। অডিশান্ নিয়ে দেখি।

বললাম, দেখ ভাই, অন্তত একটা চান্স দিয়ে দাও, আমারও মুখ রক্ষে হোক। অনেক সিঙাড়া-চা খেয়েছি, একটুখানি উসুল করতে দাও।

ভট্টাচার্যি একটা দিন স্থির করে দিলে। বললে, তাহ'লে সোমবার দিন আসতে বলে দিও—অডিশানের ব্যবস্থা করে দেব। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়।

এদিকে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলে খবরটা দিলাম সুনির্মলকে। সুনির্মল সেদিনও যথারীতি এসে আমার বাইরের ঘরে চুপ করে বসে ছিল। ভেবেছিল রোজকার মত হতাশ হয়েই তাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু খবরটা শুনেই তার কান দু'টো লাল হয়ে উঠলো, বললে, সত্যি?

বললাম, সত্যি না তো কি মিথ্যে?

—কিন্তু শেষকালে অডিশান্ করার পর রিজেক্ট করে চিঠি দেবে না তো?

বললাম, তা-তো আমি বলতে পারি না।

—কিন্তু সেইটে যাতে না হয় সেই জন্যেই তো আপনার থ্রু দিয়ে যাওয়া। সেইটে শুধু আপনি একটু ওদের বলে দেবেন দাদা!

বললাম, যা বলবার তা আমি বলেই রেখেছি, তুমি উষাকে নিয়ে সোমবার ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায় হাজির হয়ো।

সুনির্মলের মন থেকে তবু পরোপুরি ভয়টা গেল না। আস্তে-আস্তে বাইরে চলে গেল। তারপর দেখলাম রাস্তা পেরিয়ে সোজা মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে খবরটা দিতে ঢুকলো।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলাই মৈত্রমশাই আমার বাড়িতে এসে হাজির।

—দত্তমশাই-দত্তমশাই, দত্তমশাই বাড়ি আছেন নাকি?

বুড়ো ষাট-সত্তর বছর বয়েসের লোক। কিন্তু তবু ভাবলাম হয়তো রেডিওতে মেয়ের গান গাওয়ার চান্স মিলেছে বলে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন। কিন্তু না, তা নয়। আমাকে দেখেই বললেন, সুনির্মলের মুখে শুনলাম সব। তাহলে সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়ই অডিশান্ হবে?

বললাম, হ্যাঁ, সেইরকম কথাই তো আছে। আমি সুনির্মলকে তাই জানিয়ে দিয়েছি।

মৈত্রমশাই বললেন, না, সেজন্য নয়, আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম যে আমি কি সঙ্গে থাকবো?

বললাম, না-না, আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন?

মৈত্রমশাই বললেন, কষ্ট আর কিসের, মেয়ের গান রেডিওতে হবে, এ তো আনন্দের কথা। আমার কিছু কষ্ট হবে না। আপনি যদি বলেন তো আমি থাকবো।

তারপর একটু থেমে বললেন, আসলে কী ব্যাপার জানেন, এখন এখানকার দিনকাল ভালো নয়। খুকুর তো বয়েস হয়েছে কিনা, যেখানে-সেখানে একা ছেড়ে দিতে ভয় করে মশাই।

বললাম, কিন্তু কলেজে তো একাই যায়।

মৈত্রমশাই বললে, কলেজে তো আর আমি সঙ্গে যেতে পারি না দত্তমশাই, তা তাও আমি বলেছিলাম যে আমি না হয় তোর সঙ্গে যাই, আবার ছুটির সময় তোকে আমি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবো। তা খুকু আপত্তি করে।

বললাম, তা-তো করবেই।

—অথচ মেয়েকে আজকাল লেখাপড়া না শিখিয়ে মুখ্যু করে তো আর রাখতে পারি না। আজকালকার ছেলেরা আবার লেখাপড়া জানা না হলে যে বিয়েই করতে চায় না।

বললাম, কিন্তু গান? গান কেন শেখাতে গেলেন?

মৈত্রমশাই বললেন, ওই কথা কে বলে বলুন না! ওর গর্ভধারিণী যে না-ছোড়বান্দা। বলে, মেয়েকে নাকি আমি গো-মুখ্যু করে রাখতে চাই।

—আপনার গৃহিণীরই তাহলে গান শেখানোর বেশি গরজ?

—আরে তা নয় দত্তমশাই, আসলে আমায় গৃহিণীর তাগিদেই গান শেখার হিড়িক। আর তাও বলি, শুধু গান শিখলেই তো হবে না, দশ জায়গায় গাইতে হবে। আচ্ছা দত্তমশায় আপনি বলুন তো শুধু গান শিখলেই তো চুকে যায় ল্যাঠা, আবার রেডিওতে গাওয়া কেন বাপু। এই তো আমি, আমার কথাই ধরুন না। আমি তো নাচও জানি না, গানও জানি না, আমার নামও ভূ-ভারতে কেউ জানে না। তা আমি কি মানুষ নই?

বললাম, না-না, সে তো খাঁটি কথা।

মৈত্রমশাই বললেন, আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি তো তা বলবেনই, কিন্তু ওই কথা যদি আমি গিন্নীকে বলি তো তখনই লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে। একেবারে সেই যে শুরু হবে ঝগড়া, তা আর শেষ হবে না। তখন বলবে, আমার জীবনটাও তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, মেয়ের জীবনটাও ওই করে নষ্ট করে দিয়ে ছাড়বে।

মৈত্রমশাইয়ের আক্ষেপ শুনে মায়া হলো নিজের মনে। ভাবলাম ভদ্রলোক দায়ে পড়েই মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন। দায়ে পড়েই আমার কাছে তদ্বিক-তদারক করতে এসেছেন। বললাম, ঠিক আছে, আপনার যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে তো আপনিও চলুন, আমার কোনও আপত্তি নেই।

মৈত্রমশাই বললেন, হ্যাঁ, তাই ভালো। মেয়েকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বাড়িতে ধড়ফড় করবো। তার চেয়ে সঙ্গে গিয়ে দেখেই আসি না ব্যাপারটা কী?

তারপর গলা নীচু করে বললেন, আর একটা কথা।

বলে আমার কাছে সরে বসলেন। বললেন, গৃহিণী আমাকে বিশেষ করে বলতে বলেছে। আর আজকাল সব ব্যাপারেই তো ঘুস দিচ্ছি। কোর্টকাছারিতে গিয়ে জর্জ-ব্যারিস্টার-মোক্তার থেকে শুরু করে রেলের ইস্টিশান পর্যন্ত ঘুযটি ছাড়া কেউ কথা বলবে না। তাই বলছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কিসের ইঙ্গিত করছেন মৈত্রমশাই।

মৈত্রমশাই বললেন, আপনি যেন লজ্জা-টজ্জা করবেন না দত্তমশাই, এতে লজ্জা করার কিছু নেই। যদি কাউকে কিছু দিতে হয়, তাও আগে থেকে বলুন, আমি সঙ্গে করে রেখে দেব টাকাটা।

আমি বললাম, কিসের টাকা?

মৈত্রমশাই বললেন, এই ধরুন কাউকে যদি দিতে হয়, আর আজকাল সব জিনিসেরই তো দাম বাড়ছে মশাই।

বুঝতে পারলাম। বললাম, না-না, আমাদের অফিসে ওসব ব্যাপার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ওদিক থেকে।

মৈত্রমশাই চলে গেলেন। অফিসে সাড়ে ছ'টার সময়ই ওদের যাবার কথা। সেই সময়েই অডিশানের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই ওরা তিনজনে গিয়ে হাজির।

আমি তো ওদের দেখে অবাক। বললাম —সে কি! আপনারা এখনই এসেছেন? সাড়ে ছ'টা বাজতে এখনও তো অনেক দেরি।

মৈত্রমশাই এগিয়ে গেলেন। বললেন, রাস্তায় বাসের যা কাণ্ড, তাই একটু আগেই এসে পড়লাম। কেউ কিছু মনে করবে না তো?

বললাম তা নয়। আপনারা একটু বসুন, আমি দেখছি কী ব্যবস্থা হয়েছে।

সুনির্মলকে দেখলাম একপাশে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আছে। আমি ঘরের বাইরে চলে গেলাম। ভট্টাচার্যিকে গিয়ে বললাম সব।

ভট্টাচার্যি বললে, আচ্ছা মক্কেল এনেছ তুমি। আসবার আগেই তো আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে। আমি দেখাই করিনি। কেউ হয়-টয় নাকি তোমার?

বললাম, আরে না, কে আবার হবে? আমাকে ধরেছে তাই বলছি।

যা হোক, যথারীতি অডিশান হলো। উষা একটা ভজন গাইলে। সুনির্মলের ভজন গাওয়াবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মৈত্রমশাই বললেন, না-না, ভজনটাই ভালো লাগবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা শেষ হলো। ভজনের দু'টো লাইন শোনবার পরি ভট্টাচার্যি বললে, আর গাইতে হবে না, থাক।

ঘর থেকে বেরোবার সময় সুনির্মল এলো আমার কাছে।

বললে, কী হলো বলুন তো? গান ভালো হয়নি বুঝি?

বললাম, কে বললে, ভালো হয়নি?

—তবে যে গান থামিয়ে দিলেন ওঁরা?

বললাম, ওঁদের যতটুকু শোনবার ততটুকু শুনে নিয়েছে, আর শোনার দরকার নেই।

সুনির্মল বললে, আমার কিন্তু বড় ভয় করছে, শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম দেবে তো?

যার গান তার কিন্তু এসব ভাবনা নেই। সে দেখলাম রীতিমত চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে সব দেখছে। রেডিও অফিসের ভেতরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করছে। বললে, এইটে বুঝি আপনার ঘর?

চারদিকের লাল আলো, সবুজ আলো, দেখে তার যেন আর বিস্ময় কাটে না। আগে দু'বার এসেছে এখানে কিন্তু এবার আমার সুপারিশে একটু সাহস পেয়েছে যেন!

মৈত্রমশাই তাড়া দিয়ে বললেন, চলো-চলো সুনির্মল, বাড়ি চলো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—উষার গর্ভধারিণী আবার বাড়িতে একলা-একলা ভাববেন, হয়তো তিনি রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম, কিন্তু আপনি তো সঙ্গে এসেছেন, ভাবনার কী আছে?

মৈত্রমশাই বললেন, সেই জন্যে নয়, আমার মত তাঁরও তো মেয়ে-মেয়ে বাতিক আছে। খবরটা জানবার জন্য তাঁরও তো বুক দুর-দুর করছে। বলেছেন এখান থেকে সোজা গিয়ে যেন তাঁকে খবরটা দিই।

সুনির্মল বললে, হ্যাঁ, কাকীমা আমাকেও বলে দিয়েছেন।

বললাম, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি যথাসময়ে খবরটা জানিয়ে দেব।

তারা তিনজনেই চলে গেল। ভট্টাচার্যির ঘরে যেতে ভট্টাচার্যি বললে, কী মাল জুটিয়েছ হে! এ যে একেবারে বটের আটা হয়ে আটকে ধরেছিল।

—কেন, তোমাকে বিরক্ত করেছে নাকি?

ভট্টাচার্যি বললে, আর ওই মেয়েটার সঙ্গে যে বুড়ো বাপটা এসেছিল, ও একেবারে

আমার পেছন ছাড়তে চায় না। শেষে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মালটা কোত্থেকে জোগাড় করলে?

বললাম, জোগাড় কি আর করেছি! আমার ঘাড়ে এসে উঠেছে—ঘাড় থেকে কোনও রকমে নামাতে পারলেই বাঁচি এখন।

—কারা ওরা?

বললাম, আমার বাড়ির সামনেই থাকে।

—তাহ'লে তো জ্বালাবে। যতদিন না বিয়ে হয়, ততদিন এমনি করে জ্বালাবে। তারপর বিয়ে হয়ে যাবার পর একটা ছেলে-মেয়ে যা হোক কিছু হলেই গান-টান সিকেয় উঠবে।

সেদিন ঐ পর্যন্তই। আমি অবশ্য জানতাম যে, ভট্টাচার্যি যে-ক'দিন আছে, ততদিন আমার কথা রাখবে। কিন্তু তারপরে যে আর কিছু হবে না, তাও জানতাম। ততদিনে যদি মৈত্রমশাইয়ের মেয়ের একটা বিয়ে হয়ে যায় তো আমি মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু তখন কি জানি এর জের এতদূর গড়াবে?

তারপর থেকে আরম্ভ হলো তাগাদা। তাগাদার পর তাগাদা। সকালে-বিকালে তাগাদা। ভোরবেলা মৈত্রমশাই মর্নিং-ওয়াক করে ফিরে আসার সময় তাগাদা। বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরবার পথে সুনির্মলের তাগাদা। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে উষা মৈত্র। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখতে পেলেই সামনের বাড়ি থেকে সোজা এসে হাজির হতো। বলতো—দাদা, এখনও তো কোনো চিঠি এলো না আমার নামে?

বলতাম, আসবে-আসবে, অত ভাবছো কেন?

—না, আমি যে আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডদের সবাইকে বলে দিয়েছি। এখন যদি না হয় তো লজ্জায় পড়বো যে!

আমি বলতাম, বেশীদিন দেরি হবে না, চিঠি আসবে। তুমি ভেবো না।

এই রকমই চলতো। তারপর একদিন চিঠি এলো। মৈত্রমশাই হাসতে হাসতে এলেন ভোরবেলা। হাতে এক বাক্স মিষ্টি। বললাম, কী হলো?

—মিষ্টি কিসের?

হাসি দেখেই ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। তবু প্রশ্নটা করেছিলাম। মৈত্রমশাই বললেন, না, এ আমার নয়, উষার গর্ভধারিণী পাঠিয়ে দিলেন। এটা আপনাকে নিতেই হবে দত্তমশাই।

অগত্যা নিতে হলো। বললাম, গলা-টলার যত্ন নিচ্ছে তো উষা?

মৈত্রমশাই বললেন, যত্ন নিচ্ছে কিনা তা জানি না তো—

বললাম, না, আপনি একটু যত্ন নিতে বলবেন। সকালবেলা খালি-পেটে নুন-জল দিয়ে কুলকুচো করতে বলবেন রোজ।

মৈত্রমশাই বললেন, বেশ। আর কিছু করতে বলবো?

বললাম, না, আর কিছু করতে হবে না।

মৈত্রমশাই চলে গেলেন। ক'দিন ধরেই খুব আনাগোনা চললো।

মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে এলাহি কাণ্ড লেগে গেল মেয়ের গান নিয়ে। গলা যেন খারাপ না হয়। গান গাইবার দিন যেন কোনও বিপর্যয় না ঘটে। শেষে সেই দিন এসে হাজির হলো। সেদিন মৈত্রমশাই-ই শুধু নয়, শুধু সুনির্মলই নয়, মৈত্রমশাইয়ের গৃহিণীও সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

আমাকে মৈত্রমশাই বললেন, উনিও তো ধরেছেন, উনিও কি যাবেন?

বললাম, যান না, ক্ষতি কী?

পৃথিবীতে যেখানে যত আত্মীয় ছিল, সব জায়গায় চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছিল যে

অমুক তারিখে অমুখ সময়ে আমার মেয়ে গান গাইবে, তোমরা শুনবে। কেমন লাগলো তা পত্রযোগ জানাবে।

সবাই উত্তর দিয়েছিল, তারা শুনবে, আর কেমন লাগে জানাবে।

শেষকালে একদিন গান হলো। সে কী ঝামেলা! গান যেন আর কেউ রেডিওতে গায় না। কত লোক এসে নিঃশব্দে গান গেয়ে যাচ্ছে, কেউ টেরই পাচ্ছে না। যার যখন টাইম তখন সে আসে, তারপর যথারীতি ঠিক সময়ে স্টুডিওতে ঢোকে। যখন লাল আলোটা জ্বলে ওঠে, তখন গান শুরু তারপর ঠিক সময়ে গান শেষ করে চেক্ নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু এ অন্যরকম। আর্টিস্ট গান গাইতে এলো। কিন্তু সঙ্গে এলো বাপ-মা, গানের মাস্টার। স্টুডিওতে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ভট্টাচার্যি আমাকে এসে বললে, দত্ত, তুমি ওদের বাইরে যেতে বলো। আমি আস্তে-আস্তে মৈত্রমশাইকে বললাম যে স্টুডিওতে এত্ত লোকের ঢোকার নিয়ম নেই। আপনারা বাইরে বসে-বসে ঊষার গান শুনুন। সবাই আপত্তি করছে।

মৈত্রমশাই বললেন, তা-তো বটেই, ঠিক আছে, আমরা বাইরে যাচ্ছি।

তারপর গান হলো। কেমন গান হলো তা আর আমি শুনি নি। শোনবার ইচ্ছেও হয়নি। ভালো-মন্দ নানারকম গান শুনে-শুনে গান সম্বন্ধে আমাদের অরুচি ধরে গেছে। আমি ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে এসেছি।

এরপর সুনির্মল আমাদের বাড়ি এসেছিল। গান শুনে কে-কে ভালো বলেছে, তার ফিরিস্তি দিলে। মৈত্রমশাইও খুশি খুব। তারপর চিঠি আসতে লাগলো নানা দিক থেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে কাকা, বেরিলি থেকে পিসেমশাই, শোনপুর থেকে জ্যাঠাইমা। সবাই ঊষার গান শুনে মোহিত হয়ে গেছে।

এসব খবর রোজই শুনতে হতো। এক একখানা করে চিঠি আসে, আর রোজই সুনির্মল এসে তা আমাকে সবিস্তারে শুনিয়ে যায়।

কিন্তু মুশকিল হলো দ্বিতীয় প্রোগ্রাম নিয়ে—আবার কবে গান হচ্ছে!

হয়তো দ্বিতীয়বারের জন্যেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতো ওরা, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমি ছুটি নিয়ে নিলাম।

কাউকে না জানিয়ে আমি দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম।

আমি বললাম, তারপর?

প্রভাংশু দত্ত বললে, তারপর ভাবলাম আমি চলে এলে আর কিছু গণ্ডগোল হবে না। কারণ ভট্টাচার্যিও ক'দিনের জন্যে বদলি হয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লীতে এসেছিল, সে চলে গেলে কে আর কথা রাখবে?

আমি কলকাতায় এসে মৈত্রমশাইদের কথা ভুলেই গেলাম বলতে গেলে। ভোলা ছাড়া উপায়ও ছিল না। কিন্তু একদিন আবার যখন দিল্লীতে ফিরলাম, তখন দু'মাস কেটে গেছে।

দু'মাস পরে গিয়ে বাড়ির সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম। মৈত্রমশাইয়ের বাড়ি আমাদের বাড়ির মুখোমুখি। বাইরে কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি যে দিল্লীতে এসেছি, সে-খবরটা জানালাম না। চুপি-চুপি আসা-যাওয়া করতে লাগলাম বাড়ি থেকে।

বহুদিন পরে একদিন অফিসের ভেতরে কাজ করছি। হঠাৎ যেন চেনা গলা কানে এলো। ঊষার গলা না! ঊষা তাহলে কি আবার রেডিও অফিসে এসেছে! বাইরে বেরিয়ে দেখি ঊষা শুধু একলা নয়, সঙ্গে আরো কয়েকজন আর্টিস্ট! কেমন যেন অবাক লাগলো আমার। ওদের সঙ্গে কেমন করে এত ঘনিষ্ঠ হলো?

তাহ'লে কি আবার প্রোগ্রাম আছে নাকি? বেশ হাসতে-হাসতে কথা বলতে-বলতে বারান্দা পেরিয়ে চলেছে। যে আর্টিস্ট আমাদের সেতার বাজায়, আর যে তবলা বাজায়, তারা দু'জনে পাশাপাশি চলেছে।

আমার সঙ্গে দেখা হলো আনন্দীলালের। আনন্দীলাল ওদিক থেকে আসছিল। বললাম, ও আর্টিস্টটা কে আনন্দীলালা ?

আনন্দীলাল সাউণ্ড ডিপার্টমেন্টের লোক। আমার সঙ্গে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল. বললে. ও তো উষা মৈত্র।

বললাম উষা ? সে আমাদের আর্টিস্ট নাকি ?

আনন্দীলাল বললে, হ্যাঁ, আজকাল তো ঘন-ঘন প্রোগ্রাম থাকে ওর। আজও প্রোগ্রাম আছে বোধহয়।

কথা বলে আনন্দীলাল চলে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম উষা মৈত্রের দিকে। ওরা করিডোর পেরিয়ে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন করে হলো !

তবে কি আমি চলে যাবার পর ভট্টাচার্যি আবার চান্স দিয়েছিল ? না-কি সুনির্মল আমার অনুপস্থিতিতে আর কাউকে ধরে প্রোগ্রাম করে নিয়েছে !

সেদিন রেডিওর প্রোগ্রামটা খুলে দেখলাম কখন গান আছে উষার। সন্ধ্যে সাতটায় উষার ঠুংরি প্রোগ্রাম রয়েছে।

সেদিন আর সকাল-সকাল বাড়ি না গিয়ে গানটা রেডিওতে শুনতে লাগলাম। বড় মিষ্টি লাগলো গানটা।

সুনির্মল তো ভালো গান শিখিয়েছে উষাকে ! সুনির্মল তো গুণীলোক !

গান শেষ হবার পর সমস্তটা শুনে বাড়ি চলে এলাম। মনে হলো গানটা ভালই হয়েছে। দু'মাস আগেও উষার গান শুনেছি, তার চেয়ে অনেক ভালো গান শিখেছে সে। অনেক উন্নতি হয়েছে উষার।

বাড়িতে ঢোকবার আগে একবার ইচ্ছে হলো মৈত্রমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িটার সদর দরজা পর্যন্তও গেলাম। কিন্তু ভাবলাম দরকার নেই। মৈত্রমশাইয়ের মেয়ে রেডিওতে গানের প্রোগ্রাম পেয়েছে, এ তো ভালো কথা। ও নিয়ে আমার ভাববার দরকার কী ?

প্রভাংশু দত্ত গল্প বলছিল আর আমি শুনছিলাম। আমি বললাম, তারপর ?

প্রভাংশু দত্ত বলতে লাগলো, তারপর আমিও আর ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। যদিও আমার বাড়ির সামনেই মৈত্রমশাইয়ের বাড়ি, একবার গিয়ে অন্ততঃ দেখা করতে পারতাম। বলতে পারতাম, যে উষার গান শুনে খুব খুশি হয়েছি। রেডিওতে ঘন-ঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছে, এটাও খুব সুখবর।

কিন্তু ভাবলাম, ওরাই যখন আমার খোঁজ নেয় না, তখন আমারই বা কী দরকার খবর নেওয়ার। আমি কে বলো না ! আমার সঙ্গে মৈত্রমশাইয়ের ছিল দরকারের সম্পর্ক। এখন দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে, সুতরাং ওদের কাছে আমারও দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে।

তারপর হয়তো বড় জোর দু'মাস কেটেছে। সেই সময়ে আমি কী একটা কাজে নিজের অফিস থেকে বাইরে বেরিয়েছি। নিজের ঘরের বাইরে অন্য এক ডিপার্টমেন্টের কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো, দেখি বারান্দায় একটা খালি বেঞ্চের উপর সুনির্মল বসে আছে।

আমাকে সুনির্মল দেখতে পায় নি তখনও। চেহারাটা যেন সুনির্মলেরই মত, অথচ হয়তো সুনির্মলই নয়। আমি ঘুরে মুখের সামনে গেলাম ভালো করে দেখবার জন্যে। বললাম, সুনির্মল না ?

আমাকে দেখে সুনির্মল কাঁদো-কাঁদো ভাবে চাইলে আমার দিকে। তারপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললাম, কী হয়েছে তোমার ? তোমার নাম সুনির্মল না ? এরকম চেহারা হলো কেন ?

সুনির্মলের বুকের ভেতরে যেন কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল, কথা বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে। বললাম, এখানে এমন করে বসে আছো কেন ? উষার গান আছে নাকি ?

সুনির্মলের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন দাদা? আমি তো অনেক খুঁজেছি আপনাকে। শুনলাম আপনি ছুটিতে গিয়েছেন। কবে ফিরলেন?

বললাম, ফিরেছি দু'মাস হলো প্রায়। কিন্তু তোমার খবর কী বলো?

সুনির্মল একবার মাথাটা নিচু করে আবার মাথাটা তুললো।

বললে, খবর ভালো নয়। নইলে দেখছেন না আমি অফিসে যাই নি।

—কিন্তু কেন? কী হলো তোমার?

বললে, দাদা, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? সেই আড়াইটের সময়ে এসেছি।

বুঝলাম, একটা কিছু ব্যাপার হয়েছে। সেখান থেকে সুনির্মলকে নিয়ে গিয়ে বসালাম নিজের ঘরে, জল দিলাম।

সুনির্মল ঢক্-ঢক্ করে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে ফেললে।

তারপর বললে, ঊষার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। তা ভালোই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনি আমাকে বাঁচান দাদা।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কী হলো তোমার? খুলো বলো সব।

সুনির্মল বললে, আপনিই তো সেই রেডিওতে গানের ব্যবস্থা করে গেলেন। আপনিই তো দাদা চেষ্টা করে সব কিছু করালেন, আপনার চেষ্টাতেই তো সব হলো।

বললাম, সে থাক্, তারপর কী হলো বলো?

—তারপর আপনি তো ছুটিতে চলে গেলেন, আমি তখন থেকে আরো মন দিয়ে গান শেখাতে লাগলাম ঊষাকে। একটা প্রোগ্রাম হলো, কিন্তু আর একটা প্রোগ্রামের তো ব্যবস্থা হওয়া চাই। তাই ঊষাকে সঙ্গে করে নিয়ে এখানে আসতাম। আপনি নেই, তাই কে আর আমাদের আমল দেবে? শেষকালে আপনাদের ওই যে সেতার বাজায়, শশীভূষণ...

বললাম, হ্যাঁ-হ্যাঁ শশীভূষণ, ইউপি'র লোক।

—হ্যাঁ, ওই শশীভূষণের একটু দয়া হলো। একদিন শশীভূষণকে নিয়ে জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে গেলাম ঊষার গান ভালো করে শোনাতে।

তারপরের কথা সুনির্মল যা বললে, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম।

শশীভূষণ নাকি ঊষার গান শুনে একেবারে উচ্ছ্বসিত। সে বলেছে, আপনার মেয়ে একটা জিনিয়াস্ মৈত্রমশাই। আর তারপর থেকেই শশীভূষণের খুব নাকি খাতির বেড়ে গেল ওদের বাড়িতে।

—তারপর?

—তারপর শশীভূষণ প্রায়ই যায়, ঊষাকে সেতার শেখায়। শশীভূষণের সঙ্গে আপনাদের এখানকার বাহাদুরজীও যায়। চেনেন তো বাহাদুরজীকে? ওই যে তবলা বাজায়। এখন বেশ ঘন-ঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছে ঊষা, এখন যখন-তখন জলসায় যাচ্ছে। আপনি তো দিল্লী শহর চেনেন? এভাবে যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে কি যাওয়া ভালো? আপনিই বলুন?

বুঝলাম, অন্য লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করাতে সুনির্মলের মনে খুব লেগেছে।

—তা তুমি এখন এখানে কী করতে এসেছ?

—আমি? এখানে? বাড়িতে গেলে যে আমার সঙ্গে দেখাই করে না ও।

—সে কী! তোমার সঙ্গে দেখাই করে না?

সুনির্মল কাঁদো-কাঁদো চোখে চাইলে আমার দিকে। বললে, না দাদা আমার সঙ্গে প্রায়-দিনই দেখা করবার সময় হয় না ওর।

—সে কী! তুমিই তো বলতে গেলে ওকে রেডিও অফিসে গান গাইতে নিয়ে এলে। তোমার আগ্রহ দেখেই তো আমি অত করে বলে-কয়ে ব্রডকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করলাম।

আগে তো তুমি ছাড়া কেউ ছিল না উষার।

সুনির্মল বললে, এখন দাদা ওর লোকের অভাব নেই, এখন সবাই বলে উষার ফিউচার নাকি খুব ভালো।

বললাম, তো তোমার জ্যাঠাইমা, আর জ্যাঠামশাই তারা কী বলেন?

সুনির্মল বললে, তারাও আজকাল অন্য রকম হয়ে গেছে। তারা আর সে-রকম নেই। এখন আমাকে আর ওরা তেমন আমল দেয় না।

একটু থেমে সুনির্মল আবার বললে, জানেন দাদা, আগে আমি একদিন উষাকে গান শেখাতে না এলে আমার খোঁজ পড়তো। আমার বাড়িতে জ্যাঠামশাই নিজে গিয়ে খবর নিতেন—কী হলো আমার, আমার শরীর খারাপ হয়েছে কিনা, এইসব।

একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, সত্যিই তোমার জন্যে খুব দুঃখ হয় সুনির্মল। তা আমি আর এ ব্যাপারে কী করতে পারি বলো? আমি তো বাইরের লোক।

সুনির্মল বললে, কিন্তু আপনি কিছু না করলে, কে করবে? আমার কে আছে?

বললাম, তা তুমি আজকে কী করতে এখানে এসেছিলে?

সুনির্মল বললে, ওই উষার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে তো দেখা হয় না। ভাবলাম, এখানে যদি দেখা হয়। কিন্তু অনেকবার খবর পাঠালাম রিহার্শাল-রুমে, এলো না। এখানে বসে আছি, যদি এই রাস্তা দিয়ে আসবার সময় মুখোমুখি দেখা হয়।

বললাম, উষা কি আমাদের এখানে এখন রিহার্শাল দিচ্ছে নাকি?

সুনির্মল বললে, হ্যাঁ।

—কিসের রিহার্শাল?

—কোন্ থিয়েটার হবে, সেই থিয়েটারের হিরোইনের সোলো গানগুলো গাইবে।

বললাম, আচ্ছা দেখি, তুমি আমার সঙ্গে চলো তো।

সুনির্মল খুশি হলো। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রিহার্শাল-রুমের দিকে গেলাম। খোঁজ খবর নিয়ে রিহার্শাল-রুমে গিয়ে খবর নিয়ে দেখলাম গান-টান কখন শেষ হয়ে গেছে। আর্টিস্টরাও সব চলে গেছে। ঘর ফাঁকা।

সুনির্মল অবাক হয়ে গেল দেখে। বললে, তাহ'লে কি বাড়ি চলে গেল নাকি?

বললাম, তাই তো দেখছি।

—কিন্তু গেল কোন্ দিক দিয়ে? আমি তো রাস্তার ওপরই বসে আছি তখন থেকে তাহ'লে কি অন্য দরজা দিয়ে চলে গেল নাকি?

তা হতে পারে। হয়তো সুনির্মলকে বসে থাকতে দেখে ওরা অন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেছে। সুনির্মল কী করবে বুঝতে পারলে না।

আমি বললাম, তুমি এখন বাড়ি যাও ভাই, দেখি আমি কী করতে পারি। না হয় আমি শেষ পর্যন্ত শশীভূষণকে জিজ্ঞেস করে দেখবো।

বললে, না দাদা, আমার নাম করে যেন কিছু বলবেন না।

বললাম, না, সে ভয় তোমার নেই, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সুনির্মল বললে, তাহলে আপনি একটু বলে দেবেন দয়া করে। সত্যি বলছি, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি ক'দিন ধরে।

বললাম, তা তো বটেই! কষ্ট তো হবারই কথা। আচ্ছা আমি দেখছি কী করতে পারি।

সুনির্মল তো চলে গেল। আমি ভাবলাম এ আবার কী হলো। ভেবেছিলাম, এইসব ব্যাপার থেকে আমি মুক্তি পেলাম। কিন্তু এ যে দেখছি, আরো জড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তখন কি জানি, যে আমি আরো জড়িয়ে পড়বো উমা মৈত্রকে নিয়ে।

সেদিন শশীভূষণের সঙ্গে দেখা করলাম নিজেই। শশীভূষণ মাস-কাবারি মাইনের আর্টিস্ট। যারা রেডিওতে গান গায়, তাদের গানের সঙ্গে সেতার বাজায়। একজন

নামকরা সেতারীও। বললাম, উষা মৈত্র বলে কোন আর্টিস্টকে চেন তুমি?

শশীভূষণ প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বললে, আপনি কী করে চিনলেন উষাকে?

বললাম, আমার বাড়ির সামনেই তো থাকে ওরা। আর আমিই তো ভট্টাচার্যিকে বলে ওর গানের ব্রডকাষ্টিংয়ের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলাম।

শশীভূষণ বললে, কিন্তু যাই বলুন, খুব গুণী আর্টিস্ট দত্তবাবু। এতদিন একজন খারাপ মাস্টারের হাতে পড়ে সব ভুল শিখছিল। তাই আমি এখন উষাকে নিজের হাতে নিয়েছি, আর কোনও ভয় নেই।

শশীভূষমের কথা শুনে আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম।

বললাম, তুমি উষাকে নিজের হাতে নিয়েছ? তার মানে?

শশীভূষণ বললে, আমরা তো রামকিষেণের ঘরানা। এতদিন উষার কোন ঘরানাই ছিল না, তা জানেন?

বললাম, ঘরানা-টরানা যাই হোক, কিন্তু পুরোনো মাস্টারকে তোমরাই বা তাড়িয়ে দিলে কেন?

শশীভূষণ বললে, সে কি দত্তবাবু, একটা ভালো আর্টিস্ট খারাপ মাস্টারের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে, আর আমরা রামকিষেণের ঘরানার লোক হয়ে তাই দেখবো?

বললাম, তোমরা নাকি উষাদের বাড়ি যাও, শুনেছি।

—হ্যাঁ, তা যাই-ই তো। মৈত্রমশাই যে উষাকে তালিম দিতে বলেছেন আমাকে, আমি যাই আর বাহাদুরজীও যায়। তবলা না হলে ঠেকা দেবো কি দিয়ে!

বললাম, কিন্তু তোমরা যে যাও বাড়িতে, তাতে উষার মায়ের কোনো আপত্তি নেই?

শশীভূষণ বললে, আপত্তি থাকবে কেন দত্তবাবু? আমরা কয়েক দিন না গেলে উষার মা আবার জিজ্ঞেস করে, কেন এতদিন আসি নি। আর তাছাড়া আমরা ওদের বাড়ি গেলে তো ওদেরই লাভ।

বললাম, কেন? লাভ কীসে?

শশীভূষণ বললে, লাভ নয়? কত নাম হয়েছে জানেন এখন ওই উষার? আগে তো কেউ উষার নামই জানতো না। এখন চারিদিক থেকে কল্ আসছে গান গাইতে।

—খুব ভালো গান গাইছে নাকি?

শশীভূষণ বললো, আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো গায় দত্তবাবু। আপনি তো আগে ভট্টাচার্যিকে বলে এখানে চান্স করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যদি আর একবার ওর গান শোনের তো আপনিই আবার তারিফ করবেন। শুনবেন একদিন?

বললাম, না, আমার সময় হবে না।

—আরে সময় করে একদিন শুনুনই না! রামকিষেণের ঘরানা একবার দেখুনই না শুনে। বড় কড়া ঘরানা। সদারঙ-ঘরানার মত মেয়েলি-মোলায়েম ঘরানা নয়।

আমি এমনিতে গানই বুঝি না, তার ওপর ঘরানা তো আরো দুর্বোধ্য জিনিস আমার কাছে। শশীভূষণ বললে, তার ওপর আগে ভট্টাচার্যিবাবু ওকে পনেরো টাকা রেট করে দিয়েছিলেন, এখন হাফেজ সাহেবকে বলে পঁয়ত্রিশ টাকা রেট করিয়ে দিয়েছি উষার। তার ওপর ড্রামা-ডাইরেক্টর লাল-সাহেবকে ধরে গানগুলো সব উষাকে দিয়ে গাওয়াচ্ছি। তাতেও বেশ টাকা আসছে।

ব্যাপারটা বুঝলাম। উষা শুধু রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পাচ্ছে তাই-ই নয়, মোটা টাকাও পাচ্ছে। এতে মৈত্রমশাই কিংবা মৈত্রমশাইয়ের গিন্নী কারোরই আপত্তি হবার কথা নয়, বরং তাঁরা খুশিই হয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম, একজন মেয়ের ভালো করতে গিয়ে কি তবে তার খারাপই করে ফেললাম?

শশীভূষণকে সেদিন আর কিছু বললাম না। কিন্তু মনে বড় সন্দেহ রয়ে গেল। আমিই যখন উপলক্ষ্য ছিলাম, তখন আমারও তো এক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব আছে!

পরদিন সকালবেলাই সুনির্মল আমার বাড়িতে এসে হাজির।

তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

বললাম, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার সুনির্মল?

সুনির্মল বললে, ক'দিন ধরে আমার মোটে ঘুম হচ্ছে না দাদা।

বললাম, এরকম করে না ঘুমিয়ে আর কতদিন কাটাবে?

সুনির্মল বললে, আমার মত ব্যাপার হলে কি আপনিই ঘুমোতে পারতেন? শুধু ঘুমই বা কেন, খেতেও পারছি না।

—কেন, এরকম পাগলামী করছো কেন?

সুনির্মল বললে, একে আপনি পাগলামী বলছেন দাদা? আমি অত কষ্ট করে উষাকে গান শেখাল্লাম, আগে কিছু জানতো না ও, তা জানেন? হারমোনিয়াম পর্যন্ত টিপতে জানতো না। গলা বেসুরো বলতো। আমিই গলা সাধিয়ে-সাধিয়ে গলার আড় ভাঙিয়েছি। তাল্-কানা ছিল উষা, আমি নিজে ঠেকা দিয়ে দিয়ে ওকে তাল শিখিয়েছি। এখন কোত্থেকে কারা সব খারাপ করে দিলে। ওই অত সুরেলা গলার কি আর কিছু থাকবে দাদা? উষার যে সর্বনাশ করে দেবে ওরা দু'জন মিলে।

বললাম, কেন, সর্বনাশ বলছো কেন? কত টাকা পাচ্ছে উষা, তা জানো? আগে ব্রডকাস্ট করে পনেরো টাকা পেত, এখন ওরা হাফেজজীকে ধরে-করে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইয়ে দিচ্ছে—আরো শুনলাম ড্রামা-ডাইরেক্টরকে ধরে ড্রামাতেও গান-টান গাচ্ছে,—তাতেও বেশ দু'পয়সা আসছে।

সুনির্মল সব শুনলে। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আপনাকে বুঝি শশীভূষণ একথা বুঝিয়েছে? আর টাকাটাই যদি উষার আসল উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিজে তো তাহলে আগেই বলতে পারতো, তাহ'লে আর আমি ওদিকে মাড়াতাম না। আমি কেন এতদিন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে উষাকে গান শিখিয়ে গেছি? আমি এই এত বছর গান শেখাচ্ছি, একটা পয়সাও নিই নি জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে। তার কি কোনও দাম নেই? বলুন দাদা, আপনি তো বিবেচক লোক, আপনিই বলুন!

আমি আর কী বলবো। চুপ করে রইলাম। সুনির্মল আবার বলতে লাগলো, জানেন দাদা, কাল রেডিও অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করে এসে আর বাড়ি ফিরে গেলাম না। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। ভাবলাম বেঁচে থেকেই বা আর লাভ কী? আর কার জন্যেই বা বাঁচা!

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে সুনির্মল আবার বলতে লাগলো, শেষকালে যখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল তখন হাঁটতে-হাঁটতে আবার এখানে এলাম। বাড়ির সামনে আসতেই উষার গলা কানে এলো। বাইরে জানালার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগলাম! ভেতরে ঢুকতে আর প্রবৃত্তি হলো না। কী শুনলুম জানেন? ভৈরবী রাগ একটা গাইছে উষা, তাতে শুদ্ধ ধৈবত লাগাচ্ছে।

কথাটা বলে সুনির্মল ভেবেছিল আমাকে অবাক করে দেবে।

কিন্তু আমি গান সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মতই আনাড়ি। ভালো গান শুনতে ভালো লাগে, ওই পর্যন্ত। কেন ভালো কিংবা কেন খারাপ লাগে তা বলতে পারবো না। বললাম, শুদ্ধ ধৈবত মানে?

সুনির্মল আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে গানের কূট নিয়মকানুন। রামকেলিতে কোন পর্দাটা বিবাদী, আর কোন পর্দাটা বাদী, আর শুধু রামকেলি কেন, প্রায় সারা সঙ্গীত

শাস্ত্রটাই সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো। আমি বললাম, ওসব আমাকে বুঝিয়ে কী হবে! আমি তো ওসব কিছু জানি না।

সুনির্মল বললে, না দাদা আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি না। কিন্তু কী সিরিয়াস ব্যাপার বলুন, সব ভুল শেখালে আমার কষ্ট হয় না। আমার নিজের হাতে গড়া আর্টিস্ট যে উষা।

বললাম, ওসব কথা থাক। তারপর তুমি কী করলে? তুমি সেই জানলার তলায় দাঁড়িয়ে ভুল সুর শুনতে লাগলে?

সুনির্মল বললে, তা ছাড়া আর কী করবো দাদা, ওই সব ভুল সুর শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে লাগলো।

বললাম, তারপর?

—তারপর আর কী করবো। অনেক রাত্রে গান শেষ হলো, তখন আস্তে আস্তে সেখানে থেকে চলে এলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে রাত্তিরে আর ঘুম এলো না। মা বললেন, কী রে, কিছু খেলিনা কেন? আমি মাকে আর কী বলবো। বললাম, খিদে নেই। তারপর আবার ভোর হয়েছে, আবার বাড়ি থেকে বেরোলাম। বেরিয়ে আবার কোথায় যাবো, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, তাই আপনার কাছে চলে এলাম।

আমি সুনির্মলকে চা-জলখাবার খেতে দিলাম। বললাম, খাও তুমি, না খেলে যে অসুখ করবে তোমার! শেষকালে কোনদিন রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে থাকবে।

সুনির্মল খেতে লাগলো। আমার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

বললে, আপনি দিলেন বলে খাচ্ছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই এর একটা বিহিত করতে পারেন দাদা। ,একটা ভালো আর্টিস্ট, এ রকম খারাপ লোকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে, এ তো আর চোখ মেলে দেখা যায় না। আপনি একটা কিছু করুন।

বললাম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি, কী করতে পারি। তুমি যাও। দু'দিন পরে এসে কী হয় খবর নিয়ে যেও। এখন অফিসে গিয়ে মনটাকে সুস্থ করো আগে—তোমার ভালোর জন্যেই আমি বলছি এসব কথা।

সুনির্মল অগত্যা চলে গেল। অর্থাৎ স্তোকবাক্য দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে বিদায় করলাম শেষ পর্যন্ত।

প্রভাংশু দত্ত বললে, তারপর আমি একবার ভাবলাম মৈত্রমশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো কী ব্যাপার। আবার ভাবলাম, তাঁদের মেয়ের ব্যাপার তাঁরা যা ভালো বুঝেছে তাই-ই করেছে, আমি কেন খামোকা তাদের অপ্রীতিভাজন হই?

শেষ পর্যন্ত সেদিনের মত যাবো-যাবো করেও মৈত্রমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। তাছাড়া আমার নিজেরও তো ব্যক্তিগত হাজার সমস্যা আছে। আর বিশেষ করে দিন-দিন তো মানুষের সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমার যা সমস্যা, আমার বাবা-ঠাকুর্দারা ওসব সমস্যা কল্পনাও করতে পারতেন না।

কিন্তু সেদিন যে কী হলো, হঠাৎ জোর করেই মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলাম। একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিতেই দেখি মৈত্রমশাই আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটা নমস্কার করলাম। মৈত্রমশাই খুব খুশি। বললে, এ কী? আপনি? অনেক দিন পরে এলেন। কী খুশিই যে হলাম। এতদিন কোথায় ছিলেন?

—আমি ছুটিতে ছিলাম, তাই কোন খোঁজ-খবর নিতে পারি নি।

মৈত্রমশাই বললেন, আপনি এখন এলেন, খুকু আবার ঠিক এখনই বাইরে বেরিয়েছে। আপনাকে দেখলে খুব খুশি হতো সে।

বললাম, কোথায় গেছে?

মৈত্রমশাই বললেন, কোথায় নাকি গান-বাজনার একটা কন্ফারেন্স আছে। আজকাল বড্ড নাম-ডাক হয়েছে খুকুর, জানেন! চারদিক থেকে কল্ আসছে। আর সবাই খুব

বাহবা দিচ্ছে। একদিন আপনি ওর গান শুনুন! জানেন দত্তবাবু, সেই খুকু আর সে-খুকু নেই। সে এখন অনেক ইমপ্রুভ করেছে। এই তো ক'দিন আগে রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম ছিল। আপনাদের রেডিও অফিস থেকে শশীভূষণবাবু আর বাহাদুরবাবু এসে রেডিওর গাড়ি করে ওকে তুলে নিয়ে গেলেন।

আমি যেন কিছুই জানি না। বললাম, শশীভূষণবাবু? তিনি কে?

মৈত্রমশাইও যেন অবাক। বললেন, সে কী, আপনি শশীভূষণবাবুকে চেনেন না? মস্তবড় গুণী, অমন গুণী বড় একটা দেখা যায় না মশাই। রামকিষেণের ঘরানা তো আগে শুনি নি কখনও। সেদিন শুনে আমারই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আহা, কী গানই গাইছে আজকাল খুকু।

বুঝলাম যা শুনেছিলাম সবই সত্যি।

হঠাৎ বললাম, আর সেই সুনির্মল? সে কেমন আছে?

মৈত্রমশাইয়ের যেন মনে পড়লো না। খানিক ভেবে নিয়ে বললেন ও হ্যাঁ, কী জানি, সে তো অনেক দিন ধরেই আর এদিকে আসছে না।

বললাম, আমার কাছে সেদিন সুনির্মল এসেছিল।

মৈত্রমশাই বললেন, তাই নাকি? তাহ'লে আমাদের বাড়িতে এলো না কেন? ছেলেটা খুব ভালো সৎ। কিন্তু গান-বাজনাটা তেমন ভালো করে শিখলো না। নইলে ওই কেরানীগিরির চাকরি করে আর পচতে হতো না। আপনাদের রেডিওতেই ও একটা চাকরি পেয়ে যেত।

বললাম, রেডিওর চাকরি কি ভদ্রলোকের চাকরি? নিজেরা তো করছি।

মৈত্রমশাই বললেন, কেন খারাপটা আর কী? এও তো গভর্নমেন্টের চাকরি।

বললাম, তা ঠিক কিন্তু চাকরি রাখা আমাদের এখানে শক্ত। বড্ড ক্লিক।

মৈত্রমশাই বললেন, তা ওসব ব্যাপার আর কোথায় নেই আজকাল বলুন তো? কিন্তু রেডিওতে চাকরি হলে কত নাম হতো সেটা তো জানেন।

বুঝতে পারলাম সুনির্মল এখন মৈত্রমশাইয়ের বিষনজরে পড়ে গেছে। এখন এদের কাছে সুনির্মলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

মৈত্রমশাই আবার বলতে লাগলেন, আর আপনাদের রেডিওর শশীবাবুই তো এখন উষাকে গান শেখানোর ভার নিয়েছে। সেদিন বলছিল, আগেকার মাস্টার সব ভুল শিখিয়েছে।

বললাম, ভুল! সুনির্মল ভুল শিখিয়েছে?

মৈত্রমশাই বললেন, হ্যাঁ দত্তবাবু, তবে আর আপনাকে বলছি কী? আমি তো তাই শুনেই অবাক। আমরা তো আর গানের কিছু বুঝি না।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। মৈত্রমশাই আবার বলতে লাগলেন, সেই শুনে আমি একদিন সুনির্মলকে বললাম, তুমি উষাকে ভুল গান শিখিয়েছ।

—তা শুনে সুনির্মল কী বললে?

—কী আবার বলবে দত্তবাবু। আমরা তো গান সম্বন্ধে আনাড়ি। আমরা এ্যাদ্দিন কিছু বুঝতাম না, যা শিখিয়েছে তাই-ই গেয়েছে উষা! এখন বুঝছি কেন এতদিন রেডিওতে চান্স পেতো না খুকু। আমি ভুল করে ভাবতুম ওর ভেতরে বোধহয় ঘুষের কারবার চলে—ছি, ছি, ছি!

বললাম, আমাদের শশীভূষণ? সে আপনাকে ওইসব কথা বলেছে?

মৈত্রমশাই বললেন, শশীভূষণ না বললে আমরা জানবো কেমন করে বলুন? আমরা কি গানের কিছু বুঝি?

বললাম, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সুনির্মলই ঠিক শিখিয়েছিল, এরা ভুল শেখাচ্ছে।

মৈত্রমশাই বললেন, তাও হতে পারে। আমি তো গানের কিছু বুঝি না। লোকে যা বলছে, তাই বিশ্বাস করছি।

তারপর একটু থেমে বললেন, তা আপনি তো গান বোঝেন, আপনিই একবার উষার গান শুনুন না।

আমি বললাম, আমিও আপনার মত মৈত্রমশাই, গান-বাজনার কিছুই বুঝি না।

মৈত্রমশাই বললেন, আচ্ছা, আর একটা কথা, উষা যদি ভুলই গাইবে তো এখন রেডিওতে এত চান্স পাচ্ছে কেন? টাকার রেট বাড়িয়ে দিলো কেন তাহ'লে?

এ-কথার উত্তরে অনেক কথাই বলতে হয়। জানাশোনা থাকলে যে-কোনো জায়গাতেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, এই সহজ কথাটাও বলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আবার ভাবলাম একবার যখন মৈত্রমশাইয়ের মন ভেঙে গেছে, তখন আর জোর করে তা জোড়া লাগানো যাবে না। আমি চলে এলাম। সুনির্মলের জন্যে আমার দুঃখ করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইলো না।

পরদিন ছিল আমার ছুটি। সকালবেলা সুনির্মল আসে নি। এই তার প্রথম-না-আসা। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একলাই বাড়িতে কাটিয়েছি।

বিকেলবেলা রামলীলা ময়দানের দিকে বেড়াতে গিয়েছি, গিয়ে দেখি মাঠের এখানে-ওখানে ছোটখাটো ভিড় জমে আছে। ও-রকম থাকে ওখানে। একটা না একটা উপলক্ষ্য নিয়ে ওখানে কিছু জমায়েৎ হয়ই।

কিছুক্ষণ রামলীলা ময়দানে পায়চারি করে আবার ফিরতে লাগলাম। হেঁটে-হেঁটেই ফিরছি। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে আসতেই মনে হলো ভেতরে কিছু গান-বাজনা যেন চলছে। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গীত সম্মেলন। আমাকেও একটা নেমতন্নের চিঠি দিয়েছিল উদ্যোক্তারা, পকেটে হাত দিয়ে দেখি কার্ডটা রয়েছে।

ভেবেছিলাম, একটুখানি বসেই আবার উঠে পড়বো। বড়-বড় নামজাদা গায়ক-গায়িকার গান চলছে। খেয়াল-ঠুংরী। কয়েকটা গান হয়ে গেছে। আরো কিছু গান পরে হবে। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সম্মেলন শেষ হতে প্রায় রাত আটটা বাজবে।

আসলে আমার ভালোই লাগছিল না ওস্তাদী গান। ওসব-বুঝতে গেলেও তো নিজের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। উঠে আসছি, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কী যেন ঘোষণা হলো, মনে হলো যেন উষা মৈত্রের নামটা শুনলাম। উষা মৈত্র গাইবে নাকি?

যা ভেবেছি তাই। দূর থেকে দেখলাম উষা মৈত্র স্টেজের ওপরে এসে বসলো। পাশে বাহাদুরজী তবলা বাঁধতে লাগলো। আর আমাদের শশীভূষণ তানপুরা ধরেছে। ব্যাপারটা দেখে আর উঠে আসতে পারলাম না।

যেখানে বসেছিলাম, আবার সেইখানেই বসে পড়লাম। গান শোনার জন্যে বসলাম না, দেখবার জন্যে বসলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে স্টেজ অনেক দূরে। আমি প্রায় শেষের দিকে বসে আছি। উষা গান আরম্ভ করে দিলে। প্রথমে আলাপ। প্রায় আধঘণ্টা ধরে আলাপই চললো গানের। তারপর বাহাদুরজীর তবলা চটপট শব্দ করে উঠলো। তারপর একপাশ থেকে শশীভূষণ কানে তানপুরা লাগিয়ে এক মনে তারে হাত চালাচ্ছে।

পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, এ কেমন গাইছে মশাই?

ভদ্রলোক বললে, দাঁড়ান, আর খানিকটা শুনি—মনে হচ্ছে হিন্দোল।

এ-পাশের দিক থেকে একটু একটু গুঞ্জন শুনছি। যেন কারা কথা বলছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কিছু-কিছু লোক। পাশের ভদ্রলোককে আবার জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ মশাই, কী সুর গাইছে?

ভদ্রলোক বললে, এখনও বুঝতে পারছি না, পুরিয়াও হতে পারে, হিন্দোলও হতে পারে।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। পুরিয়াও হতে পারে, আবার হিন্দোলও হতে পারে? তার মানেটা কী?

এইটুকু শুধু বুঝতে পারলাম যে গানটা তেমন জমছে না যেন! আগে যে গায়ক গেয়ে গেল, তার গান সবাই মন দিয়ে শুনেছে। তার বেলায় এমন গুঞ্জন ওঠে নি, গোলমালও হয়নি। এক-একজন উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। সব দেখে-শুনে আমারই খারাপ লাগছিল।

পাশের ভদ্রলোককে বললাম, কী মশাই, কী বুঝছেন? কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক বললে, তেমন জমাতে পারছে না।

—কিন্তু কেন জমাতে পারছে না বলুন তো?

ভদ্রলোক বললে, কী জানেন, সব আর্টিস্টদেরই গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—

—তার মানে?

আমি কথাটা আরো পরিস্কার করে বুঝতে চাইলাম।

ভদ্রলোক বললে, অহঙ্কার হলেই আর্টিস্টের পতন হয়! এই ঊষা মৈত্র সবে একটু উঠছিল মশাই, একটু নাম-ধাম করছিল। আর উঠতিব মুখেই পড়ে গেল।

বললাম, কেন, পড়ে গেল কীসে বলছেন? কী জন্যে?

ভদ্রলোক বললে, ওই যে পোঁড়িদার জুটেছে।

—পোঁড়িদার মানে?

ভদ্রলোক বললে, ওই যে দু'জন দেখছেন, একপাশে একজন তানপুরা বাজাচ্ছে আর একজন তবলা, ওরাই হলো ঊষা মৈত্রের পোঁড়িদার। ওরাই খারাপ করে দিলে মেয়েটাকে। নইলে মেয়েটার মধ্যে পার্টস ছিল আগে।

তবু স্পষ্ট হলো না ব্যাপারটা।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু মেয়েটাব কী ক্ষতি করেছে ওরা?

ভদ্রলোক বোধহয় গান-বাজনার জগতের খবরাখবর রাখে।

বললে, ওই ওদের সঙ্গেই তো দিন-রাত ঘোরাফেরা করে। যেখানে-সেখানে নিয়ে গিয়ে গাওয়ায়। বাপ-মাও আর কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেন? টাকাও তো উপায় করছে বেশ!

বুঝলাম, সনির্মল যা বলেছে, তা মিথ্যে নয়। গান তখন বেশ জোরে চলেছে। হঠাৎ দূরের একটা কোণ থেকে কী একটা গোলমাল উঠলো। একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী বলছে, আর সবাই একসঙ্গে হৈ- হৈ করে উঠলো। ভালো করে তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

পাশের ভদ্রলোককে বললাম, কী হয়েছে মশাই?

ভদ্রলোক নিজেও তখন কিছু বুঝতে পারছে না। বললে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠলো। সারা হলময় একটা তোলপাড় পড়ে গেল। তখন আর গান শোনা যাচ্ছে না। কেবল চিৎকার। শশীভূষণ তানপুরা বাজাচ্ছিল। সে গান চলতে-চলতেই তানপুরা ছেড়ে স্টেজ থেকে নেমে পড়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। আর তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা।

এমন ঘটনা কোনও সঙ্গীত-সম্মেলনে আগে ঘটে নি। বেশ হাতাহাতি মারামারি চলছে দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমারই মত শান্তিপ্রিয় কিছু কিছু লোক উঠে পড়লো। গান শুনতে এসে কে আর গণ্ডগোলে পড়তে চায়?

আমিও উঠে পড়লাম। তারপর কোনওরকমে বাইরে এলে বাঁচি। কিন্তু হলের বাইরে এসেও দেখি আর এক কাণ্ড! গেটের কাছে ভিড় জমেছে খুব। খুব বচসা চলছে। কী হয়েছে দেখতে গিয়ে দেখলাম একজনকে ঘিরে অনেক জটলা চলেছে!

কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে আকাশ থেকে পড়লাম। দেখি আমাদের সুনির্মল! তার চোখ-মুখ ফুলে গেছে। কেউ যেন ঘুষি মেরে তার ওই দশা করে দিয়েছে! তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভেতর ঢুকে সুনির্মলের হাতটা ধরলাম। বললাম, এ কী? সুনির্মল? তোমার এ কী হলো? কে তোমাকে মারলে?

সুনির্মল আমাকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলে।

বললে, দাদা, আমি সত্যি কথা বলেছি বলে আমাকে সবাই ধরে মারলে।

বললাম, কী করেছিলে তুমি?

সুনির্মল বললে, ঊষা পুরিয়া রাগ গাইতে গিয়ে পঞ্চম লাগিয়েছে দেখে আমি শুধু বলেছিলাম 'ভুল হচ্ছে'—তাইতেই সবাই আমাকে ধরে মারতে এলো।

বললাম, তা তুমি ওসব বলতে গেলে কেন?

সুনির্মল বললে, তা ভুল করলে বলবো না?

বললাম, সকলের সামনে সেটা না বলে গান শেষ হয়ে যাবার পর ওদের আড়ালে ডেকে বলতে পারতে! সকলের সামনে আসরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে কেন? তোমার একটা আক্কেল নেই?

অনেক কথা বলতে লাগলাম সুনির্মলকে। অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে লাগলাম। বললাম, দেখছো অনেক লোক, অনেক বড়-বড় লোক গান শুনতে এসেছে, তাদের সামনে কি শশীভূষণদের অপমান করতে হয়? পরে বললে চলতো না?

সুনির্মলের কপাল-চোখ-মুখ তখন বেশ ফুলে গেছে।

বললে, কিন্তু ওরা যে ওকে ভুল শিখিয়েছে দাদা, পুরিয়া রাগে কখনও পঞ্চম লাগায় কেউ? এ সুরে তো পঞ্চম বর্জিত।

আমি বললাম, পঞ্চম লাগাক আর রেখাব লাগাক, তাতে তোমার কী?

—কিন্তু দাদা, আমি অত কষ্ট করে যে ওকে গান শেখালাম, তার কোন দাম নেই?

বললাম, মনে করে নাও না, ঊষা মৈত্রের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, ওকে তুমি চেনো না।

—কিন্তু তা কী করে মনে করি দাদা?

—তাহ'লে তুমি এখানে এলে কেন? না এলে তো আর ভুল সুর শুনতে হতো না। না এলেই তো ল্যাটা চুকে যেত।

সুনির্মল বললে, প্রথমে আমি তো তাই-ই ভেবেছিলাম যে আসবো না।

—তুমি না এলে আর এ-কাণ্ড ঘটতো না.

সুনির্মল বললে, এই হলের গেটের কাছে এসে ভেবেছিলাম দূরে থাকবো, ভেতরে ঢুকবো না।

—তাহ'লে ঢুকতে গেলে কেন?

সুনির্মল বললে, একবার বড় ইচ্ছে হলো যে কী-রকম গান শিখেছে ঊষা, শুনি।

বললাম, তোমার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখছি।

সুনির্মল বললে, তা-তো আমি বুঝতেই পারছি দাদা, নইলে কিছু না বলে আমার চুপ করে থাকলেই হতো। কেন যে আমি চেঁচাতে গেলাম।

সুনির্মলকে নিয়ে একটা ডাক্তারখানায় গেলাম। সেখানে ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম একটা ট্যাক্সি ডেকে।

বললাম, একটু ভালো হলেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবো মৈত্রমশাইয়ের কাছে, তুমি এখন বাড়ি যাও।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যেবেলাই সুনির্মল এসে হাজির। আমি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি সুনির্মল আমার বাইরের ঘরে বসে আছে।

বললাম, কী হলো তোমার? আবার এরই মধ্যে বেরোলে কেন?

তখনও তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

বললে, ওই যে আপনি কাল বললেন, আমাকে নিয়ে ঊষাদের বাড়ি যাবেন।

—তা আমি কি বলেছি আজই যাবো? একটু সেরে উঠলে তখন না হয় যেতে!

সুনির্মল বললে, না দাদা, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা ভালো; ওঁরা অন্তত আমাকে দেখে বুঝবেন শশীভূষণরা কত খারাপ লোক!

বললাম, তা তুমি কি মনে করো তোমার ওই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা দেখালে মৈত্রমশাইয়ের দয়া হবে তোমার ওপর? বরং তোমাকেই ধমকাবেন। বলবেন, তুমি ওসবের মধ্যে যাও কেন? তখন কী জবাব দেবে?

সুনির্মল বললে, না দাদা, আপনি একবার ওদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলুন না—সামনি-সামনি গিয়ে অন্তত দু'টো কথা তো বলতে পারবো।

সুনির্মলের অবস্থা দেখে আমার দয়া হলো।

বললাম, আচ্ছা চলো, কিন্তু ওরা কি এখন আসবে?

—কারা?

—ওই শশীভূষণ আর বাহাদুরজী।

সুনির্মল বললে, ওর তো দাদা রোজ সাড়ে সাতটার সময় ওখানে আসে।

বললাম, কোথাও গান-বাজনার ব্যাপার নেই তো আজ?

সুনির্মল বললে, না, সে আছে পনেরো তারিখে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আচ্ছা তুমি এত খবর রাখো কী করে বলো তো সুনির্মল? ওরা কবে কোথায় গান গাইবে—সব যে দেখছি তোমার নখদর্পণে!

সুনির্মল বললে, ওইটেই তো আমার দোষ। আমি কিছুতেই যে ভুলতে পারছি না।

—কী জন্যে খোঁজ রাখো বলো তো? খোঁজ রেখেই বা তোমার কী লাভ হয়?

সুনির্মলের মুখটা যেন বিষণ্ণ দেখালো। বললে, ঊষার নাম খারাপ হলে যে আমার মনে লাগে। এত কষ্ট করে ওকে গান শিখিয়েছি, আমার হাতে গড়া ছাত্রীকে ওরা এমন করে নষ্ট করে দিলে, মন খারাপ লাগবে না?

বললাম, তোমার আর কোনও গতি হবে না সুনির্মল। পৃথিবীর এত মেয়ে থাকতে তুমি সেই একজনকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছো! ও তোমাকে ভুলে গেছে কবে, তোমার কথা ও একবার ভাবেও না, আর তুমি কিনা এখনও ঊষা-ঊষা করে ভেবে মরছো!

সুনির্মল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললে, আমিও তাই এক-এক সময় ভাবি, আমার কপালে বোধহয় অনেক দুঃখ আছে।

তারপর বললে, অথচ দেখুন, আমার তো আর পাঁচটা ছাত্রীও নেই, দশটা ছাত্রীও নেই! ওই একটিই মাত্র। ও চলে গেলে আমার থাকে কী?

সুনির্মলকে এতদিন ধরে দেখে আসছি, আমি তার কোনও অপরাধ দেখতে পাইনি। হয়তো সে একটু অবিবেচনার কাজ করে ফেলেছে, হয়তো একটু অশোভন ব্যবহার করেছে। যেভাবে ব্যবহার করলে জিনিসটা ঠিক সঙ্গত হতো, তা হয়তো করেনি। কিন্তু তা হলেও তার পক্ষেও অনেক কথা ভাববার আছে। সে যে এতদিন ঊষা মৈত্রকে গান শিখিয়ে এসেছে, তাতে তো তার কোনও স্বার্থই ছিল না। সে টাকা নেয় নি, পয়সা নেয় নি। এমন কি প্রতিদিন নিজেই পকেটের পয়সা খরচ করে বাস ভাড়া দিয়ে ঊষাকে গান শেখাতে এসেছে। তারপর কতদিন ধরে রেডিওতে যাতে ঊষার গান ব্রডকাস্টিং হয়, তার চেষ্টা করেছে। যাকে ধরলে রেডিওতে ঊষার গান গাওয়া সম্ভব হয়, তাকে ধরেছে।

অর্থাৎ উষার প্রতিষ্ঠার জন্যে একজন লোকের দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব, তাই-ই সুনির্মল করে এসেছে।

তবু আজ যখন উষার সবে একটু নাম হয়েছে তখন কোথা থেকে কারা এসে তার সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত সাধনা পণ্ড করে দিলে। এতে মানুষ মাত্রেরই কষ্ট হবার কথা, দুঃখ পাবার কথা। সুতরাং সুনির্মলকে তো আমি খুব বেশি দোষ দিতে পারি না। তাই সেদিন আমি সুনির্মলকে নিয়ে মৈত্রমশায়ের বাড়িতে গেলাম। সুনির্মল আমার পেছনেই ছিল।

মৈত্রমশাই তাকে দেখেই বললেন, ও কে? সুনির্মল নাকি? কী হলো? তুমি এতদিন ধরে আসনি কেন হে? তোমার কপালে কী হলো?

সুনির্মল এ কথার কোনও উত্তর দিলে না। মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইলো। উত্তরটা তার হয়ে আমিই দিলাম। বললাম, আপনাদের শশীভূষণ আর বাহাদুরজী ওকে মেরেছে। সেই দেখাতেই আমি ওকে নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে, ও আসতে চাইছিল না।

মৈত্রমশাই বললেন, মেরেছে? শশীভূষণ আর বাহাদুরজী ওকে মেরেছে? কিন্তু তারা হঠাৎ সুনির্মলকে মারতে গেল কেন?

আমি সব ঘটনাটা খুলে বললাম। মৈত্রমশাই চুপ করে সমস্তটা শুনলেন। তারপর বললেন, তা এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

বললাম, আপনি সব করতে পারেন, শশীভূষণ আর বাহাদুরজীকে বলতে পারেন।

মৈত্রমশাই বললেন, তা আমি বলতে পারি। কিন্তু সুনির্মলই বা ওদের সঙ্গে লাগতে যায় কেন?

বললাম, দেখুন, উষারই দোষ। উষাই বা ওদের কিছু বলে না কেন?

আর ঠিক সেই সময়েই উষা মৈত্র এসে ঘরে ঢুকলো। ঢুকে আমাদের দেখেই প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে দাদা, আপনি?

তারপর সুনির্মলের দিকে ফিরে বললে, কী হলো? তোমার মুখ এত ফুলে গেছে? ওষুধ-টষুধ লাগিয়েছিলে?

সুনির্মল কিছু জবাব দিলে না সে-কথার।

বললাম, তুমি কী বলো তো উষা? তোমার সামনে সুনির্মলকে দু'জনে মিলে মারলে, আর তুমি কিছু বলতে পারলে না? দেখো তো কী রকম করে মেরেছে একে।

উষা বললে, কিন্তু শশীদারও তো মান-অপমান জ্ঞান আছে? সকলের সামনে সুনির্মলদা ওকে অমন করে বলতে গেলোই বা কেন?

সুনির্মল এতক্ষণে কথা বললে। বললে, তুমি পুরিয়া রাগে পঞ্চম দিচ্ছিলে না? পুরিয়াতে কখনও পঞ্চম লাগে? আমি তোমাকে কী শিখিয়েছিলাম?

উষা বললে, আমি কখন পঞ্চম লাগালাম? শশীদা আমাকে যেমনভাবে শিখিয়েছেন, তেমন ভাবেই তো গেয়েছি। আমার কী দোষ?

—তা আমি যেমন ভাবে শিখিয়েছি, তেমন ভাবে গাও না কেন?

—বা রে বা! শশীদা যে রামকিষেণের ঘরানার লোক।

—তা আমি কি তোমাকে এতদিন ভুল শিখিয়েছি বলতে চাও?

উষা বললে, না, তা-তো আমি বলিনি।

—তা'হলে তুমি ওদের কথাই শুনবে? আমার কথা শুনবে না?

মৈত্রমশাই এতক্ষণে কথার মধ্যেই কথা বললেন। বললেন, তোমাকেও একটা কথা বলি বাপু সুনির্মল, কিছু মনে করো না। শশীভূষণবাবুরা এখন উষাকে ঘন ঘন রেডিওতে গাইবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চারিদিক থেকে এখন ওর একটু ডাকটাক আসছে। রেডিওতে আগে পনেরো টাকা পেত, এখন পাচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা। সব তো

শশীভূষণবাবুই করে দিয়েছে। আর তুমি তো এতদিন ধরে রেডিও অফিসে ঘোরাফেরা করছো, তুমি তো কিছুই করতে পারো নি এতদিন! আর যখন উষার একটু নাম-ধাম হয়েছে, অমনি তুমি এসে ঝগড়া দিচ্ছো? তোমার তো বাবা একটু বোঝা উচিত। উষার যাতে ভালো হয় সেইটেই তো তোমার দেখা উচিত।

সুনির্মল বললে, আমি উষার ভালো চাই না? আপনি এসব কী বলছেন?

—তা ভালো চাইলে এই ঝগড়া মারামারিটা হচ্ছে কেন শুনি?

সুনির্মল বললে, কিন্তু আমি তো ঝগড়া করতে যাই নি। ঝগড়া তো ওরাই করলে।

উষা এতক্ষণে বললে, কে বললে? ঝগড়া তো তুমিই প্রথমে করলে সুনির্মলদা! ওরা তো কিছুই বলে না, ওরা তো আমার পাশে বসে তানপুরা আর তবলা বাজাচ্ছিল এক মনে।

মৈত্রমশাই কিছু বুঝতে পারছিলেন না, কী করবেন।

আমি বললাম, আপনি নিজে বলুন মৈত্রমশাই, আপনি কী চান?

মৈত্রমশাই বললেন, আমি কী চাই মানে?

বললাম, আপনি জানেন কি-না জানি না, কিন্তু আমার বলা কর্তব্য বলেই বলছি, এ ব্যাপার যেমন ভাবে গড়াচ্ছে, তাতে আপনার নিজের হাতেই ব্যাপারটা তুলে নেওয়া উচিত। বেশি দেরি করলে ব্যাপারটা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে।

—কী সঙ্গীন ব্যাপার হবে?

—চারদিকে যে রকম বদনাম শুরু হয়েছে উষার, তাতে আর দেরি করলে ফল খারাপ হবে বলে আমার ধারণা।

মৈত্রমশাই বললেন, আমার মেয়ের বদনাম হচ্ছে? কিন্তু কই, আমি কিছু শুনি নি তো! —আপনি শোনেন নি, কিন্তু আমি শুনেছি। আমি সেদিন ওই গানের আসরে হাজির ছিলাম। আশেপাশের লোক যে-সব মন্তব্য করছিল, তাতে তাই-ই প্রমাণ হয়।

—কী মন্তব্য করছিল?

—সে-সব আপনি নাই-বা শুনলেন! একদিন আপনি আমার বাড়িতে এসে নিজে আপনার মেয়ের গান শোনার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, সেইজন্যেই এত কথা বলছি।

এতক্ষণ উষা চুপ করেই ছিল। এবার কথার মাঝখানে বলে উঠলো—কী বদনাম হচ্ছে বলুন আপনি, আমি তা শুনতে চাই।

—তোমার সে-সব না শোনাই উচিত!

—কেন না-শোনা উচিত? আমি শুনতে চাই আমার সম্বন্ধে লোকে কী বলছে!

—কিন্তু সেকথা তোমার কি শুনতে ভালো লাগবে?

—বলুন না, তবু বলুন শুনি।

বললাম, নিন্দে বলেই তোমাকে তা বলতে পারছি না।

উষা বললে, কিন্তু কীসের নিন্দে! আমি কী করেছি তাদের?

—তা জানি না। তবে যেটুকু শুনেছি তাতে আমার মনেও কষ্ট হয়েছে। আমি কষ্ট পেয়েছি বলেই তোমাকে তা বলে কষ্ট দিতে চাই না, তোমার বাবাকে আমি আড়ালে সব বলবো।

বলে মৈত্রমশাইকে লক্ষ্য করে বললাম, চলুন, পাশের ঘরে আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকল শশীভূষণ আর বাহাদুরজী। আমাকে দেখে তারা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর সুনির্মলকে ওই অবস্থায় দেখে আরো অবাক হলো।

শশীভূষণ বললে, কী হলো, দত্তবাবু, আপনি?

—আমার সঙ্গে মৈত্রমশায়ের জানাশোনা আছে, তা জানতে না?

শশীভূষণ বললে, তা-তো জানতাম, কিন্তু এতদিন তো দেখি নি।

বললাম, এতদিন দরকার হয়নি তাই আসি নি।

শশীভূষণ বললে, আমাদের সম্বন্ধে কিছু কথা হচ্ছিল নাকি?

বললাম, হ্যাঁ।

—তাহ'লে আমরা আসতে বাধা পড়লো বোধহয়?

বললাম, না, আমরা অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলছি, তোমরা বসো।

শশীভূষণ বলে, তাহ'লে সেদিনকার সেই গানের আসরের কাণ্ড নিয়ে কথা বলছেন বোধহয়? কিন্তু এঁকের জিজ্ঞেস করুন না, দোষ আমাদের, না এঁর!

সুনির্মল হঠাৎ বললে, তবু বলছেন আমার দোষ? আপনারা পুরিয়া রাগে পঞ্চম লাগাচ্ছেন, তবু ওই কথা বলবেন,...জানেন না যে পুরিয়াতে পঞ্চম বর্জিত...

শশীভূষণ বললে, আপনি নিজে শুনেছেন পঞ্চম লাগিয়েছে ঊষা?

—আমি নিজে না শুনে কি বলছি? আপনারা তো বরাবর ভুল শেখাচ্ছেন ঊষাকে। আমি এতদিন ধরে যা-কিছু শিখিয়েছি সব উল্টে দিয়েছেন। তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমার নিজের হাতে গড়া ছাত্রীকে আপনারা নষ্ট করে দিলেন?

শশীভূষণ রেগে গেল। বললে, আপনি গানের কী বোঝেন? আপনি কার কাছে রাগ-রাগিণী শিখেছেন? কোন্ ঘরাণা?

সুনির্মল বললে, আমার গুরু ওস্তাদ বাদশা খাঁ। তাহ'লে বলতে চান বাদশা খাঁ গান-বাজনা ভুল শেখান?

—রেখে দিন আপনার বাদশা খাঁ। ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ আমার ওস্তাদজী। তাঁর চেয়ে তো বাদশা খাঁ বড় নয়?

ঊষা শশীভূষণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, থামুন শশীদা, বাড়ির ভেতরে এসব কেলেঙ্কারি করবেন না।

—তা আমি কেলেঙ্কারি করছি, না তোমার ওই সুনির্মলবাবু করছেন।

সুনির্মল আর থাকতে পারলে না। মৈত্রমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, আপনার বাড়ীর ভেতরে ঢুকে এরা আমাকে অপমান করবে? এদের এতদূর সাহস?

আমি ধমক দিলাম সুনির্মলকে।

বললাম, তুমি থামো তো সুনির্মল, তুমি কোনো কথা বলো না।

—কিন্তু দাদা, আমি তো কোনো কথা বলিনি প্রথমে, ওরাই তো আমার সঙ্গে কথা বলছে। ওরাই তো আমার ওস্তাদজীর নামে বদনাম দিচ্ছে।

শশীভূষণ বললে, তা নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব যে বাদশা খাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ, এ তো সবাই জানে!

—রাখুন! বাদশা খাঁর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্য নয় নাসিরুদ্দিন খাঁ!

বলতেই শশীভূষণ আর বাহাদুরজী সুনির্মলের দিকে এগিয়ে এলো।

ঊষা তাড়াতাড়ি দু'জনকে সামলে নিয়ে বললে, এ কী শশীদা, তোমরা কি মারামারি করবে নাকি!

আমিও সুনির্মলকে ধমকালাম।

বললাম, ওরা যা ইচ্ছে বলুক, তুমি চুপ করে থাকতে পারো না?

সুনির্মল চুপ করে রইলো আমার কথা শুনে। আমি মৈত্রমশাইকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। ঘরের ভেতরে গিয়ে মৈত্রমশাইকে বললাম, আপনি এর একটা বিহিত করুন! যা কাণ্ড ঘটেছে, তাতে কিন্তু শেষকালে আপনার ঊষার বিয়ের সময় গণ্ডগোল বাধবে। বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে ঊষার।

মৈত্রমশাই বললেন, দাঁড়ান, আমি একবার আমার গৃহিণীকে ডেকে নিয়ে আসি মশাই।

মৈত্র-গিন্নী বোধহয় পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সমস্তই শুনছিলেন। তিনি আসতেই আমি প্রণাম করলাম।

বললাম, আমি ঊষার বিয়ের কথা বলছিলাম মৈত্রমশাইকে।

মৈত্র-গিন্নী বললেন, ঊষার পাত্র তো ঠিক করাই আছে। তাঁরা তো ঊষাকে দেখে পছন্দও করে গেছেন। কিন্তু পাত্রটি অফিসের একটা পরীক্ষা দিতে দেরাদুনে গেছে, ছ'মাস পরে পরীক্ষায় পাশ করলেই এখানে গেজেটেড্ অফিসার হয়ে যাবে—তখন বিয়ে করবে সে।

বললাম, সে তো খুবই সুসংবাদ, কিন্তু এই ছ'টা মাসের মধ্যে যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়, তখন কী করবেন?

—কী গোলমাল হবে?

—গোলমাল তো হবেই! এখনই হচ্ছে। আমি সেদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলুম ওই গানের মজলিসে, গিয়ে আশেপাশের লোকদের মুখে যে-সব মন্তব্য শুনলাম, তাতে তো ভয় লেগে গেল আমার। সে-সব বড় কুৎসিত মন্তব্য। কী মন্তব্য আমি তা বলতে চাই না আপনাদের, আমি সে-সব উচ্চারণও করতে চাই না।

মৈত্র-গিন্নী বললেন, তা সে তো সমস্তই সুনির্মলের জন্যে। ও-ই সব চারদিকে ঊষার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে। সেইজন্যেই তো এ বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি।

বললাম, সুনির্মলকে তাহলে আপনারা চিনতেই পারেন নি।

মৈত্রমশাই বললেন, তাহলে সুনির্মল ঊষার নামে চারদিকে এত নিন্দে করে বেড়াচ্ছে কেন? ওর মত ছেলের কি এটা করা উচিত হচ্ছে?

আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। তিনি সমস্তই শুনলেন মন দিয়ে। শেষে বললেন, তাহলে এর মীমাংসা কীসে হবে?

বললাম, এক কাজ করুন। আপনারা শংকরলালের নাম শুনেছেন? সেও গান-টান খুব বোঝে। সে ভদ্র-বংশের ছেলে। সে যদি মীমাংসা করে দেয়, তাহ'লে কি আপনাদের কিছু আপত্তি আছে? সে বলুক যে, শশীভূষণ ভুল, না সুনির্মল ভুল। তার কথা যদি দু'জনে মেনে নেয়, তাহলে সব গোলমালই মিটে গেল।

মৈত্রমশাই বললেন, তার মীমাংসা কি ওরা মেনে নেবে?

—সেটা ওরাই বলুক। ওদেরই ওপর ছেড়ে দিন না।

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। বাইরে এসে সবাইকে কথাটা বললেন মৈত্রমশাই। আমিও বললাম। সুনির্মলও রাজী হলো। শশীভূষণ, বাহাদুরজী সবাই রাজি হলো। শংকরলালকে সবাই সমীহ করে। শংকরলাল রেডিও অফিসে সুর দেয়। মানুষটি ভালো। কোনও সাতে-পাঁচে থাকে না। বসে বসে শুধু সুর লাগায়। সুর-পাগলা লোক বলে সবাই তাকে ভালবাসে। সে যদি বলে শশীভূষণরা ঊষাকে ভুল শিখিয়েছে, তা'হলে সেই রায়ই সবাইকে মেনে নিতে হবে।

শশীভূষণ বললে, ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন দত্তবাবু, আমরা তাইতেই রাজি।

সুনির্মল বললে, আমিও রাজী—বাদশা খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছি।

ঊষা কিছু কথা বললে না, তবে তার মুখ দেখে মনে হলো সেও রাজী। আর তাছাড়া মাত্র ছ'মাসের তো ব্যাপার। ছ'মাস পরে তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে ঊষার।

*

তা সেদিনই গেলাম শংকরলালের বাড়িতে। ছেলেটা দিনরাত গান-বাজনা নিয়েই থাকে। ব্যাচেলার মানুষ। সারা ঘরখানাই বই আর বাজনার যন্ত্রে ভর্তি। আমার প্রস্তাব শুনে শংকরলাল বললে, আমাকে আবার ওর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন দাদা?

বললাম, তোমাকে জড়াচ্ছি না। তুমি শুধু শুনবে। শুনে বলবে ভুল সুর হয়েছে না ঠিক সুর। যদি ভুল হয় তো শশীভূষণরা ঊষাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আর ঢুকবে না কথা দিয়েছে। তখন আবার ওরা সুনির্মলকে ঢুকতে দেবে। তুমি যে রায় দেবে, দু'পক্ষই তা মেনে নেবে।

শংকরলাল কাশ্মিরী বামুন। বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। সবাই মারা গেছে। বেঁচে আছে শুধু তার সুর। বললে, আমার যে এখন অনেকগুলো কাজ হাতে রয়েছে।

বললাম, এতে আর কতটুকু সময় লাগবে তোমার?

শংকরলাল বললে, কী যে বলেন? এ কি একদিনের কাজ। একদিন শুনলে কি বুঝতে পারবো কিছু? অনেকবার শুনলে তবে মালুম হবে।

—বেশ, তোমার যতদিন সুবিধে হয় শুনবে।

শংকরলালকে কিছুতেই রাজি করানো যায় না। অনেক টালবাহানা করে শেষে রাজি করলাম। শেষে বললে, ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু একটা কথা।

বললাম, কী কথা?

—আমি যখন গান শুনবো, তখন আমাদের কাছে শশীভূষণও থাকতে পারবে না, সুনির্মলও থাকবে না। আমি কারোর সামনে থেকে গান শুনবো না।

তা তাতে মৈত্রমশাইয়ের কোন আপত্তি ছিল না। সুনির্মল এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কী হলো দাদা? শংকরলাল রাজী হয়েছেন?

বললাম, হয়েছে, অনেক বলার পর রাজী করিয়েছি, কিন্তু শংকরলাল যখন বিচার করবে, তোমরা কেউ সেখানে থাকতে পাবে না।

আমি বললাম, তারপর?

প্রভাংশু দত্ত বললে, তারপর শংকরলালকে নিয়ে গেলাম মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে।

বেশ খাতির করে শংকরলালকে বসালেন মৈত্রমশাই।

আর খাতির করে বসাবার মত লোকই বটে শংকরলাল।

শংকরলাল বিনয় করে বললে, দেখুন, আমাকে দিয়ে কেন এই অপ্রিয় কাজটি করাচ্ছেন? আমি মাঝখান থেকে অপ্রিয় হবো দু'পক্ষেরই। দু'জনের মধ্যে একজনের বিপক্ষে তো আমাকে বলতেই হবে।

মৈত্রমশাই বললেন, একটু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে। নইলে আমরা তো গানের কিছুই বুঝি না।

শশীভূষণও ছিল সেখানে। শংকরলালকে সেও খুব শ্রদ্ধা করে আমি জানতাম।

সে বললে, আপনি যা বলবেন, আমি অন্তত তাই-ই মেনে নেবো।

সুনির্মলও ছিল সেখানে। সেও বললে, আমিও মেনে নেবো শংকরলালজী। আমি যদি কিছু ভুল শিখিয়ে থাকি তো সে আমার দোষ নয়, আমাকে আমার গুরুজী বাদশা খাঁ সাহেব যা শিখিয়েছেন, তাই শিখেছি।

শশীভূষণ বললে, ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব আমার গুরু। তিনি যদি ভুল শিখিয়ে থাকেন তো আমিও নাচার।

সেদিন সকলেরই মন খুব খুশি। মৈত্রমশাইয়ের বাড়িতে সেদিন সবাই মিলে চা-সিঙাড়া জলযোগ করলাম। সবাইকে বেশ খুশি-খুশি দেখালো।

ঊষা হঠাৎ শংকরলালকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা শংকরলালজী, পুরিয়াতে শুদ্ধ নিখাদ লাগে, না কোমল নিখাদ লাগে?

শংকরলাল বললে, দেখো, একটা কথা তোমাকে বলে দেওয়া ভালো, সঙ্গীতশাস্ত্র তো বিজ্ঞান নয়, আর্ট। আর্টেরও একটা আইন আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের মত সেটা অত রিজিড্ নয়। এসব জিনিস তোমার গান না শুনে বলা যাবে না।

সুনির্মল আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। বললে, সুরের তাহলে আইন-টাইন কিছু নেই বলতে চান?

শংকরলাল বললে, আইন-টাইন নেই কে বলছে? আইন আছে বৈকি। আর সে আইনটা নিয়েই তো যত কিছু ঝগড়া, কিন্তু...

বলে শংকরলাল চা'য় চুমুক দিলে।

তারপর বললে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে সে আইন কাদের জন্যে?

সুনির্মল বললে, সকলের জন্যে।

শংকরলাল বললে, না।

আমি বললাম, এসব তর্ক এখন থাক না শংকরলাল। আগে তুমি গানটা শোন।

শংকরলাল বললে, হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো আমি এসব কথা এখন তুলতে চাইনি। আমি আগে গান শুনবো, তারপর আমার জাজমেন্ট দেবো। এখন আমি কারোর কথাই শুনবো না।

জিজ্ঞেস করলাম, তা'হলে কবে থেকে ঊষার গান তুমি শুনতে আরম্ভ করবে?

শংকরলাল মনে মনে হিসেব করে বললে, আসছে মাসের সাত তারিখে আমি একটু হাল্‌কা হচ্ছি—তারপর থেকে আমি সাতদিন পর-পর গান শুনবো।

শশীভূষণ বললে, ঠিক আছে।

মৈত্রমশাই বললেন, তাই ঠিক রইলো। আপনি আসবেন, আমার চাকর থাকুক বা আমিই থাকি, দরজা খুলে দেবো।

সুনির্মল বললে, কিন্তু এই পনেরো দিন! এই পনেরো দিন কী হবে?

শংকরলাল বললে, এই পনেরো দিন আপনাদের রেওয়াজ গান-বাজনা বন্ধ রাখতে কিছু আপত্তি আছে?

মৈত্রমশাই বললেন, না, আপত্তি কিসের! ঊষা না-হয় এ পনেরো দিন গাইবে না।

শংকরলাল বললে, তা বেশ, গাইবে না। পনেরো দিন না গাইলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

তা তাই-ই ঠিক রইলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত হয়ে গেল। তারপর আমরা যে যার বাড়ি চলে এলাম।

*

গুরু দত্ত শুনে হাসতে লাগলো। বললে, তাই নাকি? এই সব কাজ করছে শংকরলাল! আমি এতদিন ধরে শংকরলালকে দিয়ে মিউজিক করাচ্ছি, এসব ব্যাপার তো জানতাম না। তা তারপর?

বললাম, আপনি জানতেন যে, শংকরলাল একসময় রেডিওতে চাকরি করেছিল?

—তা আমাকে বলেছে, কিন্তু এ-গল্প বলেনি।

বললাম, এ-গল্প বলবার নয়, তাই বলেনি।

—কেন, বলবার নয় কেন?

বললাম, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমি তো নিজের চোখে শংকরলালকে আগে দেখি নি। প্রভাংশু দত্ত'র কাছে শুনেছিলাম। প্রভাংশু দত্ত আমাকে বলেছিল, আপনি তো বোম্বে যাচ্ছেন, ওখানে গেলে শংকরলালের সঙ্গে দেখা করবেন। শংকরলাল আমার খুব চেনা লোক, আমার নাম করবেন তাঁর কাছে।

—কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ডটা কী করলো শংকরলালজী?

বললাম, শংকরলাল নিজে পাঞ্জাবী হলে কি হবে, শংকরলালের বৌ বাঙালী, এটা জানেন আপনি?

গুরু দত্ত বললে, তা জানি। ওর বৌ'কে কত দেখেছি, আমার বাড়িতে এসে কতবার ডিনার খেয়ে গেছে।

বললাম, তার নামই তো উষা মৈত্র।

—তাই নাকি?

গুরু দত্ত হাসতে-হাসতে আকাশ থেকে পড়লো যেন।

বললে, তা জানতাম না তো।

বললাম, ওই-ই তো। শংকরলাল রোজ উষার গান শুনতো একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে। কাউকে ঢুকতে দিত না সে-ঘরে। সে বিচার করে দেখতো উষা ভুল শিখেছে না ঠিক শিখেছে।

ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় আসতো শংকরলাল, আর রাত ন'টার সময় চলে যেত!

মৈত্রমশাই বলতেন, কী বুঝছেন শংকরলালজী?

শংকরলাল বলতো, শুনেছি গান, তবে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

এমনি করে মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন আর উষাকে পাওয়া গেল না। শংকরলালও তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, তা টেরও পেল না কেউ।

আর ঠিক তারপর বোম্বের এই সিনেমা-ওয়ার্লডে একদিন শংকরলালের খুব নাম হয়ে গেল। লাখ-লাখ টাকা উপায় করতে লাগলো। গাড়ি-বাড়ি সব হলো। প্রথম দিকে মৈত্রমশাই আর মৈত্র-গিন্নী খুব চটে গিয়েছিলেন। জামাইয়ের নামে মামলা করবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন জামাইয়ের বাড়িতেই এসে দু'জন উঠেছেন।

—আর সেই সুনির্মল, শশীভূষণ বাহাদুরজী? তারা কোথায়?

বললাম, তারা সেই এখনও দিল্লীতে আছে। সুনির্মল এখনও দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে বি-গ্রেড ক্লার্ক, আর বাহাদুরজী এখনও দিল্লী রেডিও স্টেশনে তবলা বাজায়, আর শশীভূষণ সেতার।

গুরু দত্ত বললে, কিন্তু শংকরলালের বৌ তো আর গান গায় না।

বললাম, তার আর গান গেয়ে কী হবে! গান গেয়ে যা হতো, তার চেয়ে অনেক বেশিই হয়েছে। সেই দেরাদুন থেকে পাশ করা গেজেটেড অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হলেই-বা এমন কী হতো? এত সুখ তো পেতো না। এখন লণ্ডন যাচ্ছে, প্যারিস যাচ্ছে, টোকিও যাচ্ছে, বার্লিন যাচ্ছে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কল্যাণে এ-যুগে আপনারাই তো এখন ভি-আই-পি।

ততক্ষণে গাড়িটা গুরু দত্ত'র পালি হিলের বাড়ির কাছে এসে গিয়েছে।

তৃতীয়া

কাকে নিয়ে লিখি? কী নিয়েই বা লিখি?

আমার লেখক-জীবনে এত মানুষ আর এত ঘটনা দেখিছি, যে একটা জীবনে তা যদি লিখতে যাই, তো একটা হাতেও তা কুলোবে না আর একশোটা উপন্যাস লিখলেও তা শেষ হবে না। গত বছরে একটা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় যে-কাহিনীটি লিখেছিলাম, তা আজ পর্যন্তও বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় লেখার এই-ই হল দোষ। তাড়াতাড়ি লিখতে হয়, ভাববার সময় পাওয়া যায় না।

অথচ মানুষের মন নামক বস্তুটা তো অত সহজে বশ মানে না। মনকে যদি অত সহজে বশে আনতে পারব, তো লেখক না হয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে থাকলেই তো পারতুম। সেখানে গিয়ে লোটা-কম্বলই আশ্রয় করতুম।

চিরকাল লোকে আমাকে লাজুক-স্বভাবের মানুষ বলে জানে। তারা জানে আমি আড়ালে থাকি তাই আমি কিছু দেখতে পাই না।

কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে নিঃসঙ্গ করেছেন বটে, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিকে করেছেন বড় প্রখর। এই চোখ দু'টো দিয়ে আমি যা-কিছু দেখেছি, সবই আমার অনুভূতির পর্দায় স্পষ্ট করে দাগ কেটে দিয়ে গেছে।

যখন সেই মনের পর্দাখানার দিকে চেয়ে দেখি তখন ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, কত মানুষ আমাকে ভালবেসেছিল, আর কত মানুষ আমাকে ঘৃণা করেছিল! কই, তাদের সকলের কথা তো লিখতে পারি নি কিছু। একটা জীবনে কতগুলো কথা লেখা যায়? এক-একটা মানুষ যেন এক-একটা প্যাসিফিক-ওসান। তাই আমাদের কবি বলে গিয়েছেন—'তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।'

সত্যিই মানুষের বৈচিত্র্যের বুঝি শেষ নেই। আমার সমস্যার কথা শুনে আমার এক বন্ধু বললে কেন, তোমার সেই মিষ্টি-দিদিকে নিয়ে লেখ না—বেশ অদ্ভুত চরিত্রটা তোমার!

আমি বললাম, সে কবে লিখে ফেলেছি।

বন্ধু বললে, তা'হলে সেই তোমাদের বিলাসপুর অফিসের ঘড়িবাবু?

বললাম, সেও আমি লিখে ফেলেছি।

তখন বন্ধু বললে, তাহ'লে পটেশ্বরী বৌঠান? সেই তোমার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময়?

হাসতে-হাসতে বললাম, তাও লিখে ফেলেছি ভাই। আমার 'সাহেব বিবি গোলাম'টা পড়লেই দেখতে পেতে।

তখন বন্ধু বললেন, তাহ'লে তোমাদের গ্রামের সেই 'নয়নতারা'র চরিত্রটা? সেই যে চৌধুরীদের পোড়া বাড়ি, যে-বাড়ির মালিক নিজের পুত্রবধূর ঘরে ঢুকতো রাত্তিরবেলা? সেইটা নিয়ে লেখ না।

বললাম, তুমি আমার কোনও বই-ই পড়নি দেখছি। আমার 'আসামী হাজির' বইতেই সে-চরিত্রটা পাবে।

বন্ধু বললে, তা'হলে কী করবে?

বললাম, কী করব তাই-ই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।

আমার বন্ধু অনেকক্ষণ ভাবলে। বললে, আজকে থাক, দেখি কালকে আমি কোন গল্প দিতে পারি কিনা। এই বলে সে চলে গেল।

আমার জীবনে এ-রকম অনেকবার হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী আমি একলাই। অনেকে ভাবে আমি যখন এত মোটা-মোটা বই লিখেছি, তখন বোধহয় কলম নিয়ে বসলেই আমার লেখা আপনা হতেই চলে আসে।

কিন্তু আসলে কথাটা সত্যি নয়। কেউ তো জানে না যে আমার এই বইগুলোর পেছনে কী অমানুষিক যন্ত্রণার ইতিহাস লুকিয়ে আছে! অন্যেরা সভা-সমিতিতে গিয়ে ফুলের মালা পরে আনন্দ করে, আমার তখন বিশ্রাম নেই। আমার মাথায় তখন গল্পের যন্ত্রণা। মানুষ আমায় যত ভালবেসেছে, আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তার দশগুণ।

যারা আমাকে জোর করে লিখিয়েছে, তারা সব সময়ে যে ভালবেসেই লিখিয়েছে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু ফল হয়েছে তার উল্টো। সেই সব লেখা লিখেই আমি লোকের ভালবাসা পেয়েছি। তাতে দশগুণ আঘাত পেলেও সেই জনসাধারণের ভালবাসাকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছি।

কিন্তু উপন্যাস লিখতে গিয়ে এত নিজের কথাই বা কেন লিখছি?

বলতে পারেন এ-ও গল্পের ভূমিকা বিশেষ। গান গাইবার আগে যেমন আলাপ করে গায়ক। পরিণয়ের আগে যেমন পূর্বরাগের রীতি আছে, এও অনেকটা তেমনি।

আমি যে বন্ধুর কথা বলছি সে মাঝে-মাঝে বলে—তুমি তো নিজে কথা কম বল, কিন্তু তুমি লেখায় অত বাচাল কেন?

আমি জবাবে বলি—ওই, আমি কম কথা বলি বলে—

বন্ধু বলে, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমি সবিশদভাবে বুঝিয়ে বলি—ফুলের তোড়ায় কি শুধু ফুলই থাকে, আর কিছু থাকে না? তুমি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, ফুলের তোড়ায় যত ফুল থাকে তার পাঁচগুণ থাকে দেবদারু পাতা। তাতে কি ফুলের সৌন্দর্য কমে না বাড়ে, তুমিই বলো?

বন্ধু বলে—আমরা অত-শত বুঝি না ভাই, কথা হল তোমার যা বলবার তা ঝটপট বলে দাও, আমরাও তা চটপট শুনে নিই, চুকে যাক ল্যাঠা।

আমি বলি—তা'হলে তো গল্প লেখাটা খুব সোজা কাজ হয়ে যেত হে, তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।

বন্ধু বলে—তা যাই বলো, আমি ভাই তোমাদের সাহিত্য-ফাহিত্য বুঝি না, আমি ডিটেকটিভ্ গল্প পড়তে ভালবাসি, আর তাই-ই পড়ি।

শুধু আমার এই বন্ধুই নয়, পৃথিবীতে এই জাতের পাঠকের সংখ্যা নগণ্য হয়। তাদের মন নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু মনস্কতা বলে যে একটা বস্তু আছে, সেটা নেই। সেটা নেই বলেই ডিটেকটিভ গল্পের পাঠকের সংখ্যাও কম নয়।

গল্প লেখার আগে তার অস্তিত্ব থাকে লেখকের মাথায়। সে অস্তিত্ব সূক্ষ্ম, সে-অস্তিত্ব সদ্য-ভাসমান। মানুষের অগোচরে তার বসবাস! তাকে দেখা যায় না। তাকে রূপ দেবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। আরাম-নিদ্রা-বিলাস ত্যাগ করতে হয়। সাধনা দ্বারাও তেমনি অশরীরী গল্প শরীর-রূপ লাভ করে।

কিন্তু অনেক সময় সাধনার জন্যে কেউ সময়ও দিতে চায় না। বাইরের জগৎ থেকে বাধা আসে। সেখানে সম্পাদক কিংবা প্রকাশক হাতে লাঠি নিয়ে এসে হাজির হয়। এসেই বলে—গল্প দাও।

যদি বলি যে সময় চাই, তাহ'লে সে নারাজ হয়। সে বলে—ও সব আমি বুঝি না, সময় দেবার গরজও আমার নেই, আমার শুধু গল্প চাই। আমাকে গল্প দাও।

এ সত্যযুগ নয় যে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে অধীর হয়ে গেলাম আর কলমের ডগায় গড়-গড় করে গল্প গড়িয়ে পড়ল—তা হবার নয়। এ কলিযুগ, এখানে ক্রৌঞ্চ-মিথুনও দেখতে পাওয়া যায় না, আর বাল্মীকি তো এ-যুগে অদৃশ্য।

এই হেন অবস্থায় আমি আর কী করি, তাই আমার বন্ধুর দ্বারস্থ হলাম। আমার এই বন্ধু বাল্যবন্ধু বললে অত্যুক্ত হয় না। এককালে একসঙ্গে পড়েছিলাম। তখন এই বন্ধু থাকত মালদা'তে। কাকার বাড়িতে মানুষ। আমিও তখন কয়েক বছর মালদা'র স্কুলে পড়েছিলাম।

সেই সময়েই আমার বন্ধু এই জহরের সঙ্গে পরিচয়। জহরের বাবা মারা গিয়েছিল অল্প বয়েসে। বিধবা মা ছিল। কাকা সেই বিধবা বউদি আর ভাইপোকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার বদলে জহরকে বাড়ির সমস্ত কাজ-কর্ম করতে হত। বাড়ির সকলের ফাই-ফরমাশ খাটতে হত।

জহর জানত, তারা গরীব। কাকার গলগ্রহ। তাই প্রাণপণে লেখাপড়ায় ভাল হবার চেষ্টা করত। সে জানত, লেখাপড়ায় ভাল হলে তবেই তার আর বিধবা মায়ের মুখরক্ষা হবে। তখন থেকেই দেখছি সে আমাদের মতন পান, সিগারেট, চা কিছুই খেত না।

সে বলত—না ভাই, ও-সব নেশা-টেশা করা আমার মতন ছেলের পোষাবে না। আমি একে গরীব তার ওপর যদি আমার নেশার দাশ হয়ে পড়ি, তখন কে আমার এই নেশার খরচ যোগাবে। সেই জন্যেই ভাই ও-সব দিকে আমি যাব না।

আমরা জহরের অবস্থা বুঝতুম। তাই ও নিয়ে তাকে আর কোনও দিন পীড়াপীড়ি করিনি। তারপর আমি মালদা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি বাবার সঙ্গে। বাবার অফিস বদলির সঙ্গে আমারও স্কুল বদলি হল। তারপর থেকে জহরের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, আমি কী ছিলাম আর কী হয়ে গেলাম, কিছুই খেয়াল ছিল না। জীবনের সৃষ্টিকর্তা যিনি তাঁর হাতের পুতুল আমরা। বলতে গেলে বোধহয় আমাদের কোনও ক্ষমতাই নেই। আমার মনে হয় গাছের একটা পাতা পর্যন্ত সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছেটি ছাড়া নড়ে না। জানি না, এতে আমাকে কেউ ভাগ্যবাদী বলে বদনাম দেবে কি না। আর সে বদনাম দিলেও আমি আবার বিশ্বাস থেকে একতিলও নড়ব না।

ভর্তৃহরি বলে এক ঋষি কবি ছিলেন আমাদের দেশে। তিনি বলে গেছেন কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে অসৎ, কেউ বলবে পণ্ডিত, কেউ বলবে মূর্খ, সবাই নানাভাবে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি কোনও দিকে দৃষ্টি দেবে না, তুমি একমনে শুধু নিজের কাজ করে যাবে।

কথাটা যে কতখানি সত্যি তা আমি নিজের জীবনে যেমনভাবে বুঝতে পেরেছি, তেমন করে আর কখনও কোনো কথা বুঝিনি! যখন শেষ পর্যন্ত আমার একটা হিল্লে হলো তখন একদিন জহরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে চিনতে পারে নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জহর না?

জহর আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

বললে, আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না ভাই আপনাকে।

আমি আমার নাম বলতেই জহর আনন্দে একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের পরিচয় আবার ঘনিষ্ঠ হল।

আবার আমরা একাকার হয়ে গেলাম আগেকার মত। আর তারপর থেকে আমরা আবার নিয়মিত ভাবে মেলামেশা করতে লাগলাম।

আমার পেশা যা তাতে লোকের সঙ্গে মেলামেশা আড্ডা দেওয়া অপরিহার্য। আড্ডা না দিলে লেখক হওয়া যায়, কিন্তু সুলেখক হওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ আছে। এক-একটা বই লিখি আর তার সঙ্গে পরামর্শ করি। সে আমার এক-একটা পাতা পড়ে আর মতামত জানায়। গল্পটা ভালো না লাগলেও জানায়। আমি জিজ্ঞেস করি, কেন?

জহর বলে, এ-রকম করে প্রেম হয় না। এ পাতাটা নতুন করে করে লেখ তুমি।

তার মন্তব্য শুনে কখনও আমি লেখাটা বদলাই, আবার কখনও বদলাই না। জহর আমার এমন বন্ধু যে সাহিত্যের কিছুই বোঝে না। যে সাহিত্য বোঝে না, তাকেই আমার ভাল লাগে। কারণ তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। সাহিত্য বড় সূক্ষ্ম জিনিস। যে সাহিত্য বোঝে, তার সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি অপ্রিয় কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন নিজের রাত্রের ঘুম, দিনের শান্তি সব চলে যায়।

তার চেয়ে আমার অসাহিত্যিক বন্ধুই ভাল। সে সাহিত্য নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেও তা আমার মনে আঘাত করতে পারে না। যা'হোক, এবার জহরের কথাই বলি।

জহর আমাকে প্রায়ই বলত, ভাই, তুমি কিছু মনে করো না, তোমার উপন্যাস গল্পগুলো বড় ঢিমে তালে চলে। বড্ড ফেনাও তুমি গল্প নিয়ে। যা বলবার ঝপ্ করে বলতে পারো না?

বললাম, মানুষের জীবনও ঢিমে তালে চলে—তা জীবন আর গল্প কি আলাদা?

জহর বলত, কিন্তু ভাই আমরা সাধারণ মানুষ, গল্পের শেষ পর্যন্ত কী হল, তাই জানবার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে থাকি। আর তুমি সেই কথাটাই এত ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলো যে আমাদের আর ধৈর্য থাকে না।

আমি বলতাম, দেখ, সিনেমা আর সাহিত্যের মধ্যে এইটেই হল গোড়ার কথা। যে উপন্যাস যত ঢিমে তালে চলবে ততো ভাল, আর সিনেমা যত গতিসম্পন্ন হবে ততো তা ভাল হবে।

জহর বলত, এ-সব হল তত্ত্বকথা, আমাদের মত সাধারণ লোকেন ও-সব জেনে কোনও লাভ নেই।

জহর একদিক থেকে ভাল। ভাল-এইজন্যে যে কিছু না বুঝে সে অনেক বোঝার ভান করত না। তা শেষকালে আমাকে এই জহরেরই শরণাপন্ন হতে হল। জহর পরের দিন আবার এল। আমার সমস্যার কথাটা তার মনে ছিল। বললে, কী হল? তোমার সমস্যা মিটেছে?

বললাম, না ভাই, এত অল্পে যদি সমস্যা মিটত, তাহ'লে কি আমার ভাবনা? অথচ সময়ও বেশি নেই। এদের শেষ মুহূর্তে যত তাড়া। একটু যদি সময় দেয়, তাহ'লে তো একটু ভাবনার সময় পাই। সময়ও দেবে কম আবার লেখাও ভাল হতে হবে—এ বড় শক্ত জিনিস। এ তো ইলেকট্রিক বালব্ নয়, যে সুইচ টিপলাম আর আলো জ্বলে উঠল! এটা বোধহয় সম্পাদক বা প্রকাশকেরও দোষ নয়, দোষটা এত ব্যস্ত যুগের। কেবল স্পীড্ আর স্পীড্। তাই এযুগেও কোন মহৎ সৃষ্টি আর হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা মিডিওকার বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। যদিও বা কোনও মহৎ শ্রষ্টার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো সে-ও এই জাঁতাকলের ঘুর্ণির তলায় পড়ে পিষে গুঁড়িয়ে যাবে।

জহরের এ-সব কথা বোঝবার মত বিদ্যে ছিল না বা বোঝবার ইচ্ছেটাই ছিল না তার কখনও। আমার কয়েকটা বই বাধ্য হয়ে পড়েছে বলেই তার কিছু সামান্য জ্ঞান হয়েছে সাহিত্য সম্বন্ধে। আমি তাই বললাম, তুমি কিছু ভাবলে আমার জন্যে?

জহর বললে, ভেবেছি। কাল রাত্রিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি। শেষকালে কোথাও কিছু কূল কিনারা না পেয়ে ভাবলাম আমার গল্পটা তোমার কলমে লেখালে কেমন হয়!

আমি বললাম, তোমার গল্প মানে? তোমার নিজের জীবনের গল্প।

জহর বললে, হ্যাঁ, একেবারে আমার পার্সোনাল লাইফের গল্প। একেবারে সত্যি ঘটনা। আমার নিজের কানে শোনা গল্প নয়, চোখে দেখা গল্পও নয়। একেবারে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প।

বললাম, কী রকম, শুনি?

জহর বলতে লাগল, আমি বসে একমনে শুনতে লাগলাম।

আমি আমার বিধবা মা'কে নিয়ে মালদা'য় কাকার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে ছিলাম। অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর আত্মীয়ের বাড়িতে বিধবা মাকে নিয়ে গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী জিনিস, তা তোমরা কেউ বুঝবে না। শুধু লেখাপড়া নয়, সারা বৎসরের স্কুলের মাইনেটা দিত আমার কাকা। আর মা'র আর আমার খাওয়ার আর থাকবার খরচা। এই দয়ার জন্যেই সংসারের সমস্ত কাজই আমাকে আর মা'কে করতে হত।

মা'র যে বয়েস তাতে সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করা বড় কষ্টের। মা'কে দেখে আমার খুব কষ্ট হত ভাই। মা'কে যদি সে-কথা বলতে যেতাম তো মা বলত, তুই চুপ কর, তুই ও-সব কথা আমাকে বলিস্ নি। কেউ শুনে ফেলবে, তখন সর্বনাশ হবে।

মা রান্না করত সকাল থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত। এক মুহূর্তে বিশ্রাম ছিল না তার। মা যে অত পরিশ্রম করতো তার একমাত্র স্বার্থ ছিল আমি। আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো, এইটেই মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত সব সময়। মা'র একমাত্র চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে। আমিই ছিলাম মা'র মাথাব্যথা।

কাকীমা পান থেকে চুন খসলে মা'কে বকুনির একশেষ করত। আমার বড় কষ্ট হত শুনে। নিজেও ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করতাম, ভগবান তুমি মা'র কষ্ট দূর করো—মা'র কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সেদিন মা খুব বকুনি খেয়েছিল কাকীমার কাছ থেকে। আমি দূর থেকে দেখলাম মা আঁচলে চোখ মুচছে। তখন আর কিছু বলতে পারলাম না। রাত্রে মা'কে একলা পেয়ে চুপি-চুপি বললাম, মা কাকীমা তোমায় এত করে বকলে, আর তুমি চুপ করে শুনলে? কিছু বলতে পারলে না?

মা বললে, তুই চুপ কর, তোর ঘরে যা।

আমি বললাম, কিন্তু তোমাকে মিথ্যে দোষ দেবেআর তুমি মুখ বুঁজে সহ্য করবে?

মা বলত, ওরে ওতে কিছু মনে করতে নেই। তুই আগে মানুষ হ'। তুই মানুষ হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে—মাথার ওপর ভগবান তো সব দেখছেন।

আমি বলতাম, না, ভগবান নেই। ভগবান থাকলে কি আর তোমার এই কষ্ট হয়?

মা বলত, অত চেঁচাস নি, কেউ শুনতে পাবে, তখন তোকে নিয়ে কার কাছে যাব বল? কে আমাদের মাথা গোঁজার জায়গা দেবে?

মা'র দুঃখটা বুঝতাম। কিন্তু আমার কষ্ট হত এই ভেবে যে, আমি মা'র কোনও কষ্টেরই প্রতিকার করতে পারলাম না। কবে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো, ততদিন মা'কে কী করে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাব। মা'র তো বয়েস হচ্ছে।

সত্যি, এখন ভাই আমার বয়েস হয়েছে, এখন একটু স্বচ্ছল হয়েছে আমার অবস্থা। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, মা এ-সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যার জন্যে এত কষ্ট করে এখন নিজে বাড়ি করে আরাম করছি, সেই মা-ই আর শয্যাশায়ী, এ-কথা ভাবলেই

আমার খুব কষ্ট হয় ভাই। আমার এ দুঃখ কেউ-ই বোঝে না। আমার এ-কথা কে বুঝবে বল? আমি কাউকেই এ-সব কথা বলি না। আজই প্রথম তোমাকে বললাম। কারণ এ-ঘটনা না বললে তুমি গল্প লিখবে কী করে?

তুমি কলকাতায় চলে আসবার আগে থেকেই এই সব ঘটনা ঘটত। তোমরাও জানতে না যে আমার কী দুঃখ। কারণ কাউকে বলবার মত ঘটনা এ নয়। আমি কোনও রকমে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে স্কুলে যেতাম। পেট আমার সত্যিই কোনও দিন ভরত না।

আমার ভাই ক্ষিধেটা বেশি। অন্য ছেলেরা যে খেত, আমি তার ডবল খেতাম। আমার পেট কিছুতেই ভরত না। তবু মুখ দিয়ে মাকে বলতে পারতাম না যে—মা আর দু'টি ভাত দাও।

মা আমার ক্ষিদের কথা জানত। মা জানত, যে আমি একটু বেশি ভাত খাই। মা রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। কিন্তু কখনও কাছে এসে বলতে পারত না, যে আমি আর দু'টি ভাত নেব কিনা।

কাকীমা সংসারের কাজকর্ম কিছু করত না বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখত সব দিকে। কোথায় জল নষ্ট হচ্ছে, কে বেশি ভাত খাচ্ছে, কে চুরি করছে, সেই দিকেই তার ছিল বেশি নজর। আর মুখটা ছিল বড় মুখর। যাকে সামনে পেত, তাকেই যাচ্ছেতাই করে বকত।

এই পরিস্থিতিতে আমার স্কুল জীবনটা কেটেছে ভাই। একে মা-র ওই কষ্ট, তার ওপর টাকার অভাব। স্কুলে গিয়েও শান্তি নেই। গরীব বলে তোমরাও আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে না। আমি লজ্জায় তোমাদের সামনে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। আর এমন কপাল যে মন দিয়ে হয়তো বই পড়ছি এমন সময় কাকীমা এসে বললে, সরষের তেল নিয়ে এসো তো পোয়াখানেক, তেল একেবারে বাড়ন্ত।

মা বলত, ও এখন পড়ছে, সামনে ওর পরীক্ষা, আমি বরং আসছি দোকান থেকে।

কাকীমা বলত, সে কি, তুমি বাজারে যাবে? পাড়ার লোক কী বলবে বলো তো? লোকে তো তখন আমাকেই দোষ দেবে—বলবে নিজের বিধবা জা'কে কিনা বাজারে পাঠিয়েছে। লোকের মুখ তো আমি চাপা দিতে পারব না দিদি।

মা বলত, খোকার পড়াশুনো আছে তো, ওর সময় নষ্ট হবে, সেই জন্যেই বলছি।

কাকীমা তখন চেঁচিয়ে উঠত। বলতো, তুমি থামো তো দিদি, তোমার ছেলে পড়াশোনা করে তো একেবারে উল্টে যাচ্ছে, কেবল খাই-খাই বাই হলে কি লেখাপড়ায় মন বসে কারো?

আমি তখন কাকীমার কাছে গিয়ে বলতাম—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি কাকীমা, কতটা তেল নিতে হবে?

কাকীমা কখনও একবারে বেশি তেল কিনবে না। ওই এক পোয়া কি আধ পোয়া বড় জোর। তার কারণ মা যদি রান্না করতে গিয়ে বেশি তেল খরচ করে ফেলে! আর শুধু সরষের তেলের ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারেই এমনি। সরষের তেল, ঘি, দেশলাই, মশলা, সব কিছুই অল্প-অল্প কিনবে কাকীমা। কাকীমা বলতো, পয়সা কি অত সস্তা বাছা, কর্তার মুখের রক্ত ওঠা পয়সা, অমনি খরচ করলেই হল। নিজে পয়সা উপায় করতে হলে তখন টের পেতে তোমরা।

সামান্য দেশলাই কাঠি। সেই দেশলাই কাঠিটা পর্যন্ত হিসেব করে খরচ করত কাকীমা। প্রতি রাত্রে একটা করে কাঠি দিত মা'র হেপাজতে। সেই একটা কাঠিতে পরের দিন সকালবেলা মা'কে উনুন ধরাতে হবে। সেই একটা যদি কোনও উনুন জ্বালাতে গিয়ে নিভে গেল তো মা-র ওপরে তম্বি। বকুনির চোটে সেদিন আর বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারবে না।

এত দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমার পাঠকদের ভাল লাগবে কিনা জানি না। তাই, তোমাদের সাহিত্য যদি জীবনের ছবি হয়, তো তাহ'লে এগুলো বাদ দিলে তো জীবনের কথাই হয় না। তা জানি না এ-সব কথা তোমার গল্পের কাজে লাগবে কিনা, তবু বলে যাই আমি। তুমি লেখবার সময়ে যে-গুলো বাদ দেবার তা বাদ দিয়ে বাকি অন্য কথাগুলো লিখো। আমি আসাহিত্যিক মানুষ, আমার যা মনে আসে তাই বলে যাচ্ছি, তুমি আমার মত যাচাই-বাছাই করে নিও।

যা হোক, দিনগুলো যখন এই রকম কাকীমার সংসারে ফাই-ফরমাশ খেটে আর ইস্কুলের মাষ্টার-মশাইদের বকুনি খেয়ে কাটছে, তখন রাতগুলো ছিল আমার ভরসা স্থল। রাতটাই ছিল তখন বলতে গেলে আমার একান্ত নিজের।

কিন্তু আলো জ্বালিয়ে পড়া মানেই তো পয়সার অপব্যয়। এই অপব্যয়টাই কাকীমার কাছে ছিল অসহ্য। তিনি সবকিছু সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু সহ্য করতে পারতেন না কেবল একটা জিনিস—সেটা হচ্ছে পয়সার অপব্যয়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা ছিল কাকীমার কাছে পয়সা নষ্ট করা। কাকীমা রেগে গিয়ে বলত, ইলেকট্রিক লাইট বুঝি খুব সস্তা পেয়েছ দিদি যে লাইট জ্বেলে গল্প করছ? লাইট নিভিয়ে বুঝি গল্প করা যায় না? গতরে খেটে যদি পয়সা উপায় করতে হতো তো বুঝতে পারতে এই পয়সার মহিমা।

হয়তো মা তখন সত্যি-সত্যিই গল্প করছিল না, ঝিয়ের সঙ্গে বাসন মাজা নিয়ে কথা বলছিল। কথা কানে যেতেই কাকীমা ভাবলে বুঝি মা কারো সঙ্গে গল্প করছে।

মা বলত, আমি তো গল্প করিনি, কামিনীকে বলছি ভাতের থালাটা আগে মেজে দিতে।

কাকীমা বলত, তা কামিনীকে হুকুম করছ করো, কিন্তু লাইটটা নিভিয়ে কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

কাকীমার কাছে সব অপব্যয়। অকারণে আলো জ্বেলে রাখা অপব্যয়, ক্ষিধে পাওয়া অপব্যয়, এমন কি লাইট জ্বেলে পড়াশোনা করাও অপব্যয়।

তা আমার একটা সৌভাগ্য ছিল। সৌভাগ্যটা হচ্ছে এই যে আমাদের বাড়িটার ঠিক সামনেই আমাদের বাড়ির গা ঘেঁষে একটা ল্যাম্প-পোষ্ট ছিল। সদরের রোয়াকের ওপর ল্যাম্প-পোষ্টের নিচেয় বসে রাত জেগে লেখাপড়া করতাম। তাতে কাকীমার বকুনি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতুম, স্কুলের পড়াশোনা না করার অভিযোগ মাস্টার মশাইয়ের শাস্তির হাত থেকেও বাঁচতাম।

একদিন রাত্রে এমনি একমনে সেই রোয়াকের ওপর ল্যাম্পপোষ্টের আলোর নিচেয় বসে লেখাপড়া করছি। তখন আমি ক্লাস ইলেভেন-এর ছাত্র। সামনে পরীক্ষা। আমার কোনও দিকে নজর নেই। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা-বারোটা হবে, এমন সময় রাস্তার ওপর থেকে একজন মেয়ের গলা শুনলাম। মেয়েটা বলছে, একটু শুনবেন—

আমি সেদিকে চেয়ে দেখলাম! অল্প বয়েস মেয়েটার। বেশ সাজগোজ। দেখি আমার দিকে চেয়েই মেয়েটা কথা বলছে।

তখন আমার একটু আগ্রহ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলছেন?

মেয়েটি বললে হ্যা, আমার একটা কথা রাখবেন?

আমি বললাম, বলুন কী কথা?

মেয়েটি বললে, আমার একা-একা বড় ভয় করছে, আপনি যদি একটু আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেন–

আমি তো অবাক! কোথাকার কে মেয়ে তার ঠিক নেই, জীবনে কখনও তাকে দেখিনি, তার ওপর আবার অত রাত! আর তাছাড়া মেয়েটার সঙ্গেই বা কেউ নেই কেন? একলা-একলা ওই বয়েসী মেয়ে কেন বাড়ি থেকে এখন বেরিয়েছে?

আমি বললাম, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

মেয়েটা বললে, আমিও তো আপনাকে চিনি না। নেহাত বিপদে পড়েছি বলেই আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

বললাম, বলুন কী করতে হবে বলুন?

মেয়েটা বলল, আমাকে আমার বাড়িতে একটু পৌঁছে দেবেন? সামনের মাঠটার কাছে একটু গুণ্ডাদের ভয় আছে। রাত্তির বেলা ওখানে দিয়ে আমার যেতে ভয় হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটা বললে, বদ্যিপাড়ায়।

নাম শুনে চিনতে পারলাম না জায়গাটা, বললাম বদ্যিপাড়া কোন্ জায়গায়?

মেয়েটি বললে, ওই যে বড় মাঠটা পেরিয়ে নতুন কলোনী হয়েছে, তারই নাম বদ্যিপাড়া।

আমার শোনা ছিল দেশ ভাগাভাগির পর ওখানে অনেক নতুন লোক এসে নিজস্ব বাড়ি করেছে। কিন্তু ওদিকে যাইনি কখনও আগে। বাজারে গিয়ে আমার সঙ্গে অনেক নতুন মুখ দেখে কোথায় তাকে জিজ্ঞেস করতে তারা বদ্যিপাড়ার নাম করছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে একলা বেরিয়েছিলেন কেন?

মেয়েটা বললে, এসেছিলাম সিনেমা দেখতে—নাইট-শোতে।

বললাম, নাইট-শোতে কেন এসেছিলেন? তাহ'লে তো জানতেনই যে বেশি রাত হবে বাড়ি ফিরতে।

মেয়েটি বললে, ইভিনিং-শো'র টিকিট পাই নি যে, তাই নাইট শো দেখলাম। তখন ভেবেছিলাম, কেউ না কেউ ঐ দিকে যাবেই কিন্তু এখন দেখছি কেউ এদিকে এল না।

আমি ভাই কি করবো বুঝতে পারলাম না। একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে ওই রাত্রে যাওয়া, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে!

তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল মেয়েটা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তুমি কল্পনা করতে পারবে নিশ্চয়ই যে তখন আমার কী রকম মনের অবস্থা। আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত কোনও দুর্বলতা ছিল না।

আর তার ওপর সেই অত রাতে, নির্জনে একজন মেয়ে আমার সাহায্য চাইছে, এবং শুধু সাহায্য নয়, সাহায্য না-পেয়ে হতাশ হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত কাঁদছে, এ-ঘটনা যতই রোমাঞ্চকর হোক, আমার মত ছেলের পক্ষে সেটা একান্ত ভীতিজনক।

আমি ভাই সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বিশেষ করে তখন আমার মা, আমার কাকা-কাকীমার কথা মনে এল। ভাবলাম, তারা যদি কেউ দেখতে পায়! তারা দেখতে পেলে আমার যে কী সর্বনাশ হবে, তা আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম। আমার আর্থিক অবস্থা, বিশেষ করে আমার মা'র অসহায় মূর্তি সব কিছু আমার চোখে ভেসে উঠল।

মনে হলো, তখন যদি এমন কাউকে দেখতে পেতাম যে ওই বদ্যিপাড়ার দিকে যাবে, তাহ'লে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। তাহ'লে আমাকে আর বিব্রত হতে হত না।

কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় তেমন ইচ্ছে নয়। তাই আমি যখন কী করব, না করব ভাবছি, তখন মেয়েটার মুখের চেহারাটা দেখে কেমন করুণা হলো। আর তোমাকে এতদিন পরে বলতে লজ্জা নেই, মেয়েটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে আমার মনে হল মেয়েটা সুন্দরী।

কিংবা এও হতে পারে যে মাঝ-রাত্তিরের আলো-আঁধারির একটা মায়া আছে। সেই মায়ার জালে জড়িয়ে গিয়ে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও মতিভ্রম হয়। বোধহয় আমার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা'য় পড়েছিলাম পথ হারিয়ে গল্পের নায়ক নবকুমার যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখন হঠাৎ কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে। তখন নবকুমারের মনে যে অনুভূতি হয়েছে, সেই মেয়েটাকে দেকে আমারও ভাই সেই রকম অনুভূতি হল। ঠিক কপালকুণ্ডলার মত আমাকেও সেই মেয়েটা আকর্ষণ করতে লাগল। মনে হল, সে যদি আমাকে মরতে যেতেও বলে তো আমি যেন তাও যেতে পারি।

তা আমি তাই রকলাম কী, আমি তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে বসলাম। আমি ঠিক কী কথা বলব বলে ভাবছি। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে যেন কথাটা বেরিয়ে গেল। বললাম, আপনার নাম কী?

মেয়েটি বললে, সন্ধ্যা ভাদুড়ী—আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলবেন।

তা সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয়ে কখনও কি কাউকে 'তুমি' বলে ডাকা যায়? আমি বললাম, আপনার সঙ্গে তো আমার বেশি পরিচয় হয় নি, এত অল্প সময়ে আপনাকে কী করে 'তুমি' বলব! আর আপনিও তো আমার সমান বয়েসী মনে হচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আপনি আমাকে 'তুমি' বললে, আমি কিছুই মনে করব না।

এতখানি নির্ভরতায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, একটা মেয়েকে একটু সাহায্য করলে আমার ক্ষতিটা কী? সে জন্যে তো আমার কোনও পয়সা খরচ হচ্ছে না। বললাম, আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি—বলে আমি বাড়ির সদর দরজায় তালা বন্ধ করে আবার রাস্তায় এসে নামলাম। বললাম, চল!

অন্ধকার রাত। সামনে আমার পরীক্ষার কথা আমার মনে রইল না। কাকা বা কাকীমা জানতে পারলে কী বলবে তারা, তাও মনে এল না। এমন কি আশ্চর্য, আমার মা-র স্বপ্নের কথা, মা-র ওপর অত্যাচারের কথা আমার মনে এল না তখন। আমি মেয়েটির পাশে-পাশে চলতে লাগলাম। প্রথমে আমিই কথা বললাম। বললাম, এত রাত্তিরে কিন্তু সিনেমা দেখতে যাওয়া উচিত হয় নি। এখনকার দিনকাল তো খারাপ।

সন্ধ্যা ভাদুড়ী বললে, আমি তো বিকেল বেলাই ছবি দেখাতে এসেছিলাম, কিন্তু টিকিট পাইনি বলে নাইট শোতে দেখলাম।

বললাম, তা এতক্ষণ সময় কোথায় কাটালে?

সন্ধ্যা বললে, একটা চায়ের দোকানে কেবল এক কাপ চা নিয়ে বসে ছিলাম।

বললাম, তোমার এতো সিনেমা দেখার সখ।

সন্ধ্যা বলল, হ্যাঁ আমার খুব শখ, সিনেমা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আপনার সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না?

আমি তখনও কোন সিনেমা দেখিনি। তাছাড়া সিনেমা দেখবার পয়সা তো আমার পকেটে থাকত না! ঐ যুগে গুরুজনরা আমাদেব সিনেমা দেখতে নিরুৎসাহ করত।

তাই বললাম, আমার সিনেমা দেখতে তেমন ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা বললে, সেকি, আপনি সিনেমা দেখেনা না? আপনিও দেখছি ঠিক আমার বাবার মতন, আমার বাবারও সিনেমার ওপর ভীষণ রাগ ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাব বাবার যদি সিনেমার ওপর এত রাগ তো তুমি যে সিনেমা দেখতে এসেছ, এ-কথা বাবা জানলে রাগ করবেন না?

সন্ধ্যা বললে, বাবা জানতে পাবলে তো? আমি মাকে বলে দিয়ে এসেছি যে, যদি বাবা খোঁজ করে তো বলো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

আমি বললাম, তোমাব মা তো ভাল দেখছি।

সন্ধ্যা বললে, আমার নিজের মা নয়, সৎমা।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে গেলাম মেয়েটার সরলতা দেখে। আমি তো অচেনা লোক তার কাছে, তবু আমার সামনে নিজের পারিবারিক কথা বলতে তো লজ্জা করছে না। বললাম, তোমার নিজের মা কবে মারা গেছেন?

সন্ধ্যার মুখটা যেন কেমন করুণ হয়ে উঠল।

বললে, আমি নিজের মা'কে কোনদিন দেখিই নি।

সন্ধ্যার কথা শুনে আমার মনটা সত্যিই ভাই কেমন যেন ভিজে নরম হয়ে উঠল। মা ছিল আমার জীবনের সর্বস্ব। আমি জানতাম, মা থাকার কী সুখ। তাই মা না থাকার দুঃখ কী, তাও আমি কল্পনা করতে পারতাম। তাই যখন শুনলাম যে মেয়েটার মা নেই, তখন সত্যিই তার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল খুব। আমার চোখের সামনে মেয়েটার কষ্টের ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই রাস্তায় চলতে-চলতে তার দিকে চেয়ে দেখলাম, তার চোখ দু'টো কান্নায় ছল-ছল করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সৎমা তোমায় ভালবাসে?

জবাবে মেয়েটা বললে, সৎমা কি নিজের মা'র মত হয় কখনও?

বললাম, তোমার নিজের মা হলে তোমাকে এ-রকম করে একলা কখনও সিনেমা দেখতে দিতেন না। আর তোমার ভাই-টাই কেউ নেই?

মেয়েটা বলল হ্যাঁ, আমার দাদা আছে। বয়েসে আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বিয়ে করার পর দাদা বউদিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মেয়েটা বললে, আমার বউদি লোক ভাল নয়। বরাবর দাদা আমাদের সঙ্গেই থাকত, কিন্তু যেদিন থেকে দাদা একটা চাকরি পেলে সেইদিন থেকেই দাদা অন্যরকম হয়ে গেল। বউদির আর ইচ্ছে হলো না, আমাদের সঙ্গে থাকতে—দাদাকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। যতদিন দাদার চাকরি হয় নি, ততদিন বউদি আমাদের সঙ্গেই থাকত।

বললাম, সব সংসারে আজকাল এই রকমই তো হচ্ছে।

মেয়েটি বলতে লাগল, তখন আমি ছাড়া বাবাকে আর আমাকে দেখবার আর কেউই ছিল না। আমার বয়েস তখন কম। আমি তখন সংসারের কিছুই বুঝতুম না। আমি তখন বাবাকে কেবল জিজ্ঞেস করতুম—দাদা কোথায় গেল বাবা? বাবা বলত—দাদা মারা গেছে! তারপর একদিন নতুন মা এল। সেই নতুন মা'ই আমাদের বাড়ি এসে ভাঙা-সংসারটাকে মাথায় নিলে—নইলে বাবাও বাঁচত না, আর আমিও মরে যেতাম।

রাস্তায় চলতে-চলতে মেয়েটার কাহিনী শুনতে লাগলাম। দূরে দেখতে পেলাম সেই মাঠটা। সেই মাঠটা পর্যন্ত মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ।

কিন্তু কেন জানি না ভাই আমার মনে হতে লাগল, মাঠটা যেন বড় তাড়াতাড়ি এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি মাঠটা না এলেই বুঝি ভাল হতো। মনে হতে লাগল, মেয়েটি আমাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবার অনুরোধ করলে যেন আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।

আমি ভাই তখন থেকেই জানতাম যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য—ওইগুলোই হচ্ছে মানুষের আসল শত্রু। কিন্তু অনেক শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেকে ওইগুলোর খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, এও আমার জানা ছিল এবং পড়াও ছিল। কিন্তু সেই অবস্থায় পড়ে আমি যেন কেমন সব ভুলে গেলাম। মাঠটা পেরোবার পরই আমি কিছু আপত্তি করলাম না। আমি পাশাপাশিই চলতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা অন্ধকার মত জায়গায় এসেই মেয়েটা থমকে দাঁড়াল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি, থামলে কেন।

চেয়ে দেখি মেয়েটার চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে। তার চাউনি দেখে আমার ভয় লেগে গেল। এ কি? এমন করে চাইছে কেন সে আমার দিকে? জিজ্ঞেস করলাম, কী হল তোমার? আমার দিকে অমন করে চাইছ কেন?

মেয়েটা বললে, তুমি কেন এখানে নিয়ে এলে? এই ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে?

আমি? আমি তাকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি? বলছে কী মেয়েটা! আমি আঁৎকে উঠেছি তার কথাটা শুনে। মেয়েটা তখন গলাটা চড়িয়ে দিয়েছে। বললে—আপনি না নিয়ে এলে কি আমি আসতাম? বলুন, আপনার কী মতলব?

আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। অন্ধকার ফাঁকা মাঠ। কিন্তু তবু মনে হয় যেন অন্ধকারের আড়ালে কারা নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি ভয়ে একটু দূরে সরে এলাম। কিন্তু মেয়েটা এবার খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। বললে, কোথায় পালাচ্ছেন? ভেবেছেন, পালিয়ে গিয়ে পার পাবেন? আমি এখুনি চিৎকার করে লোক ডাকব।

ক্ষীণ একটা প্রতিবাদের সুরে বললাম, তুমিই তো আমাকে টেনে নিয়ে এলে। বললে, অন্ধকারে একলা বাড়ি যেতে তোমার ভয় করছে।

মেয়েটা তখন নিজের গলাটা চড়িয়ে দিয়ে বললে, বানানো গল্প বলে নিজের দোষ এড়াতে চাইবেন না, তাতে আপনারই বিপদ হবে—বলুন আমাকে কেন জোর করে এখানে নিয়ে এলেন? কী মতলব আপনার, বলুন?

আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। তবু খানিকটা সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন এসব মিথ্যে কথা বলছ?

মেয়েটা বললে, চুপ করুন, এখন ভালোয়-ভালোয় আপনার আংটিটা খুলে দিন।

মনে পড়ে গেল আমার আঙুলে একটা আংটি আছে। বাবা যখন বেঁচে সেই সময়ে আমার মা আমার পৈতের সময় ওই আংটিটা উপহার দিয়েছিল। সোনার দাম হিসেবে নয়, ওই আংটিটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। আংটিটার ওপর আমার নামের প্রথম অক্ষরটা মিনে করা ছিল। মেয়েটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, দিন আংটিটা, নইলে কিন্তু গণ্ডগোল করব আমি, চীৎকার করে লোক ডাকব।

অন্ধকারে মেয়েটার মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল একদল পুলিশের মুখ। তারপর কোর্টঘর, মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বিচার। আর তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে মা'র ওপর কাকীমার অত্যাচার। মা'র কষ্টের কথা মনে হতেই আমি নরম হয়ে গেলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমি আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে মেয়েটাকে দিলাম। আর কোত্থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকজন লোক একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হলো। সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দেখে মনে হলো সবাই যেন মেয়েটার দলের লোক। মেয়েটাকে নিয়ে তারা সবাই হাসতে-হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—এই শালা, যদি পুলিসে খবর দিস্ তো তোকে আমরা খুন করে ফেলব, সাবধান!

তারপরেই তারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

*

আমি এতক্ষণে গল্প শুনছিলাম। জহর গল্প থামাতেই জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

জহর বললে, আমার জীবনে ভাই এটা-ই দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। প্রথম দুর্ঘটনাটা ছিল আমার বাবার মৃত্যু।

জহরকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। জহরের বাবা যখন মারা যান, তখন সে আমাদের স্কুলে পড়ত না। জহর তখন অন্য কোনও জায়গায় পড়ত। বাবা মারা যাওয়ার পর যখন সে মালদা'য় তার কাকার বাড়িতে মাকে নিয়ে গলগ্রহ হয়ে এল, তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই জহরের এখন এত বয়েস হয়েছে। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে মজবুত হয়েছে তার মনটা। মনে আছে, যেদিন আমরা

মালদা থেকে চলে আসি, সেদিন তার প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। আমাদের বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ বসে-বসে আমার সঙ্গে গল্প করছিল।

সে-সব কথাগুলোও আমার মনে আছে এখনও।

জহর বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে আমাকে চিঠি দিবি তো?

আমি বলেছিলাম, নিশ্চয় দেব। তুই উত্তর দিবি তো?

জহর বলেছিল, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব।

কিন্তু ছোটবেলাকার প্রেম, হতেও যেমন, যেতেও তেমনি। মালদা থেকে কলকাতায় এসে আবার নতুন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে মিশতে-মিশতে মালদার কোন্ এক জহরের কথা মনে পড়তো তো ভাবতাম, তাকে পরের দিনই চিঠি দেব। কিন্তু পরের দিন আর তার কথা মনে মনেই পড়তো না।

জীবনের এইটেই তো মজা। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে যাওয়া, আর অতীতকে ভুলে নিকট ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করে থাকা। এই এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে যাওয়ার পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নামটাই হল 'জীবন'। এই জীবনকে পর্যালোচনা করতে গিয়েই যত গল্প-নাটক-উপন্যাসের সৃষ্টি। এতে এত বৈচিত্র্য যে কোটি বছর ধরে লিখলেও তা ফতুর হবে না। ফতুর হবারই নয়।

তাই আমার স্বভাব এই যে যখন যেখানেই যাই, সেখানেই কোনও লোক পেলে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। হাজার-হাজার গল্প শুনতে-শুনতে তার মধ্যে থেকে হয়তো একটা চরিত্র বা কাহিনী পেয়ে গেলাম। আর তাতেই আমার কাজ হয়ে যেত।

এতকাল এই করেই তো আমার চলছে। কিন্তু এতদিন পরে যে জহরের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে, এও নিশ্চয় ঈশ্বরের বিধান। নইলে এই সময়ে দেখা না হলেই তো হতো।

এখন আমারও বয়েস হয়েছে, জহরেরও বয়েস হয়েছে। সে এখন এ্যাডভোকেট। বলতে গেলে একজন নামজাদা এ্যাডভোকেট সে। বিয়ে হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। যা-যা হলে মানুষ নিজেকে সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তার সব কিছুই তার হয়েছে। মক্কেলও তার যেমন প্রচুর, আয়ও তেমনি প্রচুর। এখন শনিবার দিনটা কেবল তার ছুটি। সেইদিন কোর্ট-মক্কেল, সবকিছু থেকে পালিয়ে সে অজ্ঞাতবাস করে আমার বাড়িতে এসে।

জহর বলে, আমি ঠিক করেছি ভাই, যে এই একটা দিন সবকিছু থেকে আমি ছুটি নেব। এই একটা দিন আমি কোর্টের কথা ভাবব না, টাকার কথাও ভাবব না। আমি শনিবার দিনটা শুধু বিশ্রাম নেব। শনিবার দিনটা আমি এমন লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করব, যারা মক্কেল নয়, জর্জ নয় উকিল নয়, যারা শুধু মানুষ, মক্কেল-জর্জ-উকিল ছাড়া অন্য কিছু যাদের প্রফেশন।

জহর বলত, অভাব আমি অনেক দেখেছি, স্বচ্ছলতাও আমি অনেক দেখলাম। শুধু আমার ব্যাপারেই নয়, আমার মক্কেলদের ব্যাপারেও দেখলাম। যে বেশি টাকা যাদের নেই, যারা সামান্য দিন আনে দিন খায়, তারাই সুখী। বিশেষ করে যারা ভাড়াটে।

জহর আরো বলত, কিন্তু সেটা কি আমার ইচ্ছের অধীনে? ঝঞ্ঝাট যেমন আসে মানুষের জীবনে, তেমনি শান্তিও আসে। কিন্তু দু'টোই ক্ষণস্থায়ী। ঝঞ্ঝাটের সময় মনে হয় এ বুঝি আর কাটবে না, আবার শান্তির সময় মনে হয়, এই শান্তি বুঝি চিরস্থায়ী। কিন্তু ঝঞ্ঝাট আর শান্তি দেবার যিনি মালিক, তিনি বোধহয় তা জানতে পেরে মনে-মনে হাসেন। তাই তিনি কখন যে কাকে কি দেবেন, তা আগে থেকে কেউ কিছু বলতে পারেন না। বিপদে পড়লেই তাই আমরা ভগবানকে ডাকি আর শান্তির সময়ে আমরা অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে যাই। আমরা ভাই আসলে সবাই বুদ্ধিমান। কেউ ভক্তিমান নই। যখন

ঠাকুরকে পাঁচসিকে প্রণামী দিই, তখন ভাবি পাঁচসিকে পূজো দিয়ে কিভাবে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করব। এটা হল বুদ্ধিমানের পূজো। কত লগ্নী করে কতগুণ মুনাফা হল? কিন্তু ভক্তিমানের পূজো! সে অন্য রকম। ঠাকুরকে পূজোর জন্যেই পুজো করা—তাতে-লাভ-লোকসান হলো, তা ভাববার বালাই নেই।

জহর উকিল মানুষ। কথা বেচা তার কাজ। তাই আমার সঙ্গেও যখন সে কথা বলে, তখনও সে ভাবে আমি যেন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট। তাই আমি তাকে বাধা দিই না। যখন তার বক্তৃতা চলছে তখন আমি বাধা দিয়ে বললাম, এ তো ভাই তোমার গল্প হচ্ছে না, এ তো ভাই উপদেশ শোনানো হচ্ছে।

জহর বললে, মনে করে দিয়ে তুমি ঠিকই করেছ ভাই! আমি তো তোমাদের সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না, তাই যা মনে আসে, সেইটেই বলে যাই।

বললাম, এখন এ-সব তো হল, সেদিন সেই ঘটনার পর কী হল, তাই বল?

জহর বলতে লাগল—এখন তো ভাই আমাদের বয়েস হয়েছে, তাই সুযোগ পেলেই পুরনো কথা বলতে ইচ্ছে করে। লোক পেলেই তাই ছোটবেলার কথা বলতে শুরু করে দিই। তা তুমি যখন কালকে বললে যে, তুমি ভেবে পাচ্ছ না যে কী নিয়ে লিখবে, তখন আমি বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম। অন্য দিন ঘুম আসবার আগে কেবল ইনকামট্যাক্স আর মক্কেলের কথা ভাবি। কিন্তু কাল ভাবতে লাগলাম তোমার গল্পের কথা। আর সমস্ত জীবনটাই ভাবতে শুরু করলাম। আগে কী আমি ছিলাম, আর এখন কী আমি হয়েছি।

সত্যি ভাই, একদিন আমি একটু বেশি ভাত খেয়েছিলাম বলে আমার কাকীমা আমাকে খুব কথা শুনিয়েছিলেন, সেদিন আমার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন আমার বাড়িতে চারজন বাইরের লোক খায়। এ সব কোথা থেকে হলো? কে এ সব করালে?

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ছোটবেলাকার সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সেই যে ঘটনাটা আমি একটু আগে তোমাকে বললাম। কিন্তু সেদিনকার আমার অবস্থাটা তুমি বোঝো। আমি লজ্জায় ভাই সেদিন বাড়ি ফিরব কেমন করে বুঝতে পারছিলাম না।

যখন মনের এই রকম অবস্থায় বাড়ির সামনে এলাম তখন চেয়ে দেখলাম। বাড়ির সদর দরজায় যেমন তালা দিয়ে গিয়েছিলাম তেমনি তালা বন্ধই রয়েছে কোথাও কেউ নেই, কেউ টেরও পায়নি। জানাজানি হয়ে গেলে হয়তো খুবই বকুনি খেতাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে কেউ টের পায় নি। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেল ঠিক পরদিনই।

মা কিন্তু দেখতে পেয়েছে ঠিক। আমি তখন খাচ্ছি। হঠাৎ মা বললে, হ্যাঁ রে, তোর আংটিটা কোথায় গেল?

আমি কী বলব, কী জবাব দেব, বুঝতে পারলাম না।

শেষকালে মিথ্যে কথা বললাম, হারিয়ে গিয়েছে মা।

মা রেগে উঠল—আংটি হারিয়ে গেল! তোর পৈতের সময়ে কত টাকা খরচ করে অত ভাল আংটিটা গড়িয়ে দিলাম, আর তুই কিনা সেটা হারিয়ে ফেললি?

আমি বললাম, মা তুমি রাগ করো না, আমি দোষ করে ফেলেছি, এবার থেকে সাবধান হবো।

কাকীমার বাড়িতে মা আমাকে বেশি জোর করেও বকাবকি করতে পারছে না। কারণ কাকীমা টের পেলে আরো অনর্থ বকাবকি করবে।

মা গলা নামিয়ে বলতে লাগল, আমি তখনই বলেছিলাম ও-আংটি তুই পরিস নি, বড় হয়ে পরবি, তা আমার কথা তো শুনলি না, এখন তুই বোঝ। আমার আর কী? আর কি কখনও অমন আংটি গড়িয়ে দিতে পারব? কখনও কি তেমন অবস্থা হবে?

মা'র গালাগালি আমি সব চুপ করে হজম করে নিলাম। কিছু বলবার আর মুখ রইল না আমার। আর তারপর আস্তে-আস্তে সবই সহ্য হয়ে গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে জীবনে আর কখনও বিলাসিতা করব না। আংটিটা অবশ্য দেখতে খুব ভাল ছিল। সেকালে ওইটার জন্যে স্যাকরা খুব দামও নিয়েছিল শুনেছি।

কিন্তু সেই ব্ল্যাকমেলের ঘটনাটা ভাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ওই ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো আমি আজ যা হয়েছি, তা হতে পারতাম না। সেই যে সামান্য একটা আংটি চুরি হয়ে গেল, তার পরদিন থেকে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আমার দৃষ্টি বদলে গেল। আমি নূতন করে জগৎকে দেখতে শুরু করলাম। সামান্য একটা আংটি আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে গেল ভাই।

এর পর অনেক বছর কেটে গেছে। ঝড়ের মতই কেটে গেছে বলতে গেলে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই জানতে পারিনি ভাই। তার মধ্যে আমার মা'র মৃত্যুটা ছিল তৃতীয় দুর্ঘটনা।

আমার সেই আংটি হারানোর দুঃখ মা'র আর জীবন পর্যন্ত যায় নি। টাকার জন্যে ঠিক নয়, ওইটে আমার বাবার প্রথম আর শেষ উপহার। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা অনাথ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাবার শেষ স্মৃতি ওই আংটিটা।

সেই আংটিটা ভাই খুব ভাল ছিল। ভাল বলতে বলছি খুব দামী। অনেকখানি সোনা যেমন ছিল, তেমনি তার ওপর মিনের জমি। সেই মিনের জমির ওপর একটি সুন্দর 'জে' অক্ষর লেখা। আমার পৈতের সময় বাবা ওই আংটিটা আদর করে আমাকে দিয়েছিলেন। আর আমি এমন পাষণ্ড যে সেই আংটিটাই কিনা হারিয়ে ফেললাম।

মা শেষ জীবনে অসুখে বিছানায় শুয়ে থেকেও কেবল সেই আংটিটার কথা বলত। আমার স্ত্রীকে বলত—বউমা, জহরের হাতে কিছছু টাকাপয়সা দিও না, ওর বড় হারানো স্বভাব আছে। ওর আঙুলে একটা আধ ভরির আংটি গড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর পৈতের সময়, সেটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললে। ও বড় আখখুটে ছেলে, সব জিনিস কেবল হারাবে।

আমি তখন কত বড় হয়ে গিয়েছি, উকিল হয়ে আমার খুব পসার হয়েছে, কলকাতা শহরে বাড়ি করেছি, তবুও মা'র চোখে আমি সেই তখনও শিশু ছিলাম। মা'র চোখে আমি আর কখনও বড় হলাম না। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ-গো, তুমি নাকি ছোটবেলার তোমার পৈতের আধ ভরি সোনার আংটিটা হারিয়ে ফেলেছিলে?

আমি প্রশ্নটা শুনে হাসতাম। জিজ্ঞেস করতাম, তাহ'লে মা তোমাকেও কথাটা বলেছে?

স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, সেটা নাকি মিনে করা আংটি ছিল, আর তাতে তোমার নামের প্রথম অক্ষরটা লেখা ছিল?

অথচ মা জানত যে তখন ও-রকম একশোটা আংটি কেনবার অবস্থা আমার হয়েছিল। কিন্তু সামান্য আধ ভরি সোনার আংটির শোক মা শেষ জীবন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি।

এখনও আমার দুঃখ মা'র কথা ভেবে। দুঃখ-কষ্ট করে আমাকে মানুষ করার পেছনে মা'র যে আনন্দ হবার কথা, তা হয় নি ভাই। আমার যখন ভাল অবস্থা হল মা-ও তখন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। সেই বিছানায় শুয়ে-শুয়েই মা স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করত—আজ কি মাছ এসেছে বাজার থেকে বউমা?

স্ত্রী বলত মাছের নাম। কোনও দিন ইলিশ, কোন দিন গল্‌দা চিংড়ি, কোনও দিন আবার রুই মাছ। ইলিশ মাছ বাজার থেকে এসেছে শুনলেই মা আমার স্ত্রীকে মাছ কি রকম করে রাঁধতে হবে, শিখিয়ে দিত।

মা বলত, ইলিশ মাছটা ভেজো না বৌমা, বুঝলে? ইলিশ মাছ ভাজলে নষ্ট হয়ে যায়, জহর ভাপে রান্না ইলিশ মাছ খেতে ভালবাসে। ইলিশ মাছ একটা মুখ ঢাকা কৌটার মধ্যে পুরে ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেবে। তোমার ভাতও সেদ্ধ হবে, আবার মাছটাও ভাপে সেদ্ধ হবে।

মা বিধবা মানুষ, মাছ খেত না। কিন্তু আমি মাছ খেতে ভালবাসি, সেই জন্যে স্ত্রীকে তাই শিখিয়ে দিত। আর শুধু কি মাছ?

একদিন আবার জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ বউমা, আজ কি-কি বাজার এসেছে?

আমার স্ত্রী পরপর তালিকাটা বলে যেত। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি।

মা বলত, বউমা, কিছু মনে করো না তুমি, তোমাদের বাজার করাটা বাপু ভাল নয়। রোজই শুনছি সেই একই বাজার। কেন, বাজারে কি আর কিছু জিনিস নেই? রোজ কেবল সেই এক থোড়-বড়-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়?

আমি কি খেতে ভালবাসি, মা'র তা মুখস্থ ছিল। সকালবেলা বাজারে যাবার আগে মা বলে দিত সেদিন কি রান্না হবে না হবে। অথচ মা নিজে খেত শুধু সাবু আর বার্লি। ওই সাবু আর বার্লি খেয়ে-খেয়ে মা'র অরুচি হয়ে গিয়েছিল শেষকালটায়। মুখে কিছুই দিতে পারত না, মুখে দিলেই সব বমি হয়ে যেত।

আমি প্রতিদিনই কোর্ট থেকে এসে বাড়ির ভেতরে মাকে দেখতে যেতাম।

পাশে বসে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, আজ কেমন আছো মা?

আমাকে দেখেই মা বলত, ওরে, বউমা একেবারে কিছুই রান্না করতে পারে না রে জহর!

আমি বলতাম, কেন মা, তোমার বৌমা তো ভালই রান্না করে।

মা বলত, ছাই, ছাই রান্না করে। আজকে শুনলাম নাকি ছোলার ডাল রান্না করেছে। শুনে জিজ্ঞেস করলাম, ছোলার ডাল যে রেঁধেছো, তাতে কী দিলে? আমি শুনে অবাক রে! বউমা ছোলার ডালও রাঁধতে জানে না। ছোলার ডালে নারকোল কুঁচো আর তেজপাতা দিতে হয়, তাও বউমা জানে না। আমি তখনই বললাম, দেখো বউমা, জহর ও-ছোলার ডাল মুখে দিতে পারবে না!

আমি বললাম, হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ, আমি ও-ডাল মুখেই দিই নি আজ।

মা বলত, মুখে দিতে পারবি কী করে? বউমা যখনই বলেছে, তখনই আমি বুঝেছি ও-ডাল তুই মুখে দিতে পারবি না...

বউমা রান্না সম্বন্ধে অপটু, তা শুনলে মা খুব খুশি হত। তার পর দুঃখ করে বলত, আমার শরীরও এই সময় এমন হলো যে তোকে আমি নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারছি না।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, তাতে কী হয়েছে, তুমি যখন ভাল হয়ে উঠবে তখন আবার আমাকে রান্না করে খাওয়াবে। এখন দু'দিন একটু কষ্ট না হয় করলাম।

মা বলত, আর কি আমি ভাল হব রে! আমার তোকে রান্না করে খাওয়াতে তো আমার ভালই লাগে, কিন্তু ভগবান যে আমায় মেরে রেখেছে। আমি কী করব বল?

আমি মা'কে সান্ত্বনা দিতাম, আর মা'র রান্নার খুব প্রশংসা করতাম। সে-সব শুনে মা কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ শান্তি পেত।

আমার জন্যে মা'র যে কত দুশ্চিন্তা ছিল, তা মা'র শেষ জীবনে আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছিলাম। বরাবর দুঃখ করত যে নাতির বিয়েটা মা দেখে যেতে পারলে না। আমার ছেলে তখন ডাক্তারী পড়ছে। নাতবউয়ের মুখ না দেখে মারা যাওয়া মা'র কাছে ছিল বড় কষ্টের। মা তাই দুঃখ করত—জ্যোতির বউ আমি আর দেখে যেতে পারলাম না, এইটেই আমার দুঃখ রয়ে গেল।

জ্যোতি জন্মাবার পর থেকে সে তার ঠাকুরমার কাছেই থাকত। মা'র তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এক হাতে রান্না, আর এক হাতে নাতিকে দেখাশোনা। তবু মা'কে কখনও ক্লান্ত হতে দেখিনি। আগে মা নিজের দেওরের বাড়িতে খেটেছে।, আবার সংসারেরও ঠিক তেমনি মুখ বুঁজে খেটে যেত। অথচ আমার বাড়িতে ঠাকুর-চাকর-ঝি কোনও কিছুরই অভাব ছিল না।

আমি বলতাম, মা, তুমি একটু বিশ্রাম করো না, এখন আমার অবস্থা ভাল হয়েছে, কাজ করবার জন্যে তো যথেষ্ট লোক রেখেছি, এখন তুমি একটু বিশ্রাম নাও না।

মা বলত, লোক রেখে তো আমার ভারী উপকার হয়েছে, কেবল মাইনে খাওয়ার লোভ সকলের, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। আমি যেদিকে দেখব না, সেই দিকেই চিত্তির।

আমি বলতাম, ওদের দেখা-শোনা করার জন্যে তো তোমার বউমা রয়েছে, সে-ই দেখছে। তোমার এখন বয়েস হয়েছে, পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকলেই পারো।

মা বলে, বউমা এ-কালের মেয়ে, ভেজাল খেয়ে মানুষ। বউমা কী করে এতগুলো লোককে দেখা-শোনা করবে? আমরা সেকালের খাঁটি দুধ, খাঁটি তেল-ঘি খেয়েছি, অত সহজে আমাদের শরীর খারাপ হয় না। তুই লোকজন সব ছাড়িয়ে দ্যাখ্, দেখবি আমি একলা সংসারের সব দিক এক হাতে সামলাব।

ফলে মা-হবার তাই হলো। মা একদিন শুয়ে পড়ল। অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? সংসারের অন্য সকলকে দেখতে গিয়ে নিজের দিকটা একেবারে নজর দেয়নি। অবেলায় খেয়েছে। অত্যাচার করেছে প্রচুর। পাছে চাল নষ্ট হয়, তাই আগের দিনের ভাত-জল দিয়ে ভিজিয়ে পরের দিন খেয়েছে। তার ওপর একবেলা উপোস। বার-তিথি, একাদশী-পূর্ণিমা সব মেনেছে। আর বিছানায় শুয়েই কি নিশ্চিন্ত থেকেছে? ডালে কি ফোড়ন দিতে হবে তাও বলে দিয়েছে ঠাকুরকে, তেমনি আবার রাত্তিরে সদর দরজায় তালা লাগানো হয়েছে কিনা, তাও খবরদারি করেছে।

আজ মনে হয়, মা যদি এখন বেঁচে থাকত, তাহ'লে বোধহয় আমার সংসারে খরচ এত বাড়ত না। আসলে মা'ই ছিল আমার জীবনে লক্ষ্মী। যেদিন থেকে মা চলে গেছে, সেইদিন থেকেই আমার সংসারে অলক্ষ্মী ঢুকেছে।

এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম জহরের মুখ থেকে। বললাম, কেন, তোমার সংসারে আবার অলক্ষ্মী ঢুকল কী করে?

জহর বললে, সেই কথা বলতেই তো এত সাতকাণ্ড ভূমিকা ফাঁদছি হে। আগে গোড়ার ভিৎটা পাকা না করলে, সাত-তলা বাড়ি তুলব কী করে?

আমি বললাম, পূজা সংখ্যার উপন্যাস, বুঝতেই তো পারছ। ভিত্ বেশি পাকা করতে গেলে অনেক সময় নেবে, পাঠক-পাঠিকা তাতে অধৈর্য হয়ে উঠবে। আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের তো জানো তুমি, তারা গল্পের শেষে কী ঘটবে, সেইটেই আগে-ভাগে জানতে চায়।

জহর বললে, আমি ভাই সে-সব জানি না। আমি উকিল এ্যাডভোকেট মানুষ, আমি শুধু এই জানি যে কেসটা স্ট্রং করতে গেলে তার এভিডেন্সগুলো স্ট্রং করতে হয়—আমার মা'র কথা এত বিশদ করে এই জন্যেই বলছি যে ওই আংটি হারাবার পর থেকে মা তার দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারেনি। যখন বড় হলাম, তখন ও-আংটিটা আর আমার হাতে আঙুল ঢুকত না। আমি ওটা আর তার পরতাম না। মা বলেছিল যে, পৈতের আংটি খুলতে নেই। তাই একটা স্যাকরা ডেকে আরো বড় করে দিয়েছিল যাতে আমি আঙুলে পরতে পারি। আগেকার আংটির চেয়ে এ আংটিটা দেখতে আরো ভালো হল, আরো দামী।

তারপর মা'র পীড়াপীড়িতে আমার ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলাম। ছেলের বিয়ে করতে ততো ইচ্ছে ছিল না। কারণ তখনও সে ছাত্র। কিন্তু ঠাকুরমার ইচ্ছে পূরণ করতে গেলে বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।

ডাক্তারী পড়া ছাত্রের মত পাত্র যে আজকালকার বাজারে কত লোভনীয়, তা তুমি নিশ্চয় জান। আমার ছেলে তাই-ই। তার ওপর স্বভাব-চরিত্র, স্বাস্থ্য আর রূপ। যৌতুক সম্বন্ধে আমার কোনও দাবি-দাবা ছিল না।

এমনি করে প্রায় শ'খানের পাত্রী দেখার পর শেষ পর্যন্ত একটি পাত্রী পছন্দ হয়ে গেল, ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ। প্রথম বংশ। কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত আর বনেদী পাড়া হল জোড়াসাঁকো। সেইখানেই তাদের সাত-পুরুষের বাস। পাত্রীর বাবা নেই। বিধবা মা আছে। তার একমাত্র মেয়ে! বিরাট সম্পত্তির মালিক। মা মারা যাবার পর ওই সম্পত্তির মালিক হবে জামাই।

এই রকম সব লোভ দেখালে আমাকে ঘটক।

আমি উকিলমানুষ ও-লোভে আমি ভুলিনি। কারণ আমি আমার পেশার সূত্রে উত্থান যেমন দেখেছি, পতনও দেখেছি তেমনি। সম্পত্তির সরিকি-ঝগড়াতে কত বংশকে ধ্বংস হয়ে যেতে যেমন দেখেছি, তেমনি কত বিত্তবান মানুষকে তার অতুল ঐশ্বর্য একটি সইতে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিয়ে ফতুর হতেও দেখেছি।

তাই সম্পত্তির লোভে আমাকে কাবু করতে পারলে না ঘটকরা।

বংশ, স্বাস্থ্য আর রূপ এই তিনটেই ছিল আমার পছন্দের ইয়াডস্টিক বা মানদণ্ড। বংশ ভাল মেলে তো স্বাস্থ্য মেলে না, আর বংশ স্বাস্থ্য দুই মেলে তো রূপ মেলে না।

মা ছটফট করত। আমি পাত্র দেখে বাড়িতে এলেই প্রথমে আমাকে মা'র কাছে যেতে হত। গিয়ে বলতে হতো কেমন পাত্রী দেখলাম। মা না শুনে কিছুতেই ছাড়বে না।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে কী-রকম পাত্রী, পাত্রীর কে-কে আছে। এমন কি তারা কী খাওয়ালে, কুটুম কেমন, এমনি নানা কথা মা'কে সবিস্তারে বলতে হবে। মাকে না বলে জীবনে আমি কোনও কাজ করিনি। তার ওপর নাতির কত সাধের বিয়ে। মা'র যদি দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকত তো আমাকে কিছুই করতে হতো না, মা একলাই সব ঠিক সামলাত। কিন্তু মা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ মা'র অনুমতি না নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি নি। সব শুনে মা হয়তো বলত, না রে জহর, তুই এখানে ছেলের বিয়ে দিস্ নি।

আমি অবাক হয়ে যেতাম। বলতাম, কেন মা?

মা বলত, শুধু চা খাইয়ে তোকে ফেরত দিলে, এ-সব বাড়িতে আমি নাতির বিয়ে দেব না।

মা'র অনেক বাতিক ছিল। আমার জন্মের কিছুদিন পরেই মা বিধবা হয়েছে। পরের বাড়ির রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে, এই কষ্ট পেয়েই মা জানত কাকে বলে ভদ্রতা, কাকে বলে বনেদিয়ানা, কাকে বলে কুটুম্বিতা।

মা-র যখন আপত্তি, তখন সেখানে সম্বন্ধ করা সম্ভব হল না। শুধু চা খাইয়ে যারা ভাবী কুটুমকে আপ্যায়ন করে, তারা যে বনেদী বংশের লোক নয়, তা মা'কে বলে দিতে হত না।

শেষকালে সেই জোড়াসাঁকোর বনেদী বাড়িতেই সম্বন্ধটা পাকা করলাম। মা-ও বললে, রূপোর রেকাবিতে করে সন্দেশ দিয়েছে, ঘোলের সরবৎ খাইয়েছে, এ-ঘটনা মা'র কাছে বনেদীয়ানার নজীর।

মা আরো বললে, মেয়ের মাথায় চুল কেমন? খুলে দেখেছিস তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ মা, আমাকে বলতে হয়নি, ওরা নিজেরাই খোঁপা খুলে দেখিয়ে দিলে, আজকালকার ঝুটো খোঁপা নয়, একেবারে কোমর পর্যন্ত চুল।

শুনে খুশী হল মা। তারপর জিজ্ঞেস করলে, আর পায়ের আঙুল? ফাঁক-ফাঁক না লাগা-লাগা?

বললাম, লাগা-লাগা।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে, আর গড়ন-পিটন?

আমি বললাম, সে তো আমি তোমাকে বলেইছি মা, সেদিক দিয়ে কোনও খুঁত নেই।

শেষ পর্যন্ত মা যখন সম্মতি দিলে তখন আর দেরি করলাম না। ওখানেই পাকা কথা দিলাম।

একদিন ঘটা করে আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। তখনকার দিনে খাওয়ানোর জন্যে তো কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না। বরযাত্রীরা খেয়ে সহাস্যমুখে প্রশংসা করলে। আর তারপর আমরা বউ-ভাতের দিনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করছিলাম, আত্মীয়-স্বজন সবাই তারও খুব প্রশংসা করলে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বিশেষ করে মা যখন তাঁর নাতবউকে দেখে খুশী হয়েছে, তখন আমার কিছু বলবার রইল না।

*

জহর গল্পটা থামাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ-কি, এখনও তোমার ভূমিকা চলছে নাকি? পাঠক-পাঠিকা যে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

জহর বললে, ভাই ওসব তুমি লেখাবার সময় ঠিক করে নিও। আমি তো লেখক নই, আমি শুধু তোমাকে গল্পের কাঁচা মাল জুগিয়ে যাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে তোমার দরকার মত মাল-মশলা ঢুকিয়ে নিও।

আমি বললাম, যা-হোক, সে আমার ব্যাপার, আমি বুঝব। শুধু দেখবে শেষকালে যেন ক্লাইমেক্স ঠিক থাকে। সেখানেই গল্প-লেখকের কেরামতি।

জহর বললে, সে হয়তো আছে, হয়তো নেই। আমি শুধু যা ঘটেছিল, তাই ঠিক-ঠিক বলে যাচ্ছি কোথাও এতটুকু বাড়াবও না। একটু আগেই বলছি যে আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। আমি সেই বিয়ের পরই আবার নিজের ওকালতির কাজে জড়িয়ে গেলুম। আমি নতুন বৌকে বলে দিলাম—বউমা, তোমার সংসারের কাজ কিছু দেখতে হবে না। তুমি শুধু আমার মা-কে একটু সেবা করবে, আর কিছু তোমায় করতে হবে না।

কিন্তু আমি যখন ভাবলাম যে এইবার আমার জীবনে পরম সুখ পেলাম তখন বোধহয় আকাশের আড়ালে অদৃশ্য যে-দেবতা থাকেন, তিনি একটু হাসলেন।

গল্প শুনতে শুনতে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন, ভগবানের কথা বলছো? ভগবান হাসলেন কেন?

জহর বললে, হাসলেন এই ভেবে যে মানুষ কত আশাবাদী। দেখো আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে 'আশায় বাঁচে চাষা'। এ কথাটা শুধু চাষীদের বেলাতেই যে সত্যি তা নয়, সমস্ত মানুষের বেলাতেই সত্যি। হিটলার যদি জানতেন যে শেষে তাঁর ওই মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাবেন, তাহ'লে কি লেখাপড়া শিখতেন, না কাব্য সাধনা করতেন? সম্রাট সাজাহান যদি জানতেন যে, ছেলেরা শেষ জীবনে তাঁকে দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রাখবে তাহ'লে কি তিনি বিয়ে করতেন? নেপোলিয়ন যদি জানতেন যে, তাঁকে শেষজীবনে সেন্ট্ হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে তাহ'লে কি তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসতেন? আর আমিও যদি জানতুম যে, আমার পুত্রবধূ এসেই আমার জীবন বিষময় করে দেবে, তাহ'লে কি আমি ছেলের বিয়ে দিতুম ওখানে ওই পাত্রীর সঙ্গে?

আমার বেয়ান বিধবা হলেও অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক। আমি জানতুম যে বিধবা বেয়ানের মৃত্যুর পর একদিন আমার ছেলেই তাঁর সব সম্পত্তির মালিক হবে। তা সম্পত্তির লোভ আমার নেই। আমি যে লোভী মানুষ নই, তা আমি বলছি না। আমারও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ-মাৎসর্য সবই আছে।

কিন্তু ধর্মের লোভ কি খারাপ? সততার লোভে কি খারাপ? পুণ্যের লোভ কি খারাপ? আমার ভাই, সেই লোভ আছে। আমার ভাই সুনামের লোভ আছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে চেয়েছিলাম যে আমার সুনাম হোক। তা সেই সুনামেই আমার আঘাত লাগল।

আমার ছেলের বিয়ে দেবার পর থেকে বাড়িতে এসে শুনতে পেতাম যে ছেলের শাশুড়ি নাকি এসেছিল তার মেয়েকে দেখতে।

ছেলের শাশুড়ি এসেছে বাড়িতে, সুতরাং বাড়ীর সবাই তটস্থ।

বড়লোক কুটুম, তা সত্ত্বেও যখন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে তখন মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে হবে। একমাত্র কন্যা, তাকে ছেড়ে থাকতে যে কত কষ্ট, তা সবাই বুঝতে পারে।

বউমার মা কিন্তু প্রথমেই মা-র কাছে এসে বসে। পাশে বসে জিজ্ঞেস করে—মা, কেমন আছেন আজকে?

মা-ও খুব খুশী। নাতির শাশুড়ি যে এমন হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারে নি মা।

মা-র কাছে আমি যেতেই মা বলতো, জানিস্ বউমার মা এসেছিল আজকে। আমার কাছে বসে-বসে অনেক কথা বললে। অত বড়লোকের বউ অথচ একটুকু দেমাক নেই তার।

মা খুশী হলেই আমি খুশী হতুম। মা সারা জীবন দুঃখ-কষ্টে কাটিয়েছে। শেষ-জীবনে নাতবউয়ের মুখ দেখবার সাধ ছিল, তাও মিটেছে। তারপরে কুটুম এত ভাল হবে, তাও কল্পনা করতে পারেনি মা। সেই সাধও মা-র মিটল। এসব দেখে আমারও ভাই খুব আনন্দ হল। আমার জীবনে মা-ই সব। মাঝে-মাঝে আবার বউমার মা ভাল কিছু রান্না রেঁধে নিয়ে আসত আমার মা-র জন্যে।

সে কথা আবার আমার মা আমাকে বলত। বলে আমার স্ত্রীকে আবার বলত, বউমা, তুমি এই রকম রান্না রাঁধতে পার না? এই রান্নাই জহর খেতে ভালবাসে বউমা, আহা আমার যদি আজকে গতর থাকত, তো জহরের এত কষ্ট হত? জহর সারাদিন খেটে-খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করছে, আর তাকে দেখবারই কেউ নেই—আমায় চোখ দিয়ে এও দেখতে হচ্ছে!

সমস্ত যখন এই ভাবেই চলছে, তখন হঠাৎ খবর এল বউমার মায়ের নাকি খুব অসুখ। বউমাকে নিয়ে আমার ছেলে শাশুড়ীকে দেখতে গেল। ছেলে বউমাকে সেখানে মা'র কাছে রেখে বাড়িতে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর শাশুড়ি কেমন আছে?

ছেলে বললে, ওষুধ দিয়েছি। এখন একটু ভাল আছেন, কালকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। দেখি তিনি কি বলেন?

জিজ্ঞেস করলাম, রোগটা কী?

ছেলে বললে, আমার তো মনে হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে গাফিলতিতেই এইটে হয়েছে। সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনই তো উপোস!

আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, উপোস? উপোস করেন নাকি খুব? অত উপোস করেন কেন?

ছেলে বললে, ওই বলে কে? আমি মা'কে অনেক বলেছি, কিন্তু তিনি কেবল বলবেন, আমি বিধবা মানুষ, আর ক'টা দিনই বাঁচব, পূজো-অর্চনা না করলে পরলোকে গিয়ে ভগবানের কাছে আমি কী জবাবদিহি করব বাবা?

ছেলে শাশুড়িকে বলত, তা আপনার জীবনটা বড়ো, না পূজোটা বড় মা?

ছেলের শাশুড়ি বলত, ও-কথা বলো না বাবা, ও-কথা বলতে নেই, ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে ও-কথা বলা উচিত নয়, তাতে অমঙ্গল হয়।

আমার ছেলে তবু শাশুড়িকে বোঝাত—মা, এবার থেকে আমি মা ডায়েট চার্ট করে দেব, আপনি সেই অনুযায়ী খাবেন।

জামাইয়ের কথা শাশুড়ি অমান্য করতে সাহস করত না। মুখে বলত, তা শরীরের জন্য করতেই হবে বাবা, তুমি যখন বলছ, তখন মেনে চলতেই হবে। কিন্তু দু'-একদিন পরেই আবার সব নিয়ম পালটে যেত। হঠাৎ হয়তো পুরুত মশাই এসে হাজির হত।

পুরুত মশাই যা বিধান দিতেন, গিন্নীও তাই-ই করতেন। আমার ছেলের শাশুড়ি ডাক্তারের কথার চেয়ে ঠাকুরমশাইয়ের কথাকে বেশি মূল্য দিতেন। এমন কোনও ব্রত নেই, যা তিনি পালন করতেন না। এমন কোনও পূজো নেই, যা তিনি করতে চাইতেন না। লক্ষ্মী পূজো থেকে শুরু করে মনসাপূজো পর্যন্ত সমস্ত পূজোই তাঁর করা চাই।

বউমা বলত, মা তুমি এত পূজো, এত ব্রত, উপোস করো কেন?

মা বলত, করি কি আমার নিজের জন্যে রে, করি তোদের জন্যে। তোদের ভালোর জন্যেই তো দিন-রাত আমার চিন্তা।

সব শুনে আমার মা বলত, ভালোই তো। অনেক পুণ্যি করে এসেছিল তোমার মা, তাই যেমন ইচ্ছে পূজো-ব্রত সব কিছু করতে পারছে। আর আমার দেখ দিকিনি কপাল, একনাগাড়ে শুয়ে পড়ে আছি তো পড়েই আছি। আর জন্মে যে কত পাপ করেছিলাম, তাই আমার এত ভোগান্তি।

মা-র অসুখ বলে বউমাও সব সময়ে আমাদের বাড়ি থাকতে পারত না। এখানে দু'দিন থেকেই আবার ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে চলে যেতো। ছেলে রোজ একবার করে শ্বশুরবাড়িতে যেত আর অনেক রাত্রে এ-বাড়িতে ফিরে আসত। ছেলে বাড়িতে এলেই আমি জিজ্ঞেস করতাম, আজ কেমন আছেন তোমার শাশুড়ি?

ছেলে বলত, কাল ভাল ছিলেন, কিন্তু আজ আবার শরীরটা খারাপ হয়েছে।

—কেন? হঠাৎ আবার শরীর খারাপ হল কেন?

ছেলে বলত, কাল যে একাদশী গেছে—একেবারে নির্জলা উপোস। একাদশীর দিনে ওষুধ পর্যন্ত মুখে দেবেন না।

আমি বলতাম, তা একাদশীর খবরটা তাঁকে দেওয়া হয় কেন? কে সে খবর দেয়?

ছেলে বলত, ওই সব পুরুত আর ঠাকুরমশাইরা। সে একেবারে একগাদা পুরুত আর একগাদা পণ্ডিত। তাদের সকলের মাসোহারা বন্দোবস্ত করা আছে। মাসে-মাসে তারা সব টাকা পায় আর তার সঙ্গে সিধে। কারো পাওনা মাসে পাঁচ সের চাল, কারও আবার তিন সের। কারো দু'বছরে একটা করে কম্বল, আর কাউকে বছরে দু'টো গামছা। এসব আমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেই।

আমার ছেলে শ্বশুরবাড়িটা ভাই অদ্ভুত। খুব বনেদী বংশ বটে, কিন্তু সব আলাদা-আলাদা হাঁড়ি। এক বাড়িতে সাতাশটা সরিক। সাতাশটা রান্নাঘর। তাই কারো রান্নাঘরে ঠাকুর রান্না করছে, কারো রান্নাঘরে বাড়ির গিন্নী। তাই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের রেষারেষি আছে। এক বাড়িতে মাংস রান্না হল, তো অন্য বাড়িতে কুঁচো চিংড়ি।

ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় অতটা টের পাই নি। নাম করা বংশ। তিন পুরুষ আগে আমার বউমার বাবার ঠাকুর্দা সেকালে রায়বাহাদুর হয়ে ছিলেন। তাঁর বাবা প্রথমে ওই জোড়াসাঁকোতে বাড়ি করেন। তারপর থেকেই ওই বংশের উন্নতি শুরু হল।

মেয়ে দেখার দিনে পাত্রীর কাকা এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, বড়দা বেশিদিন বাঁচেন নি, তখন থেকে বৌদি ছিলেন, আমাদের কাছেই আছেন। এই মেয়েটি আমার বড়দার একমাত্র সন্তান।

সেইদিনই শুনেছিলাম যে বউমার মা সারাদিন কেবল পূজো-আর্চ্চা নিয়েই থাকেন। কিন্তু সেই পূজো নিয়ে থাকা যে এতখানি, তা-তখন কল্পনা করি নি। ভেবেছিলাম তা হয়। অনেক বাড়িতেই বাড়ির গৃহিণীদের দিন-রাত ঠাকুর-পূজো আর ঠাকুর-সেবা নিয়েই দিন কাটাতে দেখেছি। কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। তবে বউমার মা-র মতন কাউকে দেখি নি। আমার মা সব শুনে বললে, আমারও একবার তোর বউমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে?

সেবার অনেক কষ্টে মা'কে কোনও রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আর তখন ডাক্তার-ডাক্তারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বাড়ি। যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ কেউ একাদশীর দিনে একফোঁটা জলও খাওয়াতে পারে নি, এমনি নিষ্ঠাবতী মহিলা তিনি।

*

জহর গল্প বলতে-বলতে এবার থামল। আমি গোড়া থেকে শুনছিলাম। বললাম, এ তুমি ক'টা গল্প বলছ ভাই? তুমি তো গল্প আরম্ভ করলে মালদা'র। এখন বলছো তোমার জোড়াসাঁকোর বেয়াই-বাড়ির গল্প। এর সঙ্গে মালদা'র গল্পের তো কোনো মিল পাচ্ছি না।

জহর বললে, একটা মিল আছেই, নইলে এত কথা বলছি কেন? আমি এ্যাড্‌ভোকেট মানুষ আবোল-তাবোল কথা বলা ভাই আমাদের লাইনে নিয়ম নেই। জজসাহেব তাহ'লে বলা বন্ধ করে দেবে—আমি যা বলছি, তা শুধু শুনে যাও। তুমি দেখনি, আমাদের পৃথিবীতে পাহাড়-সমুদ্র-মরুভূমি সমস্ত কিছু আপাতঃদৃষ্টিতে কেমন এলোপাথাড়ি করে বসিয়ে দিয়েছে, তাই নয়? কিন্তু সেই এলোপাথাড়ি জিনিসগুলোই আবার যখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তখন কি মনে হয় না যে, এই আপাততঃ এলোপাথাড়ি জিনিসগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে?

আমার এই কাহিনীর মধ্যেও সেই সামঞ্জস্য সেই ঐক্য পাবে, যখন এ-গল্পের শেষটুকু শুনবে! আমি যে এ্যাড্‌ভোকেট, তা-তো প্রথমেই বলেছি। এ্যাড্‌ভোকেটরা যখন জজের সামনে তার সওয়াল করে, তখন অনেক সময় মনে হয় উকিল বুঝি আবোল-তাবোল বকছে। কিন্তু যখন সওয়াল শেষ হয় তখন বোঝা যায়, সমস্ত আবোল-তাবোলের মধ্যেও একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। তখন সমস্ত আবোল-তাবোল কথা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার এই কাহিনীও ভাই তাই।

ভাগ্যের এমনই এক চক্র যে ছোটবেলা থেকে আমি যা-যা কাজ করেছি, সেই প্রত্যেকটি কাজের এমন [illegible] ভাবেও পাচ্ছি। ভাল কাজে ভাল ফল পেয়েছি, এবং খারাপ কাজে খারাপ ফল পেয়েছি এখনও পাচ্ছি। পরকালের জন্যে আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। এবং সত্যি কথা বলতে কী, কাউকেই সে অপেক্ষা করতে হয় না।

আমার ছেলের শ্বশুর ছিলেন বড়লোকের ছেলে। বাপের টাকার শেষ নেই, তাই তিনি যাকে সামনে পেতেন নিজের হাতে তাদের সকলেরই মাথা কাটতেন। একবার রেসের মাঠে গিয়ে তিনি এক লাখ টাকার একটা চেক কেটেছিলেন। রেসের মাঠের ইতিহাসে সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ ঘটনা। তারপর থেকেই রেসের মাঠে নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, যে এক লাখ টাকার একখানা চেক আর কাটা যাবে না।

বাপ ছিলেন ভারি কড়া। প্রথম-প্রথম ছেলেকে সাবধান করে দিতেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে ছেলে আর শোধরাচ্ছে না, তখন তাকে আর তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না। তাই যতদিন বাপ বেঁচেছিলেন, ততদিন ছেলেও আর বাড়িতে আসেন নি।

একদিন হঠাৎ যখন তিনি খবর পেলেন যে বাবা মারা গেছেন, তখন তিনি বাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে নতুন বিয়ে করা স্ত্রী।

কাকা-কাকিমা, খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইরা এসে দাঁড়াল।

মাথা ন্যাড়াও করেননি তিনি, শ্রাদ্ধ করা তো দূরের কথা। বউকে নিয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। যাঁরা তার অংশ ভোগ করতে পারবে বলে আশা করেছিলেন, তাঁদের আশায় ছাই পড়ল। তাতে বউমার বাবার কিছু এল গেল না। তিনি নিজের সম্পত্তি আলাদা করে নিলেন মামলা করে। অনেক দিন লাগল সে-মামলার ফয়শলা হতে। যখন ফয়শলা হল, তখন নিজের খুশী মতন চলতে লাগলেন।

আমার বউমার কাছে থেকেই ভাই আমি এই সব গল্প শুনেছিলাম। বউমার ঠাকুরদা কোন উইল করে যান নি তাই রক্ষে। তিনি তাঁর ন্যায্য অংশ নিয়ে আলাদা করে ভাইদের বাড়ির দিকে পাঁচিল তুলে দিলেন। শরিকদের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু বউমার বাবা তাঁর হাল-চাল তখনও বদলালেন না। সেই সময়ে বউমা ওই বাড়িতে জন্মাল। যতদিন ছোট ছিল বউমা, ততদিন কিছু জানতেই পারে নি। তারপর একটু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে তারা অত বড় বাড়িতে আলাদা। অনেকগুলো রান্নাঘর তাদের বাড়িতে। যতগুলো রান্নাঘর ততগুলো হাঁড়ি। বাইরে থেকে তারা এক, কিন্তু ভেতরে খাবার সময় আলাদা। বউমা আমার কাছে গল্প করত—পাশের বাড়ির ভাই-বোনরা যখন খেত, মা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলত—ওরা এখন খাচ্ছে, তুমি ওখানে যেও না।

বউমা বলত, কেন মা, ওখানে গেলে কী হয়?

মা বলত, ওখানে গেলে তোমাকে হ্যাংলা বলবে, বলবে এ মেয়েটা খেতে পায় না।

এই রকম করে মেয়ে বড় হল। স্কুলে ভর্তি হল। মনে আছে, তখন থেকেই মা কেবল ঠাকুর-দেবতা দিয়েই থাকত। একটা-না একটা পূজো রোজই বাড়িতে হত। কোনও দিন লক্ষ্মীপূজো, কোনও দিন কালীপূজো, কোনও দিন কালীপূজো, কোনও দিন শিবপূজো। পূজোর আর কামাই ছিল না কোনও দিন। আর প্রায়ই মা উপোস করত।

মেয়ে জিজ্ঞেস করত, কই মা তুমি যে খেলে না? মা বলত, আমায় আজকে খেতে নেই, আজকে যে অশোকষষ্ঠী—তা জানো না তুমি?

মেয়ে জিজ্ঞেস করতো, এত পূজো করে কী হয়, এত উপোস করে কী হয় মা?

মা বলত, কী আবার হবে ভালোই হবে। তোমাদের ভালোর জন্যেই তো করি। তোমার ভাল হবে, তোমার বাবার ভাল হবে। তোমাদেরও ভাল হলে আমারও ভাল হবে।

মাকে জিজ্ঞেস করত, তুমি এত পূজো-টুজো কেন করো মা, আর কারোর মা তো এত পূজো করে না, এত উপোস করে না।

মা বলত, ওরা পূজো না করলে ভগবানই রাগ করবে ওদের ওপর। আর আমি পূজো করি বলে দেখবে তোমার কেমন ভাল হবে।

মেয়ে জিজ্ঞেস করত, আমার কী ভাল হবে মা?

মা বলত, তুমি যখন বড় হবে, তখন দেখবে, তোমার কেমন ভাল বর হবে কেমন ভাল ছেলে হবে, সমস্ত ভাল হবে তোমার। লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।

মেয়ে শুনত সব। জিজ্ঞেস করত, তোমার মা-ও খুব পূজোআর্চা করত বুঝি? তাই তোমার বুঝি এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে?

মা বলত, হ্যাঁ, তাই তো তোমার মত এমন লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছে আমার—তুমি যেমন আমার খুব লক্ষ্মী মেয়ে—বলে মা মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমি খেত। আদর করত।

বাবা কিন্তু এসব পছন্দ করত না। বলত, এ ঘরে এসব কী হচ্ছে?

মা বলত, তুমি কিছু মনে করো না, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে কথা বলতে পারবে না।

বাবা বলত, মিছিমিছি ওই পুরুত-ঠাকুরগুলোকে অত খাইয়ে, টাকা দিয়ে কী লাভ হয় তোমার ? ওরা তো বুজরুক।

মা বলত-ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। ঠাকুর রাগ করবে। পূজো করেছি বলেই তোমার মত স্বামী পেয়েছি, মনমত মেয়ে পেয়েছি।

বাবা বলত, এইসব কথা বুঝি ওই বুজরুকগুলো তোমাকে শিখিয়েছে ? তুমি তো জান না, ওরা কী সব বস্তু ! কেবল ওই সব বলে-বলে তোমার কাছে টাকা মারবার তাল করছে।

আর সত্যিই মা-র সে কী পূজোর ধূম। আর কী সব দান-ধ্যান !

কাউকে অর্থদান, কাউকে স্বর্ণদান, কাউকে ভূমিদান। দান-ধ্যানের শেষ ছিল না মা'র। আর তার সঙ্গে সেবা। মানে ভূরিভোজন। সমস্ত মাসোহারা ব্যবস্থা ছিল সকলের সঙ্গে। কাউকে মাসে দশ টাকা, কাউকে আবার একশো টাকা। বাবার টাকা ছিল অঢেল। বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি তো ছিলই। তার ওপর ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া বাবার অনেকগুলো বাড়ি ভাড়ার দরুণও হাজার-হাজার টাকা আসত। তার সঙ্গে ছিল সোনা-হীরে-মুক্তোর সব গয়না। কত যে গয়না ছিল মা'র, তার হিসেব ছিল না। তাই মা-ও ধর্ম কর্মের জন্যে দেদার টাকা খরচ করত। সংসারে আপনজন বলতে তো মাত্র তিন-জন। তিন-জনের খাওয়া-দাওয়া-পরার জন্যে আর কতই বা খরচ হত। কিন্তু খরচটা বেশি হত ওই পূজো-হোম আর যজ্ঞের জন্যে।

বাবা যেমন ছিল নাস্তিক, মা ছিল তেমনি ঠিক তার উল্টো। তাই সারা দিন যে বাবা কোথায় থাকত ঠিক ছিল না। এক-একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত মেয়ের। মেয়ে জেগে উঠে অবাক হয়ে দেখত, মা একমনে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে-বসে জপ্ করছে। মেয়ে ডাকত মাকে, মা—

মা আচমকা মেয়ের গলা পেয়ে তার কাছে আসত। বলত, তুমি এখনও ঘুমোওনি মা, এখনও জেগে আছ ? ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়, অনেক রাত হয়ে গেছে।

মেয়ে বলত, তুমি কেন জেগে আছে মা, তুমি ঘুমিয়ে পড়। এই আমি তোমার পাশে শুয়ে আছি—বলে মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়ের পাশে শুয়ে থাকত। যতক্ষণ না মেয়ের ঘুম আসত, ততক্ষণ শুয়ে থাকত। তারপরে অনেক রাত্রে যখন বাবা আসত, তখন মা ঘরের দরজা খুলে দিত। বাবা মা'কে বলত, কী হল, তুমি এখনও জেগে আছ ?

মা বলত, তুমি বাড়ি ফেরোনি, আমি কী করে ঘুমোই ? তুমি না ফিরলে কি আমার ঘুম আসে ?—বলে মা বাবার খাবার সাজিয়ে দিত।

বলত, খেয়ে নাও তুমি, তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি—

বাবা বেশির ভাগ দিনই বলত, আমি খাব না, আমি খেয়ে এসেছি।

মা বলত, তুমি খাবে না ?

বাবা বলত, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো ?

মা বলত, তুমি খাওনি আর আমি তোমার আগে খেয়ে নেব, এ-কথা কী করে ভাবলে তুমি ?

বাবা বলত, তুমি দেখছি মহা মুশকিলে ফেল আমাকে। তুমি বাড়িতে থাক, সময়মত খেয়ে নাও না কেন ? আমি কখন কোথায় থাকি, তার কি ঠিক আছে ?

মা বলত, অন্ততঃ রাত দশটার মধ্যে এলেই পারো।

বাবা বলত, তুমি মেয়েমানুষ, সারাদিন বাড়ির মধ্যে থাক, তুমি কী বুঝবে ? আমার কত কাজ, তা জানো ?

মা বলত, কী তোমার এত কাজ ? তোমার যা-কিছু কাজ, তার সবই তো তোমার অফিসের লোকেরা করে।

বাবা বলত, আমার মামলা-মোকদ্দমা নেই?

মা বলত, সে তোমার উকিল-এ্যাটর্নীরা আছে, তারাই সব করে—সেই জন্যেই তো তারা মাসে-মাসে মোটা মাইনে পায়।

বাবা বলত, উকিল-এ্যাটর্নীর ওপর সব ভার ছেড়ে দিলেই হয়েছে, তারা সব গ্রাস করবে। তুমি তো চেনো না তাদের? তারা এক-একজন রাঘব-বোয়াল একেবারে।

মা বলত, তা সম্পত্তি থাকলেই মামলা-মোকদ্দমা থাকবে।

বাবা বলত, আবার মামলা-মোকদ্দমা না করলে সম্পত্তিও বেহাত হয়ে যাবে। তুমি তো আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের চেনো না। যেদিন থেকে তোমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি, সেইদিন থেকেই জ্ঞাতিরা আমার উপর রেগে আগুন। তারা ভেবেছিল, আমি আর কখনও বাড়ি ফিরব না।, তারাই সব ভোগ-দখল করবে। আমি যে তাদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি। রাগ হবে না?

মা বলত, সম্পত্তির জন্যেই যদি ওদের এত রাগ আমাদের ওপর, তাহ'লে সম্পত্তি ত্যাগ করলেই পার! এত সম্পত্তি নিয়ে আমাদের কী হবে? তার চেয়ে বরং সম্পত্তি একটু কম থাকা ভাল, তাতে তোমারও শরীর ভাল থাকবে, আর এত রাত করে তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না।

একটু থেকে আবার মা জিজ্ঞেস করত, কী খেলে?

বাবা বলত, কী আর খাব, ওই বড়বাজারের অফিস-পাড়ায় যা পাওয়া যায় সেই-ই খেলাম, ওই কচুরী আর আলুর দম।

মা বলত, ওমা, ওই বিষগুলো তুমি খাও? তাতে যে তোমার অসুখ করবে!

বাবা বলত, তা অসুখ করলে আর কী করব বলো, বড়বাজারে ওর থেকে কোন কিছু ভাল খাবার পাওয়া যায় না।

মা বলত, তুমি যদি বলো তাহ'লে আমি না-হয় গুপীকে দিয়ে তোমার গদীতে খাবার পাঠিয়ে দিয়ে পারি।

বাবা বলত, তুমি তো খাবার পাঠাবে, কিন্তু খাবে কে?

—কেন, তুমি খাবে!

বাবা বলত, আমি কোথায়-কখন থাকি, তার কি কিছু ঠিক আছে? আমার কি থাকবার জায়গা একটা? কখনও গদীতে থাকি, কখনও যাই উকিলের বাড়ি, কখনও যাই ব্যাঙ্কে। তারপরে আছে শেয়ার মার্কেট। সে-সব কথা তুমি ঠিক বুঝবে না।

মা বলত, আমি তো সেইজন্যেই বলি এ-সব ব্যবসা-ট্যবসা তুমি ছেড়ে দাও।

বাবা বলত, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিই আর জ্ঞাতিরা হাসুক।

বাবার মুখে কেবল সব সময়ে জ্ঞাতিদের কথা। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করে বাবা যে সম্পত্তির ভাগ কোর্ট থেকে হাতে পেয়েছিল, সেই সম্পত্তি যাতে আরো বাড়ে, সেই কথাই বাবা সব সময়েই ভাবত। ঘুমিয়েও বাবা সেই সম্পত্তির স্বপ্ন দেখত।

বাবা একবার বলত, সম্পত্তি ঝামেলা, এবার সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব—উকিল-পেশকার আর মোক্তার-মুহুরির জ্বালায় আর পারছি না, মরে গেলাম একেবারে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই বাবা একেবারে অন্য মানুষ।

বাবা বলত, আজকে আর বাড়িতে খাব না, এখুনি বেরোতে হবে।

মা জিজ্ঞেস করত, কোথায়?

বাবা বলত, আজকে সেই পার্টিশান-কেসটার রায় বেরোবে হাইকোর্টে, তাই উকিলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে, সকাল দশটার মধ্যে।

মা বলত, তা তুমি আগে বলবে তো। আগে বললে আমি ঠাকুরকে রান্না করে দিতে বলতুম।

কোথাকার মামলা, কাদের সঙ্গে মামলা, কেন মামলা, সে-সব কিছুই জানত না মা। সঙ্গে-সঙ্গে মা ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে লোক পাঠাত। ঠাকুরমশাই তাড়াতাড়ি ছুটে আসত। বলত, কী মা-জননী, আবার তলব কেন?

মা বলত, আপনাকে এখখুনি হোমের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠাকুরমশাই অবাক হত। বলত, কী হয়েছে মা-জননী?

মা বলত, খুব বিপদে পড়েছি ঠাকুরমশাই, আজকেই যা-হোক একটা যাগ-যজ্ঞ করতে হবে। আজকে হাইকোর্টে মামলার রায় বেরোবে। আপনি অন্তত একটা কিছু করে আমাকে বাঁচান।

আমার মা জিজ্ঞেস. করত, কত টাকা আপাততঃ লাগবে? পাঁচশো টাকায় কুলোবে?

ঠাকুরমশাই বলত, আপাততঃ তাই-ই দিন, পরে দরকার হলে আমি মা-জননীর কাছে চেয়ে নেব।

সঙ্গে-সঙ্গে আলমারির চাবি খুলে নগদ পাঁচশো টাকা ঠাকুরমশাই-এর হাতে তুলে দিত। আর তারপরে বাড়িতে এলাহি-কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। ধূপ-ধূনোর গন্ধে আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজে সারা বাড়ি গম-গম করত। সাতাশটা শরিক বুঝতে পারত, আবার বড় শরিকের বাড়িতে কোনও হোম-যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। আর শুধু যে যজ্ঞ হবে তা তো নয়, তার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ-ভোজন আর মোটা দক্ষিণে।

সেই একদিনেই মা'র হাজার টাকার ওপর খরচ হয়ে যেত। রাত্তিরে বাবা যখন ফিরত তখন বলত, এ-কি, আজকেও আবার কিছু ব্রতট্রত ছিল নাকি তোমার?

ও বাড়িতে এ-রকম প্রায়ই হত, তাতে অবাক হবার হত কিছু ছিল না। কিন্তু বাবার জানবার ইচ্ছে, সেদিনের পূজোর উপলক্ষটা কী?

মা কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলে না। জিজ্ঞেস করলে, হাইকোর্ট তোমার মামলার রায় বেরোল আজকে? তুমি জিতেছ তো?

বাবা জিজ্ঞেস করলে, সেইজন্যেই বুঝি আজ আবার উপোস করলে তুমি?

মা বললে, তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও, তবে আমি তোমার জবাব দেব।

বাবা বললে, আমরা ডিক্রী পেয়েছি।

—ডিক্রী মানে?

বাবা বললেন, ডিক্রী মানে, আমরা মামলায় জিতেছি।

মা দু'হাতের পাতা জোড় করে অদৃশ্য ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললে, আমি জানতাম তুমি জিতবেই।

বাবা হাসতে লাগল। বললে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু কত টাকা খরচ হলো শুনি?

মা বললে, তুমি কেবল খরচের কথা বল কিন্তু এই যে তুমি আজকে মামলায় জিতলে, এটা কি ভাবছ তোমার উকিলের জন্যে?

বাবা হেসে বললে, তা না তো কি তোমার গুরুদেবের জন্যে?

মা বললে, হ্যাঁ, গুরুদেবের জন্যেই তো। গুরুদেব হোম করলে বলেই তো সব ফাঁড়া কেটে গেল তোমার।

বাবা বললে, তা টাকা কত খরচ হল সেইটে বল তো?

মা বললে, মা-গো মা, তোমার বেশি টাকা খরচ করিনি গো আমি, সব মিলিয়ে হাজার খানেক টাকাও নয়। তুমি টাকার কথা অত ভাবছ কেন? এই যে তুমি মামলায় জিতলে, এতে তোমার কত হাজার টাকা লাভ হলো বল দিকিনি?

মা'র যুক্তির কাছে বাবাকে হার মানতে হতো শেষ পর্যন্ত।

আমাদের গাঙ্গুলী পরিবারের মধ্যে মা'কে কেউ দেখতে পারত না। আমি এক বার মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মা, তুমি বাড়িতে কারো সঙ্গে মেশো না কেন?

মা হেসে বলত, কে বলে মিশি না? ওরাও তো কেউ আমাদের কাছে আসে না।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, কেন আসে না মা?

মা বলত, কেন আসে না জানিস রে, কারণ আমি গরীব ঘরের মেয়ে বলে। টাকা না থাকাটা যে কী জিনিস তা তুই বুঝলি না, আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি রে! তাই তো দিনরাত কেবল আমি ভগবানকে ডাকি। তাই তো দিনরাত পূজো করি, ব্রত করি, উপোস করি।

মা'র এ-সব কথা বাইরে কেউ জানত না। মা ঠাকুর-দেবতার পূজোতে যত ইচ্ছে খরচ করত, কিন্তু এমনিতে খরচের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করত।

বাবা বরং বলত মা'কে—কই, তুমি তো আমার কাছে টাকা চাচ্ছো না? সংসার খরচের টাকা তো এবারে নাওনি তুমি?

মা বলত, দরকার হলেই বলব, টাকা এখন আমার কাছে আছে।

বাবাও অবাক হয়ে যেত। বাবা বলত, টাকা তোমার কাছে আছে কী করে? তোমাকে তো আমি বেশি টাকা দিই নি।

মা বলত, আমি যে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে টাকা খরচ করি গো।

বাবা বলত, দেখি তোমার ক্যাশ-বাক্স দেখি। দেখি তোমার কত টাকা আছে?

জোর করে একদিন, বাবা-মা'র ক্যাশ-বাক্স দেখলে। দেখা গেল মা'র বাক্সের ভেতরে টাকার বাণ্ডিল। বাবা তো চমকে উঠল। বললে, সে কী এত টাকা তুমি কোত্থেকে পেলে? চুরি করলে নাকি?

মা বললে, হ্যাঁ, তোমার পকেট থেকে চুরি করেছি।

শুধু কি টাকা! কত জিনিস যে মা'র আলমারিতে থাকত, তার ঠিক নেই। কোনও দিন বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে যাবার সময়ও আমার মা'কে কখনও বেশি গয়না পরে যেতে দেখি নি।

অথচ মা'র গয়না যে কত ছিল তা আমি দেখেছি। আলমারি খোলবাব সময় কতদিন আমি উঁকি মেরে দেখেছি কত ভাল-ভাল শাড়ি, কত ভাল-ভাল শায়া, শেমিজ, তা আর গুণে শেষ করা যায় না।

আমার মা সব শুনত অবাক হয়ে। বলত, তোমার মা'র অনেক পুণ্যি নাতবউ, অনেক পুণ্যি করে তোমার মা এসেছিল। ভগবান যে তাঁকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন, ভগবানের মনে কী আছে কে জানে?

বউমা বলত, আমিও তো তাই বলি, মা কেন এমন কষ্ট পাচ্ছে! মা জীবনে তো কাউকে ঠকায় নি, জীবনে কখনও কারো মন্দ চিন্তা করেননি। সারা জীবন যত রকম পূজো-ব্রত-অনুষ্ঠান আছে, পাঁজিতে যা কিছু নিয়মকানুন লেখা আছে, সব বর্ণে-বর্ণে পালন করে এসেছে। মা তো তাই এখন বলে, আগের জন্মে বোধহয় আমি অনেক পাপ করেছিলাম, তাই আমার এ-জন্মে এত ভোগ হচ্ছে।

শেষ জীবনে আমার ছেলের শাশুড়ি অসুখে ভুগে যে কত কষ্ট পেয়েছে, সে কথা শুনলে তুমি চমকে যাবে ভাই। ছেলের শ্বশুর ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর টাকা

জন্মিয়েছিলেন, সেই শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকে বউমার মা একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত দিন কাটাতেন।

কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। আমার ছেলেকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ কী রকম ডাক্তার তোমরা, একটা রোগীকে সারিয়ে তুলতে এতদিন লাগাচ্ছ কেন? বয়েস তো ওঁর বেশি নয়!

আমার ছেলে আগে প্রকাশ করেনি, পাছে কেউ জানতে পারে। শুধু আমাকে চুপি-চুপি বলেছে, বাবা, ও-রোগ সারবে না!

আমি ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন সারবে না?

ছেলে বললে, পেটে ক্যানসার হয়ে গেছে।

ছেলের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। যে-লোক এত ঠাকুর-দেবতা মানত, এত পূজো আর উপোস করত, তার কপালে এত কষ্ট!

ছেলে বললে, ওই সব অনিয়ম অত্যাচার করে করেই ওই হয়েছে। নিজের শরীরের দিকে তো কোনদিনও দেখেন নি। শ্বশুরমশাই রাত একটা-দুটো করতেন বাড়ি ফিরতে। তাই শাশুড়ীও অত রাত পর্যন্ত উপোস করে জেগে থাকতেন!

ছেলের মুখে তার শাশুড়িও আসল রোগটার নাম শুনে বুঝলাম এর আর কোনও প্রতিকার নেই। আমার বড় ভাবনা হল। আমার স্ত্রী আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলে—তুমি এত গম্ভীর-গম্ভীর কেন? কী হয়েছে তোমার? সব সময়েই দেখছি মুখটা কেমন ভার-ভার!

আমি একটা বাজে কারণ দেখালাম। বললাম, একটা জটিল মামলা খুব ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। কেসটা খুব সিরিয়াস।

আমাদের কারবারের একটা সুবিধে এই যে নিজের কোন সমস্যাকে আমরা পরের বলে চালিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারি। এই কারণেই আমাদের সম্বন্ধে লোকের এত খারাপ ধারণা। আমরা অনেকটা বহুরূপীর মত। ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের রঙ বদলায়। জজের সামনে আমরা এক-রকম, আবার মক্কেলের সামনে অন্যরকম। আবার স্ত্রী সামনে একরকম, পাড়া-পড়শীর কাছে আবার অন্যরকম। আমাদের আসল রূপটা যে কী, সেটা নিজেরাই জানি না।

*

এতক্ষণ জহরের কথা আমি শুনছিলাম। জহর থামতেই জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

জহর বললে, এর 'তারপর' একটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনই তুমি তা জানতে চেও না। আগ্রহটা ভাল জিনিস, কিন্তু তা বলে অতি-আগ্রহ থাকা ভাল নয়। জজের সামনে আমরা সওয়াল করি, কিন্তু সওয়াল করতে উঠে প্রথমেই আমরা আসল পয়েন্টটা প্রকাশ করি না। সেটা আমাদের তুরুপের তাস। সেটা রেখে দিই শেষকালের জন্যে।

বললাম, তাহ'লে তুরুপের তাসটা এবার ছাড়ো। এখন তো গল্প শেষই হয়ে এসেছে।

জহর বললে, শেষই হয়ে এসেছে অবশ্য। কিন্তু ট্রেন যখন কোনও স্টেশনে গিয়ে থামে, তখন তো হুট্ করে তা থামে না। থামবার আগে ট্রেনের গতিটা আস্তে-আস্তে কমে এসে-এসে এক সময়ে থেমে যায়। আমার এ গল্পটাও হল সে রকম। অনেকটা আমার ছেলের শাশুড়ির ক্যানসার রোগটার মতন। ওই রোগ যখন কাউকে ধরে তখন রোগীকে অক্টোপাশের মত আস্তে-আস্তে ধরে। প্রথমে টেরই পাওয়া যায় না, যে রোগ কখন ধরল। যত দিন যায়, ততো তার প্রকোপ বাড়ে। বাড়তে-বাড়তে চরমে ওঠে।

এক-সময়ে ডাক্তাররা বললে, হস্‌পিটালে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে।

কিন্তু ছেলের শাশুড়ি বললে, আমি হাসপাতালে যাবো না।

ছেলে বললে, কিন্তু বাড়িতে কি অত ভাল চিকিৎসা হয়? তা কি করে সম্ভব?

শাশুড়ি বললে, আমি স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না। মরতে হয় আমি এখানেই মরব।

মেয়ে বললে, মা তুমি অবুঝ হয়ো না, ডাক্তারবাবু তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন, তুমি কেন আপত্তি করছ?

মা মাথা নেড়ে বলত, ওরে তুই বুঝবি না, হাসপাতালে গেলে আমাকে কেউ পূজো করতে দেবে না। ঠাকুরকে এখানে চাল-জল কে দেবে? ঠাকুরের ভোগ না দিয়ে যে আমি কি মুখে দিই না। হাসপাতালে সে-সব কে করবে?

মেয়ে বলত, তোমার ঠাকুরকে তুমি তাহ'লে হাসপাতালে নিয়ে চল।

মা বলত, দূর, ঠাকুরকে কখনও কি ওর নোংরার মধ্যে নিয়ে যেতে আছে? সব যে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়ে যাবে।

যার যখন যেখানে মৃত্যু বাঁধা আছে, সেখানেই তার মৃত্যু হবে। এ আর কারোব ক্ষমতা নেই যে ঠেকাবে। তাই একদিন যখন ছেলে এসে জানালে যে তার শাশুডিব মৃত্যু হয়েছে, তখন খুব বেশি বিচলিত আমি হইনি। মৃত্যু যেখানে অবধারিত, সেখানে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।

আর তাছাড়া যে-যে স্টেশনের টিকিট কেটেছে, সেই স্টেশনেই তাকে নামতে হবে। তার আগের স্টেশনেও না, আব তার পরের স্টেশনেও না। যদি মানুষ তার ববাদ্দ স্টেশনেব বাইরে অন্য কোন স্টেশনে নামে, তাহ'লে তো বিনা-টিকিটে ভ্রমণের অভিযোগে টিকিট চেকারের কাছে দণ্ড দিতে হবে, কিংবা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

যাহোক এসব কথা উকিলের মুখে পাত্তা পায় না। শোভা পায় তোমাদের মুখেই। তবু বলি এই জন্যে যে এটা তো আদালত নয়, আর আমিও এখানে উকিল নই, মানুষ। বলতে গেলে সাধারণ একজন মানুষ। তোমার বন্ধু বিশেষ।

বড়লোক পরিবারের গৃহিণীর মৃত্যু। তাব শ্রাদ্ধ-টাদ্ধর ব্যাপারে কত যে ঝামেলা হল, তা বলে তোমাকে আমি ভাই ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তার ওপর শরিকে-শবিকে ঝগড়া। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তা এ তো ভাগের মা নয়, এর এক সন্তান। অর্থাৎ আমাব বউমা। কিন্তু শরিকের বউ তো। সাতাশটা রান্নাঘরের মধ্যে এক রান্নাঘর। সেই বান্নাঘরেব দবজায় ঝাঁপ পড়ল। সেখানে আব কেউ কোনওদিন বান্না করবে না। অনেক ঘটা কবে শ্রাদ্ধ হল। কোথাও কোনও কার্পণ্য কবলে না আমার বউমা আর আমার ছেলে। শেষকালে প্রশ্ন উঠল সম্পত্তি নিয়ে।

এইখানেই ভাই আমার গল্প শুরু হল। একেবারে কাহিনীর শেষে এসে শুরু। তাই একে তুমি শুরুও বলতে পার, আবার শেষও বলতে পাব। জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই যে মানুষের জীবন-পরিক্রমা, এই পরিক্রমা আদি থেকে শুরু করে আবার সেই আদিতে গিয়েই শেষ।

যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন রণক্ষেত্রে আমার প্রবেশ। কারণ আমি উকিল। আবার শুধু উকিল নয়, হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট। শরিকরা নানা মতলব করে ছেলের শাশুড়ির সব সম্পত্তি নিজেরা গ্রাস করতে চাইলে। কিন্তু বাদ সাধলাম আমি।

সেই মামলা চলল পনেরো বছর। গত পবশুদিন তার রায় বেরিয়েছে। ছেলের শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি এতদিন সেই আগেকার মতই আটকে ছিল। শাশুড়ির মৃত্যুর পরই সব বিলি ব্যবস্থা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু শরিকের শত্রুতার জন্যে কিছু করা যায় নি। কোর্ট থেকে লোক এসে আলমারি-সিন্দুক-ক্যাশবাক্সতে তালা লাগিয়ে সীল করে দিয়েছিল। অতদিন পরে কাল ডিক্রী পেয়েই কোর্টের লোকের সামনেই সেই সীল ভাঙা হল। আমি হাজির ছিলাম আমার ছেলের পক্ষের উকিল হিসেবে।

যেখানে যত কাগজ-পত্র-দলিল-দস্তাবেজ ছিল, আমি তার সমস্ত কিছুর লিস্ট তৈরি করে নিলাম। সধবা অবস্থায় ছেলের শাশুড়ি যে শাড়ি পরতেন, তাও গোছা-গোছা পাট করে রাখা ছিল। তারপর সিল্কের চাদর, ওড়না, তাও থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে। কাপড়চোপড়ের মধ্যে কয়েক হাজার টাকা রেখেছিলেন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে, তার বেশির ভাগই খরচা হয়নি। গুণে দেখলাম, সেও প্রায় হাজার বারো টাকার মতন। বড় টিপে-টিপে খরচ করতেন তিনি। স্বামী থাকতেও বটে, আর বিধবা অবস্থাতেও। কোথায় কবে কাশীতে কিংবা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, সেই বাবা বিশ্বনাথের আর জগন্নাথদেবের পট তখনও একভাবে রাখা আছে। একটা জিনিসও তিনি ফেলতেন না। সে ছোটো এক টুকরো কাগজই হোক আর একটা তালপাতা জড়ানো সিঁদুর-পাতাই হোক। আশ্চর্য, একটা জিনিসও তিনি ফেলেন নি। সব জমিয়ে রেখেছেন। কার জন্যে, কীসের স্বার্থে জমিয়ে রেখেছেন, তা কেউ জানে না। মানুষ যে কেন জমায় তাও জানি না, তবু জমাতে হয় শেষ জীবনের দুর্দিনের আশঙ্কাতেই বোধহয়। কিন্তু এ-রকম জমানো প্রবৃত্তিও আমি আমার জীবনে আর কারও দেখিনি। উকিল হিসেবে আমাকে অনেক উইলের প্রোবেট্ নেবার কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আগে কখনও আমার অভিজ্ঞতা হয়নি ভাই।

তারপর ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের পাস-বই আলমারির মধ্যেই ছিল। কোর্টের অর্ডার আর সাক্‌সেসান সার্টিফিকেট দেখিয়ে টাকাগুলো তোলা হলো।

শেষকালে লকার। লকারের চাবিও ছিল আলমারিতে। সেই চাবি দিয়ে লকার খোলা হল। লকারের ভেতরে উঁকি মেরে আমার চোখ আকাশে উঠল। কত রকম গয়না যে একজন মহিলার থাকতে পারে, তখন তা দেখলাম। আর শুধু কি একটা লকার? সব ব্যাঙ্কের লকার থেকে গাদা-গাদা গয়না বেরোল। আমি নিজে সেই গয়নার একটি লিস্ট তৈরি করলাম। মুক্তো-হীরে-সোনা-রূপো-পান্না কত রকমের গয়না যে, তার সবগুলোর নামও জানি না আমি।

আমি বউমা'কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা'র যে এত গয়না ছিল, তা-তো তিনি বলেও যাননি?

বউমা বললে মা'র বড্ড জমিয়ে রাখার নেশা ছিল। আমি ছোটবেলায় যে সব খেলনা নিয়ে খেলতাম, সেটাও মা ফেলে দিত না, সব জমিয়ে রাখত। মা খুব গরীব ঘর থেকে এসেছিল কি না, তাই ওই রকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বউমা আবার বললে, বাবা বিয়ের সময় শরিকদের কারোর মত নেয়নি বলেই শরিকরা বাবা-মা'কে ত্যাগ করেছিল। সেই দুঃখেই মা'ও কারোর সঙ্গে কথা বলতো না, কারোর সঙ্গে সম্পর্কও রাখত না। অথচ একই বাড়িতে একই ছাদের তলাতেই থাকত।

বললাম, তাহ'লে তো সারাজীবনই তোমার মা কষ্ট পেয়ে গিয়েছিল।

বউমা, বললে, তার জন্যে তো আমার মা কেবল পূজো-আর্চা নিয়ে থাকত। শরিকদের সঙ্গে এক বাড়িতে থেকেও কারো সঙ্গে কথা বলার সম্পর্ক ছিল না, ওটা মা'র ভাল লাগত না। আর বাড়িতে সারাদিন তো কোনও কাজ ছিল না মা'র। আমি চলে যেতাম আমার স্কুলে, আর বাবাও চলে যেত তার অফিসে। তাই একলা-একলা কী আর করবে, কেবল গুরুদেব ঠাকুর আর পূজো।

পনেরো বছর পরে সেই সব সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে ভাবছিলাম, এ-সব সম্পত্তি কেন মানুষ জমায়, কিসের জন্যে? কার স্বার্থে? আমি উকিল, কোর্টে-কাছারিতে যে-সব মামলা হয়, তা শুনতে-শুনতে আমার নিজেরই ভাই ঘেন্না হয়ে যায় আমার পেশার ওপর। মাঝে-মাঝে আমার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে জেরার

সময়ে। তাই তো বলছি, পৃথিবীতে কত রকম যে মানুষ আছে, কত রকম যে চরিত্র আছে, তা আমি দেখেছি ভাই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ছেলের শাশুড়ির মত মানুষ আমি দেখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

জহর বলতে লাগল, সেই কথাই তো এবার বলছি। লকার থেকে যে সব গয়না বেরলো, তার লিস্ট করছিলুম কাল। আমার ঘরে তখন কেউ ছিল না। একলা-একলা সব জিনিসগুলোর লিস্ট করতে-করতে হঠাৎ এক কাণ্ড হল ভাই।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কাণ্ড?

জহর বলতে লাগল, মনে আছে সেই যে গোড়ায় তোমাকে বলেছিলাম মালদা শহরে একটা মেয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিল, মানে আমাকে ঠকিয়েছিল? আমার আংটিটা নিয়ে গিয়েছিল?

বললাম, হ্যাঁ, সেই মিনে করা আধভরি সোনার আংটিটা?

জহর বললে, যেটা আমার পৈতের সময় বাবা তৈরি করে দিয়েছিল, মিনের ওপর ইংরাজী 'জে' অক্ষরটা লেখা, সেই আংটিটা হঠাৎ পাওয়া গেল সেই সব গয়নার ভেতর থেকে। আমি তো ভাই স্তম্ভিত। কতকাল আগের যে ঘটনা। ওই আংটিটার জন্যে মা-র কাছে আমাকে কত গঞ্জনা শুনতে হয়েছে। এতদিন পরে কিনা আমার ছেলে শাশুড়ির গয়নার বাক্সের মধ্যে থেকে সেটা পাওয়া গেল!

আমি অবাক। বললাম, সেই একই আংটি?

জহর বললে, হ্যাঁ, সেই একই আংটি। অন্য কোনও মহিলা হলে হয়তো সেটা ভেঙে স্যাকরাকে দিয়ে অন্য-ডিজাইনের গয়না গড়িয়ে নিতো। কিন্তু ওই যে, সব জিনিস জমানো স্বভাব, সেইজন্যে সেটাও জমিয়ে রেখেছিল।

আমি বললাম, কিন্তু তোমার বেয়াইয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কী করে?

জহর বললে, তা জানি না ভাই। হয়তো আমার মত তাকেও ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করে জড়িয়ে ফেলেছিল। আসলে কী যে হয়েছিল, তা-তো জানবার আর কোনও উপায় নেই এখন। যার জন্যে হয়তো শরিকরাও তাদের একঘরে করে দিয়েছিল।

বললাম, তারপর কী করলে আংটিটা নিয়ে?

জহর বললে, কী আর করব বলো। মাকেও আর বলতে পারি না যে, মা যে-আংটিটার জন্যে তুমি অত বকাবকি করেছিলে, আমাকে সেই আংটিটা এখন পেয়ে গেছি—এই দেখ—কারণ মা ততদিন মারা গেছে।

আমি বললাম, তোমার ছেলে আর বউমাকে কী বললে?

জহর বললে, তারা তো কেউ জানে না ভাই ও ঘটনা। আমি যে একটা মিনে করা আংটি পেয়েছি, সেটা আমি কাউকে বলিনি। লিস্টের মধ্যেও ওটা নেই। আমি জানি না ওটা নিয়ে আমি এখন কী করবো। তুমি যখন কালকে আমাকে বললে যে পূজো সংখ্যায় লেখার জন্যে তুমি প্লট খুঁজে বার করতে পারছ না, তখন আমি বলেছিলুম যে আমি তোমাকে প্লট দেব। কিন্তু তখন জানতুম না যে, আমার নিজের বাড়িতেই এমন একটা প্লট জমানো রয়েছে।

তারপর জহর তার পকেট থেকে একটা আংটি বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই দেখ ভাই সেই আংটিটা।

আমি আংটিটা দেখলুম। জহর হয়তো ভাবলে আমি আংটিটার দিকেই চেয়ে দেখছি। কিন্তু আসলে আমি সেই আংটিটার মধ্যেই তখন যেন বিশ্বরূপ দর্শন করছি।

*

চতুর্থী

আমরা কি সবাই অভিনেতা? এই আমরা যারা পুরুষ? এক-এক সময় ভাবি, আমরা তো সব সময়ে অভিনয় করেই চলেছি। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছি কতটুকু? কতটুকু নিজেকে জেনেছি আর পরকেই বা জানিয়েছি।

এসব ভাবনা আমার বহুদিনের। ছোটবেলা থেকেই মানুষকে জানবার এবং নিজেকে মানুষের কাছে জানাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছি, তাতে দুর্ভোগ বেড়েছে বৈ কমে নি। বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে, গৃহবিবাদ বেড়েছে, মাঝখান থেকে আমি শুধু একলা হয়ে পড়েছি দিন-দিন।

তা হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই। যত একলা হয়েছি ততোই নিরপেক্ষ বিচার করতে পেরেছি মানুষকে। মানুষের কাছ থেকে আপাততঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের সঙ্গেই আরো বেশি করে যুক্ত হয়েছি। দর্শনের ভাষায় যাকে বলা যায়—বিয়োগ করে যোগ করেছি।

কিন্তু নারী?

সেখানেই মুশকিলে পড়েছি বরাবর। আজকের নারী আর সে যুগের নারীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। আজ রাস্তায়-বাজারে-অফিসে নারী। নারীর সঙ্গে পুরুষ দিনের পর দিন পাশাপাশি বসে চাকরি করছে। ঘোমটার আড়ালে যে-রহস্য লুকিয়ে থাকতো, তা এখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সহাবস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে পারস্পরিক কৌতূহল মিটে গেছে। কিন্তু তবু বলবো, পুরুষ কি নারী, কারোরই অভিনয় করা আজো বন্ধ হয় নি। সামনে সবাই আমরা এখনো অভিনয়ই করি। পরের সামনেও অভিনয় করি, নিজের সামনেও। তাই আজ আমাদের জীবনে ঘর আর পর একাকার হয়ে গিয়েছে।

এমনি অভিনয় করতে-করতে এখন মানুষের জীবনে অভিনয় প্রায় একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সব সময় ধরা যায় না কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা স্বভাব। সেই কারণেই স্বভাবটাকেও আমরা অনেক সময় অভিনয় বলে ভুল করি, বা অভিনয়টাকেই স্বভাব।

এমনি একজনকে আমি জেনেছি। সে অভিনেত্রী নয় বটে, কিন্তু অভিনয় করে-করে অভিনয় করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার নাম রঞ্জনা। অভিনেত্রী, কিন্তু সে অভিনয় অন্য রকম।

এদের সকলকে যে আমি সচক্ষে দেখেছি তা নয়, এদের সম্বন্ধে আমি শুনেছি। সেও প্রায় একরকম দেখারই মতো। আর তা ছাড়া নিজের চোখে দেখলেই কি সত্য দর্শন হয়? সত্য জিনিসটা দেখবার জিনিসই নয়, আসলে সেটা উপলব্ধির। উপলব্ধির জারক-রসে শোধন করে নিলে তবেই সত্য-স্বরূপ নজরে পড়ে। আপনারা রঞ্জনার অভিনয় শুনুন।

জয়পুর থেকে প্রায় মাইল চল্লিশের মধ্যে কিষেণগড়। কিষেণগড় নানা কারণে বিখ্যাত। ওখানেই রূপনগর নামে একটা গড় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ওই রূপনগরের কাহিনী নিয়েই তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাস লিখেছিলেন। সে-সব অন্য প্রসঙ্গ। অন্য প্রসঙ্গ হলেও এ-গল্পে একটা কথা বলা দরকার। কারণ কিষেণগড়ের ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর সঙ্গে দেখা না হলে এই নটনীদের ব্যাপারটা জানতেই পারতাম না।

ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর কিষেণগড়ের বাড়িটা রাজস্থানের সব বাঙালি যাত্রীর একটা চিরস্থায়ী আস্তানা। নিজে ডাক্তার, কিন্তু বাঙালি দেখলে একটা রাতের জন্য তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, থাকতে হবে, খেতে হবে, ঘুমোতে হবে।

আজকালকার এই পরশ্রীকাতরতার যুগে, পরস্পরকে ছোট করবার যুগে, ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসু একজন ব্যতিক্রম।

একদিন আমিও ওই পথের যাত্রী হয়েছি। অবসর কিংবা সুযোগ পেলেই রাজস্থানে বেড়াতে যাবার লোভ আমার দুর্বার।

তাই প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন আজমীর হয়ে আর এদিকে ফিরি নি। সোজা আবু-পাহাড় হয়ে একেবারে ওখা-পোর্ট আর দ্বারকার দিকে চলে গিয়েছি। কিন্তু উনিশশো বাষট্টি সালে যখন গেলাম, তখন জয়পুরেই থাকবো বলে আস্তানা নিয়েছিলাম।

প্রভাত গুহরায় আমার স্নেহভাজন বন্ধুপ্রতিম। সে জয়পুরের বাসিন্দা। বহু বছর থেকেই সে চিঠি লিখতো—একবার জয়পুরে আসুন। আমি আপনার জন্যে বাড়ি ঠিক করে রাখবো।

তা সেবার যখন আজমীরে গিয়েছিলাম, তখনও বলেছিল। তারপর বছরের পর বছর চিঠি লেখে চলেছে সে। কিন্তু যাওয়া কী অত সহজ! ঘর ছেড়ে, কাজকর্ম ছেড়ে কে বেরিয়ে পড়তে পারে বাইরে?

রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে—

'জড়ায়ে আছে বাধা
ছাড়ায়ে যেতে চাই।
ছাড়িতে গেলে বুকে বাজে!'

অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই আবার বলেছেন—

'দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

এই দোটানা নিয়েই তো মানুষের জীবন। এই টানা-পোড়েনের মাকু চালাচ্ছে কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা, তারই আকর্ষণ-বিকর্ষণে আমরা চলি আর নিজের ক্ষমতার দম্ভে পৃথিবী পদভারে কাঁপিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখাই। কিন্তু বুঝতে পারি না যে, সেই অদৃশ্য দেবতা আমাদেরই অগোচরে আমাদের দিয়েই নিজের গোপন ইচ্ছাটা কেবল পূর্ণ করে নেয়। আমরা তা দেখতেও চাই না, জানতেও পারি না।

আজমীরের 'বেঙ্গলী সুইটস্'-এর দোকানটা অনেকেই দেখেছেন। সেই দোকানের মিষ্টি অনেকেই খেয়েছেন। সঙ্গে ভাতের হোটেলও আছে।

দোকানের মালিক সদানন্দ ব্যানার্জীকে নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন অনেকে। সেই তিনিই সেবার বলেছিলেন, আপনি কিষেণগড়ে যাবেন না?

বললাম, কেন, কিষেণগড়ে কী আছে?

সদানন্দবাবু বলেছিলেন, কেন, কিষেণগড়ে ডাক্তার সত্য বোস আছে—

তা তখন হাতে সময় ছিল না বলে আর কিষেণগড়ের দিকে ফিরে আসি নি। সোজা চলে গিয়েছি মাউণ্ট আবুর দিকে।

কিন্তু এবার অন্য প্রোগ্রাম করেছিলাম। জয়পুরে পূজোটা কাটিয়ে তারপর

কিষেণগড় হয়ে চিতোর আর উদয়পুরের দিকে যাওয়ার কথা। মাঝখানে পড়ে কিষেণগড়। আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। যখন গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন দেখি একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। খাট-বিছানা, খাওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম মজুত।

ডাক্তারবাবু বললেন, এখানে থেকে যেতে হবে ক'দিন—

তথাস্তু! তা ছাড়া এতখানি খাতির পেলে ভালো লাগারই কথা। জীবনে ভালোবাসার চেয়ে দামী জিনিস তো আর দু'টি নেই। ওটা অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে পাওয়া যায়।

থেকে গেলাম কিষেণগড়ে। ক'দিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করলাম। ডাক্তারবাবু কিষেণগড়ের সবেধন-নীলমণি ডাক্তার। কুড়ি মাইল—পঁচিশমাইল দূর-দূর গ্রাম থেকে তাঁর কল্ আসে। সঙ্গে আমি থাকি। রাজস্থানের গ্রামের ভেতরটা দেখা হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ বললেন, ওই দেখুন একটা নটনীদের গ্রাম।

—নটনী? কথাটা কেমন নতুন ঠেকলো! 'নটনী' মানে?

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন। নটনীদের পেশাই হচ্ছে নাচ-গান। ওদের পয়সা দিলে নাকি আমার-আপনার বাড়িতে নেচে গেয়ে যাবে। কারো বাড়িতে বিয়ে সাদি হলে ওরা আসে। নেচে-গেয়ে যায়, খানা খায়। তারপর চাষ-বাস আছে। তারপর যারা তাও পারে না, অর্থাৎ যারা দেখতে তেমন ভালো নয়, তাদের জন্য আবার অন্য বৃত্তি আছে।

—কী বৃত্তি?

ডাক্তারবাবু বললেন, শরীর বেচার ব্যবসা।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কিন্তু এখানে ওদের খদ্দের কোথায়? এখানে কে ওদের খোরাক জোগাবে?

ডাক্তারবাবু বললেন, ওদের খোরাক জোগাবার লোকের অভাব হয় না কোথাও, সে গ্রামেই বলুন আর শহরেই বলুন। মানুষের ওলডেস্ট প্রোফেসান ওইটেই।

তা বটে! রাজস্থানের ছোট-ছোট গ্রামের মতই নটনীদের গ্রাম। কোনও তফাৎ নেই। গ্রামের বাইরে চারদিকে ক্ষেত আর মাঠ। ক্ষেত-ভর্তি গম আর জোয়ার। হলদে সবুজ মাঠ। দূরে ধূ ধূ করছে পাহাড়। আর তারই মধ্যে মধ্যে গ্রাম।

বললাম, ওদের তো অসুখ হয়, ওখান থেকেও তো আপনার কল আসে?

ডাক্তার বললেন, কেন আসবে না, আসে। ওরা বেশ ভালো টাকাই দেয়। ওদের অবস্থাও বেশ ভালো।

—পুরুষমানুষেরা কী করে?

তারা ঢোলক বাজায়, নটনীদের তদারকি করে। যেখানে নটনীদের মুজরো আসে, ওরা সেখানে ওদের সঙ্গে যায়। গান গায়। তা ছাড়া নানারকম বদমাইস লোকও তো আছে। রাজস্থান তো বলতে গেলে ডাকাতদের দেশ। এখানে ডাকাতি অনেকের পেশা। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদেরও যেতে হয়। তা সত্ত্বেও কত খুন-খারাপি হয়ে গেছে, তার কোনো ঠিক আছে!

গাড়ি চালাতে-চালাতে ডাক্তারবাবু গল্প বলছিলেন। একটু থেমে বললে, এবার যেদিন ও-গ্রামে কল্ আসবে, আপনাকে নিয়ে যাবো, অনেক গল্প-উপন্যাসের প্লট পাবেন।

বললাম, প্লটের জন্যে নয়, নতুন ধরনের মানুষ দেখতেই আমার ভালো লাগে।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা যদি বলেন, আমার ডাক্তারখানাতেই তো ওরা আসে।

—কই, আমি তো দেখি নি।

ডাক্তারবাবু বললেন, ঠিক আছে, এবার এলে আমি আপনাকে দেখাবো।

তারপর আবার বললেন, এই নটনীদের আপনি রাজস্থানের সব জায়গায় দেখতে

পাবেন, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, মেবার, চিতোরগড়। কিন্তু উদয়পুরে কোনো নটনী নেই।

—কেন ? আমি অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

ডাক্তারবাবু বললেন, সে একটা বড় ট্রাজিক গল্প আছে। আচ্ছা, আপনি আগে উদয়পুর থেকে ফিরে আসুন না, তারপর আপনাকে বলব।

আমার যেন কৌতূহল তখন আরও বেড়ে গেল। বললাম, আপনি এখনই বলুন না, আমার বড় শুনতে ইচ্ছে করছে।

—না, আগে আপনি ঘুরে আসুন, তারপর বলবো।

*

এর পর উদয়পুর চলে গিয়েছিলাম চিতোরগড় হয়ে। উদয়সাগর দেখতে গিয়ে গাইডরা এসে ছেঁকে ধরলো। একটু সুবিধে-সুযোগ পেয়েই নানারকম কথা তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কোথায় নাথদোয়ার, কোথায় বৃন্দাবনপ্রাসাদ। এক-একটা করে সব জেনে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের এখানে নটনী নেই ?

গাইড বললে, না হুজুর, উদয়পুরে নটনী নেই–

—কেন, উদয়পুরে নটনী নেই কেন ?

—তা জানি না হুজুর। আর সব জায়গায় আছে, আমাদের উদয়পুরে নেই।

শুধু একজনকে নয়, সব গাইডকেই ডেকে-ডেকে, পয়সা দিয়ে আলাপ করে চা খাইয়ে গল্প করলাম। যদি গল্পের মধ্যে কোনও নটনীর হদিস পাই। গাইডদের ডেকে এনে নিজের খরচে হোটেলে খাইয়ে-দাইয়েও কোন সুলুকসন্ধান পেলাম না। সবারই ওই এক কথা! উদয়পুরে কেন নটনী নেই, তা কেউ জানে না। শেষকালে একদিন সব কিছু জেনে এসে আবার ফিরে এলাম কিষেণগড়ে।

ডাক্তারবাবু তখন রোজকার মত ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারি করছেন। ওপাশে কম্পাউণ্ডার নিতাইবাবু ওষুধ তৈরি করছে এক মনে। আর ঠিক ডাক্তারবাবুর সামনে একজন ওই-দেশী মহিলা বসে আছেন, মহিলাকে দেখে আমি সোজা ভেতরের অন্দরমহলের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু কাজ করতে-করতেই ডাকলেন।

বললেন, বসুন বিমলবাবু, এখানেই বসুন।

অগত্যা সঙ্কোচ ত্যাগ করে পাশের একটা চেয়ারে বসলাম।

ততক্ষণে ডাক্তারবাবু মেয়েটিকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মদ খাওয়া একটু কমিয়ে দিতে হবে তোমাকে, বুঝলে ?

মেয়েটি হাসলো। রাজস্থানী পোশাক-পরা চেহারা। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। হাসলে আবার গালে টোল পড়ে। বাঁ-দিকের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। বয়েসের তেজ যেন ঘাগরা-ওড়নার ফাঁক দিয়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মেয়েটি বললে, না ডাগ্‌দারবাবু আমি সরাব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, আর রাতে ভালো করে ঘুমোতে হবে। ঘুম কম হচ্ছে।

—না ডাগ্‌দারবাবু, আমি তো ঘুমোই। পেট ভরে ঘুমোই। ভোর চারটের নিদ্ করতে যাই, আর বেলা বারোটায় উঠি। পুরো আট ঘণ্টা নিদ্ যাই।

ডাক্তারবাবু বললেন, না, ও রকম ঘুম হয়, রাত দশটায় বিছানায় যেতে হবে, আর ভোর ছ'টায় উঠবে। তোমার শরীরে একদম খুন নেই। এই দাওয়াই দিচ্ছি, এই দাওয়াই খেলে দরদ-টরদ চলে যাবে।

—আর কাশি ?

—কাশিও চলে যাবে। আমার কথা শুনে চললে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনও

ভাবনা নেই।

মেয়েটি এবার উঠলো, ওষুধ নিলে কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে। টাকা দিলে গুণে-গুণে। তারপর চলে যাবার সময় ওড়নাটা ভালো করে মাথায় ঢেকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে বিদায় নিলে।

রাস্তার বাইরে একটা বয়েল-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেখানে একটা বুড়ি মতন কে বসেছিল ভেতরে। মেয়েটা লাফাতে-লাফাতে গিয়ে তার ওপর উঠে বসল। ডাক্তারবাবু এবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, কিছু বুঝলেন?

বললাম—না।

—সে কি, আপনাকে বোঝাবার জন্যেই তো বসতে বললাম। এই-ই হলো নট্‌নী।

আমি আর-একবার নট্‌নীকে ভালো করে দেখবার জন্যে রাস্তার দিকে চাইলাম। কিন্তু তখন নট্‌নীকে নিয়ে বয়েল-গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমার পেশেণ্ট ওরা। এই কিষেণগড়ে অনেক নট্‌নী আছে। সেবার তো ওদের গ্রাম দেখিয়েছিলাম আপনাকে। তবে এরা শহরের নটনী। তাই ওদের অবস্থা একটু ভালো। এদের পেছনে বড়-বড় রেইস্ আদমি আছে। তারাই এদের খোরাক যোগায়।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, উদয়পুরে গিয়ে কী দেখলেন?

বললাম, টুরিস্ট-গাইডে যা-যা লেখা আছে তাই-ই দেখলাম।

—আর নট্‌নী?

বললাম, না। অনেক চেষ্টা করেছি দেখতে। অনেক গাইডকে হোটেলে এনে খাইয়েছি, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না।

ডাক্তারবাবু বললেন, তবে শুনুন।

গল্প আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু, এমন সময় আরো কয়েকজন রোগী এসে পড়লো। আর গল্প বলা হলো না। বললেন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলবো।

কিষেণগড় জায়গাটা পুরোনো। সুগার-মিল আছে। সিনেমা-হাউস আছে। বড় একটা বিজনেস-সেণ্টার। জয়পুর আর আজমীরের মধ্যে যাতায়াত করবার পথে একটা বড় শহর। সারারাত লরিগুলো মাল নিয়ে যাতায়াত করে।

একেবারে বাজারের ওপর ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর বাড়ি। উত্তর দিকে আবার একটা বিরাট কটন্ মিলের ফ্যাক্টারির কনস্ট্রাক্‌শান চলছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, এ রাজস্থান আর সেই আগেকার রাজস্থান নেই। তাড়াতাড়ি সব বদলে যাচ্ছে। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম, তখন মাংসের সের ছিল দু'আনা, এক আনা। এখন দু'টাকা কিলো।

পুরোনো দিনের গল্প চলছিল ডাক্তারখানার বাইরে ইজিচেয়ারে বসে। সামনে দিয়ে এক-একটা লরী যাচ্ছে গুম্‌গুম্ শব্দ করে আর কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তারপর আছে সামনেই রেলওয়ে স্টেশন। কিষেণগড় স্টেশনের প্লাটফরমের ওপরে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিলে হয়তো ডাক্তারবাবুর বাড়িটাও দেখা যায়।

কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে অনেক। তাই শব্দের আর গোলমালের তীক্ষ্ণতা কম। সামনের স্টোভ সারানোর দোকানের মালিক ঝাঁপ বন্ধ করে বিড়ি টানতে-টানতে শেষবারের মত নিজের বাড়ি চলে গেল। একটা টাঙ্গাওয়ালা সোয়ারী পায়নি বলে অনেকক্ষণ বাস স্ট্যাণ্ডেই ঘোরাঘুরি করে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে আস্তাবলের দিকে গাড়িখানাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চললো। ডাক্তারবাবু গল্প বলতে লাগলেন

ইজিচেয়ারে বসে।

আমার চোখের সামনে তখন ভাসতে লাগলো উদয়পুর, উদয়সাগর, বৃন্দাবন প্যালেস, রাণা স্বরূপ সিং আর এক নটনী। নাথদোয়ারের মঙ্গল সিং-এর মেয়ে রঙনা।

ডাক্তারবাবু বললেন, সকালবেলা ওই যে মেয়েটাকে দেখালাম, ওর নামও রঙনা—কিন্তু ওরা এসব কিছুই জানে না।

বললাম, কি জানে না?

—এই যে গল্প আপনাকে বলছি। অনেক রেইস্ বাবু আছে ওদের। অনেক মাল্‌টি-মিলিওনার বাবু। তারা ওদের নিয়ে এখন ফুর্তি করে, ওদের পেছনে টাকা খরচ করে। যার ভাগ্য ভালো, তারা বাবুদের কাছে থেকে গাড়ি পায়, বাড়ি পায়। কেউ-কেউ বাইরে বেড়াতে যায়। কেউ বা লণ্ডনে, কেউ আমেরিকায়। দুনিয়ার সারা দেশে ওরা যেতে রাজি। কিন্তু উদয়পুরে ওরা যাবে না। যদি উদয়পুরে 'প্যালেস হোটেলে'র' এয়ার কণ্ডিশন্ ঘরেও নিয়ে যাবার লোভ ওদের কেউ দেখায়; তবু ওরা উদয়পুরে যাবে না। এমনি ওদের সংস্কার।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি উদয়পুর থেকেই তো এলেন। কিন্তু সেখানেও দেখে এলেন এ-গল্পটা কেউ জানে না। জানবে কী করে? তারা কী নটনী দেখেছে আমার মত! তারা কী আমার মত ওদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছে! ওদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে অনেকেই, ওদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছেও অনেকে। কিন্তু আমার মত চোখ দিয়ে কেউ তো ওদের দেখে নি।

তা সত্যি! ডাক্তারবাবুর চোখ ছিল। যখন এক-একটা কাহিনী বলতেন, রাজস্থানের এক-একটা ইতিহাস বলতেন, তখন মনে হতো উনি যেন বাঙালি নন, খাস রাজস্থানী।

—ইণ্ডিয়ার অন্য স্টেটের সঙ্গে এই রাজস্থানের কোনও তুলনা করবেন না আপনি। এই রাজস্থান এখনও একটা মিউজিয়াম হয়ে আছে। হয়তো ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে আর এ রকম থাকবে না। কিন্তু তবু যেটুকু জানি আপনাদের বলে যাই। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এ নিয়ে লেখেন। এর মানুষরা অন্য জাতের থেকে আলাদা। এর মাটিটা পর্যন্ত অন্য রকম। এর খনিতে যা পাওয়া যায়, তা অন্য স্টেটের মাটিতে পাওয়া যায় না।

বলতে-বলতে আসল গল্পের খেই হারিয়ে ফেললেন ডাক্তারবাবু।

আমি বললাম, তারপর রঙনার কী হলো?

রঙনা? ডাক্তারবাবুর মনে পড়ে গেল যেন এতক্ষণে।

বললেন, হ্যাঁ, রঙনার কথাই বলি। নাথদোয়ারের মঙ্গল সিং-এর মেয়ে। মঙ্গল সিংও নাচতো, গাইতো। নাথদোয়ারের মন্দিরে শিব-চতুর্দশীর রাত্রে নাচতেই হয়। ওটা নিয়মই। শিব-চতুর্দশীর রাত্রে উদয়পুরে যত নটনী আছে সকলকে নাচতে হবে। ওরা ছোটবেলা থেকেই নাচতে শেখে। নাচই ওদের নেশা, ওদের পেশা। আর নাচই কী এক-রকমের?

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন দেখেছি ওসব। এই কিষেণগড়ে প্রথমে সুগার মিলে ডাক্তারি চাকরি নিয়ে আসি। ডাক্তারমানুষ বলে আমাকে বেশ খাতির করতো সবাই। নটনীরাও খাতির করতো। শিবপূজোর প্রসাদ পাঠিয়ে দিত বাড়িতে। ওদের বাড়িতে যা-কিছু উৎসব হলে আমার যাওয়া চাই-ই চাই। নইলে ওরা রাগ করতো।

আর সে কী নাচ, আপনাকে কী বলবো! রাজপুতদের লাঠি দেখেছেন তো? ওই লাঠি একজন উঁচু করে ধরতো, আর তারই ডগার ওপর একজন নটনী ব্যালেন্স রেখে নাচতো। ঘুরে ঘুরে নাচ।

আমি গল্প শুনছিলাম। বললাম, পড়ে যেত না?

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি কখনো কাউকে পড়ে যেতে দেখিনি। তবে শুনেছি নাকি দু-একবার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার ডাক্তারখানায় তাকে নিয়ে এসেছে। তারপর হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মলম লাগিয়ে তাকে সারিয়ে তুলেছি। ওরা আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ওরাই আমাকে এই গল্পটা বলেছে—রঙনার গল্পটা তাই ওদের সকলের মুখে-মুখে।

রাণা স্বরূপ সিং-এর আমল তখন। এই রাজস্থানের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে স্বরূপ সিং এর নামও যেমন, প্রতিপত্তিও তেমনি।

রঙনার তখন বেশ বয়েস হয়েছে! পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে দেখে হিংসে করে। বলে, বে-শরম! বে-শরম বললো তো বললো তাতে রঙনার বয়েই গেল। তোমার তো আমি খাইও না, পরিও না। তুমি আমার মতো নাচো, তাতে তোমারও খাতির হবে, তোমারও পয়সা হবে।

ইণ্ডিয়ার সব জায়গা থেকে তখন তীর্থযাত্রীরা আসে নাথদোয়ারে পুজো দিতে। তখন এখনকার মত ট্রেনও ছিল না, বাসও ছিল না, প্লেন তো দূরের কথা। সেই তীর্থযাত্রীরা এসে পাণ্ডাদের বাড়িতে উঠতো, মন্দিরে পুজো দিত। কিন্তু রঙনাকে নজরে পড়ে গেলেই জিজ্ঞেস করতো, ও কে? কাদের মেয়ে?

পাণ্ডারা বলতো, ও রঙনা, নটনীর মেয়ে নট্‌নী।

—নট্‌নী কি?

পাণ্ডারা বলতো, যারা নাচা-গানা করে, তাদেরই নট্‌নী বলে হুজুর!

—কী রকম নাচা-গানা করে?

—খুব ভালো হুজুর।

—ওর নাচ দেখাতে পারো?

—খুব পারি হুজুর। নাচা-গানাই তো ওর পেশা।

—তাহ'লে লাগাও একদিন, নাচ দেখি।

তা তার ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হয় না। হয়তো সিন্ধ থেকে বড় শেঠজী এসেছে। অনেক টাকার মালিক। সঙ্গে টাকার পাহাড় এনেছে। টাকা খরচ করবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কত টাকা নেবে নাও, সবচেয়ে যা ভালো নাচ আছে, তাই দেখাতে হবে।

—হুজুর ওরা লাঠির ওপর নাচতে পারে, দড়ির ওপরও নাচতে পারে।

—দড়ির ওপর কি রকম নাচ?

—দু'টো লম্বা লাঠির ওপর মাথায়-মাথায় দড়ি বাঁধা, তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁটে যাবে।

—তা তাই-ই দেখাও নাচ।

নাথদোয়ারের নটনীপাড়া থেকে দলবল এসে হাজির হয় পাণ্ডাদের বাড়ির সামনের উঠোনে। ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ করে ঢোল বাজতে শুরু হয়, আর শুরু হয় নাচ। রঙনা সেরা নট্‌নী। আর সব নট্‌নীকে সে নেচে কুপোকাৎ করে দেয়। জোয়ান মেয়ে। যেমন গড়ন তার, তেমনি তেজ। অন্য নট্‌নীরা তার সঙ্গে পারবে কেন?

শেঠজী বলে, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

আসর খতম হলে নট্‌নীরা এসে শেঠজীর সামনে মাথা নিচু করে, সেলাম করে। মাথার বেণীটা ঝুলে পড়ে সামনের দিকে।

শেঠজী একমুঠো মোহর সামনে এগিয়ে দেয়। বলে, তোমার নাম কী নট্‌নী?

পাশ থেকে রঙনার বাপ বলে, রঙনা।

রঙনা! বেশ নামটা। শেঠজী মনে-মনে উচ্চারণ করে। তারপর রঙনার গড়নটার

দিকে চেয়ে দেখে। বোধহয় ভেতরে-ভেতরে লোভ হয়। তারপর যখন অনেক পরে সবাই চলে যায়, তখন পাণ্ডাজীকে আড়ালে ডেকে বলে, পাণ্ডাজী, এই নট্নীর বাড়ি কোথায়?

পাণ্ডাজী বলে, হুজুর, ওদের মহল্লা আছে নাথদোয়ারে, সেই মহল্লায় থাকে।

—এখানে ডাকলে আসবে না?

পাণ্ডাজী বলে, কেন আসবে না হুজুর, ওদের তো ও-ই পেশা। হুজুর যতবার ডাকবেন, ততবার আসবে। দলবল নিয়ে এসে গেয়ে যাবে, নেচে যাবে।

শেঠজী বলে, না, সে-রকম নয়। দলবল নিয়ে নয়। একলা লুকিয়ে-লুকিয়ে আসতে বললে আসবে?

পাণ্ডাজী বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে চমকে ওঠে। বলে, না হুজুর, ওরা বড় জাঁদরেল জাত। রাজপুতদের সঙ্গে ওই নট্নীদের মেলে না। ওরা যেমন নাচতে গাইতে পারে, তেমনি আবার ছোরা চালাতেও পারে। নট্নীদের দিকে কেউ নজর দিলে ওরা তার জান্ নিতে কসুর করবে না।

শেঠজী সিন্ধী মানুষ। অগাধ টাকার মালিক। টাকা আছে বটে, কিন্তু তা বলে প্রাণের ভয় কিছু কম নেই। ঠাকুর-দেবতা দেখে পুজো-টুজো সেরে আবার দেশে ফিরে যায় ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে।

এই রকম করে নট্নীদের খবর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধ থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে ত্রৈলঙ্গ দেশেও খবরটা চালাচালি করে।

সব জায়গায় লোক বলে, নট্নী দেখেছিস? নট্নী?

কেউ-কেউ বলে, না।

—যা, তাহলে রাজস্থানে যা, গিয়ে দেখে আয়। আর নট্নীর সেরা নট্নী নাথদোয়ারের রঙনা।

তারপর থেকে সেই বর্ষাকালটা কাটলো, আর দলে-দলে তীর্থযাত্রী আসতে লাগলো উদয়পুরের নাথদোয়ারে। শেঠজীর কল্যাণে নাথদোয়ারের ঠাকুরের গায়ে সোনার গয়না উঠলো। নাথদোয়ারের সেবাইতদের সিন্দুকে মোহরের পাহাড় জমে উঠলো। বড়-বড় সোনার ঘড়ার ভেতর সোনার মোহর জমে উপচে পড়তে লাগলো।

আসলে কিন্তু ঠাকুর-দেবতা সব বাজে কথা। আসল টান হলো ওই নট্নীর। রঙনার জন্যেই নাথদোয়ারে এত লোক আসে। রঙনার জন্যেই এত ভিড় হয় নাথদোয়ারে। রঙনাই যেন নাথদোয়ারের ঠাকুর।

কিন্তু খবরদার, খুব সাবধান! ওদিকে নজর দিয়ো না তোমরা। নট্নীরা বড় সর্বনেশে মানুষ। ওরা গান গাইতে, নাচতেও যেমন, আবার তোমাকে খুন করে ফেলতেও তেমনি!

✻

মহেশ্বরপ্রসাদ এককালে গরীব ছিল। মহেশ্বরপ্রসাদের মা'র যখন বয়েস কম ছিল, তখন তার নাচের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোল বাজিয়েছে। আর যখনই অবসর পেয়েছে তখনই নটনীপাড়ার মেয়েদের নাচ শিখিয়েছে। নট্নীদের নাচ বড় জব্বর নাচ। যে সে শিখতে পারে না। মেয়ে যখন জন্মায়, তখন বুড়োরা এসে তার মুখ দেখে না, পা দেখে। হাত দিয়ে পায়ের গড়ন পরীক্ষা করে। ছোটবেলা থেকে সেই পায়ের যত্ন হয়। ওদের জুতো পরিয়ে দেয়। চামারদের কাছ থেকে পায়ের মাপ দিয়ে সে জুতো তৈরি করিয়ে আনে। তারপর আছে মালিশ। কি-সব একরকম গাছ-গাছড়া আছে, তারই রস গরম করে পায়ে মালিশ করা হয় রোজ।

আমি বললাম, কী গাছের রস?

ডাক্তারবাবু বললেন, সে গাছের নাম ওরা কাউকেই বলে না।

—তা তারপর ?

—তারপর যখন দু'বছর বয়েস হবে মেয়ের, তখন খুব ঘটা করে উৎসব হবে। মানে আমাদের যেমন লেখাপড়ার হাতে-খড়ি হয়, ওদেরও তেমনি। আমাদের মধ্যে বামুনদের যেমন পৈতে হয়, ঠিক সেই রকম আর-কি! তারপর মহেশ্বরপ্রসাদ সেই মেয়েকে নিয়ে পড়বে। মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলে বোল্ তুলবে—

তা ধিন ধিন্ তা
ত্রেকেটে তাক্, ত্রেকেটে তাক্
ধিন্ তাক্, ধিন্ তাক্
ধিন্ ত্রেকেটে তাক্—

ঢোল বাজায় মহেশ্বরপ্রসাদ আর জোরে মুখে-মুখে বোল্ তোলে। দরকার হলে নেচেও দেখিয়ে দেয়। নটনী সেই তালে-তালে নাচে।

দু'বছরের মেয়ে রঙনা সেই তখন থেকেই ওস্তাদ। একবার একটা বোল্ তুলে দিলে আর ভোলে না। মহশ্বরপ্রসাদ নিজেই রঙনার কেরামতি দেখে অবাক হয়ে যায়। বলে, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

সেই মেয়ে বড় হলো। বড় যত্নে বড় হলো রঙনা। মহেশ্বরপ্রসাদ নটনীপাড়ার নামকরা বাজিয়ে। গান শিখিয়ে, নাচ শিখিয়ে বুড়ো হয়ে গেছে তখন। পাড়ার দশজন ভয়-ভক্তি করে। মানেও সবাই।

সবাই বলে, গুরুজীর নসীবটা ভালো। মেয়ে গুরুজীর সুখ আনবে।

তা সুখই হলো শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরপ্রসাদের। নাথদোয়ারে সবাই রঙনার নাম করে। নাথদোয়ার ছাড়িয়ে উদয়পুরেও নাম ছড়িয়ে গেল। শেষকালে উদয়পুর থেকে যোধপুর, বিকানীর, জয়পুর, কিষেণগড় সব জায়গাতেই রঙনার নাম।

—কে রঙনা ?

—ওরে, রঙনা সেই গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে বাপেরও নাম ছড়িয়ে গেল রাজস্থানে। রাজস্থান থেকে বাংলা মুলুক। বাংলা মুলুক থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্য। আর যেখানেই তীর্থ করতে যাও, রাজস্থানের পুষ্কর তীর্থ দেখতে যেতেই হবে। আর পুষ্কর দেখলে তো নাথদোয়ার আর কতদূর ? নাথদোয়ার গিয়ে শিবের প্রসাদ পেতেই হবে। শিব তো সকলেরই দেবতা। নামেরই যা ফারাক। কেউ ডাকে ভোলা-মহেশ্বর বলে। কেউ ডাকে ত্রিলোকনাথ বলে। আবার কেউ তাকে একলিঙ্গেশ্বর বলে। আসলে সবই এক, একই সব।

ডাক্তারবাবু বললেন, একদিন স্বরূপ সিং-এর কাছে খবরটা গেল।

স্বরূপ সিং হলো উদয়পুরেশ্বর। শিব যেমন ভুবনেশ্বর, স্বরূপ সিং তেমনি উদয়পুরেশ্বর। বড় খেয়ালী রাজা।

তখন বৃন্দাবন-প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেছে। চারদিকে উদয়সাগর। কথাই আছে উদয়সাগরের জল একবার যদি খাও তো তোমার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত উদয়সাগর ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়েও আছে, জড়িয়েও আছে। বড়-বড় পাহাড়ের ওপর উদয়পুরের কেল্লা, সেখানে উঠতে গেলে পা ব্যথা হয়ে যাবার জোগাড়। তারপর একবার পাহাড়ের ওপর উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। তখন উদয়সাগরের হাওয়া তোমার দেহ-মন জুড়িয়ে দেবে। সেই উদয়সাগরের ভেতরে বৃন্দাবন-প্রাসাদ। বড় যত্ন করে সে প্রাসাদ সাজিয়েছেন স্বরূপ সিং। সেইখানেই বসেন স্বরূপ সিং। সেইখানে বসে-বসেই স্বরূপ সিং বড়-বড় ওস্তাদের গান শোনেন। জলের স্রোতের ওপর গানের সুর ভেসে গিয়ে দূরের পাহাড়ের গায়ে আছাড় খায়।

গান শুনতে-শুনতে স্বরূপ সিং বলেন, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

শুধু স্বরূপ সিং একলা নয়। সঙ্গে মন্ত্রী থাকে, মোসায়েব থাকে, পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ সবাই তাতে তাল দেয়। তারাও সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

রাণা স্বরূপ সিং যদি গান শুনে ভালো বলে, তো আশপাশের পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-পরিষদ সবাইকে তা ভালো বলতে হবে। রাণার যদি কোনও দিন গান শুনতে ভালো না লাগে তো কারোরই সেদিন শুনতে ভালো লাগবে না।

রাণা স্বরূপ সিং যদি বলেন, আজ দিনটা তো ভালো নয়, জগমন্ত সিং।

জগমন্ত সিং খাস মন্ত্রী। তিনিও বলবেন, না মহারাণা, আজকের দিনটা একবারেই ভালো নয়।

একবার বাইরে থেকে এক ভাট এসেছিল। নাম—ভাট তিলকচাঁদ। ভাট আগেও অনেক এসেছে উদয়পুরে! রাণার নিজস্ব মাইনে-করা ভাটও আছে। কিন্তু অনেকে বললে, এ ভাটটা নাকি ভালো গান করে।

রাণা বললেন, জগমন্ত সিং যদি বলে এ ভালো ভাট, তা'হলে আসুক, গান গাক্।

জগমন্ত সিং আসতেই স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন, নতুন ভাট কেমন গান গায় জগমন্ত সিং?

—খুব ভালো মহারাণা, বড় ভালো গান গাইছে আজকাল।

রাণা বললেন, তা'হ'লে আনো তাকে।

রাণার লোক ভাটকে আনতে গেল।

কিন্তু তিলকচাঁদ বললে, এখন আমার সময় নেই, আগে যোধপুরের রাণাকে গান শুনিয়ে আসবো, তারপর উদয়পুরের রাণাকে গান শোনাবো।

যে লোক ডাকতে গিয়েছিল সে বললে, কেন? যোধপুরের রাণা কি উদয়পুরের রাণার চেয়ে বড়, যে তার কাছে আগে যাবে?

ভাট তিলকচাঁদ বললে, আজ্ঞে, যোধপুরের রাণার কাছ থেকে যে আগে বায়না নিয়েছি।

খবরটা স্বরূপ সিং-এর কাছে পৌঁছতেই তিনি একেবারে আগুন হয়ে গেলেন।

বললেন, কী, এত বড় সাহস ভাটের! ডাকো ভাটকে এখানে। উদয়পুরের চেয়ে যোধপুর বড় হলো?

তখুনি জগমন্ত সিং-এর কাছে তলব গেল। মন্ত্রী জগমন্ত সিং স্বরূপ সিং-এর মেজাজ চিনতো। বুঝতে পারলে ভাটের এবার সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। ভাটের যোধপুর যাওয়া ঘুচে গেল চিরকালের মত।

স্বরূপ সিং-এর কাছে আসতেই জগমন্ত সিং-এর ওপর হুকুম হলো—ডাকো ভাটকে এখানে। এনে বাঘের মুখে ফেলে দাও।

তা তাই-ই হলো। কেউ জানলো না কেন ভাট তিলকচাঁদ যোধপুরে যেতে পারলে না। কেউ বুঝতে পারলে না ভাট তিলকচাঁদের গান আর কেউ শুনতে পায় না কেন?

ভাট তিলকচাঁদের নাম রাজস্থানের ইতিহাস থেকে মুছে দিলেন মহারাণা স্বরূপ সিং। তিনি ছিলেন এমনি মানুষ।

যারা নাথদোয়ারে থাকে, তারা মহারাণার এসব কাহিনী শুনেছে। শুনেছে উদয়পুরের মহারাণা খামখেয়ালী লোক। শুনেছে, মহারাণা যার ওপর সদয় হবেন, তাকে হয়তো একেবারে জায়গীর দিয়ে দেবেন। কিন্তু যার ওপর রাগ হবে, তার চরম সর্বনাশ করে তবে তাকে ছাড়বেন।

নটনীরা অনেকবার গেছে স্বরূপ সিং-এর দরবারে। স্বরূপ সিং বড় দিলদার লোক। বড় দরদী লোক। বড় জহুরী। গুণীর গুণের কদর আছে তাঁর কাছে। নটনীরা গিয়ে নাচে, গায় আর মোটা ইনাম নিয়ে আসে। আহেরিয়ার দিন দরবারে মজলিস বসে।

স্বরূপ সিং-এর দরবারে আহেরিয়ার দিনে শুধু নটনীরা আসে না। আসে শেঠজীরা। উদয়পুরের বড়-বড় শেঠজী সব। লাখ-লাখ টাকার কারবার তাদের। তারা এদেশ থেকে ওদেশে মাল চালান দেয়। মালের মহাজনও বটে তারা, ওদিকে বাংলাদেশ, ওদিকে দাক্ষিণাত্য, আবার ওদিকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট। তাদের কারবারের জাল গোটানো সারা হিন্দুস্থানে! মাল চালানি, আমদানি, রপ্তানি চলে। তারাও বহু টাকার মালিক। তাদের মোহর আছে, সোনা আছে, হীরে আছে, নোকর-চাকর-বাঁদী সবই আছে। তাদেরও হাজার-হাজার লোক আছে খোসামোদ করবার জন্যে।

কিন্তু স্বরূপ সিং-এর সামনে এসে সবাই জুজু।

সেই পাহাড়ের নীচু থেকে ওপর প্যালেসে ওঠবার সময় পায়ের জুতোজোড়া হাতে তুলে নেয়। স্বরূপ সিং-এর সামনে জুতো পরাই নিষিদ্ধ। জুতো যদি কেউ পরতে চায় তো নিচেয় পরুক, ওই যেখানে তালাও আছে, যেখানে ধোবিঘাটে ধোপারা কাপড় কাচে, যেখানে চাষারা ক্ষেতে লাঙল দেয়, যেখানে বাজারে আনাজ-তরকারি বিক্রি হয়, ওখানে জুতো পরে মশ-মশ করে হাঁটুক। কিন্তু এখানে নয়। এই পাহাড়ের তলা থেকে, যেখান থেকে এই প্যালেসটা উঠেছে, ওইখান থেকে জুতো খুলে হাতে করে এসো। এসে আমার সামনে নিচু হয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াও। তারপর আমি বসতে বললে বসবে, কথা বলতে বললে কথা বলবে। আর আমি হাসালে হাসবে, আমি গম্ভীর হলে গম্ভীর হবে।

কিন্তু রাগ? রাগের কথা শুনবে?

সে-রাগের ঘটনাও আছে স্বরূপ সিং-এর জীবনে। মন্ত্রী জগমন্ত সিং সে ঘটনাও জানে। স্বরূপ সিং একদিন সন্ধ্যেবেলা শিবপুজো সেরে সিঁড়ি দিয়ে দরবারের দিকে আসছেন। হঠাৎ কানে গেল গানা-বাজার শব্দ। কোথায় গানা-বাজা হচ্ছে?

ডাকলেন জগমন্তকে। বললেন, কে গান গাইছে জগমন্ত সিং?

মুশকিলে পড়লো জগমন্ত সিং। কান পেতে শুনতে লাগলো। তাই তো। কার এত বুকের পাটা? স্বরূপ সিং এর অনুমতি না নিয়ে গানা-বাজা করে কী করে লোক! এ তো কানুন নয়। এ তো বে-কানুন।

জগমন্ত সিং খবর আনতে পাঠালে শহরের মহল্লা থেকে।

বাজারের সামনে শেঠজীদের মহল্লা। শেঠজীরা চারদিক থেকে টাকা আমদানি করে আনে! কেউ কারবার করে দিল্লীর বাজারে, কেউ করে কলকাতার বাজারে। চারদিকের কারবারের টাকা এসে জমা হয় উদয়পুরের শেঠজীদের পাড়ায়। শেঠজীরা টাকা এনে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। খরচ করতে হলে লুকিয়ে-লুকিয়ে খরচ করতে হয়। জানতে পারলেই বিপদ। একবার যদি স্বরূপ সিং-এর কানে ওঠে অমুক শেঠজীর টাকা হয়েছে তো আর রক্ষে নেই। তখন জগমন্ত সিং-এর ওপর হুকুম হবে টাকাটা আদায়ের। একটা কোনও ছুতো-নাতায় টাকা দিতে হবে দরবারে। মহারাণার মেয়ের সাদিই হোক আর নাতির অন্নপ্রাশনেই হোক, হাজার-হাজার টাকা এনে ঢেলে দিতে হবে রাণার পায়ে।

সেদিন শেঠজীদের পাড়ায় বড় মজলিস বসেছিল। মজলিস বলতে এমন কিছু নয়। নাচা-গানা-বাজা। নটনীর দল এসেছে নাথদোয়ার থেকে। তাদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের সঙ্গে নটনীর দলে এসে নাচা-গানা-বাজা করছে। আর শেঠজী আত্মীয়-কুটুমরা এসে জুটেছে আসরে। ওদিকে রান্না-খাওয়ার আয়োজন হচ্ছে ভেতরে।

উপলক্ষটা সামান্য। একটা কারবার নতুন করে ফাঁদতে যাচ্ছে শেঠজী। তারই মহরৎ-উৎসব। আসলে অনেক টাকা জমে গেছে ভাঁড়ারে। সেগুলো খরচ করার দরকার।

এক একজন করে নটনীরা নাচছে, আর তাদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদ তদারকি করছে। ভুল হলেই ধমক খেতে হবে গুরুজীর কাছে।

হঠাৎ কানাকানি ফিস্-ফিস্ শুরু হয়ে গেল। শেঠজীদের মধ্যে যেন গুন্‌গুন্ করে

কথাবার্তা চলছে। দু'-একজন গান শুনতে-শুনতে বাইরে উঠে গেল। এমন তো হয় না।

মহেশ্বরপ্রসাদের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে নাচ শিখিয়েছে নটনীদের। তাদের নাচ দেখতে দেখতে কেউ আসর ছেড়ে উঠে গেলে তার বড় খারাপ লাগে। নিজের অপমান মনে হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলটিকে আরো জোরে বাজাতে বললে।

তারপর রঙনার দিকে চেয়ে দেখলে। রঙনা তখন নিজের খেয়ালেই নাচছে। একবার বুকটাকে চিৎ করে দিচ্ছে, একবার ঘুরে-ঘুরে কাৎ হয়ে সকলকে সেলাম করছে। তারপর সেই রকম কাৎ হয়েই একটা পা বাড়িয়ে দিলে উল্টোদিকে। এই জায়গাটায় বারবার আসরের সমঝদার গুণী লোকেরা 'তওবা' 'তওবা' বলে তারিফ করে। এক জায়গাটাতেই শেঠজীরা সাধারণত ইনাম দেয়। কিন্তু তাজ্জব! কেউই কিছু বলে না।

রঙনাও নাচতে-নাচতে একটু অবাক হয়ে গেল। এত মন দিয়ে নাচছে সে, অথচ কই কেউ তো তারিফ করছে না অন্য দিনের মত।

গুরুজীর দিকে একবার চাইলে রঙনা। মহেশ্বরপ্রসাদ বুঝলো ব্যাপারটা। রঙনাকে তাতিয়ে দেবার জন্যে জোরে তারিফ করে উঠলো—বহোত আচ্ছা—বহোত আচ্ছা—

তারিফ করলে বটে মহেশ্বরপ্রসাদ, কিন্তু তেমন মনের জোর পেলে না।

হঠাৎ আসরের দিকে নজর পড়তেই দেখলে শেঠজীরা কেউ নেই। কয়েকজন ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে শুধু বসে আছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ উঠল। কিন্তু রঙনা তখনও নাচছে। তার কোনও দিকে খেয়াল নেই। গুরুজী তাকে শিখিয়েছে—যখন নাচবে সে তখন কোনোদিকে নজর দেয় না যেন। তার চোখের সামনে তখন আর কেউ নেই, কিছু নেই। গুরুজীর মুখটাই তখন শুধু মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে নাথদোয়ারের ঠাকুর একলিঙ্গনাথের কথা। মনে-মনে প্রণাম করছে সে ঠাকুরকে, গুরুজীকে। হে একলিঙ্গনাথ, হে গুরুজী, আমাকে সাহস দাও, ভক্তি দাও।

শেঠজীর বাড়ির ভেতরে তখন তুমুল কাণ্ড চলছে। মহেশ্বরপ্রসাদ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে হুজুর? নটনীর কী কসুর হলো?

কেউ মহেশ্বরপ্রসাদকে কথার জবাবই দেয় না। বললে, কি হলো হুজুর?

শেঠজীরা তখন এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে। বাড়িময় হৈ-চৈ চলছে। মহেশ্বরপ্রসাদ তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ কে যেন আসরের মধ্যে এসে চিৎকার করে উঠল—নিকাল্ যাও, নিকাল্ যাও।

রঙনা তখন নাচছে। মহেশ্বরপ্রসাদ এক ধমক দিয়ে উঠল, হুঁশিয়ার।

লোকটা বললে, আর দেরি করো না গুরুজী, এখুনি ভাগো এখান থেকে।

—কেন? কি কসুর হলো?

—তোমার কসুর কিছু হয় নি। কসুর হয়েছে আমাদের।

—কি কসুর?

কসুর যে কি, তা বলতে গেলে অনেক সময় লাগে, অত সময় কোথায়? সে সময়ও কেউ দিলে না। কথাটা বলেই লোকটা অন্য ধান্ধায় দৌড়লো।

মহেশ্বরপ্রসাদের মনে আছে সেদিনকার সেই কাণ্ড!

সেই তখনই সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল দলবল নিয়ে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। যখন মহেশ্বরপ্রসাদ নটনীর দল নিয়ে মহল্লা পেরিয়ে অনেক দূর পালিয়ে গেছে, তখন শেঠজীর বাড়িটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে।

সত্যিই স্বরূপ সিং-এর সেদিন বড় রাগ হয়েছিল।

জগমন্ত সিং খবরটা নিয়ে এসেই সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিংকে।

স্বরূপ সিং দরবারে এসে যখন বসলেন, জগমন্ত সিংও পেছনে পেছনে এলো। স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর? কোন্ শেঠজীর কোঠিতে গানা-বাজা হচ্ছে?

জগমন্ত সিং বললে, বাজার-মহল্লাতে শেঠ ঝুমুটমলের কোঠিতে।

—কে শেঠ ঝুমুটমল?

—হুজুর, ওই যে, যে শেঠ গুজরাটে বাদাম-দানার কারবার করে, সেই শেঠ—

—তা হঠাৎ নাচা-গানা-বাজা লাগিয়েছে কেন?

জগমন্ত সিং বললে, হুজুর, কাফি নাফা হয়েছে, অনেক টাকা কামিয়েছে, তাই কিছু নাচা-গানা-বাজাতে ওড়াচ্ছে।

—তা গানা-বাজা যে করছে, তার জন্য রাজ-দরবার থেকে পাঞ্জা নিয়েছে?

—না হুজুর।

—তবে ফাঁসাও ওকে।

হুকুম হয়ে গেল মহারাণা স্বরূপ সিং-এর। ফাঁসাও বললেই ফাঁসাও। এর আর আপিল নেই, আর আর মাফি নেই। একে শেঠ ঝুমুটমল বিদেশে গেছে, তার ওপর বিদেশে গিয়ে বাদাম-দানার কারবার করেছে। কারবার করে কাফি নাফা হয়েছে। তারপর সেই নাফার টাকা নিজে খুশিমত গানা-বাজা করে ওড়াচ্ছে। তারপর সব চেয়ে বড় অপরাধ করেছে এই যে, গান-বাজনা করবার পাঞ্জা পর্যন্ত নেয়নি দরবার থেকে।

হুকুম মিলে গেছে। সুতরাং আর কারো তোয়াক্কা নেই।

সেই রাজ-হাভেলির ওপরে পাহাড়ের চূড়ো থেকেই কামানদাগা হলো। এমন করে টিপ করা হলো, যাতে কামানের গোলা গিয়ে পড়ে ঠিক শেঠ ঝুমুটমলের কোঠির ওপর। আর পড়লো তাই।

আর পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে শেঠ ঝুমুটমলের কোঠিতে আগুন ধরে গেল। আশেপাশের বাড়ির ক্ষতি হলো। একটু আগেই যেখানে গান-বাজনা, আনন্দ-উৎসবের হিড়িক পড়েছিল, সেখান থেকেই আবার কান্নার রোল উঠলো। উদয়পুরের শেঠ বাজার-মহল্লায় আগুন ধরে গেলো এক দণ্ডে। বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে পালালো বাজার-মহল্লার লোকজন।

আর স্বরূপ সিং তাঁর উঁচু পাহাড়ের ওপরের ঘর থেকে বসে-বসে মজা দেখতে লাগলেন। বুঝুক মজাটা। দরবার থেকে পাঞ্জা না নিয়ে গান-বাজনা করে পরকে টাকা দেখানোর মজাটা বুঝুক শেঠ ঝুমুটমল। শেঠ ঝুমুটমলের সঙ্গে বাজার-মহল্লার অন্য শেঠরাও টের পাক্। স্বরূপ সিং যে এখনো মরে নি, স্বরূপ সিং যে এখনও বেঁচে আছে, এ-খবরটা মাঝে-মাঝে সকলকে জানানো দরকার। নইলে রাণাকে মানবে কেন উদয়পুরের লোক?

জগমন্ত সিংও খুশি! হ্যাঁ, জব্দ বটে শেঠ ঝুমুটমল। ঝুমুটমলের নয়া কোঠি হয়েছিল, নয়া বিবি হয়েছিল। ঝুমুটমল টাকাও কামাচ্ছিল খুব, নাথদোয়ার থেকে নটনীদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদকে এনে গানা-বাজা-নাচা লাগিয়েছিল।

কিন্তু জগমন্ত সিং জানতেও পারলে না যে তার আগেই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল ঝুমুটমলের বাড়িতে। খবর পেয়েই লোকজন সরে পড়েছিল।

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন বাজার-মহল্লা পেরিয়ে বড় তালাওটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই কামানের গোলাটা এসে পড়লো শেঠজীর কোঠির মাথায়। আর চারদিকে ধোঁয়ার পাহাড় উঠলো। ধোঁয়া উঠে উদয়পুরের আসমান ঢেকে দিলে।

ঝুমুটমলও জেনানাদের সঙ্গে করে নিয়ে তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে পড়েছে। যারা জানতে পারে নি, তারাই পাথর চাপা পড়ে মরেছে শুধু। তাদের কান্নায় আর চিৎকারে তখনও কান পাতা যায় না। যে মরেছে, সে তো বেঁচেছে।

কিন্তু যারা তখনও মরে নি, আধমরা হয়ে রয়েছে, তাদেরই যত যন্ত্রণা।

আর যারা একেবারে রক্ষে পেয়ে গেছে, তারা তখন দূরে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। তারা যে রক্ষে পেয়ে গেল, এই-ই একলিঙ্গনাথের অগাধ দয়া। জয় একলিঙ্গ কি জয় হো, জয় বাবা একলিঙ্গ কি জয় হো!

*

ডাক্তারবাবু গল্প বলতে-বলতে এবার থামলেন। আমি বললাম, তারপর?

কিষেণগড়ের ডাক্তারখানার সামনে বসে গল্প হচ্ছিল। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে তখন। একটা কুকুর সামনের ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ কেঁউ-কেঁউ করে একবার আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তারবাবু বললেন, দেখুন-দেখুন, কুকুরটার শীত করছে তাই কাঁদছে।

আমিও দেখলাম, কুকুরটা আবার ল্যাজ গুটিয়ে শরীরটাকে আরো বেশি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। রাস্তায় ঘেয়ো কুকুর। কোথাও আশ্রয় নেই বলেই রাস্তার ধুলোর ওপর খোলা আকাশের তলায় ঘুমোবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, তখনকার দিনে রাজস্থানের মত প্রজা, স্বরূপ সিং-এর চোখে তারা সবাই-ই যেন ওই ঘেয়ো কুকুর। তাদের বাড়ি-ঘর-বৌ-ছেলেমেয়ে কিছুই যেন থাকতে নেই। তারা যেন মানুষ নয়। স্বরূপ সিং-এর চোখে রাজস্থানের প্রজা মানেই জানোয়ার। তারা মরলেই বা কী, আর বাঁচলেই বা কী! তখনকার সমাজে ওই-রকমই ছিল নিয়ম। কয়েক শো বছর আগের গল্প আপনাকে বলছি। তখন রাণা মানেই ভগবান। দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপর তার ঠাঁই।

কিন্তু ওই যে কথায় আছে—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এও ঠিক তাই। মহারাণা স্বরূপ সিং তবু দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপর। কিন্তু তার ওপরে যদি কেউ তো সে হলো ওই মন্ত্রী জগমন্ত সিং।

বাজার-মহল্লায় যদি কোতোয়ালের অত্যাচার হয় তো তার আপীল-আর্জি যাবে খুব বড়-জোর জগমন্ত সিং পর্যন্ত। স্বরূপ সিং পর্যন্ত পৌঁছবেই না। স্বরূপ সিং টেরই পাবে না উদয়পুরের কোন্ মহল্লায় কোন্ শেঠজীর ওপর কি অত্যাচার হলো। সারা রাজস্থান চালায় জগমন্ত সিং। কিন্তু আসলে স্বরূপ সিং-এর বাঁ-কলমায়।

এমনিই স্বরূপ সিং-এর হুকুম তামিল করতে জগমন্ত সিং-এর পেছপা হবার কথা নয়। স্বরূপ সিং এর কানে জগমন্ত সিং যেমন শোনায়, স্বরূপ সিং তেমনিই শোনে।

জগমন্ত সিং যদি বলে—এবার ক্ষেতে মকাই ফলেছে বেশ, চাষীরা খুব নাফা করেছে।

স্বরূপ সিং বলে, তাহ'লে খাজনা বাড়িয়ে দাও।

খাজনা বাড়লেই স্বরূপ সিং-এর লাভ। মন্ত্রী জগমন্ত সিং-এর লাভ।

আসলে স্বরূপ সিং-এর চেয়ে জগমন্ত সিং-এরই লাভটাই বেশি।

কিন্তু স্বরূপ সিং-এর খেয়ালের আবার তুলনাও নেই। অত্যাচার করতেও যেমনি, দান করতেও তেমনি। ভাট তিলকচাঁদ খুব গান গায় ভালো। ভাটের মুখে স্বরূপ সিং-এর পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের গুণপণা শুনে স্বরূপ সিং মহাখুশি। বললে, পঞ্চাশ মোহর একে দিয়ে দাও জগমন্ত সিং।

স্বরূপ সিং যখন যা দিতে বলবে, তা দিতে হবেই। স্বরূপ সিং-এর সামনে তাই-ই দিতে হলো। ইনাম পেয়ে খুবই খুশি ভাট তিলকচাঁদ। স্বরূপ সিংকে মাথা নিচু করে বারবার কুর্নিশ করলে।

কিন্তু বাইরে আসতেই জগমন্ত সিং বললে, শোনো ভাট তিলকচাঁদ!

তিলকচাঁদ একটু অবাক হয়ে গেল। কই, কোনো তো কসুর হয় নি ভাট তিলকচাঁদের। রাণা-দরবারে যেমন-যেমন আদব-কায়দা মানতে হয়, সবই তো ঠিক-ঠিক

মেনেছে সে। আর এক আদব-কায়দা শুধু উদয়পুরেই নয়। যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর, সব জায়গাতেই একই কানুন।

জগমন্ত সিং-এর মুখটা কিন্তু গম্ভীর-গম্ভীর।

দেখেই একটু সন্দেহ হয়েছিল। বললে, নমস্তে মন্ত্রীজী!

জগমন্ত সিং বললে, খুব তো দাঁও মেরে নিলে স্বরূপ সিংজীকে সোজা মানুষ পেয়ে। তা আমার হিস্যা কোথায়?

—হুজুর, আপনার হিস্যা? ইস্‌কে মতলব?

জগমন্ত সিং বললে, তোমার পাওনা থেকে আমার অংশ না দিয়েই তুমি চলে যাচ্ছো?

ভয় পেয়ে গেল তিলকচাঁদ। এমন ঘটনা এর আগে কোথাও ঘটে নি।

তাড়াতাড়ি মোহর ক'টা বের করলে পুটলি থেকে। জগমন্ত সিং সব ক'টা মোহর নিজের হাতে নিয়ে তা থেকে পাঁচটা ভাট তিলকচাঁদের হাতে দিয়ে বাকি পঁয়তাল্লিশটা নিজে ট্যাঁকে গুঁজে রেখে বললে, নাও, আমার হিস্যা নিলাম, এখন তুমি বিদেয় হও।

এ রকম ঘটনা নতুন নয়। উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিং-এর কাছ থেকে যারা ইনাম পেয়েছে, তাদেরই এই অভিজ্ঞতা আছে।

তা সেদিন বাজার-মহল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে মহেশ্বরপ্রসাদ সেই জন্যেই অবাক হয় নি। কিন্তু শেঠ ঝামুটমলজী যে রাণার কাছে থেকে অনুমতি না নিয়েই নাচা-গানা-বাজা করবে, তা কেমন করে জানবে মহেশ্বরপ্রসাদ! জানলে আগেই হুঁশিয়ার হয়ে যেত।

রঙনা বললে, গুরুজী, এখন কী হবে?

শুধু তো রঙনা নয়। নটনীর দলে আরো অনেক মেয়ে আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে নাচতে এসেছিল মহেশ্বরপ্রসাদ।

ঝামুটমলের বাড়ি গেছে, সম্পত্তি গেছে, কিছু লোক মারাও গেছে। বাজার-মহল্লার শেঠজীরা নিজের-নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত। তখন আর নটনীদের ভালো-মন্দ দেখবার সময় নেই কারো।

মহেশ্বরপ্রসাদ সেই অত রাত্রে আবার উট-ভেড়া করে নাথদোয়ারে ফিরে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। ইনাম-ইজ্জত কিছুই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে কিছু হয়রানি আর লোকসান তার নসীবে ছিল। তারপরে মহেশ্বরপ্রসাদ এদিকে আসে নি। কিন্তু যেমন করে কে যেন স্বরূপ সিং-এর কাছে রঙনার কথাটা কেউ তুলেছিল!

স্বরূপ সিং-এর কাছে কথা তোলবার লোকের অভাব হয় না।

—কি নাম কঁহা? রঙনা?

—জী সরকার। অপূর্ব নাচে, অদ্ভুত গায়। তার নাচ দেখতে কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে আদমীরা আসে। শুধু রঙনার নাচ দেখবার জন্যে বহুত টাকা খরচ করে।

স্বরূপ সিং বলেছিল, ঠিক আছে, রঙনাকে হিঁয়া লাও।

হুকুমটা হয়ে গেল জগমন্ত সিং-এর ওপর।

এ-সব খবর মহেশ্বরপ্রসাদ জানতো না। নাথদোয়ারের মাঠে-মন্দিরে-পাহাড়ে তখন নটনীরা গুরুজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদয়পুরে আর যাবে না তারা। বড় তকলিফ পেয়েছে সেবারে। নটনীদের নাচ যদি দেখতে চাও এই নাথদোয়ারে এসো। এখানে এসে আমাদের নাচ দেখো! মুজরো করো। আমরা তোমাকে নাচ দেখাবো, গান শোনাবো। আর নাচ দেখে তোমার যদি ভালো লাগে তো খুশি হয়ে আমাদের ইনাম দিয়ো। আমরা খুশি হয়ে তা মাথায় তুলে নেবো।

কিন্তু সেদিন স্বরূপ সিং-এর হুকুমনামা এসে হাজির হলো মহেশ্বরপ্রসাদের কাছে, স্বরূপ সিং-এর হুকুমনামা, কিন্তু হুকুম পাঠিয়েছে জগমন্ত সিং। আর সে হুকুমনামা নিয়ে এসেছে দরবারের পেয়াদা।

মহেশ্বরপ্রসাদ পড়তে জানে না। বললে, আমাকে কী করতে হবে?

পেয়াদা বললে, মহারাণা স্বরূপ সিং রঙনা'র নাচা-গানার সুখ্যাতি শুনেছে, তাই মহারাণা নিজে রঙনার নাচ দেখবেন।

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে, কিন্তু উদয়পুরে বাজার-মহল্লার শেঠজী ঝুমুটমলের কোঠিতে নাচতে নিয়ে খুব তক্‌লিফ গিয়েছে, আবার নতুন কি তক্‌লিফ হবে বুঝতে পারছি না।

পেয়াদা বললে, মহারাণা স্বরূপ সিং খুদ্ নিজে ডেকেছে, তক্‌লিফ আবার কি হবে? স্বরূপ সিং খুশি হলে ইনাম দেবে, ইজ্জত দেবে।

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে, কী ইজ্জত দেবে?

—রঙনা যে ইজ্জত চাইবে, সেই ইজ্জতই দেবে। যা ইনাম চাইবে, তাই দেবে।

—আর যদি খুশি না করতে পারে?

পেয়াদা বললে, কেন খুশি হবে না গুরুজী, রাজস্থানের সব লোক খুশি হচ্ছে, আর মহারাণা স্বরূপ সিং খুশি হবে না? মহারাণা স্বরূপ সিং তো জহুরী লোক। সেবার ভাট তিলকচাঁদ দরবারে গাইতে এলো, মহারাণা তার গান শুনে খুশি হয়ে তাকে পঞ্চাশ মোহর ইনাম দিলে।

—পঞ্চাশ মোহর তো দিলে, কিন্তু মন্ত্রী জগমন্ত সিং তা থেকে কত হিস্যা নিলে?

কথা হচ্ছিল মহেশ্বরপ্রসাদের ঘরের দাওয়ায় বসে। হঠাৎ রঙনা ঢুকলো! বললে, গুরুজী, কথা দাও, আমি যাবো।

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে বললে, সে কি রে? কথা দেবো? তুই যাবি? সেবার যে বাজার-মহল্লায় গিয়ে অত তক্‌লিফ হলো। তুই বললি আর উদয়পুরে যাবি না?

রঙনা বললে, সেবার তো শেঠজীর কোঠিতে গিয়েছিলাম, এবার তো রাণার দরবারে।

পেয়াদা হুকুম জারি করে দিয়ে চলে গেছে। তার কাম হাসিল।

পেয়াদা চলে যাবার পর মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়ের দিকে চাইলে।

বললে, কী রে, সত্যিই তুই যাবি?

রঙনা বললে, হ্যাঁ গুরুজী, আমি সত্যিই যাবো।

—কিন্তু শেষকালে যদি কোন বিপদ হয়?

রঙনা বললে, কি বিপদ হবে—আমি যাবার আগে 'সেজা' করে যাবো। তুমি আমার সেজার ইন্তেকাম করো।

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল মেয়ের কথা শুনে। কতদিন ধরে মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়েকে বলেছে সেজা করতে।

আমি এতক্ষণ একমনে শুনছিলাম। বললাম, 'সেজা' কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, ওরা বিয়েকে 'সেজা' বলে। আমার মনে হয় 'শয্যা' কথাটা থেকেই 'সেজা' এসেছে, অর্থাৎ বিছানা। কিন্তু ওদের বিয়েটা আমাদের বিয়ের মত নয়। সে এক অন্যরকম।

আমি বেশ অবাক হলাম। বললাম, কী রকম?

—ওরা তরোয়ালকে বিয়ে করে বিমলবাবু। মানে ওদের বিয়ে হয় বরের তরোয়ালের সঙ্গে।

—তরোয়াল? বলছেন কি?

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলছি। বিয়ের সময় বর বিয়ে করতে আসে না। আসে তার তরোয়াল। সেই তরোয়ালের সঙ্গে বিয়ের যা-কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান শুরু হয়। খুব ঢাক-ঢোল-জগঝম্প বাজে। লাড্ডু-প্যাঁড়া-পুরি-ভাজি-গুলজামুন এই সব খাওয়া-দাওয়া হয়। বড়লোকের বাড়িতে ঘটাটা বেশি হয়, আর গরীব লোকের বাড়ি একটু কম। তা বিয়েই হোক আর 'সেজা'ই হোক, মঞ্জুরী নিতে হবে রাণার দরবার

থেকে। দরবার মঞ্জুরী না দিলে আর ঘটা-টটা কিছুই হবে না।

তা ঘটা-টটা হবার দরকার নেই। সে পরে হলেও চলবে। আগে তো রঙনার 'সেজা' হয়ে যাক্। মহেশ্বরপ্রসাদ বললে, তবে তাই হোক।

হোক মানে একদিন তরোয়াল এলো রঙনার কাছে। বরের বাড়ি দূরেও নয় বেশি। পাশের মহল্লাতেই দুখহরণ থাকে, তারই ছেলে হলো বর। সেই বর তলোয়ার পাঠিয়ে দিলে একদিন। সঙ্গে লোকজন, ঘোড়া, উট, জাঁকজমক, যা আসবার এলো।

যারা জানতো না, তারা বললে, কে তরোয়াল পাঠালে গো?

যে জানে সব, সে বললে, ঠাকুর-মহল্লার চমন।

—চমন? কোন্ চমন? কার লেড়কা?

—দুখহরণের লেড়কা চমন।

চমন দুখহরণের লেড়কা বটে, কিন্তু কিছু করে না সে। মানে কাজের চেয়ে তার বাঁশি বাজাবার দিকে ঝোঁক বেশি। যখন সবাই নাচে, সে বাঁশিটা নিয়ে পোঁ-পোঁ করে।

রঙনা বলতো, তোর কিছু হবে না, তুই বাঁশি বাজানো ছেড়ে দে।

চমন বলতো, আমার বাঁশি বাজানো না হোক, তোর নাচ তো হবে। তুই নাচবি আর আমি তোর তারিফ করবো?

রঙনা বলতো, তারিফ করবার জন্যে তোর মত বেকার লোককে দরকার নেই। বড়-বড় শেঠজীরা আমার তারিফ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।

অর্থাৎ চমন বুঝতে পেরেছিল রঙনার কাছে বেকার লোকের তারিফেরও কোনো দাম নেই। কিন্তু কোন্ কাজটা করবে সে? কোনও কাজই যে তার করতে ভালো লাগে না। মন দিয়ে চেষ্টা করলেও যে বাঁশিটা তার হবে না, তা সে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল।

তা সবাই কী সব পারে? আর সবাইকেই যে সব কাজ করতে হবে, আর পারতে হবে, সেটাই বা কে বললে? সেইটেই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? কিছু না-করতে পারাটাও তো একটা পারা। তাই যখন নটনীদের নাচ-গান চলতো, মুজরো নিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ কোথাও যেত, তখন চমন শুধু সঙ্গে যেতে চাইতো!

রঙনা বলে, ওই তো বললাম, কেবল আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে যে।

—তা মুখের দিকে চেয়ে থাকলে তোর ক্ষতি কি?

—বা রে, আমি যে বোল্ ভুলে যাই।

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে, ঠিক আছে, ও তোর মুখের দিকে চাইবে না। হলো তো?

তারপর চমনের দিকে চেয়ে বললে, খবরদার, কারোর মুখের দিকে যেন চাস নি।

চমন জিজ্ঞেস করতো, তাই'লে কোন্ দিক চাইবো?

রঙনা বলতো কেন, কারোর দিকে চাইতে হবে না, চোখ বুঁজে থাকলেই তো হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ বলতো, না-না, তার চেয়ে তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকিস, আমার তাতে কোনোও বোল্ ভুল হবে না।

কিন্তু তা কি হয়? তা কি সম্ভব? হঠাৎ এক-একবার চেয়ে ফেলতো রঙনার মুখের দিকে। আর তখনই ধমক খেতো রঙনার কাছ থেকে।

রঙনা বলতো, ওই দেখ গুরুজী, চমন আবার আমার দিকে চাইছে।

কিন্তু সেই চমনই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো একদিন। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। সারা নাথদোয়ারে তোলপাড় পড়ে গেল। একদিন দৌড়তে-দৌড়তে দুখহরণ মহেশ্বরপ্রসাদের কাছে এসে হাজির।

—কী ব্যাপার?

—না আমার ছেলেটা সর্বনাশ করে ফেলেছে!

—কী সর্ব্বোনাশ গো দুখহরণ? কী সব্বোনাশ?

—চমন নিজের দু'টো চোখ অন্ধ করে ফেলেছে। ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে দু'চোখ দিয়ে!

—ডাক্তারকে দেখিয়েছো?

ডাক্তার মানে সেকালের রাজস্থানের ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি মহেশ্বরপ্রসাদ দৌড়ে গেল ঠাকুর-মহল্লায়। রঙনাও দৌড়ে গেল। তখন মহল্লার ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই জুটেছে দুখহরণের বাড়িতে। ডাক্তার যখন চমনের চোখে কী সব গাছের পাতা বেটে দিয়ে চলে গেছে। চমন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তারপর সেই চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেল। চোখ দু'টো চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল চমনের। সবাই জিজ্ঞেস করলে, কেন রে, চোখ দুটো কিসে নষ্ট হলো তোর?

চমন বললে, আমি নিজেই চোখ দু'টো নষ্ট করে ফেললাম।

—কেন, তোর চোখ কি দোষ করলো?

চমন বললে, চোখ থাকলেই কেবল রঙনাকে দেখতে চায়।

মহেশ্বরপ্রসাদের তখন খেয়াল হলো। তখনই হঠাৎ মালুম হলো যে রঙনার 'সেজা' দিতে হবে। এতদিন ঢোল বাজিয়ে আর নটনীদের নাচিয়ে তার দিন কেটেছে শুধু। মেয়ের দিকে মন দেবার আর ফুরসুত হয় নি।

তাড়াতাড়ি 'সেজা'র বন্দোবস্ত করতে লাগলো মহেশ্বরপ্রসাদ। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে খোঁজ-খবর চালাতে লাগলো। রঙনা কিছুই জানতে পারে নি। কোথা থেকে কে তরোয়াল পাঠাবে, কি-রকম পাত্র, তারই হিসেব নিকেশ করতে লাগলো লুকিয়ে লুকিয়ে। রঙনাকে তরোয়াল পাঠাবার মত পাত্রের অভাব নেই। সবাই রঙনাকে 'সেজা' করতে চায়।

হঠাৎ এক পাত্র মিললো। মহেশ্বরপ্রসাদ তাতে ভারি খুশি। মেয়েকে বলতেই মেয়ে ক্ষেপে উঠলো, কেন তুমি ওখানে আমার সেজার ব্যবস্থা করতে গেলে গুরুজী?

—কেন, অন্যায়টা কি করলাম আমি?

রঙনা বললে, না, আমি ওখানে সেজা করবো না।

—তা কেন করবি নে, তা তো বলবি?

রঙনা বললে, করবো না, আমার খুশি।

—তাহ'লে কাকে সেজা করবি?

রঙনা বললে, চমনকে।

—চমন? সে তো কাণা। তাকে 'সেজা' করবি?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখ মা। সে অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। তোকেও দেখতে পাবে না, তোর নাচকেও দেখতে পাবে না। তোকেই শেষ পর্যন্ত তাকে সামলাতে হবে। সারা জীবন সামলাতে হবে। তা পারবি তো? বেশ ভালো করে ভেবে দ্যাখ।

রঙনা কিন্তু অনড়-অটল। বললে, পারবো গুরুজী। যে আমার জন্যে নিজের চোখ দু'টো নষ্ট করতে পারে, আমি নিজের তার চোখ হয়ে উঠবো। আমার নিজের একজোড়া চোখ যতদিন আছে, ততদিন চমনের চোখের অভাব হবে না।

মহেশ্বরপ্রসাদ আর কিছু বললে না। মেয়ের যখন একবার চমনকে 'সেজা' করবার মতি হয়েছে তো সে আর নড়বে না। গেল মহেশ্বরপ্রসাদ দুখহরণের বাড়ি।

দুখহরণও ঢোল বাজায়। মহেশ্বরপ্রসাদের দলে। দুখহরণকেও মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে তৈরি করেছে। দুখহরণের ছেলে চমনকে জন্মাতে দেখেছে মহেশ্বরপ্রসাদ। কথাটা শুনে দুখহরণের সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেল যেন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো! বললে, গুরুজী, সবই একলিঙ্গনাথের মর্জি।

আর চমন? চমনকে বলতেই সে বললে, গুরুজী, রঙনাকে বোলো, এবার তার

দিকে চাইলে সে যেন আর রাগ না করে। এবার যেন সে বোল্ না ভুলে যায়!

তা জাঁকজমক যা হবার তা হলো। তরোয়াল পাঠালো চমন আর তার সঙ্গে চাঁপাফুলের মালা, আর মিষ্টি-খাবার।

রঙনা সেই ফুলের মালা তরোয়ালের গলায় পরিয়ে দিলে! তারপর সেই ফুল-পরা তরোয়াল বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। নটনীদের নাচ হলো, গান হলো। রঙনা নাচলো, দুখহরণ ঢোল বাজালো। নটনী-মহল্লার সবাই এলো সেজার উৎসবে। শুধু এলো না চমন। কারণ তার আসতে নেই। সে আসবে পরে।

যেদিন চমন আসবে, সেদিন আরো বড় উৎসব হবে। আরো নাচ গান হবে, আরো লাড্ডু, মিঠাই, আরো গুলজামুন খাবে সবাই। তার আগে রঙনা মহারাণা স্বরূপ সিং-এর দরবার থেকে ইনাম নিয়ে আসুক, ইজ্জৎ নিয়ে আসুক।

*

ডাক্তারবাবু থেমে বললেন, কত রাত হলো? আপনার খুব ঘুম পাচ্ছে নাকি?

আমি বললাম, তারপরে বলুন কি হলো?

কিষেণগড়ের রাস্তা তখন নিঝুম। যে-কুকুরটা এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, সে আবার কেঁউ-কেঁউ করে ডেকে উঠলো। একখানা ট্রেন শাটিং করছিল স্টেশনের প্লাটফর্মে, সেটা হঠাৎ হুইশল্ বাজিয়ে রাত্রের অন্ধকারটা চিরে খান-খান করে ফেলে দিলে। ডাক্তারবাবু বললেন, বিমলবাবু আপনার ঘুম পেলে বলবেন।

বললাম, সে কী, দেখছেন উঠছি না পর্যন্ত, এক নিঃশ্বাসে শুনছি আপনার গল্প।

ডাক্তারবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, তার আদব-কায়দা-কানুনই আলাদা। বিশেষ করে অত বছর আগের ঘটনা। আপনি যদি কখনও গল্প লেখেন এই নিয়ে, তো আমি আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবো। এসব ছাপানো বইতে পাবেন না। এখানে এই কিষেণগড়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাইব্রেরীতে অনেক পুরোনো তুলোটি-কাগজে লেখা পুঁথি আছে। আপনাকে সব দেখাতে পারি।

বললাম, সে-সব পরে হবে, যদি কখনও উপন্যাস লিখি তো তখন দেখবো। এখন বলুন, তারপর কী হলো?

ডাক্তারবাবু বললেন, তারপর মহেশ্বরপ্রসাদ দলবল নিয়ে এলো উদয়পুরের স্বরূপ সিং-এর দরবারে। জগমন্ত সিং-এর কথা তো আগেই বলেছি। যেমন করে ভাট তিলকচাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, তেমনি করেই মহেশ্বরপ্রসাদের দলকে অভ্যর্থনা করা হলো। যারা জুতো পরে এসেছে তাদের জুতো খুলতে বলা হলো পাহাড়ের তলাতেই। খালি পায়ে উঠতে হবে ওপরে।

সবাই তাই-ই করলো। জুতো খুলে উঠলো ওপরে।

আসলে স্বরূপ সিং তো শুধু মহারাণা নয়, মহাদেবতা। ঈশ্বরের সমান। উদয়পুরের একলিঙ্গনাথ। সুতরাং তার কাছে যাচ্ছো যখন, তখন নিরাভরণ হয়ে যেতে হবে। দেবদর্শন করতে হলে যা করতে হয়, তাই করতে হবে।

কিন্তু ওপরে গিয়েও দেবদর্শন পাওয়া গেল না। মহারাণার হুকুমই সেদিন তিনি দরবারে নাচ দেখবেন না। দেখবেন বৃন্দাবন-প্যালেসে।

বৃন্দাবন-প্যালেস হলো একেবারে উদয়সাগরের ভেতর। বিরাট প্রাসাদ। কিন্তু স্বরূপ সিং-এর প্রাসাদ থেকে আধ-মাইলটাক। নৌকা করে যেতে হয়। নৌকা ছাড়া অন্য কোনও যাবার রাস্তা নেই। বৃন্দাবন-প্যালেসের চারদিকে অথৈ-অগাধ জল। জলে জল চারদিকে। সেই জলের উপর মহারাণা স্বরূপ সিং মাঝে-মাঝে জলবিহারে বেরোন। সঙ্গে থাকে পাত্র-মিত্র-পরিষদবর্গ। যারা স্বরূপ সিং-এর কাছ থেকে কিছু প্রসাদপ্রার্থী,

তারা সঙ্গে সঙ্গে জল-বিহার করবার সুযোগ খোঁজে। সঙ্গে থাকতে-থাকতে যদি একবার হাসি মুখের সুযোগ নিয়ে কিছু পেয়ে যায়, তারই প্রত্যাশায় তারা থাকে। তারপর যখন জল-বিহার শেষ হয়ে যায়, তখন তারা আবার পরের দিনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

আর সেও দেখবার মত প্যালেস বটে। আপনি তো দেখে এলেন? শুনেছি এখন নাকি মহারাণা প্যালেসটাকে হোটেল করে দিচ্ছে। আমেরিকান টুরিস্ট যারা আসবে, তারা ওখানে দিনে মাথাপিছু হাজার টাকা চার্জ দিয়ে থাকবে।

বললাম, হ্যাঁ, এখনও রাজমিস্ত্রি খাটছে। সবগুলো ঘর আমাদের দেখতে দিলে না।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি সবই দেখেছি। আর তাছাড়া আপনি না দেখতে পেলেও আপনার ক্ষতি হবে না, ও-সম্বন্ধে আপনাকে আমি অনেক বই সাপ্লাই করতে পারবো—তাতে অনেক ছবি-টবি আছে। রাণারা যে কত সৌখিন ছিলেন, কত ঐশ্বর্য, কত জাঁকজমক ছিল তাঁদের, তাও জানতে পারবেন। ওই স্বরূপ সিং-এর আমল থেকে তা বেড়েই চলেছিল। তা যাকগে সে-সব কথা।

সেই বৃন্দাবন-প্যালেসের চবুতরায় নাচের আসর বসলো সেদিন। গণ্য-মান্য গুণীজনদের আসরে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মহারাণার মঞ্জুরী পাবার পর নাচ আরম্ভ হলো। প্রথমে অন্য নটনীরা নাচলো। এক-এক করে সকলেই নাচের খেলা দেখালে। দুখহরণ ঢোল বাজাতে লাগলো তার সঙ্গে।

দলের সবাই এসেছে, শুধু আসে নি চমন। সে রঙনাকে 'সেজা' করেছে! তরোয়াল পাঠিয়েছে। সুতরাং সে আসতে পারে না। সে পরে আবার আসবে দলের সঙ্গে। কিন্তু রঙনা যখন নাচতে উঠলো, তখন নাথদোয়ারের ঠাকুর-মহল্লায় চমন দু'টো বোবা-চোখ নিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

বলছে, কিছু ভয় নেই রঙনা, তুমি নাচো।

রঙনা বলছে, কিন্তু তুমি যে দেখছো আমার দিকে—আমি যদি বোল্ ভুলে যাই।

চমন বলছে, আমি তো আর দেখতে পাই না রঙনা।

রঙনা বলছে, আচ্ছা এই নাও, তুমি আমার চোখ দু'টো নাও।

চমন বলছে, কিন্তু আমাকে চোখ দিয়ে দিলে, তুমি দেখবে কি করে?

রঙনা বলছে, আমি পা দিয়ে নাচবো, আমার পা-দু'টো থাকলেই তো হলো।

হঠাৎ রঙনার খেয়াল হলো কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায়, চমন তো তার দিকে চেয়ে নেই। কাউকেই চেনে না রঙনা। সবাই কিন্তু তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তুমি কোথায় চমন? তুমি তো আমার দিকে চেয়ে দেখছো না?

চমন কোথা থেকে যেন বললো, আমি কী করে দেখবো, আমার কি চোখ আছে?

—আছে-আছে, তোমার চোখ আছে চমন! রঙনা চিৎকার করে উঠলো, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তোমার চোখ থাকবে চমন।

—কিন্তু তারপর? তুমি যখন চলে যাবে?

—আমি কোথায় আর চলে যাবো? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় শান্তি পাবো?

—আমাকে তুমি এতই ভালোবাসো রঙনা।

—কিন্তু তোমার মত যদি ভালোবাসতে পারতাম! তোমার জন্য আমি যদি আমার সব কিছু দিতে পারতাম! তুমি কী চাও বলো।

—কিছু চাই না আর আমি। আমি সব পেয়েছি।

—কিন্তু তবু কিছু চাও। কিছু নিবেদন না করে যে কিছু নিতে নেই।

—তুমি আমাকে তোমার সব দিয়েছো রঙনা। আমি তোমাকে পেয়েছি। আর পাওয়ার কিছু বাকি নেই যে আমার!

—তাহ'লে বেশ, এবার তুমি আমার সম্মান নাও। যত সম্মান, যত খাতির, যত প্রীতি, যত তারিফ স্বরূপ সিং আমায় দিচ্ছে, এ সবই তোমার।

—রঙনা, সত্যি তুমি কতো ভালো।

রঙনা তখন বেহুঁশ হয়ে নাচছে। তার ঘাঘরায় জরির-চুম্কি বসানো ফুল-লতা-পাতাও নাচছে। মহারাণা স্বরূপ সিং-এর চোখের পাতা নড়ছে না। জগমন্ত সিং-এর চোখের পাতাও নড়ছে না, পাত্র-মিত্র পরিষদ কারো চোখের পাতা নড়ছে না। উদয়সাগরে যত জল আছে, তাদের মাথাতেও যেন আর ঢেউ নেই। সব ঢেউ যেন রঙনার নাচ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রঙনার দিকে।

—এ সবই তোমার চমন। এই খাতির, তারিফ, এ-সব তোমাকে দিলাম।

—কিন্তু তোমার সম্মান তো আমারই সম্মান রঙনা। তুমি আমি কী আলাদা?

রঙনা বললে, এসো, তুমি আর আমি আজ একাকার হয়ে যাই।

আরো জোরে নাচ চলতে লাগলো রঙনা। আরো তারিফ, আরো খাতির, আরো হাততালি। সমস্ত বৃন্দাবন-প্যালেসটা তখন চমকে চমকে উঠছে রঙনার পায়ের আঘাতে। চঞ্চল হয়ে উঠছে বক্ত, ভেঙে ভেঙে পড়ছে আভিজাত্য।

ওই উদয়সাগরের স্থির নিশ্চল জল পেরিয়ে ওপারের বড় কেল্লাটার কোঠরে-কোঠরে আরো কয়েক শো জোড়া চোখ এদিকে চেয়ে দেখছে।

নাচ আমরা অনেক দেখেছি মহারাণা, কিন্তু ঢোলকের দুলকির তালে তালে নেচে মনকে বিকল করে দেওয়ার এমন নাচ দেখে আগে আর কখনও এমন করে আত্মহারা হই নি। একটার পর একটা নাচ হচ্ছে। যেন নাচের ঢেউ, যেন নাচের মালা।

মালার মত এ নাচের ছন্দের ফুল জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। এ-নাচ যে দেখে তার কাজ ভুল হয়ে যায়, কর্তব্য ভুল হয়ে যায়, জীবন-মৃত্যু, হাসি-কান্না, সংসার-পৃথিবী, সবকিছু ভুলে আত্মনিবেদন করে পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছে করে।

—তুমি চেয়ে থাকো চমন। তুমি যত চেয়ে থাকবে, ততো আমি জোর পাবো মনে।

—এই তো চেয়ে আছি রঙনা।

—তুমি দেখতে পাচ্ছো!

—বা রে, তুমি আমায় চোখ দিয়েছো, আমি দেখতে পারো না? কী বলছো তুমি?

—যতক্ষণ আমি নাচবো, ততক্ষণ তুমি চেয়ে থাকবে। তুমি চেয়ে না থাকলে, আমি নাচ কাকে দেখাবো?

ইনাম এলো নাচের শেষে। মহারাণা স্বরূপ সিং-এর পূর্বপুরুষের সগর্ব সঞ্চিত ঐশ্বর্য। তিলে-তিলে জমে-ওঠা সম্পত্তি। তারই একটা কণা।

মহারাণা নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন রঙনার গলায়।

—পরো চমন, পরো। এতো তোমারই।

—আমাকে কী এ মণিহার মানাবে রঙনা? তার চেয়ে তুমিই পরো।

রঙনা হাসলো, বা রে, তুমি আমি কী আলাদা নাকি? তুমি যে কি!

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—মহারাণাকে খুশি করবার জন্যে আরো নাচতে পারে।

স্বরূপ সিং বললেন, অনেক পরেশানি হবে, থাক।

মহেশ্বরপ্রসাদ নিবেদন করলে, না হুজুর, রঙনা আপনার গোলাম, পরেশানি হবে না। আরো যদি হুকুম হয় তো রঙনা আরো নাচতে পারে।

একজন শেঠজী পাশে বসে এতক্ষণ নাচ দেখছিল। শেঠজী বললে, দড়ির ওপরেও নাচতে পারে নটনী।

—বসি?

হ্যাঁ, দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিতে-হাঁটিতে নাচবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত।

—তবে তাই নাচো। ওই নাচই হোক।

চমনের মুখে-চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

বললে, না-না, তুমি নেচো না রঙনা, নেচো না।

রঙনা হাসলো। মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস কেন বেটি?

রঙনা বললে, ভয় পাবে কেন গুরুজী? তুমি তো আছো?

—হ্যাঁ, আমি তো আছিই, ভয় কি তোর?

সব ব্যবস্থাই হলো তখন। প্রথমে বেশী দূর নয়, এই অলিন্দের খিলেন থেকে ওই অলিন্দ পর্যন্ত। মাটি থেকে সাত হাত উঁচু। রঙনা ওপরে উঠেছে। মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলের পিঠে চাঁটি দিয়ে বোল্ তুললো। আর সঙ্গে-সঙ্গে নটনীর দল গান গেয়ে উঠলো তালে-তালে। রঙনা তখন দড়ির ওপর নাচছে।

—খুব হুঁশিয়ার রঙনা। খুব হুঁশিয়ার!

—তুমি এত ভাবছো কেন? এ কী নতুন?

—নতুন নয়, কিন্তু আমার তো বরাবরই ভয় করে!

রঙনা বললে, তোমার কোনও ভয় নেই, আমার কিছু হবে না দেখো। এই দেখ, আমি কেমন নাচছি। গুরুজীর ঢোলের তালে-তালে আমি বোল্ তুলছি। এই দেখো, আমার হাত কাঁপছে না, আমার পা কাঁপছে না, আমার বুক কাঁপছে না।

যখন নিচেয় নামলো রঙনা, তখনও চমন তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

—কী দেখছো অমন করে চমন?

—আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, কেমন ভয় পেয়েছিলাম। তুমি যদি পড়ে যেতে!

—তাই কখনও পড়ি? তুমি পাহারা দিয়ে রয়েছো, পড়বো কী করে। আমি তো কোনওদিকে দেখিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েছিলাম সারাক্ষণ!

সামনে স্বরূপ সিং-এর মুখ তখন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারদিকে তারিফ, চারদিকে খাতির। যত তারিফ পায় রঙনা, ততো খুশি হয় মহেশ্বরপ্রসাদ। এ তারিফ তো শুধু তার একলার নয়। এ তারিফ তাদের সকলের। গুরুজী তাদের নাচ শিখিয়েছে। তাই রঙনার এত সম্মান।

উদয়পুরের মহারাণা আগেও নটনীদের নাচে তারিফ করেছে, আগেও কত ইনাম দিয়েছে, ইজ্জৎ দিয়েছে। এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু স্বরূপ সিং আলাদা প্রকৃতির মানুষ। জগমন্ত সিং যা বলে, তাই-ই শোনে। তাই এতদিন ডাক পড়ে নি রঙনার। আর তা ছাড়া কড়ার করে নিয়েছে মহেশ্বরপ্রসাদ যে, ইনাম যা তারা পাবে তার হিস্যা দিতে হবে না জগমন্ত সিংকে। এই কড়ায় মানলে তবে আমরা যাবো, নইলে যাবো না।

—রাজি তো?

—হ্যাঁ রাজি!

কিন্তু কথার যেন খেলাপ না হয়, দেখো বাবা!

পেয়াদা সেই কথাই দিয়েছে এখানে আসবার আগে।

জগমন্ত সিংকে চুপি-চুপি বললে মহেশ্বরপ্রসাদ—হুজুর, এবার তো নাচ খতম।

জগমন্ত সিং বললে, আগে মহারাণা বলুক খতম, তবে তো খতম হবে! তুমি কি-রকম বে-আক্কেলে লোক হে।

আর বেশি কিছু কথা বললে না মহেশ্বরপ্রসাদ।

আসর তখন জম-জমাট। শেঠজীরা কেউ উঠতে চায় না। মহারাণা স্বরূপ সিং না উঠলে কে আর উঠবে? কার সাধ্যি ওঠবার?

হঠাৎ স্বরূপ সিং বললেন, আরো উঁচু দড়ির ওপর উঠতে পারে এই নটনী?

—হ্যাঁ হুজুর, খুব পারবে?

—কত উঁচু দড়ির ওপর নাচতে পারবে?

—যত উঁচুতে নাচাতে হুকুম হবে হুজুরের।

—তাহ'লে এক কাজ করো।

বলে আর এক মতলব মাথা থেকে বার করলেন স্বরূপ সিং। ওই যে ওই বড় হাভেলিটা দেখছো কেল্লার ওপর?

—হ্যাঁ, দেখছি হুজুর।

—ওই কেল্লার মাথায় যদি দড়ি বাঁধে একটা দিকে, আর এদিকে এই হাভেলির মাথায়, তার ওপরে নাচতে পারবে তোমার নট্‌নী?

বিচিত্র সব খেয়াল। রাণা-মহারাণাদের খেয়ালের যেন আর অন্ত নেই। পোষা বাঘের পিঠে বাঁদর বসিয়ে, তার সঙ্গে হাতির লড়াই লাগিয়ে দিয়েই আনন্দ! দশতলা বাড়ি ওপর থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিচের মাটিতে লাফিয়ে পড়ানোতেও আর এক রকমের আনন্দ। উদ্ভট আনন্দের উপকরণ না জোগালে আবার জগমন্ত সিং-এর চাকরি থাকবে না। মোট কথা স্বরূপ সিংকে খুশি রাখতে হবে যে-কোনও উপায়ে। সহজে খুশি হবার লোক নয় মহারাণারা। আর সেই তখন লড়াই-ফড়াইও নেই, যে তাই নিয়েই মেতে থাকবেন। কি করা যায়?

জগমন্ত সিং মহেশ্বরপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—পারবে তোমার নট্‌নী?

মহেশ্বরপ্রসাদ আবার রঙনাকে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, পারবি বেটি তুই?

রঙনা ভালো করে বিপদের ঝুঁকি ভেবে নিলে।

বললে, তুমি আশীর্বাদ করলে কেন পারব না গুরুজী?

মহেশ্বরপ্রসাদ জগমন্ত সিংকে জিজ্ঞেস করলে, কী ইনাম পাবেঁ?

জগমন্ত সিং আবার স্বরূপ সিংকে জিজ্ঞেস করলে, ওদের ওস্তাদজী জিজ্ঞেস করছে, যদি পারে তো মহারাণা কি ইনাম দেবেন?

স্বরূপ সিং বললেন, তামাম উদয়পুরের আধা দিয়ে দেবো।

—তামাম উদয়পুরের আধা!

—তামাম উদয়পুরকা আধা!

কথাটা নিয়ে গুনগুন্‌ করে সবাই আলোচনা করতে লাগলো।

উদয়পুরের অর্ধেক! মহারাণার যা খেয়াল, তাতে তো তাও অসম্ভব নয়। জগমন্ত সিং মহারাণার মুখের দিকে একবার চাইলে। মহারাণাকে বহুদিন ধরেই চেনে জগমন্ত সিং! যাকে যা দেবে বলে মহারাণা তা কড়ায়-ক্রান্তিতে দেন!

—মহারাণা, আপনি বলছেন কি? সাচ-মুচ আধা উদয়পুর দিয়ে দেবেন নাকি?

স্বরূপ সিং বললেন, আরে তা কখনও পারবে নটনী?

—কিন্তু যদি পারে, তখন?

মহারাণা বললেন, যদি পারে তো তখন দেখা যাবে। এখন মজা দেখ না।

ততক্ষণে মহেশ্বরপ্রসাদ ডিম-ডিম্‌ করে ঢোল-বাজানো শুরু করে দিয়েছে। নট্‌নী গুরুজীর সামনে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে। তারপর?

তারপর কাকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম করলে কে জানে। খানিকক্ষণ চুপ করে চোখ দু'টো বন্ধ করে রইলো। তুমি নেই এখানে। তবু তুমি আছো চমন। তোমার কথাই আমি সারাক্ষণ ভেবেছি, তা জানো? তুমি নাথদোয়ারে বসেই আমাকে আশীর্বাদ করো। জানো, তোমাকে আমি একদিন কত বকেছি। কত অনুযোগ করেছি তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকো বলে। আজ তোমার চেয়ে-থাকা চোখ দু'টোর কথাই স্মরণ করছি এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো চমন। তোমার আশীর্বাদ পেলে আমি আর কাউকে ভয় করি না। কিন্তু কই, তুমি তো সাড়া দিচ্ছো না চমন। আমি তবে

কোন্ ভরসায় দড়ির ওপর উঠবো বলো। কে আমাকে পাহারা দেবে? কে আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষে করবে? কই, তুমি সাড়া দিচ্ছো না যে! চমন, তোমার সাড়া না পেলে যে আমি উঠতে পারছি না ওই দড়ির ওপর। তুমিই যে আমার সর্বস্ব।

ডাক্তারবাবু থামলেন। আমি বললাম, তারপর?

—তারপর জীবনে যা কখনও হয় নি মহেশ্বরপ্রসাদের, তাই-ই হলো। এখানে ভাটেরা এখনও সেইসব গান গায়। ভাট তিলকচাঁদের লেখা সেইসব গান। রঙনা-চমনের গান। আপনি আর কিছুদিন থাকলে একদিন আপনাকে ভাটের গান শুনিয়ে দিতাম। আমাদের বাংলাদেশে যেমন ময়মনসিংগীতিকা মহুয়া-মলুয়ার গান আছে, এদের এখানেও সেই রকম রঙনা-চমনের গান আছে। কোনও লেখা নেই। ভাটের মুখে-মুখে চলে শুধু সে-সব গান। আমি শুনেছি। এর পরের বারে যখন আসবেন, তখন শুনিয়ে দেবো!

বললাম, সে যা হোক, তারপর কী হলো? রঙনা নাচতে পারলো?

ডাক্তারবাবু বললেন, শুধু তো নাচা নয়, ওপার থেকে নাচতে-নাচতে সেই দড়ির ওপর দিয়ে এপারে হেঁটে আসতে হবে।

কিষেণগড়ের রাস্তায় তখন শীতকালের মাঝরাত্রিতে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কুকুরটা বার-দুই কেঁউ-কেঁউ করে চেঁচিয়ে তারপর কুণ্ডলীটা আরো পাকিয়ে নিয়ে শোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এবার আর পারলো না। ওপারের চায়ের দোকানটা তখন সবেমাত্র খুলেছে। সেখানে ভোরবেলা থেকে বাসের যাত্রীরা এসে চা খাবে। জয়পুর থেকে যারা ফার্স্ট বাসে আজমীর যাবে, তাদের চা জোগাবে ওই চা-ওয়ালা। তাই ভোর রাত থাকতে-থাকতে তাকে উনুনে আগুন দিতে হয়।

কুকুরটা সেইখানে গিয়ে শুলো, একটু আগুন পোয়াবার আশায়।

কিন্তু দোকানীটা তাড়া করেছে—এই, ভাগ-ভাগ।

ডাক্তারবাবু বললেন, কত রাত হলো? আজ তো আপনার আর ঘুম হলো না?

বললাম, তা না হোক, রোজই তো ঘুমোই, একটা রাত না-হয় নাই ঘুমোলাম। তবু তো একটা গল্প শুনতে পেলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, লিখবেন নাকি গল্পটা? যদি লেখেন তো আরো একবার রাজস্থানে এসে ঘুরে যাবেন। তাড়াহুড়ো করে যেন পুজো-সংখ্যার কোনো কাগজে লিখে দেবেন না। ওতে কেবল কোনও রকমে পাতা ভর্তি হয়। ভাটদের কাছে থেকে ছড়াগুলো খাতায় লিখে নেবেন। অনেক ভালো-ভালো ছড়া আছে ওদের।

—সে নেবো, আপনি ভাববেন না। কিন্তু তারপর কি হলো, বলুন।

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন, সেও ঠিক এই রকম শীতকাল। নটনী সকলের শেষে একলিঙ্গনাথের উদ্দেশ্যেও প্রণাম করে নিয়ে দড়ির ওপর উঠলো। ওঠাটা কি সহজ? সেই কেল্লার সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে একেবারে চূড়ায় উঠলো। সেখানে উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিং-এর নিশান ওড়ে, মানে উদয়পুরের স্টেট-ফ্ল্যাগ। সেইখানে নিয়ে গেল রঙনাকে জগমন্ত সিং-এর লোক।

রঙনা নিচের দিকে চেয়ে দেখলে। সব জায়গায় শুধু জল। কেবল জল আর জল। নিচের বৃন্দাবন-প্যালেস আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় সেই মহারাণার দরবার, কোথায় সেই মহারাণা স্বরূপ সিং, আর জগমন্ত সিং, আর কোথায় বা গুরুজী আর তার দলের লোকেরা! শুধু ঢোলকের দুলকি তালটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

—কেন তুমি ওখানে উঠলে রঙনা?

—তুমি কিছু ভেবো না। মহারাণা যে আধখানা উদয়পুর আমাকে দান করে দেবে।

—তুমি মহারাণাকে চেনো না? মহারাণার কথায় তুমি বিশ্বাস করছো রঙনা?

—না-না চমন, মহারাণা কী কথার খেলাপ করতে পারে? তাহ'লে কেন আমি এত ঝুঁকি নিচ্ছি। আমরা তখন খুব আরামে থাকবো চমন। তোমায় কিছু কাজ করতে হবে না। আমি নাচবো আর তুমি বাঁশি বাজাবে।

—কি যে বলো! আমি নাকি আবার বাঁশি বাজাতে পারি।

—খুব পারবে চমন, খুব পারবে। তখন আরো ভালো বাঁশি কিনে দেবো তোমায়।

মহেশ্বরপ্রসাদ তখন প্রাণপণে বোল্ তুলছে। দুখহরণ ঢোলকের তাল দিচ্ছে। ডিম্-ডিম্ করে হাওয়ায় ছন্দ দুলছে উদয়সাগরের জলের ঢেউতে। ঢেউগুলোও তালে তালে এসে বোল্ তুলছে বৃন্দাবন-প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর।

স্বরূপ সিং ওপরের দিকে চেয়েছিলেন। জগমন্ত সিংও চেয়েছিল। সবাই উদ্গ্রীব আগ্রহে চেয়েছিল ওপরের দিকে। রঙনা আস্তে-আস্তে দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে-নাচতে আসছে। এসে পড়লো। আর বেশি দূর নেই।

এইবার? এইবার তো অর্ধেক উদয়পুর দিয়ে দিতে হবে নটনীকে।

মহেশ্বরপ্রসাদ আরো জোরে-জোরে বোল দিতে লাগলো।

দুখহরণকে বললে জোরসে বাজাও—জোরসে—

দুখহরণ আরো জোরে বাজাতে লাগলে। উদয়সাগরের ঢেউগুলো আরো দুলে-দুলে আছাড় খেতে লাগলো বৃন্দাবন-প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর।

জগমন্ত আর দেরি করলে না। মুখটা তার কালো হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। এখনই যদি নট্নীটা দড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছোয় তো তখন কি হবে?

মহারাণার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে জগমন্ত সিং। সে-মুখে কোনও আতঙ্ক নেই কোনও উদ্বেগ নেই। যেন উল্লাসের উচ্ছ্বলতা সমস্ত মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে এতবড় উদয়পুর এর অর্ধেক যে দান করে দিতে হবে একজন নগণ্য নটনীকে তার জন্যে কোনও দুশ্চিন্তার ছায়াও নেই তাঁর মুখে।

আশ্চর্য। আশ্চর্য হবার মত ঘটনাটাই বটে। এক অখ্যাত নগণ্য নটনী যে এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজে অনায়াসে সাফল্য লাভ করলো তার জন্যে আশ্চর্য হয়নি জগমন্ত সিং। আশ্চর্য হয়েছে স্বরূপ সিং-এর অপাত্রে দানের প্রতিশ্রুতি দেখে। অপাত্রই তো বটে। নট্নীরা যে অপাত্র, তাতে আর জগমন্ত সিং-এর কোন সন্দেহ ছিল না।

আর উদয়পুরের অর্ধেক চলে গেলে জগমন্ত সিং-এর ক্ষমতারও অর্ধেক চলে গেল। অর্ধেক ক্ষমতা মানে অর্ধেক জীবন। ক্ষমতাই তো জীবন। এই এত প্রতিপত্তির শীর্ষে বসে যে-ক্ষমতার বড়াই আজ করছে জগমন্ত সিং, তা আর তখন থাকবে না। অর্ধেক উদয়পুরের লোক জগমন্ত সিংকে আর সেলাম করবে না। অর্ধেক লোক ভেট পাঠাবে না। অর্ধেক লোকই যদি তাকে অগ্রাহ্য করে, তাহ লে তার আর অস্তিত্ব রইলো কোথায়?

হাতের পাশের তরোয়ালটাকে জোরে টিপে ধরলে জগমন্ত সিং।

তখনও নটনী আসছে। এসে পড়লো বলে আর দেরি নেই। আর খানিকক্ষণ পরেই একেবারে সে হাজির হবে সামনে। এসেই দড়ি থেকে নেমে পড়বে আসরের ওপর।

দুখহরণ আরো জোরে ঢোলক বাজিয়ে দিলে।

মহেশ্বরপ্রসাদ তখন বোল দিচ্ছে মুখে তা—ধিন—ধিন—তা—

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো সকলে অবাক হয়ে দেখলো। ব্যাপারটা যেন এক নিমেষে ঘটে গেল। প্রথমে চোখকে বিশ্বাস করা গেল না। সবাই চমকে উঠে 'হাঁ'-'হাঁ' করে উঠেছে। কী হলো? কী হলো?

কি যে হলো, তা সবাই চোখের সামনেই দেখেছে। তবু বিশ্বাস করতে পারলে না।

*

ডাক্তারবাবু আবার গল্পটা থামাতেই আমি বললাম, তারপর ?

ডাক্তারবাবু বললেন, কত রাত হলো বলুন তো ? তিনটে বেজে গেছে বোধহয়। আজমীরের ট্রেনটা আসছে দেখছি।

বললাম, ওসব কথা থাক, আমার ঘুম পাচ্ছে না। বলুন, তারপর কী হলো ?

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন, একটা জাত যখন ক্ষেপে যায়, তখন বুঝতে হবে সত্যিই কোথায় একটা অন্যায় ঘটেছে। রাজস্থানের একটা গৌরব একটা ঐতিহ্য ছিল এককালে। সে ঐতিহ্য বীরত্বের, ত্যাগের। সেই ঐতিহ্যের জন্যেই ইণ্ডিয়ার ইতিহাসে রাজস্থানের অত সুনাম। রাণা প্রতাপের নাম কে না জানে বলুন ?

কিন্তু আবার তারই পাশে আছে মানসিংহ। রাজস্থানের যে-সব রাণা স্বার্থের জন্যে মোগল বাদশাহের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারা আবার এখানকার কলঙ্ক। তারা রাজস্থানের লোক হলেও রাজস্থানের লোকেরা তাদের কথা স্মরণ করে না। এই নটনীরা, যাদের আজকে আমার ডিস্‌পেনসারিতে দেখালেন, ওঁরা রাণা প্রতাপের নাম করে। রাজস্থানের বীরদের ওরা এখনও পূজো করে। ভাট তিলকচাঁদের ছড়া গান করে। কিন্তু রাণা মানসিংহের কথা ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা চুপ করে থাকবে।

আমি বললাম, তারপর কি হলো বলুন ? ইতিহাসের কথা পরে শোনা যাবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, ইতিহাসও তো গল্প। আপনারা যা লেখেন তাও তো ইতিহাস। দু'শো বছর পরে যখন কেউ এই সময়কার ইতিহাস জানতে চাইবে, তখন আপনাদের ওই গল্প-উপন্যাসগুলোই তো পড়বে। তখন বিচার হবে দু'শো বছর আগের মানুষ কী ভাবতো, কী কল্পনা করতো, কি স্বপ্ন দেখতো। আজ যদি স্বরূপ সিং-এর আমলের কোন উপন্যাস-গল্প পাওয়া যেত, তো জানতে পারা যেত কেন সেদিন জগমন্ত সিং, স্বরূপ সিং-এর মন্ত্রী হয়ে এত বড় ট্রেচারী করলে।

বললাম, কী ট্রেচারী করলে জগমন্ত সিং ?

—সেই কথাই তো বলছি। কিন্তু তার আগে চমনের কথা বলে নিই। নাথদোয়ারের একটা মহল্লায় তখন চমন চুপ করে বসেছিল। নটনীর দল সবাই চলে গেছে উদয়পুরে। মহল্লা ফাঁকা। একটা লোক নেই যে তার সঙ্গে কথা বলে চমন! তবু নিজের মনেই একবার ডাকলে, রঙনা।

—এই তো আমি। তুমি আমার দিকে চাও।

—আমি যে অন্ধ! চাইবো কি করে ?

—বাইরের চোখ দু'টোই কি বড় ? আমি গগনে দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার দিকেই চেয়ে আছ, তুমি দেখতে না পেলে কি আমি এত উঁচুতে উঠে উদয়সাগর পার হতে পারছি ? তুমিই তো আমায় সাহস দিয়েছো চমন।

—কিন্তু আমার যে ভয় করে।

—ভয় আর করো না। আমি থাকতে তোমার ভয় কিসের ? আমি যে তোমার জন্যে ইনাম নিয়ে যাচ্ছি উদয়পুর থেকে। ইনাম নিয়েই চলে যাবো তোমার কাছে। বেশি দেরী করবো না।

ভাট তিলকচাঁদ তার ছড়ায় এই জায়গাটা বেশ করুণ করে লিখে গেছে। নটনীরা যখন ভাট তিলকচাঁদের ছড়াগুলো গায়, তখন যারা আসরে বসে থাকে, তাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে।

—আমার যে বড় একলা লাগছে রঙনা।

—একটু একলা-একলা লাগা ভালো। আমরাও বড় একলা-একলা একটু লাগছে।

—তুমি দূরে থাকলে আমার সব ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

—আমারও তো ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

—এবার সাদি হয়ে গেলে তুমি যেখানে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুমি সঙ্গে না এলে আমি আর কোথাও যাবোই না।

—আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

—জানো তুমি যখন আগে আমার দিকে চেয়ে থাকতে, আসলে ভালো লাগতো।

—তাহ'লে তুমি আমাকে চেয়ে থাকতে বারণ করতে কেন? আমাকে বকতে কেন?

—তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতাম।

—আমি কিন্তু ভাবতাম, তুমি আমায় মোটেই পছন্দ করো না।

—এবার তো বুঝেছো?

—খুব বুঝেছি। বুঝেছি বলেই তো তোমার জন্যে এত ছট্ ফট্ করি, তোমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারি না।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চমন যেন সব দেখতে পেল। ভয়ে আঁতকে উঠলো। কই? তুমি কোথায় গেলে? কোথায় তুমি? তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না রঙনা। আমার চোখ কী আবার খারাপ হয়ে গেল? আমি কী আবার অন্ধ হয়ে গেলাম? সব যে অন্ধকার! কোথায় গেলে তুমি? রঙনা—রঙনা—রঙনা।

ঠাকুর-মহল্লার আশেপাশে যারা ছিল তারা দুখহরণের ঘরের ভেতরে চমনের কান্না শুনতে পেয়েছে। শুধু কান্না নয়, যেন আর্তনাদ। সবাই দৌড়ে এলো। কী হয়েছে চমন? কী হলো রে তোর?

চমনের সেই আর্তনাদ নাথদোয়ার পেরিয়ে একেবারে উদয়পুরের উদয়সাগরে এসে হাজির হয়েছিল। চমনের আর্তনাদের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদের আর্তনাদও সেদিন সচকিত করে দিয়েছিল সমস্ত উদয়সাগরকে। উদয়সাগরের ছলকে ওঠা জলও যেন একই সুরে আর্তনাদ করে উঠেছিল সেদিন। সেদিন সেই সন্ধ্যের আকাশে বাতাসে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সকলের আর্তনাদ অশরীরী আত্মা হয়ে সমস্ত উদয়পুরে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিন্তু সেদিন স্বরূপ সিং কি তখন জানতে পেরেছিল যে, তারই একটা কথার জন্যে নট্নীদের সম্প্রদায়ে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে?

সত্যিই সেদিন সে-আসরে যারাই বসেছিল, তারা বিপর্যয় দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

মহেশ্বরপ্রসাদ চিৎকার করে উঠলো—এ দুষমণি, এ বিলকুল দুষমণি।

স্বরূপ সিং আত্মসংবরণ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর জগমন্ত সিং-এর দিকে তাকিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন—জগমন্ত সিং!

সামনের উদয়সাগরের জলের ওপর তখন ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠছে রাগে অভিমানে ক্ষোভে আর যন্ত্রণায়।

ঠিক নাচতে এসে যেখানে নট্নী জলের ওপরে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে যেন একটা বোবা বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে ফুলতে লাগলো অকারণে। আর তারপর সব বিপর্যয় জলের লেখায় ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গিয়ে মিলীয়মান সূর্যের লাল আভায় রক্তাভ রক্তের আভরণে ঢেকে গিয়েছিল।

—জগমন্ত সিং।

—জী রাণাসাহেব।

—উদয়পুরের অর্ধেক ওই নট্নীকেই দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছিলাম, ওর দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করো।

—কিন্তু নট্নী তো উদয়সাগর পার হতে পারে নি রাণাসাহেব!

—পারে নি সে, তোমারই জন্যে জগমন্ত সিং।

—কেন রাণাসাহেব, আমি কি করলাম?

—আমি দেখতে পেয়েছি, যখন নটনী দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে-নাচতে এই বৃন্দাবন-প্রসাদের দিকে আসছিল, তুমি তোমার ভোজালি দিয়ে দড়ির গোড়াটা কেটে দিয়েছো। দড়ি কেটে না দিলে নটনী ঠিক এপারে চলে আসতো। ওদের অর্ধেক উদয়পুর দিতেই হবে। দলিল বানাও এখুনি।

কিন্তু ওদিকে নটনীর দল সবাই রঙনাকে খুঁজছে। বিরাট পরিধি উদয়সাগরের। কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? জলের স্রোতের তলায় তলিয়ে তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সারারাত সন্ধান চললো সেদিন। ভোরেও সন্ধান চললো। উদয়পুরের স্বরূপ সিং-এর হুকুমে রাজ-ডুবুরীরাও নামলো জলে। তারাও খুঁজলো।

শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে উদয়সাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখা গেল, রঙনার নিষ্প্রাণ দেহটা পাথরের শ্যাওলাতে গা এলিয়ে দিয়ে দুলছে।

দলবল দিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ জলে যাবার চেষ্টা করছে। সব শেষ। সব আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের। সেই সর্বস্বটুকুকে চিরকালের মত খুইয়ে তারা চলে যাচ্ছে উদয়পুরের অতিথিশালা থেকে।

হঠাৎ হুকুম এলো রাজ-দরবার থেকে। মহারাণা তলব দিয়েছেন মহেশ্বরপ্রসাদকে। মহেশ্বরপ্রসাদ বললে, কেন? আবার তলব কেন?

—স্বরূপ সিং একটা দলিল দেবেন মহেশ্বরপ্রসাদকে।

—কিসের দলিল!

—তা জানি না। আপ্ চলিয়ে!

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন স্বরূপ সিং-এর দরবারে পৌঁছুল, তখন সব তৈরি। দলিল-দস্তাবেজ সীলমোহর হয়ে গেছে। নিজের হাতে সই করে দিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিং।

...আমি অর্ধেক উদয়পুর পরলোকগতা নটনী রঙনার উত্তরাধিবর্গকে বংশ-পরম্পরায় ভোগ-দখল করিবার অধিকার দিলাম। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

—এইটে তুমি নাও মহেশ্বরপ্রসাদ। তোমার মেয়ের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। কিন্তু তবু আমার জবান আমি রাখছি। জগমন্ত সিং আমার মন্ত্রী, সে দড়ি কেটে না দিলে তোমার মেয়ে ঠিক এপারে পৌঁছোতে পারতো।

মহেশ্বরপ্রসাদ রাগে মনের মধ্যে গজরাতে লাগলো। বাইরে কিছু প্রকাশ করলো না। স্বরূপ সিং আবার বললেন, নাও, এ দলিল নাও।

মহেশ্বরপ্রসাদ এবার হঠাৎ ফেটে পড়লো যেন। বললে, না।

স্বরূপ সিং বললেন, কেন, নেবে না কেন? আমি তো নিজের ইচ্ছাতেই দিচ্ছি।

মহেশ্বরপ্রসাদ পাথরের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বললে, না, আমার বেইমানের দান নিই না।

—বেইমানের দান! বলছো কী তুমি মহেশ্বরপ্রসাদ? আমি বেইমান?

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে, বেইমানের শুধু দানই নেবো না, তা নয়। বেইমানের জলও খাবো না আমরা। যতদিন একজন নটনীও বেঁচে থাকবে, ততোদিন উদয়পুরের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে কেউ আসবে না। উদয়পুরের জল, উদয়পুরের হাওয়া নটনীদের কাছে বিষ জ্ঞান করবো।

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে মহেশ্বরপ্রসাদ। দলবল নিয়ে উদয়পুর ছেড়ে সেদিনই

চলে গেল। স্বরূপ সিং কথাগুলো শুনলেন শুধু কান পেতে। কোন প্রতিবাদের ভাষা আর তাঁর মুখ থেকে বেরোয় নি সেদিন।

ভাট তিলকচাঁদের গানে সেই রকমই লেখা আছে।

*

আমি বললাম, তারপর ?

ডাক্তারবাবু বললেন, সেই তিনশো বছর আগেকার এ ঘটনা এখনকার নটনীরা আজও গান গেয়ে গেয়ে শোনায় সকলকে। সেই যে তারা সেদিন উদয়পুর ছেড়ে নাথদোয়ার ছেড়ে চলে এসেছে, তারপর আর ফিরে যায় নি। স্বরূপ সিং-এর কত রাণা এসেছে—গেছে, কিন্তু কেউই আর নটনীদের এই সংকল্প থেকে টলাতে পারে নি। কত বড়-বড় শেঠজী এদের নিয়ে কত জায়গায় যায় দিল্লী যায়, বোম্বাই যায়, প্যারিস, আমেরিকা নিয়ে যায় ফূর্তি করবার জন্যে। সব জায়গাতেই তারা যায় একসঙ্গে। কিন্তু লাখ-লাখ টাকার লোভ দেখালেও তারা উদয়পুরে আর যাবে না। সেই যে একদিন বেইমানি করে একজন নটনীকে মেরে ফেলা হয়েছিল, সে বেইমানির কথা এখনও ওরা ভুলতে পারে নি!

কিন্তু উদয়পুর আর সে উদয়পুর নেই। এখন নেটিভ স্টেটের রাজাদের স্টেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তাদের 'প্রিভিপার্স' থেকে সামান্য কিছু মাসোহারা দেওয়া হয় মাত্র। এখন উদয়পুরের মহারাণা বৃন্দাবন-প্যালেসটাকে হোটেল করে দিয়েছে। দিনে একখানা কামরার জন্যে সাতশো-আটশো টাকা চার্জ দিয়ে থাকতে পারে, তারাই সেই হোটেলে ওঠে।

এই সেদিন কুইন এলিজাবেথ এসেছিল, গ্রীসের রাণী এসেছিল। সবাই উঠেছিল ওই প্যালেসে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের গেস্ট ছিল ওরা। কিন্তু ওরাও শুনেছে মাঝরাত্রে উদয়সাগরের বুক থেকে যেন হু-হু কী রকম একটা আর্তনাদ কানে আসে। কে যেন আর্তনাদ করে, কে অমন করে কাঁদে, তা কেউ জানে না, কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

কিন্তু ভাট তিলকচাঁদ লিখে গেছে—চমনের অশরীরী আত্মা এই উদয়সাগরের চারপাশে নাকি কেবল ঘুরে বেড়ায়। সে একদিন অসহায় হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্ধ মানুষ। কিন্তু কোথায় যে গিয়েছিল সে, কী হয়েছিল তার—তার আর কোনও খোঁজ কেউ পায় নি। উদয়সাগরের বুকের ওপর মাঝরাত্রের ওই শব্দটা শুনে অনেকে কল্পনা করে নেয়, ও চমন। ও চমনেরই অপরিতৃপ্ত আত্মা। চমনের আত্মাই ওই উদয়সাগরের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে রঙনাকে খোঁজে, কিন্তু পায় না। আর পায় না বলেই হাহাকার করে ওঠে। তার সেই আর্তনাদ হাহাকার হয়ে উদয়সাগরকে তোলপাড় করে তোলে মাঝরাত্রের অন্ধকারে!

হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হলো যেন! বললেন, ইস্ একেবারে ভোর হয়ে গেছে। কিছু খেয়ালই ছিল না। ওই দেখুন, আজমীর এক্সপ্রেসটা যাচ্ছে।

আমি কিন্তু তখনও সেই নটনীর গল্পটাতেই মশগুল হয়ে আছি।

পঞ্চমী

আমার এক বন্ধু খুব জ্যোতিষচর্চা করতো। সে মানুষ পেলেই তার জন্ম-সাল-তারিখ জোগাড় করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করে দিতো। সব ভবিষ্যদ্বাণীই যে তার মিলতো, তা নয়। কিছু মিলতো, আবার কিছু বা মিলতোও না। কিন্তু তাতে তার জ্যোতিষ-চর্চার কোনও ক্ষতি হয় নি।

একদিন সে শেষে আমাকেই ধরলে। আমার জন্ম-সাল-তারিখ-তিথি শুনেই সে কাগজপেন্সিল নিয়ে কী সব অঙ্ক কষতে বসলো। জটিল-দুর্বোধ্য সেসব অঙ্কের হিসেব। প্রায় একঘণ্টা সময় লাগলো সেই জটিল-কুটিল অঙ্কের যোগফল বার করতে।

তারপর বললে—তোমার বিপরীত রাজযোগ আছে হে—

বিপরীত রাজযোগের মানে যে-কী, তা আমি জানি না। মানে জানতে চাইতে যে-সব ব্যাখ্যা দিলে, তা আরো দুর্বোধ্য! পাঠ্য বই-এর চেয়ে যদি মানে বই বেশী কঠিন হয়, তা'হলে যে-অবস্থা হয়, তার ব্যাখ্যা শুনে আমার অবস্থাও তাই হলো।

বললাম-আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, তুমি একটু খুলে বলো-

বন্ধুবর বললে—দেখো, আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে। আসলে তোমার ভাগ্যও তাই। তুমি বেশ চাকরি-বাকরি করছিলে, সে চাকরিতে প্রভিডেণ্ড-ফাণ্ড ছিল, পেনশন ছিল, উপরন্তু উইডো-পেনশনের পাকা ব্যবস্থাও ছিল। তারপর সারা জীবন বিনা পয়সার ট্রেনের ফার্স্টক্লাশে সারা ইণ্ডিয়া ঘুরে বেড়াতে পারতে! তা না করে তুমি গোঁয়ার-গোবিন্দের মত দুম্ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য করতে বসলে। এতে লাভ কী হলো? সাহিত্য করে কী এমন তোমার চতুর্বর্গ ফল হলো শুনি? এই ছোটলোকের দলে তুমি কেন নাম লেখাতে গেলে?

আমি রেগে বললাম—তা বলে তুমি আমাকে ছোটলোক বলবে?

বন্ধু বললে—হ্যাঁ, বলবোই তো। প্রতি বছরে একই লেখক পূজো সংখ্যায় চার-পাঁচটা করে উপন্যাস লিখবে। এটা কি ভদ্দরলোকের কাজ, না এগুলো সত্যিকারের উপন্যাস? এ গুলোর একটাও কি কালের ধোপে টিঁকবে। বেশ্যারা টাকার জন্য যা করে, তোমরাও তো তাই-ই করো। তারা তবু একদিকে ভালো যে, তারা নিজেদের বাজারের মেয়েমানুষ বলে স্বীকার করে, আর তোমরা করো বেশ্যাবৃত্তি, অথচ বলে বেড়াও তোমরা সাহিত্যিক। তোমরা যা করছো, এর নাম কি সাহিত্য। তুমি কি মনে করো, আমাদের দেশে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একজনও খাঁটি সাহিত্যিক জন্মাবে?

হচ্ছিল জ্যোতিষ নিয়ে কথা, হঠাৎ উঠে পড়লো সাহিত্যের প্রসঙ্গ। আত্মনিন্দে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়! আমি উঠে পড়লাম।

বন্ধু বললে—তুমি রাগ করো আর যাই-ই করো ভাই, তুমি আধুনিক সাহিত্যিক বলে নিজেকে জাহির করো, তাই কথাটা তো তোমার গায়ে লাগবেই। কিন্তু আমরা ভাই

পাঠক, তোমাদের যেমন যা-ইচ্ছে লেখবার স্বাধীনতা আছে, আমাদের তেমনি যা-ইচ্ছে বলবার অধিকারও আছে। আমরা কেন তোমাদের ছেড়ে কথা বলবো?

আমি আর কোনও কথা না বলে বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধু আমার সঙ্গ ছাড়ল না। সে-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলো।

বললে—অনেক কড়া কড়া কথা বললাম রাগ করো না। তোমার কুষ্ঠিতে 'বিপরীত-রাজযোগ' আছে বলেই বললাম। এ যোগ শুধু তোমারই যে আছে তাই-ই না। এ আমি অন্য লেখকদের কুষ্ঠিতেও দেখেছি। আজ গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে যত লেখক জন্মেছে, সকলেরই এই এক দশা। পাঁচ-দশ বছর কিম্বা পনেরো-কুড়ি বছর তোমাদের পরমায়ু। তোমরা মরে যাবার আগে দেখে যাবে, যে তোমাদের নাম লোকে ভুলে গেছে। তোমাদের বই আর কেউ কেনে না, কোনও পাবলিশার্স আর তোমাদের বই ছাপতে চাইবে না। কোন সম্পাদকও আর তোমাদের দরজায় এখনকার মতো ধর্ণা দেবে না। তখন আবার যেসব নতুন আধুনিক লেখক জন্মাবে, তাদের কাছে গিয়ে তারা তখন ধর্ণা দেবে। তখন তোমরা হয়ে যাবে প্রবীণ সাহিত্যিক, আর তারা তখন হবে আধুনিক। এটাই আধুনিক সাহিত্যিকদের বিধিলিপি।

বন্ধুর কথায় আমি তখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। বললাম—থামো-থামো, ওসব কথা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে রাজী নই—

বন্ধু বললে—আরে, তোমার কুষ্ঠি দেখেই আমি এসব বলছি। তোমার কুষ্ঠিতে যে বিপরীত রাজযোগ আছে। নইলে কি আর এত কথা বলতাম? আর তাছাড়া এ তো আমার নিজের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলে আমাদের দেশে একজন কবি ছিলেন, তাঁর নাম শুনেছো? তিনি কি বলেছিলেন জানো?

বললাম—কী বলেছিলেন?

বন্ধু বললে—শোন, তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেই বলছি। কথাটা মনে রাখলে তোমারই ভালো। সেই রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোকের বয়েস যখন পঁয়ষট্টি, তখন নতুন এক দল আধুনিক কবি গজিয়ে উঠলো। তারা নতুন কবিতা লিখতে শিখেই নিজেদের একটা দল তৈরী করলে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা মাসিক পত্রিকাও বার করলে। সেই মাসিক পত্রিকায় তারা লিখতে লাগলো, যে তারাই হলো সব আধুনিক কবি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন প্রবীণ কবি। মানে পুরোনো, অর্থাৎ সেকেলে। তার মানে তিনি বাতিল হয়ে গেছেন। তা সেই শুনে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানো। বলেছিলেন—'ভরসার কথা এই যে, আধুনিক থাকবে, এত পরমায়ু তার নেই...'। কথাটার মানে বুঝতে পারলে। প্রত্যেক বছরে যে পাঁজি ছাপা হয়ে বেরোয়, তার মাথায় লেখা থাকে 'নতুন পঞ্জিকা', কিন্তু দেখবে পরের বছরেই সে পাঁজি পুরোনো পঞ্জিকা হয়ে যায়। তখন নতুন করে আবার 'নতুন পঞ্জিকা' ছাপা হয়ে বেরোয়। কিন্তু আজ কোথায় গেলো সেই আধুনিক কবিরা? তাদের আর নাম শুনতে পাও? অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথ হয়েই এখনও পাঠকদের মাঝে বেঁচে আছেন—

তা চুলোয় যাক সাহিত্য। আসল বস্তু হলো বিপরীত রাজযোগ। এ-সব অনেক দিন আগেকার কথা। আমার জ্যোতিষীবন্ধু ছিল পাগল-ছাগল মানুষ। নিজের জীবনে তার কিছুই হয় নি। পরের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে রাস্তায় চলতে গিয়ে গাড়ি-চাপা পড়ে নিজেই একদিন বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল। জীবনে এ রকম কত বিচিত্র লোকের সঙ্গে আমার নানাভাবে পরিচয় হয়েছে, আবার একদিন তারা হারিয়েও গেছে কোথায় কোন ভবিষ্যতের গর্ভে, কে তার হিসেব রেখেছে?

কিন্তু ওই বিপরীত রাজযোগ, ওই কথাটা ভুলতে পারি নি।

সেবার বিহারের একটা শহরের এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে এই বিপরীত রাজযোগের

একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখতে পেলাম। সেই কাহিনীটাই আজ আপনাদের বলছি।

*

আমার এক বন্ধু ডাক্তার। ডাক্তার অবনী সরকার। কলকাতার কলেজেই সে ডাক্তারী পড়েছিল। ডাক্তারী পাশ করবার পর চাকরীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই হয়নি। তখনকার দিনে ডাক্তারী পাশ করে একটা ডাক্তারখানা খুলতে অন্তত হাজার চারেক টাকা লাগলো। সে টাকাও তার ছিল না।

তারপর প্র্যাকটিশ জমতে-জমতে যদি এক বছর কেটে যায়, তখন সেই সময়টায় সে খাবে কী? অনেকেই ডাক্তারী পাশ করে তখনকার দিনে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় ডাক্তারখানা খুলে বসতো। কিন্তু তেমন শাঁসালো শ্বশুরই বা ক'জনের কপালে জুটবে? যাদের কপাল ভালো ছিল, তারা বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে চার-পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সুযোগ-সুবিধে মত একটা পাড়ায় ডাক্তারখানা খুলে বসাতো। আর যারা তা পেতো না, তারা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াত!

তা তখনকার দিনে চাকরির বাজার এখনকার দিনের মতই ছিল মন্দা। অনেকের ধারণা এখনকার দিনকালই সব চেয়ে মন্দা। কিন্তু আমি দেখেছি বাজার চিরকালই মন্দা। আমার ঠাকুরদাকে বলতে শুনেছি—এখন দিনকাল মন্দা, খুব সাবধান। তারপর আমার বাবাও বলেছে—দিনকাল মন্দা পড়েছে, খুব সাবধান। আমি আবার এখন বাবা হয়েছি। এখন আমিও আমার ছেলেকে বলি—এখন দিনকাল বড় মন্দা, খুব সাবধান—

আসলে আবহমানকাল ধরে এমনিই চলে আসছে।

অবনী সরকার প্রথমে কলকাতাতেই চাকরির চেষ্টা করলে। ঘরকুনো বাঙালী, ঘরে থাকতে পেলে কে আর বাইরে যেতে চায়?

কিন্তু যখন কোথাও চেষ্টা করে কিছু পেলে না, তখন বাইরে চেষ্টা করতে লাগলো।

অনেক মানুষ সাধ করে ঘর ছাড়ে, আবার অনেকে অনেক জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ঘর ছাড়ে। তবে সাধ করে ঘর ছাড়ুক, আর জ্বালায় ঘর ছাড়ুক, যার ভালো হবার কথা তার ঘরে থেকেও ভালো হয়, আবার কারো-কারো ঘর ছেড়েই ভালো হয়।

অবনীরও তাই হয়েছিল। অবনীর ঘর ছাড়বার পর তার দুর্ভাগ্যও তাকে ছাড়লো। অবনীর কে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বুঝি ছিল বিহারের মধুবাণীতে। চাকরির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবনী সেখানে গিয়ে হাজির হলো, আর সেখানে গিয়ে রাজা হয়ে বসলো।

একেবারে রাজা তো রাজাই। দু'এক বছরের মধ্যেই সে একেবারে মধুবাণীর মহারাজা হয়ে উঠলো। অর্থাৎ তার গাড়ি হলো, বাড়ি হলো, বিয়ে হলো, ছেলে হলো। এবং ঢোলের মতই সেই ছিপছিপে অবনী একেবারে সুগোল হয়ে উঠলো। যখন আমার সঙ্গে মধুবাণীতে তার দেখা তখন আর আমি তাকে চিনতেই পারি না দেখি তার ডিস্‌পেন্সারিতে একেবারে রোগীর কুম্ভমেলা বসে গেছে।

বিহারে তখন এমনিতেই ডাক্তারের অভাব। যত হাতুড়ে কবিরাজ হোমিওপ্যাথি আর হেকিমের দাপট। আর যত না রোগীকে দেখে তার চেয়ে রোগীর থেকে বেশি পয়সা শুষে নেয়। সেই সময় একে খাস কলকাতা থেকে খাঁটি এম-বি পাশ করা ডাক্তার গিয়ে পৌঁছতেই লোকে তাকে রসগোল্লার মতন লুফে নিলে।

আমাকে সেই মধুবাণীতে দেখে অবনী অবাক। বললে—তুই?

বললাম-স্টেশনে নেমে শহর দেখতে বেরিয়েছিলুম, হঠাৎ তোর ডাক্তারখানার সাইনবোর্ডে তোর নামটা দেখে ঢুকলাম। তোর নামটা সাইনবোর্ডে না দেখতে পেলে কিন্তু তোকে চিনতে পারতুম না। এ-কি চেহারা হয়েছে তোর?

অবনী হাসতে লাগলো। বললে—মধুবাণীর জল-হাওয়া, আর সিলভারটনিক খেয়ে

এই হয়েছে—

বললাম—কিন্তু এই কুম্ভমেলা কি এখানে রোজই বসে ?

অবনী সগর্বে বললে—হ্যাঁ, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা একদিন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমার ডাক্তারখানায় কুম্ভমেলার আর শেষ নেই, অশেষ।

—কিন্তু ময়লা জামা-কাপড় পরা লোক, এরা টাকা দেয় ?

অবনী বললে—এদের চেহারা এই রকম দেখতে বটে, কিন্তু এক-একজন লাখপতিয়া—

—কী-রকম ?

—আরে এরা যে চাষী, এদের তো ইনকাম-ট্যাক্‌স দিতে হয় না, আর বাঙালীদের মত ফোতো-কাপ্তেনও নয় এরা! তাই এদের টাকা কেবল আমদানীই হয়, রপ্তানী হতে জানে না। তাই এদের আয়টার সবটাই আয়। তার মধ্যে আর ব্যয় বলে কোনও বস্তু নেই। ব্যয় যা-কিছু হয়, শুধু ঔষুধে আর ডাক্তারে—

অবনীর কথায় তার বাড়িতেই দু-চার দিন রয়ে গেলুম। তার বিশেষ অনুরোধ। আর আমারও একটা নতুন জায়গা, নতুন সমাজ দেখবার লোভ।

তা অবনীর বাড়ীতে থাকবার, খাবার ও শোবার ব্যবস্থা ভালো। বিশেষ বিশেষ রোগীদের ভালো করে চিকিৎসা করবার জন্যে ইনডোরে থাকবার বন্দোবস্ত তার ছিল। সার-সার সব ঘর করে দেওয়া রয়েছে, সেখানে রোগীদের নিয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ-কেউ থাকে আর পাশের উঠোনে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। তাতে চিকিৎসাও ভালোভাবে হয়, আবার রোগীদের খরচাটাও পড়ে কম।

আমি অবনীর বাড়িতে ক'দিন বাস করে ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ভাবলাম, কলকাতার ডাক্তাররা কলকাতায় বসে কেন গুঁতোগুঁতি করে মরে। অবনীর মত বাইরে এলেই পারে।

সন্ধ্যাবেলা অবনী যখন রোগী দেখতো, আমি তার পাশে বসে-বসে সব লক্ষ্য করতুম। কারোর পেটের ব্যারাম, কারোর কাশি, কারোর ছেলের বোখার, কারোর বউয়ের ছেলে হবে। অবনী সরকার একাধারে চোখের ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, আবার সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেনও বটে। কখনও ছুরি দিয়ে রোগীর পেটও কাটতে হয়। অবনীর মধ্যে যে এত গুণ ছিল, তা আমি জানতাম না। ছেলেবয়সে স্কুল-কলেজে অতি সাধারণ ছাত্র ছিল অবনী। মাঝে-মাঝে পরীক্ষায় ফেলও করতো সে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে কখন কার ভাগ্য খুলে যায় কে বলতে পারে ? এই অবনী, এ কি কখনও ভাবতে পেরেছিল যে, একদিন ডাক্তারী শিখে সে এত টাকা রোজগার করবে ?

অবনীর স্ত্রীও দেখতুম খুব ব্যস্ত। সংসার ছোট হলে কী হবে। অবনীর স্ত্রীরও সংসারের কাজ নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।

একদিন খেতে বসে অবনীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার সময় কী করে কাটে মিসেস সরকার ? অবনী তো সারা দিন-রাতই রোগী নিয়ে ব্যস্ত, আর তাছাড়া চাকর-ঝিও তো অসংখ্য, আপনি সারাদিন কী করেন ?

অবনীর স্ত্রী বললে—সে কী বলছেন, আমার কী কম কাজ ? এই যে আপনি এসেছেন, আপনি কি খাবেন না খাবেন, তা আমাকে দেখতে হবে না ? ঠাকুর-চাকর-ঝি সব কিছু থাকলেও, তাদের ওপর তদারকী তো সেই এক আমাকেই করতে হবে! আর যেদিকে দেখবো না সেইদিকেই তো চিত্তির—

অবনীও বলতো—দ্যাখ্, ছোটবেলা থেকে ভয়ানক অর্থকষ্টে ভুগেছি, আমার বাবা ছিলেন সৎ লোক, একটা পয়সা ঘুঁষ নিতেন না। চাকরিতে যখন সবাই ঘুঁষ নিতো, বাবা

তখন সেকালের আদর্শ মেনে চলতে গিয়ে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে গেছেন। অথচ আমার বাবার যে চাকরি ছিল, আতে ঘুষ নেওয়ার সুযোগ ছিল প্রচুর। যদি নিতেন তা'হলে তখন কলকাতায় আমাদের দু'খানা পাকা বাড়ি হতে পারতো—

তারপর একটু থেমে আবার বলতো—আর আমার স্ত্রী, সেও খুব গরীবের মেয়ে, এত টাকা সে জীবনে দেখেনি। এখন দেখছে আমার হাতে এত টাকা আসছে, সে-ই বা আপত্তি করবে কেন? আর তাছাড়া, এইটেই তো টাকা উপায় করবার বয়েস। এই বয়সেই যদি টাকা উপায় না করি তো কবে করবো? এরপর তো বয়েস বাড়বার সঙ্গেই ব্লাড প্রেসার হবে, ডায়াবেটিস আসবে, পেটের গোলমাল হবে, তখন তো আর এতো খাটিতে পারবো না—

কিন্তু এ-সব কথা বেশি বলবার সময়ই পেতো না অবনী।

খেতে বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার হয়ত নীচের ডিসপেন্সারী থেকে ডাক আসতো। একজন মরো-মরো রোগী এসেছে, এখুনি তাকে দেখতে যাবার জন্যে নীচে নামতে হবে।

আমি মিসেস সরকারকে বলতাম—আপনি একটু বারণ করেন না কেন অবনীকে? আগে শরীর না আগে টাকা?

মিসেস সরকার বলতেন—কিন্তু টাকা উপায় না করলে আমাদের চলবেই বা কী করে বলুন? বাড়ীতে এতগুলো মানুষ খেতে তার ওপর দু'জন কম্পাউণ্ডার, তাছাড়া আমার দু'টো মেয়ে। তাদের বিয়ের জন্যে এখন থেকেই টাকা জমাতে হবে। তারপর আছে ছেলের ভবিষ্যত। ছেলে নাবালক। তাকে তো যেমন-তেমন করে মানুষ করলে চলবে না। আর ক'বছর পরেই তো তাকে আমেরিকা কিম্বা জার্মানী কোথাও না কোথাও পাঠাতে হবে। এ-দেশে লেখাপড়ার হাল তো দেখছেন। ইণ্ডিয়াতে কি আর কোনও ছেলে মানুষ হবে মনে করেন?

তা-সত্যি। অবনীর দুই মেয়ে, এক ছেলে। মধুবাণীতে ভাল স্কুল-কলেজ কিছুই নেই। তাদের তিনজনকে দার্জিলিং-এ রেখে পড়াতে হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের পেছনে মাসে হাজার টাকা করে পাঠাতে হয়। অবনীর তো পৈত্রিক টাকা কিছু নেই, পৈত্রিক জমিদারীও নেই যে, সে অসুখে পড়লে সেই টাকা ভাঙাবে আর খরচ করবে।

ক'দিন অবনীর বাড়ীতে থেকে আর তার প্র্যাকটিসের বহর দেখে মনে হলো, অন্ততঃ মাসে তার দশ হাজার টাকা উপায় হয়। কিন্তু খরচ তো তার বদলে বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচের মধ্যে যা-কিছু ওই ছেলে-মেয়ের পড়ানো। আর ড্রাইভার, কম্পাউণ্ডার, চাকর-ঠাকুর-ঝি'র মাইনে আর তাদের খাওয়া। মধুবাণীর মতন জায়গায় জিনিসপত্রের দামও সস্তা। সস্তা গণ্ডার দেশ। আশে-পাশে দশ মাইলের চৌহদ্দীর মধ্যে আর একটি দ্বিতীয় ডাক্তার বলতে কোনও বস্তু নেই। মাছ-মাংস-তরকারি সমস্তই তো বলতে গেলে অবনী বিনা পয়সায় পায়। মাছ-মাংস-তরকারিওয়ালাও তো অবনীর রোগী।

আর দুধ? বাড়ীতে দু'টো মোষ। দু'টো মোষ মিলে রোজ দশ সের দুধ দেয়। সে একেবারে বটের আটার মত খাঁটি দুধ। অত দুধ খাবে কে? স্বামী-স্ত্রী দু'জনে সে দুধ দিনে-রাতে দশবার খেয়েও কুলিয়ে উঠতে পারে না। মিসেস সরকার সে দুধ বিক্রী করে। সেই দুধ থেকে ক্ষীরের খোয়া তৈরী হয়। তাতে অবনীর দু'পয়সা পকেটে আসে! আমি এইসব দেখতুম আর আমার মনে পড়ে যেতো কলকাতার ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

*

ডাঃ জে-এন-দাস! জোড়াসাঁকোর এত বড় ডাক্তার তখন কলকাতায় ছিল না। সে তখন তাঁর কী পশার! আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন ডাক্তার দাস। এখনও আছেন। এখন আর তাঁর তেমন পশার নেই। পশার নেই, তার কারণ তিনি রোগী এলে দেখেন

না। বলে দেন—না, আমার সময় নেই—

অথচ ডাক্তার দাস এককালে নাইবার-খাবার সময় পেতেন না। আমাদের পাড়ার লোক, আমার দাদার বন্ধু। ডাক্তার দাসের বাবাও ছিলেন পাড়ার বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি ছিলেন আমার বাবার বয়েসী। বড়লোক বলে ডাক্তার দাসের বাবার বেশ সুনাম ছিল পাড়ায়। মনে আছে তিনি মারা যাবার পর খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হয়েছিল। পাড়ায় এমন কোন লোক ছিল না, যার নেমন্তন্ন হয়নি, সে শ্রাদ্ধে। তাতে এমন খাওয়া খাইয়েছিলেন সকলকে, যে বহুদ্দিন পরে সে-খাওয়া গল্পকথা হয়ে উঠেছিল।

লোকে বলতো—হ্যাঁ, খেয়েছিলেম বটে ডাক্তার দাসের শ্রাদ্ধে—

অসময়ের ফুলকপি, অসময়ের বাঁধাকপি থেকে অসময়ে এঁচোড়ের ডালনা পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর ছেলে ডাক্তার জে-এন-দাস! ডাক্তার জে-এন-দাস মানে যতীন্দ্রনাথ দাস। কিন্তু নামটা কেউ উচ্চারণ করতো না। কারণ ও-নামটা বলতে গেলে কেউ জানতোও না। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং ছোটবেলা থেকেই আমরা ডাক্তার জে-এন-দাসের বাড়ীর ভেতরে যেতাম। তাঁর বাড়ীতে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিলো।

আমরা ডাক্তার দাসের বাড়ীতে ভেতরের ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক হয়ে যেতাম। দশটা চাকর, বারোটা ঝি, তিনটে ড্রাইভার আর অসংখ্য আত্মীয়-অনাত্মীয়তে ঘর ভর্তি থাকতো সব সময়ে। দেশ থেকে কেউ দু'দিনের জন্যে এলে দু'মাস থেকে যেতো সে বাড়ীতে। কেউ কলকাতায় অসুখে চিকিৎসা করতে এসেছে। উঠবো কোথায়? না চলো যতীনের বাড়ীতে। যতীনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে থাকা-খাওয়ার সমস্যা নেই, চিকিৎসার খরচ নেই। এমনকি ওষুধের খরচ, যা সমস্যা, সে সবও কিছু নেই।

যেন ধর্মশালা। ধর্মশালার মতই খোপ-খোপ ঘর। খোপে-খোপে মানুষ। তাদের খাওয়া-পরা-থাকা সমস্ত কিছুর ভার ডাক্তার দাসের ওপর। তিনি উদয়াস্ত খাটতেন। যারা বাড়ীর অতিথি, তারা অনেক সময় তাঁকে চোখেও দেখতে পেত না। রাত্রে ঘুমিয়েও শান্তি ছিল না ডাক্তার দাসের।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথমে কিছু রোগী পেয়েছিলেন ডাক্তার দাস।

সে প্রথম জীবনের কথা। তাঁর বাবার কম রোগী ছিল না। তখন ছিল একজন কম্পাউণ্ডার। আরও একজন কম্পাউণ্ডার ছিল, সে কেবল রোগীদের বাড়ী-বাড়ী ইঞ্জেকশন দিয়ে বেড়াত। সেই সিনিয়ার ডাক্তার দাসের যখন ছেলে হলো, তখন পাড়াশুদ্ধ লোককে তিনি তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন।

তারপর সেই ছেলে বড় হয়ে ডাক্তারী পড়তে লাগলো। ডাক্তারী পড়া তখনকার দিনে ছিল খাটুনির ব্যাপার। এখনকার মত টুকে পাশ করা ডাক্তার নয়। ডাক্তার যতীন দাস মেডিসিনেও ফার্স্ট হলেন, সার্জারীতেও ফার্স্ট হলেন। দু'টোতেই সোনার মেডেল পেলেন।

আমরা ডাক্তার জে-এন-দাসকে দেখতাম বটে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় থাকতো না তাঁর। সব সময়ে রোগীরা তাঁকে ঘিরে থাকতো। আর যত দিন যেতে লাগলো, ততোই রোগীর ভীড় বাড়তে লাগলো। তখন আর ডাক্তার দাসের সাক্ষাৎ পাওয়াই ভার হলো রোগীদের পক্ষে। রোগীরা ভোরবেলা এসে শুনতো, ডাক্তারবাবু রাত তিনটের সময় কোথায় কোন জরুরী কল-এ বেরিয়ে গেছেন। তারা কম্পাউণ্ডারবাবুকে জিজ্ঞেস করতো—ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন?

কম্পাউণ্ডারবাবু বলতেন—তার কোনও ঠিক নেই।

সত্যিই কখন যে ডাক্তার দাস বাড়ী ফিরবেন, তার কোনও ঠিক ছিল না। হয়তো ফিরে এসেই আবার তখুনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কোথাও বেরিয়ে যেতেন। রোগীরা তাঁর চেম্বারে হাঁ করে অপেক্ষায় বসে থাকতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খাওয়া নেই, নাওয়া

নেই রোগীরা রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতো, কিন্তু তবুও ডাক্তার দাসের আর মুহূর্তের জন্যে বাড়ি ফেরার সময় হতো না।

আমরা ডাক্তার দাসের বাড়িতে গিয়ে সে-দৃশ্য দেখেছি। একতলার একটা পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বাঁদিকে রোগীদের বসবার ঘরখানা সব সময়ে ভর্তি থাকতো। কিন্তু যাঁর জন্যে তারা বসে থাকতো, তাঁর আর দেখা পাওয়া যেত না।

আর যখন হঠাৎ আচমকা আসবেন, তখন সোজা ভেতরের একটা ছোট ঘরে ঢুকে যাবেন গট্-গট্ করে। কোনও দিকে চেয়ে থাকবার ফুরসৎ হবে না তাঁর। সেখানে গিয়ে তিনি রোগীদের নামের তালিকাটা পড়বেন। এক-দুই-তিন করে নম্বর দেওয়া আছে প্রত্যেক রোগীদের নামের আগে। তাঁর এ্যাসিস্‌টেন্ট প্রথম রোগীর নাম ধরে ডাকবেন—বিমলাকান্ত হালদার, বরানগর—

অমনি বিমলাকান্ত হালদার ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন। অন্য রোগীরা তখন হাঁ করে বাইরের ঘরে তীর্থের কাকের মত বসে থাকবে, তাদের নাম ডাকার অপেক্ষায়। মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে আবার তাঁর এ্যাসিস্‌টেন্ট চীৎকার করে ডাকবেন—দেবকুমার সাঁতরা, উলুবেড়িয়া—

এই রকম এক-একজনের পর নাম ডাকা চলবে কতক্ষণ তার ঠিক নেই। কখনও ডাকবেন—শশীভূষণ সরকার, রাঁচী।

আবার কখনও ডাকবেন—ভক্তিভূষণ মুখার্জি, বেলঘরিয়া—

নামের যেন নামাবলী। আর এত দূর-দূর থেকে যে রোগীরা আসে, তারও এক বিচিত্র ভূগোল-পরিচিতি উল্লেখ করার মত। কেউ এসেছে গৌহাটি থেকে ট্রেনে চেপে, কেউ শিলং থেকে প্লেনে। আবার ভূটানের রাণীমাও কখনও আসেন সপরিবারে। সকলেরই রোগ সারাতে গেলে ডাক্তার দাসকে দেখালেই নিশ্চিন্ত। বলতে গেলে বাংলা -বিহার-উড়িষ্যার একমাত্র ধন্বন্তরি ডাক্তার জে-এন-দাস। তারপর রোগী দেখা শেষ হতে না হতে ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজার নির্দেশ শোনা যাবে। তখন হস্‌পিট্যাল। হস্‌পিট্যাল ডিউটিও দিতে হয় তাঁকে।

এটা নিয়ম। নিয়ম রক্ষে। সধবা স্ত্রীলোকের যেমন সিঁথির সিঁদুর, ডাক্তার দাসের তেমনি হস্‌পিট্যাল। হস্‌পিট্যালে দূর-দূর থেকে রোগীরা এসে টিকিট করে বসে থাকে। তারা জানে ডাক্তার দাসের সময়ের খুব দাম আছে। বাঁধা সময়ের মধ্যে ডাক্তার দর্শন তাদের ভাগ্যে নাও মিলতে পারে। তাই গ্রামের রোগীরা চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে এসে বসে থাকে। আর একটা টিকিট করে নেয়। যে যত আগে আসবে, তার ততো প্রথম দিকের নম্বরের টিকিট মিলবে।

কিন্তু টিকিট মিললেই যে ডাক্তার দাসের দর্শন পাওয়া যাবে, এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। কারণ ডাক্তার জে-এন-দাস ভগবানের মত। তিনি আছেন আবার নেইও। ভগবান যেমন আছেন কি নেই, তা নিয়ে যুগ-যুগ ধরে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। ডাক্তার জে-এন-দাসও তেমনি কোথায় আছেন, কখন আছেন কিম্বা একেবারে আছেন কিনা, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

এই অবস্থা শুধু যে হস্‌পিট্যালে কিম্বা তাঁর চেম্বারে তাই-ই নয়, সর্বত্র। কিন্তু সবচেয়ে নিয়ম করে যেখানে ডাক্তার জে-এন-দাস যান, সেটা হলো তার নিজের নার্সিংহোম।

আসলে হাসপাতালটি হলো চাকরি, সেখানে কোনো রকমে একবার হাজিরা দিলেই হয়ে যায়। সেখানকার রোগীরা গরীব, তাদের টাকা-পয়সা দেবার তেমন ক্ষমতা নেই। তারা বেঁচে থাকলেও যা, মরে গেলেও তাই। তাদের বাঁচা-মরা নিয়ে ডাক্তার জে-এন-দাসের কোনও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নেই। সেখানে রোগীদের দেখবার জন্যে জুনিয়র

ডাক্তাররা আছে, তারাই সব কাজ করে। তিনি শুধু হাজির থাকেন, আর সিগারেট খান।

হাসপাতালের সব রোগীরাই চায় ডাক্তার দাসকেই তাদের রোগ দেখাতে। চায় যে, ডাক্তার দাসই তাদের চিকিৎসা করুন। কিন্তু ডাক্তার দাসের অত সময় কোথায়?

তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দাসকে যে মাইনে দেয়, তাতে ডাক্তার দাসের কিচ্ছুই হয় না। তাঁর গাড়ীর একদিনের পেট্রোল খরচও তাতে উঠে না। তিনি যে হাসপাতালে দয়া করে হাজির থাকেন, এইটেই রোগীদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি!

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা'হলে ডাক্তার দাস হাসপাতালের চাকরি করেন কেন? সে চাকরি তো তিনি ছেড়ে দিলেই পারেন?

কিন্তু না, হাসপাতালের চাকরিটা তাঁর রাখা দরকার। হাসপাতাল থেকেই তাঁর নাম ছড়ায়। আর হাসপাতালে যে-সব বড়লোক রোগী আসে, তাঁদের তিনি বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ চিকিৎসা করবার, কিম্বা তাদের তিনি তাঁর চেম্বারে যেতে বলেন।

চেম্বারে এলে তাঁর নগদ পাওনা একশো টাকা। আর নার্সিং-হোমে একবার যদি তেমন কোনও শাঁসালো রোগীকে পাঠাতে পারেন, তো হাজার-হাজার টাকা তাঁর মুঠোর মধ্যে এসে যায়।

হাসপাতালটা হলো দাতব্য ব্যাপার। দাতব্যের ওপর আস্থা নেই ডাক্তার দাসের। আজকাল যে দাতব্য করে সে নির্বোধ। দাতব্যের টাকা কখনও সদ্ব্যয় হয় না, সৎ পাত্রের হাতেও পড়ে না। দাতব্যের ওষুধ থেকে সুরু করে দুধ পর্যন্ত সবই ভেজাল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের সবই যখন ভেজাল, আবার যখন তার মাইনেটাও নামমাত্র, তখন কেন যে ডাক্তাররা হাসপাতালে চাকরি করে, তার রহস্য যদি কেউ আবিষ্কার করতে যায় তো তা'হলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক্। আসল প্রসঙ্গ ছিল 'বিপরীত-রাজযোগ'। বিপরীত-রাজযোগের কথা বলতে গিয়েই এই কথা এসে গেল। এসে গেল অবনী সরকারের কথা আর ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

*

সত্যিই কী বিচিত্র সংসারের এই মানব-সমাজ, আর কী বিচিত্র এই মানুষের মন! কোথায় কলকাতার এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তারপরে লেখাপড়া শিখেছি জোড়াসাঁকোর কোন এক গলিতে আর কোথায় সেই মধুবাণী। জোড়াসাঁকোর এই জে-এন-দাসকেও দেখেছিলাম, আবার মধুবাণীর সেই অবনী সরকারকেও দেখলাম। আর দেখে এসেছি এই নিজেকে।

কোথায় কোন সরকারি চাকরীতে কী বিচিত্র কাজই না করে বেড়িয়েছি। আমার চাকরীর সম্ভার দৌলতে কত লোক কত খাতির করেছে, আবার কত লোক আমার কুৎসা রটনা করতেও কসুর করেনি। কত লোককে জেলে পুরেছি ঘুঁষ নেওয়া বা দেওয়ার অপরাধে, আবার কত চরম অপরাধ করে ধরা পড়েও আইনের মারপ্যাঁচে কত লোক ছাড়াও পেয়ে গেছে! আজ কোথায় গেল সেই তারা? আর আমিই বা কোথায় এসে পৌঁছোলাম আজ? এ সমস্তই কি বিপরীত-রাজযোগের ফল? কে জানে!

নইলে এখন লেখার নেশাতেই বা মাতাল হলাম কেন? আর কেনই বা লিখছি? কাদের জন্য লিখছি? কে বুঝবে আমার লেখা? কাকে বোঝাবো যে লিখলেই লেখক পদবাচ্য হয় না, আবার পড়লেই পাঠক-হওয়া সম্ভব নয়। সত্যিই তো লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যাঁরা সময় কাটাবার জন্যে বই পড়ে, তারা কি সবাই খাঁটি পাঠক?

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে বহুকাল আগেকার আমার সেই জ্যোতিষী বন্ধুর কথা মনে পড়তো! সত্যিই কি আমার এই সাহিত্যের নেশা বিপরীত রাজযোগের ফল?

অবনী সরকারের ডাক্তারী করার নেশা দেখতাম, আর টাকা উপার্জনের বহরটাও দেখতাম। আর মনে পড়তো, আমাদের সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশের ডাক্তার জে-এন-দাসের কথা।

দু'মাস আগে থেকে নাম লিখিয়ে রাখতে হতো ডাক্তার দাসকে দিয়ে রোগী দেখাতে গেলে। ডাক্তার দাসের দু'জন লোক ছিল চেম্বারে। একজন শুধু খাতায় নাম লিখতো। আর একজনের কাজ ছিল শুধু টেলিফোন ধরা।

আর টেলিফোনের যেন আর কামাই ছিল না কখনও। বেজে চলেছে তো বেজেই চলেছে। একটা বাজা শেষ হয়, তো আবার আর একটা। ক্বচিৎ-কদাচিৎ যদি কখনও নেহাৎ জরুরী কোনও কথা বলার দরকার হয়, তখন ডাক্তার দাস নিজে টেলিফোন ধরতেন। আর ডাক্তার দাসের স্ত্রী?

ডাক্তার দাসের বিয়ের দিনে আমাদের নেমন্তন্ন হয়েছিল। সে-কি জাঁকজমক। সমস্ত পাড়াটা সেদিন আলোয় আলো হয়েছিল। ডাক্তার দাসের বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। তিন দিন ধরে কেবল ব্যাচের পর ব্যাচ্ খেয়েই গেছে এক নাগাড়ে। আর সে-খাওয়াও এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

খেতে বসে লোক বলছে—হ্যাঁ, খাওয়ার মত খাওয়া বটে—

কোথাকার কে কীসের সম্পর্ক, কার মাসতুতো ভাই-এর বোনের জামাই, কার পিসতুতো বোনের দেওর, কেউই বাদ পড়ে নি। সম্পর্কের একটা ক্ষীণ সূত্র থাকলেই হলো, তার কাছেও নেমন্তন্ন চলে গেল।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়ে গেল সবাই বউ-এর রূপ দেখে। এমন রূপও কখনও হয় নাকি কোন বউ এর?

বড় মামা বললে—যতীনের বউকে দেখেছিস?

মেজ মাসিমা বললে—বউ যদি করতে হয়, তো ওই রকম বউই করা উচিত। যাকে এক কথায় বলা যায় ডানা কাটা পরী—

ডানা কাটা পরী কথাটা বড় পুরোনো। বহু ব্যবহারে ও কথাটা ধার এখন কমে গেছে। এখন ও কথাটার আর কোন জৌলুস নেই। ভালো করে সাজালে ও রকম অনেক মেয়েকেই ডানা কাটা পরীতে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু বিয়ের পরেও যখন যতীনদার বউকে দেখতাম, তখন যেন আর কারো চোখের পাতা পড়তে চাইতো না।

মাসীমা বলতো—বউমা, এ হলো যতীনের বন্ধুর ছোট ভাই—আমার কাবলুর বন্ধু—

রাঙা বৌদি কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল।

কাবলুও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। কাবলু যতীনদার ছোট ভাই। কাবলু আর আমি এক ক্লাসে পড়তাম। সেই সূত্রে তাদের বাড়ীতে ঘন-ঘন যাওয়া আসার সুযোগ ছিল আমার। সকালে-বিকেলে কাবলুর সঙ্গেই আমার সর্বক্ষণ কাটাতো। কাবলুর বন্ধু বলে তাদের বাড়ির মধ্যেও ছিল আমার অবাধ গতিবিধি। কাবলুকে যদি বাইরে না পেতাম, তো সোজা চলে যেতাম অন্দরমহলে। একেবারে রান্না-বাড়ির সামনে, যেখানে মাসিমা ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছেন?

ঠাকুর-চাকর-ঝি নিয়ে তখন মাসীমা একেবারে সাংসারিক কাজে ব্যতিব্যস্ত। বলতাম—মাসীমা, কাবলু কোথায় জানেন?

মাসীমা ব্যস্ততার মধ্যেই বলতো—কাবলু? বোধহয় ওপরে আছে, দেখোগে যাও—

আমি কাবলুর খোঁজে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতাম।

মাসীমাদের যৌথ-সংসার। বিরাট বাড়িও যেমন তেমনি আবার লোকও বাড়িতে অসংখ্য। ভাই-ভাগনে-পিসী-বোনঝি-কাকা-সম্বন্ধীতে সমস্ত বাড়ি ভরভরাট। সকাল থেকে কেবল রান্না খাওয়া, বাসন মাজা, গল্প-আড্ডাতেই সমস্ত বাড়িটার সময় কেটে যায়

হু-হু করে। কে কখন যাচ্ছে, তারও যেমন সময়-অসময় নেই, তেমনি আবার কে খেলে বা কে খেলে না, তারও হিসেব রাখা কঠিন। কোনও ঘরে কেউ বসে-বসে পিড়িং-পিড়িং করে সেতার সাধনা করছে, আবার কোনও ঘরে হয়ত কোন নাতনীর প্রসব বেদনা উঠেছে, তার জন্য কেউ ছুটেছে দাই ডাকতে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা-অব্যবস্থার মাথার ওপর ছিলেন যতীনদার বাবা। তিনিই বলতে গেলে মোটা রোজগার করতেন, আর আশে-পাশে যারা থাকতো, তারা সামান্য টুকি-টাকি কিছু করলেও তাঁর পয়সাতেই খেত।

তার ওপর ছিল ক্যারাম-বোর্ড, তাস, দাবা আর আড্ডা। এতগুলো লোকের ফাই-ফরমাস খাটতে-খাটতে ঠাকুর-চাকর ঝি'দের সারাদিন হিমসিম খেয়ে মরতে হতো। হঠাৎ রাঁধতে-রাঁধতে সরষের তেল কম পড়লে মুদিখানায় লোক ছুটতো। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকা-মুটের মাথায় এসে হাজির হতো সরষের মস্ত বড় একটা টিন, আর তার সঙ্গে নুন-লঙ্কা-গুড়-তেজপাতা, হলুদ। কোথা থেকে যে সে-সব আসতো, কে তার টাকা জোগাতো আর কে-ই বা ও-সব খেতো, তার হিসেবও কেউ জানতে চাইত না, কিম্বা হিসেব বোধহয় রাখতোই না। ছোটবেলা থেকে এই আবহাওয়ায় যতীনদা মানুষ হয়েছিল। যতীনদার ছোট ভাই কাবুলও ওই ভাবেই মানুষ হয়েছিল।

তা যতীনদা যেমন দাদার বন্ধু, আমার বন্ধু তেমনি কাবলু। কাবলু আর আমি এই অবস্থাতেই একসঙ্গে বড় হয়েছি। কাবলুদের বাড়ি যেমন ছিল আমাদের বাড়ি, তেমনি আমাদের বাড়িটাও ছিল কাবলুদের বাড়ি!

কাবলুকে খুঁজতে-খুঁজতে যখন দোতলায় উঠলাম, তখন কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে-খুঁজতে শেষকালে পেয়ে গেলাম যতীনদার ঘরে। সে ঘরে গিয়ে দেখি কাবলু এক মনে রাঙা বৌদির সঙ্গে লুডো খেলছে। দেখি সেই রাঙা বৌদির কপালে সিঁদুরের টিপ। রাঙা বৌদি সবে চান করে উঠেছে তখন। চুল এলো করা। ফরসা টক্-টক্ করছে গায়ের রং। পায়ে আলতা লাগানো। একটা হলদে রং-এর শাড়ী পরনে। আমি ডাকলুম—কাবলু—

ডাকতেই কাবলু আর রাঙা বৌদি দু'জনেই আমার দিকে চাইলে।

দেখলাম, রাঙা বৌদির চোখের কালো ঝালর দেওয়া পাতা দু'টো যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। হয়তো বিস্ময়টাই হাসি হয়ে চোখের পাতায় ঝুলছে। বিস্ময় যে আবার লোক বিশেষে হাসির রূপ নেয়, তা সেই রাঙা বৌদিকে দেখেই আমি প্রথম টের পেয়েছিলুম। কাবলু আমাকে দেখিয়ে বলল—এই আমার বন্ধু বিলু—

রাঙা বৌদির চোখে যেন আবার বিস্ময় আর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। আসলে ঝিলিক ঠিক নয়। ঝিলিক কথাটা বললে ঠিক বলা হবে না। বোধহয় প্রলেপ বললেই ঠিক বলা হবে। কে যেন রাঙা বৌদির চোখে-মুখে একটা বিস্ময় আর হাসির প্রলেপ লাগিয়ে দিল।

কাবলু বললে—আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে, আমরা এক ক্লাসে পড়ি—

রাঙা বৌদি কিছু বললে না। তেমনি নির্বাক একটা হাসি হাসতে লাগলো আমার দিকে চেয়ে। কাবলু আমার দিকে চেয়ে বললে—আমি রাঙা বৌদিকে তিনবার হারিয়ে দিয়েছি–জানিস?

তারপর রাঙা বৌদির দিকে চেয়ে বললে–তুমি বিলুর সঙ্গে খেলবে রাঙা বৌদি, ও-ও খুব ভালো লুডো খেলতে পারে—

এই-ই হলো সূত্রপাত। মনে আছে, রাঙা বৌদির সঙ্গে আমি যখনই খেলেছি, তখনই আমি তাকে হারিয়ে দিয়েছি। রাঙা বৌদি বলতো—তোমাদের সঙ্গে আমি আর খেলবো না। আমি একবারও জিততে পারি না—

রাঙা বৌদির এই কথাগুলো শুনে তখন কিছুই মনে হয়নি। তখন রাঙা বৌদিকে লুডো খেলায় হারিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা অসাড় আনন্দ পেয়েছি। মনে হয়েছে, রাঙা বৌদি আমাদের চেয়ে সব বিষয়ে বড় হলেও, রূপে-গুণে আমাদের হারিয়ে দিলেও একটা বিষয়ে অন্ততঃ আমরা রাঙা বৌদিকে হারিয়ে দিয়েছি। সেটা হলো লুডো খেলায়।

সেই লুডো খেলার নেশা যেন শেষকালে আমাকে পেয়ে বসলো।

আমার লেখাপড়া ছিল বটে, কিন্তু রাঙা বৌদির তো কোনও কাজকর্ম করতে হতো না। কেবল সেজে-গুজে বসে থাকা আর লুডো খেলা ছাড়া আর কোনও কাজই ছিল না বলতে গেলে। আর কাবলু আর আমার কাজই ছিল, পালা করে রাঙা বৌদির সঙ্গে রোজ লুডো খেলা।

মা বলতো—কোথায় যাস রে তুই সকালবেলা ? তোর লেখাপড়া নেই ?

আমি বলতুম—কাবলুদের বাড়িতেই যাই মা—

মা বকাবকি করতো—কাবলুদের বাড়িতে গিয়ে কী হয় ? এগ্‌জামিনের সময়ে কাবলু কি তোর খাতায় লিখে দেবে ?

বলতুম—বারে, আমরা যে একসঙ্গে পড়ি। একসঙ্গে পড়লে বেশি করে মন বসে।

মা বিশ্বাস করতো কিনা জানি না। হয়তো বিশ্বাস করতো, কিম্বা হয়তো বিশ্বাস করতো না। কিন্তু মা'র বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আমি পরোয়া করতাম না। আমার তখন লুডো খেলার নেশা, রাঙা বৌদির কাছে থাকার নেশা। এই নেশা আমাদের দু'জনকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মাতিয়ে রেখেছিল। আগেই বলেছি ডাক্তার দাসের বিরাট সংসার। সেখানে কে সেতার বাজাচ্ছে, কে পড়ছে কি পড়ছে না, কে খেতে পাচ্ছে না, তার হিসেব রাখা শক্ত ছিল। যার যখন ক্ষিধে পেয়েছে, সে এসে খেতে বসে গেলো! যখনই ক্ষিধে পাবে, তোমার তখনই ভাত তৈরি। তার মধ্যে কোন্ বউ পাড়ার কোন্ ছেলের সঙ্গে লুডো খেলে সময় কাটাচ্ছে, তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে ? আর কার কত সময় আছে ?

আর যতীনদা ? যতীনদা তখন ডাক্তারী পাশ করে সবে বেরিয়েছে। তাকে পশার করতে হবে। তার পশার বাড়াতে হবে। বাবা যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন অবশ্য কোনও ভাবনা নেই। ততদিন সংসার যেমন চলছে তেমনিই চলবে।

কিন্তু তারপর তো এই সমস্ত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভার যতীনদার ঘাড়েই চাপবে। তখন তো তার একলার উপার্জনেই এই সবকিছু চালাতে হবে। তখন কর্তা মারা গেছে বলে পান থেকে চুন খসে গেলে কেউ আর সহ্য করবে না। তখনও ঠিক বাড়িতে এই আধমণ চালের ভাত রান্না হবে, তখনও অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-অনাত্মীয় বরাবরের মতো যে কেউ বাড়িতে এসে হাজির হবে এবং সেই পাত পেড়ে খেয়ে যাবে।

সুতরাং যতীনদাও ভোরবেলা থেকে বাবার ডাক্তারী পেশার সাহায্য করতে বসে যেত। ডাক্তার দাসের যে রোগীকে দেখতে যাবার সময় হতো না সেখানে যেত যতীনদা। সেই রোগী দেখতে-দেখতেই যতীনদার হাত পাকতো আর পশার বাড়তো। একটা রোগী ভালো হলে সেই পাড়ার আরো দশটা বাড়িতে যতীনদার ডাক পড়তো।

এই রকম করে করে বাবার যত বয়েস বাড়তে লাগলো, যতীনদার প্র্যাকটিসও ততো বাড়তে লাগলো। বাড়তে-বাড়তে শেষে এমন হলো, যে বাড়িতে এসে নাইবার-খাবার সময়ও পেত না যতীনদা। যতীনদার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়া ঘুচে গেল, যতীনদার আড্ডা-গল্প-আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। তখন কেবল রোগী আর রোগ, তখন কেবল ওষুধ আর প্রেসক্রিপসন। আর এদিকে রাঙা বৌদির লুডো খেলাও ততো বেড়ে যেতে লাগলো। বাবা বলতেন—তা হোক, এখন তোমার কম বয়েস, এখন তুমি যত খাটতে পারবে পরে আর তত খাটবার ক্ষমতা তোমার থাকবে না।

যে কেসটা যতীনদা বুঝতে পারতো না, সে-কেসটা নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতো যতীনদা। জটিল সব কেস সেগুলো। মরণাপন্ন রোগী। প্রায় কোলাপ্স করবার দাখিল। সেই সব কেস সারিয়ে যতীন্‌দা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতো। কেস যত জটিল হতো, সেই নিয়ে ট্রিটমেণ্ট করতে যতীনদা তত আনন্দ পেত। মনে হতো যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। টাকা তুচ্ছ, স্ত্রী তুচ্ছ, সংসার পরিবার স্বজন-বন্ধুবান্ধব সব তুচ্ছ হয়ে যেত তখন। তখন তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল রোগী!

আর বাড়ির ভেতরে যতীনদার শোবার ঘরের বিছানার ওপর বসে রাঙা বৌদির লুডো খেলায় ততো উল্লাস, ততো উৎসাহ, ততো উদ্দীপনা।

মনে আছে, একবার কাবলুর জ্বর হয়েছিল। রাঙা বৌদির লুডো খেলবার সঙ্গী নেই। হঠাৎ রাঙা বৌদির চাকর এসে ডাকল আমাকে।

আমি তো অবাক। বললাম, কী হলো? হঠাৎ তলব কেন মধু?

মধু বললে—রাঙা বৌদিমণি আপনাকে ডেকেছে—

আমি তো আনন্দে গদগদ। রাঙা বৌদি আমাকে ডেকেছে?

তাড়াতাড়ি জামা আর প্যাণ্টটা পালটে নিয়ে দৌড়ে গেলাম কাবলুদের বাড়ি।

রান্না বাড়ির উনোনের পাশেই মাসীমাকে দেখতে পেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কাবলু কোথায় মাসীমা—

—কাবলুর তো কাল থেকে জ্বর হয়েছে, তুমি জানো না?

বললাম—কই না তো, আমি তো কিছুই শুনিনি—

মাসীমা বললে—জ্বর হবে না? অত কাঁচা তেঁতুল খেয়েছে, জ্বর তো হবেই—

—তেঁতুল? তেঁতুল কখন খেলে? আমি তো তেতুল খেতে দেখি নি—

মাসীমা বললে—আচার করবার জন্যে বাজার থেকে কাঁচা-তেঁতুল আনিয়েছিলুম, সেই-ই গোটা কয়েক চুরি করে নুন-তেল দিয়ে খেয়েছে—

অবশ্য দু'দুটো নামজাদা ডাক্তার বাড়িতে রয়েছে, তাতে ভয়ের কিছু ছিল না। এক দাগ ওষুধ খেলেই সেরে উঠবে। তার জন্যে কারো বেশি মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু কাবলু না থাকলে রাঙা-বৌদি কার সঙ্গে লুডো খেলবে?

সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে-ঘরে কাবলু শুতো, সেই ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কাবলু অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে।

কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, গা একেবারে আগুন।

আমার হাতের ছোঁয়া লাগতেই কাবলু চোখ তুলে একটু চাইলে। দেখলাম, লাল করমচার মত চোখের রং। আমার দিকে একবার একটুখানি দেখেই আবার চোখ বুঁজিয়ে ফেললে। বললুম—কী রে, তোর জ্বর হয়েছে?

কাবলু কিছু উত্তর দিলে না। যেমন চোখ বুঁজিয়ে ছিল, তেমনি চোখ বুঁজেই রইল। বললাম—তুই কাঁচা তেতুল খেতে গেলি কেন? এই বর্ষাকালে কেউ কাঁচা তেঁতুল খায়?

সে কথার আর সে কোনও জবাব দিলে না। বোধহয় আমার কথাগুলো তার কানেও গেল না। তারপর আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ভাবলাম, দেখি রাঙা বৌদি তার ঘরে কী করছে। পায়ে-পায়ে যতীনদার ঘরের দিকে গেলাম। আমি জানতাম, যতীনদা ভোরবেলাই ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে যায়। ঘরটার সামনে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে ডাকলুম—রাঙা বৌদি—

ভেতর থেকে রাঙা বৌদির গলার আওয়াজ শুনলাম—কে রে?

আমি সাহস পেয়ে ভেতরে ঢুকে বললাম—আমি—

—তুমি? এসো-এসো—বলে রাঙা বৌদি সেজে-গুজে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল। আমাকে দেখে উঠে বসলো।

আমি বললাম—কাবলুর জ্বর হয়েছে খুব, তাকে দেখতে এসেছিলুম—

রাঙা বৌদি যেন আমায় পেয়ে বেঁচে গেল।

বললে—আয়-আয়, ভেতরে আয়, লুডো খেলবি?

এ যেন সেই 'ভাত খাবি? না 'আঁচাবো কোথায়' অবস্থা। সাগ্রহে বললাম—কেন খেলবো না?

মনে আছে, রাঙা বৌদির সঙ্গে লুডো খেলতে-খেলতে কোথা দিয়ে যে দুপুর একটা বেজে গিয়েছিল, তা টেরই পাই নি। যখন রাঙা বৌদিকে মধু খেতে ডাকতে এল, তখন খেয়াল হলো যে বেলা হয়েছে।

বাড়িতে আসতেই মা বকাবকি সুরু করে দিলে—কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ? কেবল আড্ডা আর আড্ডা? এত আড্ডা দিলে লেখাপড়া কখন করবি?

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে বললাম—কাবলুর জ্বর হয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

মা বললে—তা জ্বর হয়েছে তো তুই কী করছিলি সেখানে বসে-বসে? তার মাথা টিপে দিচ্ছিলি? ওদের বাড়িতে দু' দুটো ডাক্তার। তাকে দেখবার কি লোকের অভাব আছে, যে তুই সেখানে গিয়ে বসেছিলি? এই অবেলায় খেলে তোর যদি জ্বর হয়, তখন তোকে কে দেখবে বল দিকিনি?

এ'রকম বকুনি খাওয়া ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যেস। জীবনে ভালবাসা কাকে বলে তা যেমন কখনও জানতে পারিনি, ভালোবাসা পেলে যে কত ভালো লাগে, তাও ছিল আমার কল্পনার বাইরে।

মা'র বকুনি খেতুম বটে, কিন্তু সে সমস্তই পুষিয়ে যেত রাঙা বৌদির স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে। আমি রাঙা বৌদির কাছে গেলে রাঙা বৌদি যেন বেঁচে যেত। অন্ততঃ কথা বলবার একটা লোক পেত।

রাঙা বৌদি যদিও ছিল বড়লোকের বাড়ির বউ। তাও আবার সে এত বড়লোক যে সে বাড়ির বৌকে সংসারের কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হতো না। রাঙা বৌদি যদি কোনদিন কোনও ছুতোয় নীচের রান্না বাড়িতে আসতো তো শাশুড়ি, দিদি শাশুড়ি, মাস শাশুড়ি যে যেখানে থাকতো, সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠতো। তারা সবাই বলতো—তুমি আবার নীচেয় এলে কী করতে বউমা? তুমি ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে যাও—এখানে ধোঁয়ার মধ্যে তোমার কষ্ট করে—

রাঙা বৌদি বলতো—না আমি একটু এমনি দেখতে এলাম—

—না-না, তোমাকে আর এই ধোঁয়াধুলোয় আসতে হবে না। এখন তুমি উপরে যাও—

রাঙা বৌদি বলতো—আমি আপনাদের তরকারি কুটে দেব?

—না বউমা, তরকারি কোটবার লোকের কি বাড়িতে অভাব, যে তোমাকে তরকারি কুটতে হবে? শেষকালে যদি বঁটিতে তোমার হাত কেটে যায়, তখন যে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। শেষকালে যতীন আবার আমাদেরই দোষ দেবে—

এমনি করে সবাই মিলে রাঙা বৌদিকে পটের বিবি সাজিয়ে বসিয়ে রেখে দিতো। কোনও কাজ করতে হতো না রাঙা বৌদিকে। কাজ করবার লোকেরও যেমন অভাব ছিল না বাড়িতে, আর কাজ থাকলেও তা তাকে করতে দেওয়া হতো না।

সুতরাং লুডো খেলা ছাড়া রাঙা বৌদি আর করবেই বা কী?

তাই ডাক পড়তো আমার, আর ডাক পড়তো কাবলুর।

কিন্তু সংসারের বাঁধা পথের সরল গতিতে কখন যে হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তা যদি কেউ আগে থেকে জানতে পারতো!

সেই অত বড় সংসার, অত জাঁক-জমক, অত জম-জমাট বংশ হঠাৎ একদিন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। একদিন রাত দু'টোর সময় মা ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে ডাকলে। আমি ধড়মড়

করে উঠে বসেছি। বললাম—কী মা?

মা বললে—শুনেছিস, তোর মেসোমশাই মারা গেছেন—

মেসোমশাই! মেসেমশাই মারা গেছেন! ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করে কাটে নি। মেসোমশাই মারা গেছেন! কার মেসোমশাই, কোন মেসোমশাই, কবে মারা গেছেন, কখন মারা গেছেন—আমার কাছে যেন স্বপ্নের মত লাগলো কথাটা।

কিন্তু পাশের বাড়ি থেকে যখন মেয়েলি গলার কান্নার রোল কানে এল, তখন জিনিসটার গুরুত্ব উপলব্ধি হলো। তখন মনে পড়লো, কার কথা বলছে মা। তখন বুঝলাম, যতীনদার বাবা মারা গেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমি গায়ে জামাটা চড়িয়ে যতীনদার বাড়ির উদ্দেশ্য দৌড়লাম। মা'কে শুধু জিজ্ঞেস করলাম—দাদা কোথায়মা? দাদাকে খবরটা দাও নি?

মা বললে—দাদা অনেকক্ষণ চলে গেছে, তোর বাবাও গেছে–

তারপর একটু থেমে বলল–তুই যা, আমিও একুট পরে যাবো—

আর একমুহূর্ত দেরি করলুম না। দৌড়ে চলে গেলাম যতীনদাদের বাড়ি। বাইরে থেকেই কান্নার শব্দ কানে এসেছিল, ভেতরে গিয়ে দেখি তখন লোকে লোকারণ্য। আমাদের জোড়াসাঁকোর পাড়ার কোনও লোক আসতে আর বাকি নেই। সবাই ডাক্তার মেসোমশাইকে ভালোবাসতো। ডাক্তার-মেসোমশাইও সকলের বিপদে-আপদে গিয়ে হাজির হতেন। অত বড় লোক, অত ব্যস্ত লোক, তবু সকলের জন্যেই সমবেদনা আর সহানুভূতি ছিল তাঁর। বয়েস হয়েছিল তখন তাঁর অনেক। কিন্তু কোনও রোগী তাঁকে ডাকলে আর তিনি 'না' বলতে পারতেন না। অনেক সময়ে অনেক লোক তাঁর নায্য পাওনা দিতেও পারতো না। যাদের বাড়িতে এককালে দু'টাকা ভিজিট নিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে বরাবর দু'টাকাই নিতেন। কেউ আবার আট টাকা, আবার যারা নতুন লোক, তাদের কাছে ষোল টাকাও নিতেন। আর যারা বস্তির গরীব লোক তাঁর কাছে রোগ দেখাতে আসতো, তাদের কাছ থেকে অনেক সময়ে কিছুই নিতেন না। বলতেন—তুই আবার টাকা দিবি কোত্থেকে? বরং ওই টাকাটা দিয়ে তুই মাছ-মাংস কিনে খাস—

আহা, সেই লোকটাই চলে গেলেন। যারা-যারা সেদিন তখন ডাক্তার মেসোমশাই-এর মৃত্যুর খবর পেয়ে সেখানে হয়েছিল, তারা সকলেই হায়-হায় করতে লাগল। এ-মৃত্যু যেন তাদের পরমাত্মীয়ের মৃত্যু। এ যেন তাদের পরমাত্মীয়ের বিয়োগ।

দেখলাম, যতীনদা বাবার পাশে বসে আছে। একেবারে ভেঙে পড়েছে মানুষটা। যতীনদার যে শহরে তখন দিন-দিন পশার বাড়ছিল, সে-তো ডাক্তার মেসোমশাই-এর ছেলে বলেই। ডাক্তার মেসোমশাইকে সবাই ভালোবাসতো বলেই যতীনদাকেও ভালোবাসতো। বাবার কাছেই যতীনদার হাতেখড়ি। বাবার রোগীরাই আবার ছেলের রোগী হয়ে উঠেছিল কালক্রমে। বাবার বয়েস বাড়ার সঙ্গে বাবার জায়গাটা ছেলে নিয়ে নিচ্ছিল আস্তে-আস্তে।

সুতরাং যতীনদারই সব চেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার চোখে তখন এতটুকু জল দেখিনি। একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল একভাবে।

আর রাঙা-বৌদি? সেই রাত দু'টোর সময় বাড়িটা যেন দিন হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার মেসোমশাই-এর মৃত্যুতে। যে-যেখানে ছিল সবাই এসে হাজির হয়েছিল। আমি কাবলুর পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলাম। কাবলু খুব কাঁদছিল। কাবলুর অবশ্য কাঁদাই স্বাভাবিক। কারণ তার বাবা চলে যাওয়া মানে সব চলে যাওয়া। যতীনদার চেয়েও ডাক্তার মেসোমশাই কাবলুকেই বেশি ভালোবাসতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ কী করে এমন হলো রে?

কী করে যে এমন হলো, তা কি কাবলুই জানে? শুধু কাবলু কেন, কেউই জানতো

না। সকালবেলাও সেদিন কেউ জানতো না যে এমন হবে. বিকেল বেলাও কেউ জানতো না। এমন কি সন্ধেবেলাও যেমন রোজ তিনি তাঁর চেম্বারে বসে রোগী দেখেন, সেদিনও তেমনিই দেখেছেন। তারপর রাত সাড়ে ন'টার সময় যেমন রোজ খাওয়া-দাওয়া সারেন, তেমনিই সেরেছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম বা অত্যাচার অনাচার হয়নি বা হতে দেননি। আর তারপর শুতে গেছেন। শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েছেন। হঠাৎ মাঝ-রাত্রে কী-রকম একটা ঘড়-ঘড় শব্দে মাসীমার ঘুম ভেঙে গেছে। মাসীমা পাশেই শুয়ে থাকতো। সেই আওয়াজটা শুনেই মাসীমা মেসোমশাই-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার? কষ্ট হচ্ছে খুব? অমন করছো কেন?

কিন্তু ডাক্তার-মেসোমশাই তখন যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ করছেন!

মাসীমা আবার জিজ্ঞেসা করলে—যতীনকে ডাকবো?

তবু কোনও জবাব নেই ডাক্তার মেসোমশাই-এর মুখে।

মাসীমা আর দেরী করলেন না। কেমন যেন ভয় হলো তার। ছেলের ঘরে গিয়ে ডাকলে—ওরে যতীন, যতীন—

যতীনের কোনোও সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু ভেতরে থেকে দরজা খুলে আলুথালু সাজে বেরিয়ে এল রাঙা বৌদি—

মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—যতীন কোথায় বউমা? যতীন ঘরে নেই।

রাঙা বৌদি বললে—তিনি তো নেই মা—

—নেই মানে? কোথায় গেল সে?

রাঙা বৌদি বললে—তিনি তো কল-এ বেরিয়ে গেছেন মা—

—কল-এ বেরিয়েছে? কখন বেরলো? আমি তো কিছু টের পাইনি। আমাকে তো কিছু বলোনি তুমি। সে-তো খেয়ে-দেয়ে ঘরে শুতে এল. তারপর তো আমরা খেতে বসলুম—

রাঙা বৌদি বললে—তিনি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ যে একটা জরুরী টেলিফোন এল। সেই টেলিফোন পেয়েই তো চলে গেলেন। বললেন, ফিরতে অনেক রাত হবে—

মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন—এখন কি হবে? তোমার শ্বশুর যে কেমন করছেন, এখুনি তাঁকে ওষুধ দেওয়া দরকার।

বাড়িময় তখন সবাই খবরটা পেয়ে গেছে। সব ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ফট্-ফট্ করে যে-যেখানে ছিল, সবাই ডাক্তার মেসোমশাই-এর শোবার ঘরে দৌড়ে এসেছে।

কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, যতীনদাও ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ফিরলো। তবে ফিরলে হবে কী, আর একটু আগে ফিরলে অবশ্য কী হতো বলা যায় না, কিন্তু যাঁর আবার উপরে যাবার সময় হয়ে গেছে, তাঁকে কে আটকে রাখবে?

বাড়িতে নিজের ছেলে ডাক্তার থেকেও কোন লাভ হলো না। ডাক্তার মেসোমশাই তার আগেই মারা গেলেন। এর পর থেকেই সব যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সোজা-পথের গতিতে হঠাৎ জীবনের গাড়িটার একটা ধাক্কা লাগলো। যেমন ভাবে জগৎ-সংসার চলছিল, তখন তেমন আর চললো না। এমন কি যে পাড়ায় আমরা বাস করতাম, তখন সেই জোড়াসাঁকো পাড়াই যেন রাতারাতি কানা হয়ে গেল।

ডাক্তার মেসোমশাই-এর যে বাড়িতে রোজ আধমণ চালের ভাত রান্না হতো, যে-বাড়ি সারা দিন-রাত লোকজন সমাগমে অত সরগরম ছিল, সেই বাড়িটাও তারপর থেকে কেমন যেন ঝিমিয়ে এল।

তখন অবশ্য আমি কাবলুদের বাড়িতে যেতাম। সেটা যেন আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। সেই আগেকার মতন রাঙা বৌদির সঙ্গে লুডোও খেলতাম। রাঙা বৌদিও ঠিক সেই আগেকার মত সেজে-গুজে বিছানার ওপর বসে থাকতো। কিন্তু আগেকার মত আমাদের খেলা যেন আর জমতো না।

ডাক্তার মেসোমশাই-এর শ্রাদ্ধের পর পর্যন্ত কিছু ইতর-বিশেষ হয়নি। কিছু বুঝতেই পারেনি কেউ যে বাড়িটা ভিতটা এমন করে নড়ে গেছে। বুঝতে পারা যায়নি যে সংসারের ফাটল ধরেছে!

বুঝতে পারা গেল পরে যখন যতীনদা আলাদা বাড়ি করলে।

আলাদা বাড়ি করা এমন কিছু দোষের নয়। কারণ, যতীনদার পসার তখন এত বেশি বেড়ে গেছে যে, তার সব সময় বাড়ি আসা সম্ভব হতো না। যতীনদা তখন নার্সিংহোম করেছে পার্ক স্ট্রীটে। বাড়িও করেছে থিয়েটার রোডে।

পার্ক স্ট্রীট সাহেব-পাড়া। সাহেবপাড়া মানে আন্তর্জাতিক মানুষের পাড়া। সেখানে সাহেব আছে, চিনেম্যান আছে, এমব্যাসীর লোকজন অফিস-কারবার আছে। আর আছে ইংরেজদের ছেড়ে চলে যাওয়া বাড়িগুলোর নতুন বাসিন্দারা। সেই সব নতুন বাসিন্দারা হলো সব নতুন যুগের মানুষ। নতুন শ্রেণী।

সমাজের এই নতুন শ্রেণীর মানুষদের নতন পাওয়া ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে তখন পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল জম-জমাট হয়ে উঠলো। ওই উত্তরের শ্যামবাজার, বউবাজার জোড়াসাঁকো অঞ্চল—যেগুলো আগেকার বনেদী বাড়ি বলে বিখ্যাত ছিল তা আস্তে-আস্তে ম্লান হয়ে গেল। আর দক্ষিণের হরিশ মুখার্জি রোড, পদ্মপুকুর কিম্বা বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরও তখন কেমন দিশি চেহারা নিয়েছে। যাকে বলে বনেদীয়ানা, তা সে-সব জায়গার গা থেকে কখন মুছে গেছে। সেই সময়ে যারা নতন শ্রেণী গজিয়ে উঠলো, তাদের নজর পড়লো পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, আর থিয়েটার রোডের দিকে। সেখানে বাস করলে নতুন সমাজের শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। সমাজের নতুন ইজ্জৎ পাওয়া যায়।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—আপনার ঠিকানা?

আপনি যদি তার জবাবে বলেন—জোড়াসাঁকো, তা'হলে আপনার ইজ্জৎ কমে যাবে। আপনি যদি জোড়াসাঁকোর ডাক্তার হন কিম্বা আপনার চেম্বার যদি জোড়াসাঁকোয় হয়, তাহলে আপনার ভিজিট কমে যাবে। আপনি আট টাকা কিম্বা আরো বেশি হলে বড় জোর ষোল টাকা দাবি করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনার চেম্বার পার্ক স্ট্রীট কি ক্যামাক স্ট্রীট কিম্বা থিয়েটার রোড হয় তা'হলে আপনি যা খুশী ভিজিট্ চাইলেও কেউ-ই তা দিতে আপত্তি করবে না। আর তার সঙ্গে আপনার নার্সিংহোম। নার্সিংহোম যদি শ্যামবাজার কি বউবাজার কিম্বা জোড়াসাঁকোয় হয় তা'হলে সেখানকার রোগীরা হবে সস্তার রোগী, গরীব রোগী।

বাড়ির ঠিকানা থিয়েটার রোড, অর্থাৎ সেটা আপনার চেম্বার। সেখানে রোগ দেখাতে গেলে আমি আপনার সব দাবী মেটাবো। কারণ সে রোগী আসবে নেপাল থেকে, সিকিম থেকে ভুটান থেকে। নেপাল-ভুটান-সিকিমের রাজা-রাণীরা বড় কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যায়, আমেরিকায় যায়। কিম্বা ওই রকম কোনও দেশে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করার পেছনে একটা ইজ্জতের প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কাছে 'ইণ্ডিয়া' মানে বোম্বাই-দিল্লী আর নয় তো কলকাতা। আর কলকাতা বলতে আসল কলকাতাকে বোঝায় না। বোঝায় ঐ নকল কলকাতা। মানে ওই পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট আর থিয়েটার রোডের আশে-পাশের জায়গাগুলো।

তাই যতীনদা যখন ডাক্তার দাস হয়ে উঠলো, তখন পসারের খাতিরে বাড়ি করলে থিয়েটার রোডে। আর নার্সিং-হোম পার্ক স্ট্রীটে।

পার্ক-স্ট্রীটের নার্সিং হোমের জৌলুষ, বড় উঁচু দরের জৌলুষ। ডাক্তার দাসের সে

নার্সিং হোমে সাধারণ লোকের গতিবিধি নিষেধ। তিনশো টাকার দৈনিক ভাড়া দিয়ে ডাক্তার দাসের নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার ভাগ্য ক'টা লোকের কপালেই বা জোটে।

কিন্তু তবু সেই দৈনিক তিনশো টাকার খদ্দেরদেরই এত ভীড়, যে তার জন্যেও ডাক্তারদের খোসামোদ করতে হয়। মুখের খোসামোদ নয়, চেম্বারে গিয়ে রোগ দেখিয়ে কিছু টাকাও খেসারত দিতে হয়।

যতীনদা তখন ডাক্তার দাস। শিক্ষিত-ধনী সমাজের ডাক্তার, গরীব লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। যদি কোনও গরীব লোক, ডাক্তার দাসকে দিয়ে তার চিকিৎসা করতে চায় তো, সে চলে যাক হাসপাতালে। হাসপাতালের আউটডোরে গিয়ে টিকিট করুক। সেখানে গিয়ে আরও হাজার জনের সঙ্গে লাইন দিক্। আর লাইন দিলেই যে ডাক্তার দাসের দেখা পাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, তবে তাঁর এ্যাসিস্টেন্টরা আছে, তারা দেখবে। তাদের দুধের পিটুলি গোলা জল খেতে হবে। সেই পিটুলি গোলা জল খেয়েই নিজেকে মনে করতে হবে খাঁটি দুধ খাচ্ছি।

কিন্তু তা বলে ডাক্তার দাস যে হাসপাতালের চাকরিটি ছেড়ে দেবেন, সে ক্ষমতা বা সে সাহসটুকুও তাঁর নেই। ওটা সেই যা আগে বলছি—সিঁথির সিঁদুর। ওই সিঁথির সিঁদুরটাকে মূলধন করেই তিনি বাজারে মোটা লাভের ব্যবসা করেন। স্বামীর ভালো আয় না থাকলে যেমন স্ত্রীলোকেরা করে থাকে।

তা যতীনদার আরো পসার হোক কি আরো খ্যাতি হোক, ডাক্তার হিসেবে আরো প্রতিষ্ঠা হোক, তা নিয়ে আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ বা ঈর্ষা ছিল না। আমাদের ক্ষোভ আর ঈর্ষা ছিল অন্য কারণে।

আসলে রাঙা বৌদির জন্যেই কাবলুর আর আমার ক্ষোভ ছিল।

যতীনদা থিয়েটার রোডে বাড়ি করে চলে গিয়েছিল, তাতে যদি দুঃখ কেউ পেয়ে থাকেন তো সে মাসীমা, কাবলুর মা। মাসীমা শেষের দিকে কাঁদতো।

মাসীমা ডাক্তার-মেসোমশাই-এর শোকে কাঁদতো, না সংসার ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়াতে কাঁদতো, না কি ছেলে-বউ আলাদা হয়ে যাওয়াতে কাঁদতো, তা বলতো না কাউকে। কিন্তু যতীনদার নিজের প্রাকটিসের ভিড়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসতে না পারলেও রাঙা বৌদি মাঝে-মাঝে আসতো শাশুড়িকে দেখতে।

মাসীমা রাঙা বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো। বলতো—তোমরা চলে গেলে বউমা, কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকি, কার জন্যে এই ভূতের বেগার খাটি? তোমার শ্বশুরও চলে গেলেন, যতীনও চলে গেল, তা'হলে কীসের জন্যে এই সংসার।

রাঙা বৌদি বলতো—তা আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না, মা আমাদের বাড়িতে আপনিও চলুন, এখানে কেন পড়ে আছেন?

মাসীমা বলতো—না বউমা, তোমার শ্বশুর যে-বাড়িতে মারা গেছেন, সে বাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। তোমার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না—

তারপর মিষ্টি খেতে দিতো রাঙা বৌদিকে। বাড়ি শুদ্ধ সবাই রাঙা বৌদিকে দেখতে আসতো। মাসীমা বলতো—তুমি আর একটা সন্দেশ নাও বউমা? তোমাদের সাহেব পাড়ায় এ রকম সন্দেশ পাবে না। আর যতীনের জন্যেও দু'টো নিয়ে যাও। আমার যতীন ছোটবেলায় এই সন্দেশ খেতে খুব ভালোবাসতো—

বলে মধুকে দিয়ে ভালো-ভালো মিষ্টি কিনিয়ে আনতো। তারপর প্যাকেট-সুদ্ধ সন্দেশগুলো রাঙা বৌদির হাতে দিত। বলতো—ভাত খাবার পর এই সন্দেশগুলো দিও যতীনকে, বুঝলে বউমা।

তারপর বলতো—এই সেদিন ইলিশ মাছ এসেছিল বাড়িতে, গঙ্গার ইলিশ। বেশ সরষে দিয়ে ঝাল রেঁধেছিল ঠাকুর। সবাই খেয়ে খুব তারিফ করতে লাগলো। শুনে

আমার কেবল যতীনের কথা মনে পড়তে লাগলো। এই ইলিশ মাছ যতীন বড় খেতে ভালবাসতো, ভাবলুম যতীন বোধহয় আর এসব খেতে পাচ্ছে না—

তারপর জিজ্ঞেস করতো—তা তোমাদের বাজারে ইলিশ মাছ-টাছ আসে? ও তো শুনেছি সাহেব-মেমদের পাড়া। ওরা কি আর ইলিশ মাছ খায়?

রাঙা বৌদি বলতো—ইলিশ মাছ কতদিন আমরা চোখে দেখিনি মা, তা আর মনে পড়ে না—

—কেন, তোমাদের লোককে আমাদের বাজারে পাঠালেই পারো—

রাঙা বৌদি বলতো—আপনার ছেলে এখন অন্যরকম হয়ে গেছে মা—

মাসীমা অবাক হয়ে যেত। বলতো—কেন, অন্যরকম হয়ে গেছে মানে?

রাঙা বৌদি বলতো—আমাদের ওখানে তো ঠাকুর নেই, সব বাবুর্চি-খানসামার ব্যাপার। তারা কেবল চিকেন আর মটন আনে।

—তাই নাকি? ঠাকুর নেই?

—না বাবুর্চি আছে। উনি তার রান্নাই পছন্দ করেন এখন। বলেন শরীরের পক্ষে চিকেনটা খুব উপকারী। ওতে নাকি শরীরে শক্তি বাড়ে—

—আর তুমি? তুমিও চিকেন খাও নাকি?

রাঙা বৌদি বলতো—দু'জন মানুষের জন্যে আবার দু'রকম রান্না কি হয়? আমিও তাই খাই।

মাসীমা জিজ্ঞেস করতো--আজ কী রেঁধেছিল? রাঙা বৌদি বলতো—সুপ, চিকেন কারি, রাইস আর পুডিং—

—ওমা—মাসীমা অবাক হয়ে যেতো রাঙা বৌদির কথা শুনে।

বলতো—কেন বউমা, তোমরা ভাত খাও না?

রাঙা বৌদি বলতো—হ্যাঁ ওই যে বললুম রাইস মানেই ভাত।

—আর চচ্চড়ি, ডালনা, শুক্তো, বেগুন ভাজা এসব কিছু করতে বলো না কেন তোমাদের বাবুর্চিকে?

রাঙা বৌদি বলতো—আপনার ছেলে ওসব কিছু খাবে না। বলে ওসব খেলে নাকি শরীরের কোনও উপকার হয় না শুধু জিভের জন্যে ওই সব খাওয়া—

মাসীমা সব শুনে অবাক হয়ে রাঙা বৌদির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বলতো—তা'হলে তো তোমার বড় কষ্ট বউমা তুমি তো পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে ইলিশ মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসতে। এখন তো তা'হলে তোমার পেটই ভরে না।

তারপর কী ভেবে নিয়ে মাসীমা বলতো—তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো না বউমা। তোমার তো অনেকগুলো গাড়ি তুমি রোজ দু'বেলা বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়ে দিও বরালে? আমার এখানে যে রান্না হবে তোমার জন্যে পাঠিয়ে দেব—তোমার ড্রাইভারকে বলে দিও, সে টিফিন-কেরিয়ার করে নিয়ে যাবে আর পরের দিন আবার সেটা ফিরিয়ে দেবে—

রাঙা বৌদি বলতো—আপনার ছেলের কি আর খাবার সময় আছে যে মন দিয়ে চেখে-চেখে খাবেন। তিনি কখন খান আর কখন না-খান, তারই ঠিক নেই। অর্ধেক দিনই বাড়িতেই খান না—

মাসীমা অবাক হয়ে যেতো। বলতো—সে কি, যতীন অর্ধেক দিনই বাড়িতে খায় না? তা'হলে কি বাইরে খায়?

রাঙা বৌদি বলতো—তা জানি না। খাবার সময় কোথায় তাঁর বলুন? ভোর পাঁচটা-ছটা থেকেই তো কেবল রোগী আর রোগী। রোগীর ভিড়ের জ্বালাতেই তো বাড়ি সমসময় সরগরম। অনেকদিন আবার আমার সঙ্গে দেখাই হয় না—আমাকে টেলিফোন

করে দেন, আমি নেপাল চলে যাচ্ছি—

মাসিমা রাঙা বৌদির মুখে এসব শুনে অবাক হয়ে যেত। যতীন যদি বাড়িতেই না আসে, বাড়িতেই না খায়, তা'হলে অমন ডাক্তারী করার দরকারটাই বা কী? তা'হলে আলাদা বাড়ি করে সাহেবপাড়ায় যাবারই বা কী দরকার? আর তা-ছাড়া তার বিয়ে করাই বা কেন? কই ডাক্তার মেসোমশাইও তো ডাক্তারী করতেন. কিন্তু তিনি তো এমন করতেন না। তিনি তো ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করতেন! তিনি সংসারও দেখতেন। রাত্রে তো বাড়িতেও ফিরতেন তিনি। কিন্তু যতীনের এ কী ডাক্তারী করা, যে বউমাকে একলা রেখে কেবল রোগী নিয়ে মেতে আছে।

—তা তোমার একলা-একলা সময় কী করে কাটে বউমা?

রাঙা বৌদি বলতো—আমাকে গাড়ি দিয়েছেন, আমি কেবল সেই গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াই—

—কেবল গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াও?

—তা ছাড়া আর কী করবো মা। বাড়িতে তো আর লোকজন কেউ নেই। এমন একটা লোক নেই, যে তার সঙ্গে গল্প করি। আর খেতে তো মাত্র দু'টি প্রাণী। রান্নাই বা আর কত হবে। যদি কখনও ইচ্ছে হলো তো নিউমার্কেটে গিয়ে চোখের সামনে যা পাই, তাই কিনে আনি—

—কী কেনো?

রাঙা বৌদি বলতো—কখনও চিকেন কিনি, কখনও শাড়ি, কখনও ব্লাউজ আবার কখনও ড্রয়িং-রুম সাজাবার জন্যে পুতুল খেলনা, চেয়ার টেবিল, বিছানার চাদর-বালিশের ওয়াড় কিনি! নিউ মার্কেটে কেনবার জিনিসের কি অভাব আছে? দরকার থাকলেও কিনি, না দরকার থাকলেও কিনি—

—তাতে তো তোমার অনেক টাকা বাজে খরচ হয়। এত বাজে খরচ কেন করো? এত টাকা নষ্ট করা কি ভালো? যতীন তো আমাকেই মাসে পাঁচশো টাকা করে পাঠায়, তাই-ই আমার খারাপ লাগে। এখন কম বয়সে, এখনই তো টাকা উপায় করার বয়েস। এখন একটু টাকা জমিয়ে নাও। একদিন তোমাদেরও তো ছেলে-মেয়ে হবে বউমা, সংসার হবে, তখন তো টাকার দরকার হবে। চিরকাল তো মানুষের সময় ভালো যায় না! এই দেখ না কর্তা যখন ছিলেন, তখন যদি আমি তোমার মত দু'হাতে টাকা খরচ করতুম তো আজ আমার এই সংসার চলতো? যতীনকে তুমি বলে দিও বউমা, আমাকে আর এই মাস থেকে পাঁচশো টাকা করে পাঠাতে হবে না—

রাঙা বৌদি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসার খবর পেলেই আমি দৌড়ে ও বাড়ি চলে যেতুম। কাবলু আর আমি চুপ করে বসে থাকতুম কতক্ষণে মাসীমার সঙ্গে রাঙা বৌদির কথা শেষ হবে। যতক্ষণ রাঙা বৌদি মাসীমার সঙ্গে কথা বলতো, ততক্ষণ আমরা হাঁ করে বসে থাকতুম রাঙা বৌদির দিকে চেয়ে। আর শুধু আমরা নয়, বাড়ির সবাই যে-যেখানে থাকত, রাঙা বৌদি আসার খবর পেলেই দৌড়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসতো। তারপর এক সময় রাঙা বৌদির বাড়ি যাবার সময় হতো। তখন আমাদের দিকে রাঙা বৌদির নজর পড়তো! কাবলুর আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতো—কী, তোমরা কেমন আছো? লেখাপড়া করছো তো মন দিয়ে?

এ কথার জবাবে কাবলুও মাথা নাড়তো, আমিও নাড়তুম।

রাঙা বৌদি বলতো—হ্যাঁ, খুব ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া না করলে জীবনে কিছুই করতে পারবে না। লেখাপড়া মন দিয়ে করেছিল বলেই তোমার দাদা অত বড় হয়েছে তা জানো? কত জায়গা থেকে তোমার দাদার ডাক আসে। কত জায়গায় তোমার দাদা রোগী দেখতে যায়। তিনটে গাড়ি কিনেছে, দেখেছ তো। এই যে

গাড়ীটা চড়ে এসেছি. এটার দাম নব্বই হাজার টাকা। তোমার দাদা যে গাড়িটা চড়ে যায়. সেটার দাম তিনলাখ দশ হাজার টাকা। এছাড়াও আরো একটা গাড়ি আছে, তোমার দাদার। তোমরাও যদি দাদার মতন লেখাপড়া করো তো তোমরাও এমনি বড়লোক হতে পারবে, জানলে ?

আমি হঠাৎ কথার মধ্যিখানে জিজ্ঞেস করে ফেললুম—এখনও তুমি সেই লুডো খেলো নাকি ?

কাবলু বললে—না। তুমিও চলে গেলে আর লুডো খেলাও বন্ধ হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—এখন তা'হলে কী করে সময় কাটাও তুমি ?

রাঙা বৌদি হাসতে লাগলো। সেই আগেকার মিষ্টি-মিষ্টি হাসি।

বললে—সময় কাটাবার কি জিনিসের অভাব আছে আমার ? হঠাৎ ইচ্ছে হলো রাজ-বাহাদুরকে ডাকলুম। তাকে বললুম গাড়ি বার করতে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলুম কোনদিন বকখালিতে। সেখানে একটা রেস্টহাউস আছে. সেই রেস্ট হাউসে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে চুপ-চাপ করে সমুদ্রের ঢেউ গুনতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—রাজ বাহাদুর ? সে কে ?

রাঙা বৌদি বললে—সে আমার ড্রাইভার। খুব একস্‌পার্ট ড্রাইভার। এমন একস্‌পার্ট ড্রাইভার যে. সে যখন গাড়ি চালায় তখন এতটুকু ধাক্কা লাগে না শরীরে। রাজ-বাহাদুরের গাড়িতে চড়লে মনে হয়. যেন আমি দোলনায় দোল খাচ্ছি। এমন আরাম লাগে—

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি আর লুডো খেলো না কেন রাঙা বৌদি ? তা'হলে তো তোমার অনেক সময় কাটতো।

রাঙা বৌদি বলল—লুডো আর খেলবো কার সঙ্গে ? ঝি-চাকরের সঙ্গে ?

বললাম—কেন. আর কেউ নেই তোমাদের বাড়িতে ? যতীনদা যখন বাড়িতে আসে. তখন তার সঙ্গেই খেললেই পারো।

রাঙা বৌদি বললে—দূর বোকা ছেলে. তাঁর কত কাজ। তাঁর কত রোগী। ভোর ছ'টার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকে—তোর দাদার সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় না। এক-একদিন রাত্রিরেও ফেরেন না। কাজ খুব তো. কাজের ঠেলায় তোর দাদা সব সময় অস্থির। তোর দাদার সঙ্গে দেখা করতে হলে দু'মাস আগে থেকে খাতায় নাম লিখিয়ে রাখতে হয়. তা জানিস্ ?

আমরা রাঙা বৌদির কথা শুনে অবাক হয়ে যেতাম। আশ্চর্য তো! এত কাজের মানুষ যতীনদা। কিন্তু কই ডাক্তার-মেসোমশাইকেও তো দেখেছি। তাঁরও তো অনেক রোগী ছিল। তাঁকেও তো সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রোগী দেখে বেড়াতে হতো। কিন্তু তিনি তো তবু বাড়িতে এসে ভাত খেতেন। মাসীমার কাছে সংসারে সকলের সুবিধে-অসুবিধের খবর নিতেন। রাত্রিরে বাড়িতেই ঘুমোতেন। যদি কখনো তেমন জরুরী দরকার পড়তো. তো রাত্রে গাড়ি বার করতে বলতেন ড্রাইভারকে। গাড়ি বেরোলে তিনি রোগী দেখতে যেতেন। তাও সে কালে-ভদ্রে। তা বলে রাঙা বৌদির সঙ্গে দেখা হবে না যতীনদার, এ আবার কেমন কথা।

রাঙা বৌদি বললে—তোরা জানিস না. তাই ওই কথা বলছিস। তোর দাদা আরো অনেক বড় ডাক্তার। ডাক্তারদের মধ্যেও তো আবার ছোট-বড় আছে। তোর দাদা যে এখন ইণ্ডিয়ার মধ্যে একজন নামকরা ডাক্তার। অত বড় ডাক্তার ইণ্ডিয়ার চার-পাঁচজন মাত্র আছে। কত জায়গা থেকে তোর দাদার ডাক আসে. তা জানিস ?

কাবলু জিজ্ঞেস করল—কত জায়গা থেকে ?

রাঙা বৌদি বললে—একবার আফগানিস্থানের প্রেসিডেণ্টের বাড়ি থেকেও ডাক এসেছিল—

—তা'হলে তো যতীনদা অনেক টাকা পেয়েছে সেখান থেকে ? প্রেসিডেন্টের বাড়ির রোগীর চিকিৎসা তো আর কম টাকায় হবে না ?

—তা-তো হবেই না। একবার আবার সিলোন থেকেও কল এসেছিল। আর ইণ্ডিয়ার ভেতর বোম্বাই, গুজরাট, কেরালার তো কথাই নেই। তা সব জায়গায় তো আর তোর দাদা যেতে পারে না অত সময় কোথায় ? একে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের চাকরি, তার ওপর আবার নিজের থিয়েটার রোডে বাড়ির চেম্বার। সবদিক তো নিজেকেই সামলাতে হবে। এ-কাজ তো আর এ্যাসিসটেন্টদের দিয়ে চালানো যায় না।

কাবলু বললে—তা'হলে তো যতীনদার অনেক টাকা, না রাঙা-বৌদি ?

রাঙা বৌদি বললে—হ্যাঁ অঢেল টাকা। এত টাকা যে, সে গুণে শেষ করা যায় না।

আমি বললাম—তা'হলে তো তোমার খুব মজা, না রাঙা বৌদি ?

রাঙা বৌদি বললে—কেন, মজা কেন ?

আমি বললাম—বাঃ, মজা না ? তুমি বেশ অনেক সিনেমা দেখতে পারো। কেউ তা'হলে তোমাকে কিছুই বলতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে না তুমি কেবল সিনেমা দেখে টাকা নষ্ট করছো।

রাঙা বৌদি এবার আরো জোরে হেসে ফেললে। বললে—দূর সিনেমায় তো যখন-তখন গেলেই হলো। ও দেখতে আর কত পয়সাই বা খরচ হয় ? সিনেমা দেখার যা খরচ, তার চেয়ে বেশি খরচ যায় আমার গাড়ির পেট্রলের পেছনে, গাড়ির ড্রাইভারের মাইনের জন্যে। রাজাবাহাদুরকে তোর দাদা কত মাইনে দেয় জানিস ?

—কত ?

রাঙা বৌদি বললে—শুনে চমকে যাবি। সাড়ে বারোশো টাকা—

সাড়ে বারোশো টাকা একজন মোটর ড্রাইভারের মাইনে শুনে আমরা সত্যিই চমকে উঠলাম। একজন বি-এ, এম-এ পাশকরা ছেলেও তো অফিসে ঢুকে অত টাকা মাইনে পায় না আজকাল !

কাবলু বললে—কেন, অত টাকা মাইনে দাও কেন ? তোমাদের টাকা কি সস্তা ?

রাঙা বৌদি বললে —মাইনে দেব না ? আমার ড্রাইভারের কত খাটুনি তা জানিস ? দিন-রাত যখন ইচ্ছে ডাকলেই তাকে গাড়ি বার করতে হয়। সময়-অসময় নেই, খাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। আর শুধু কি মাইনে ? তার ওপর ফ্রী থাকবার ঘর, জামা কাপড়, পুজোর বোনাস ! আর দু'বেলা খাওয়া, চা-জলখাবার। আজকাল আর কাজ করবার সময় মন যদি খুশি না থাকে তো ভালো করে কাজ করতে পারে কখনও কেউ ? নইলে রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে যদি এ্যাকসিডেন্ট হয় ?

—ক'টা ড্রাইভার তোমার ?

রাঙা বৌদি বললে—আমার একজন। ওই রাজ-বাহাদুর। কিন্তু তোর দাদার দু'টো গাড়ি, তিনজন ড্রাইভার।

—কেন ? দু'টো গাড়ি, তিনজন ড্রাইভার কেন ?

রাঙা বৌদি বললে—বা রে, একটা গাড়ি যদি কারখানায় যায়, তখন কাজ চলবে কী করে ? তোর দাদা রোগী দেখতে যাবে কী করে ? সেই জন্যে দু'টো গাড়ি রেখেছে।

—তা দু'টো গাড়ির জন্যে তিনজন ড্রাইভার কেন ?

—বাঃ ধর একজন ছুটি নিলে, আর একজনের জ্বর হলো, তখন বাকি ড্রাইভারটা কাজ চালাবে। মানে তোর দাদা বলে, গাড়ি খারাপ হয়ে কারখানায় যেতে পারে মেরামতের জন্যে, ড্রাইভার ছুটি নিতে পারে দেশে যাবার জন্যে ড্রাইভারের অসুখও করতে পারে, কিন্তু কাজ তো তা বলে বন্ধ থাকলে চলবে না। এই ধর না পৃথিবীতে

রোজ কত লোক মরছে, তা বলে কি পৃথিবী থেমে থাকছে? পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই চলছে। তোর দাদা বলেন, তেমনি তাঁর সংসার চলুক আর না চলুক, তাঁর ড্রাইভার ছুটিই নিক্ আর গাড়ি কারখানাতেই যাক, তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তা যতীনদার না-হয় অনেক কাজ, অনেক জায়গায় তাকে যেতে হয়, তার মেডিকেল কলেজ আছে, চেম্বার আছে। তার কাজের মানে বুঝি। কিন্তু তুমি? তোমার দিন-রাতের ড্রাইভারের কীসের দরকার। তোমার তো আর তেমন জরুরী কোনও কাজ নেই।

রাঙা বৌদি বলে উঠলো—বলিস কী তোরা? আমার জরুরী কোনও কাজ নেই? টাকা উপায় করাটাই বুঝি কাজ আর সংসার যে টাকা উপায় করে না, সে বুঝি কাজ করে না? তোর দাদা যখন দশবারো দিনের জন্যে বাইরে চলে যায়, তখন কি আমি বাড়িতে বসে থাকি নাকি? আমিও তো বেরিয়ে পড়ি—

—তুমিও বেরিয়ে পড়ো? কোথায়?

—এই যেখানে আমার খুশি। ইচ্ছে হলো তো গাড়ি নিয়ে রাঁচি চলে গেলুম।

—রাঁচি?

—হ্যাঁ, নয় রাঁচি, নয় হাজারিবাগ নয় বেনারস। বেনারসের গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে হাওয়া খেতে লাগলুম।

—কীসে যাও? প্লেনে না ট্রেনে?

রাঙা বৌদি বললে—দূর, আমার গাড়ি রয়েছে আমি গাড়িতে চড়ে চলে যাই। আর আমার রাজবাহাদুর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমার ভাবনা কী? রাজবাহাদুরকে তাহ'লে অত টাকা মাইনে দিই কেন? সাড়ে বারোশো টাকা তো শুধু ওর মাইনে, তাছাড়া আরো কত টাকা ওকে দিই, তার কি হিসেব আছে? যখন ওর যা দরকার হয়, তাই-ই তো দেওয়া হয়। আর রাজবাহাদুরও তেমনি ড্রাইভার আমার, ও একেবারে প্রাণ দিয়ে করে আমার জন্যে।

যখন জোড়াসাঁকোয় আসতো রাঙা বৌদি, আমি খবর পেয়েই দৌড়ে যেতুম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারতো না রাঙা বৌদি। মাসীমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই চলে যেত। বলতো—যাই, এখন আবার অনেক কাজ আমার—

কাজ? রাঙা বৌদির কাজের কথা শুনে আমার হাসি পেত। বলতাম—বা রে, তোমার আবার কাজ কী। তোমার তো কাজই নেই।

—কী বলিস? কাজ নেই? এখুনি বাড়ি ফেরার পথে নিউ মার্কেটে যেতে হবে।

—নিউ মার্কেট? কেন? তুমি আবার সেখানে বাজার করবে নাকি?

রাঙা বৌদি বলতো—তা বাজার করতে হবে না? বাজার না করলে সংসার চলে? বাড়ির দরজা জানালার পর্দাগুলো ছ'মাস হয়ে গেল বদলানো হয়নি। সেই এক ডিজাইনের পর্দা ছ'মাস ধরে ঝুলছে। লোকে বলবে কী বল দিকিনি? বলবে, এদের পয়সা নেই, নতুন পর্দা কিনতে পারে না। আমাদের পাড়ার সবাই তিনমাস অন্তর-অন্তর পর্দা, ফার্ণিচার সমস্ত কিছু বদলায়। আমাদেরই কেবল বদলানো হয়নি। এখন নিউ মার্কেটে গিয়ে সেই পর্দাগুলো ডেলিভারী নেব তারপর লাঞ্চ খেয়ে নিয়েই আবার সিনেমায় যেতে হবে, একটা ভালো ছবি এসেছে এলিটে।

রাঙা বৌদির কথাগুলো শুনতাম আর অবাক হয়ে যেতাম। ভাবতাম, সত্যিই রাঙা বৌদি কি সুখেই আছে। আমার নিজের বাড়ির বৌদিদের তো দেখেছি। আমরা বৌদিরা সংসারের জন্যে খেটে-খেটে হাড়-মাংস কালি হয়ে যেত। আমার মা'কে বৌদিদের দিন-রাত বকা-ঝকা করতে দেখেছি, আর বৌদিরা মুখ বুঁজে তা সহ্য করতো। সেই যে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রান্নাঘরের ঝিক্কি দিতে আরম্ভ করতো, তা চুকতে দুপুর

একটা-দু'টো বেজে যেত। তারপর যদিই বা আধ ঘণ্টার জন্যে একটু বিশ্রাম মিলতো তারপর থেকেই আবার সংসারে চাকা বন-বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করতো। তখন ইস্কুল থেকে ফিরতো ভাইপো, ভাইঝিরা। তাদের জল-খাবারের বন্দোবস্ত করা, জামা-ফ্রক বদলে খাইয়ে-দাইয়ে চাকরের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে পাঠানো, আবার সেই যে শুরু হতো রাত্তিরের একগাদা লোকের পিণ্ডি তৈরী করা, সে এক এলাহি কারখানা! কেউ তরকারিতে ঝাল না দিলে তার মুখে খাবার রুচবে না, কেউ খাবে সেদ্ধ রান্না। আবার কারো মচমচে করে ভাজা না হলে গলা দিয়ে ভাতই নামবে না। তার ওপর বাড়ির কর্তা, যিনি, তাঁর জন্যে সমস্ত কিছু আলাদা। তাঁর সেদ্ধ চালের ভাত চাই, আতপ চাল তাঁর পেটে সহ্য হবে না। মেজোবৌদির বাচ্চা ছেলেটা জন্মে থেকেই পেট রোগা। ডাক্তার বলে দিয়েছে তাকে শুধু পাউরুটি টোস্ট আর হলুদ-গোলা মাছের ঝোল, আর কিছু তার চলবে না। আর কিছু খেলেই তার বমি হয়ে যাবে।

আর সকলের ওপরে আছে, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর সেখান থেকে তাদের বাড়ি নিয়ে আসা।

এসব কাজও তো বৌদিদের। বৌদিরা না হলে এসব কাজ করবে কে? আমরা বাড়ির ছেলেরা তো আর এসব বাজে কাজ ঘাড়ে নেব না। আমাদের নিজেদের আড্ডা দেওয়া আছে, রাস্তার মোড়ে কিংবা ফুটপাতের ওপর, অথবা কারোর বাড়ির সামনের রোয়াকের ওপর বসে-বসে জটলা করার ডিউটি আছে।

অথচ রাঙা বৌদির জীবনটা ছিল ঠিক তার উল্টো।

মা বলতো—যতীনের বউ-এর কথা ছেড়ে দে। যতীনের কত টাকা, অত টাকা কে খাবে তারই ঠিক নেই, তো তার বউ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা? আমাদের খাটবার কপাল, আমরা কেবল খাটতেই জন্মেছি আর এক রকম খাটতে-খাটতেই একদিন মরে যাবো।

আমি যখন বৌদিদের কাছে রাঙা বৌদির গল্প বলতাম, তখন বৌদিরা হাঁ করে সব শুনতো। মনে-মনে রাঙা বৌদির ঐশ্বর্য আর সুখের গল্প শুনে হা হুতাশ করবো। মুখে শুধু বলতো—সত্যি, বউটা আর জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল ঠাকুরপো। সেজবৌদি বলতো–তা যতই সুখ হোক দিদি, ও দেখবে এই রকম শুয়ে বসে ঠিক একদিন হাতীর মত মোটা হয়ে যাবে—অত সুখ কি ভালো দিদি?

বুঝতাম বৌদিরা ভেতরে-ভেতরে রাঙা বৌদিকে হিংসে করতো। অথচ প্রায় একই বয়েসের বউ, একজন একেবারে স্বর্গের ঐশ্বর্য ভোগ করবে, আর একজন সংসারের জাঁতা-কলে পিষে শুকিয়ে মরবে, এটা তাদের মনঃপুত হতো না। মনঃপুত হতো না বলেই ও-বাড়িতে রাঙা বৌদি এলেই আমার বৌদিরা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতো। তখন আমাদের বাড়ির মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত রাঙা বৌদিকে দেখবার জন্যে। সেই বিরাট এয়ারকণ্ডিশন করা বিলিতি গাড়ি, আর সেই ড্রাইভার, ড্রাইভারের রঙ-চঙা পোষাক পরা জাঁদরেল চেহারা। আর রাঙা বৌদি গাড়ি থেকে নামবার আগেই ড্রাইভার নিজের বসবার জায়গা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে রাঙা বৌদির পাশের দরজাটা সসম্ভ্রমে খুলে দাঁড়িয়ে থাকা, সেও এক দর্শনীয় ব্যাপার—

বৌদিদের সঙ্গে আমার মা ও জানলায় এসে দাঁড়াতো। বলতো—বাঃ গাড়িটা তো বেশ। খুব দামী গাড়ি। নিশ্চয় অনেক টাকা দাম হবে। যতীনের টাকার তো অভাব নেই অথচ তার ভোগ করবার সময়ও নেই। তার বউই সব ভোগ করছে—

হ্যাঁ, সত্যিই, ভোগ বলে ভোগ। রাঙা বৌদির মত যেমন এমন ঐশ্বর্যও কারো থাকে না, তেমনি রাঙা বৌদির মত এমন ভোগও কারোর জীবনে সাধারণতঃ ঘটে না।

*

এসব ঘটনা এতদিন পরে মনে পড়ার কারণ হলো এই অবনী। অবনী সরকার। অবনীর বাড়িতে ক'দিন থেকে আর তার ডাক্তারী পশার দেখে আমার কেবল সেই জোড়াসাঁকোর পাড়ার যতীনদার কথাই মনে পড়তো।

অবশ্য যতীনদার সঙ্গে অবনীর তুলনা করা চলে না।

যতীনদা হয়েছিল কলকাতার ডাক্তার জে. এন. দাশ। আর অবনী হয়েছে সামান্য মধুবাণীর মত বিহারের ছোট একটা গ্রামের ডাক্তার সরকার। যতীনদা জন্মেছিল বড়লোকের ছেলে হয়েই। ডাক্তার মেসোমশাই নিজের নামজাদা ছিলেন বলে তাঁর ছেলের পশারের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য ডাক্তার মেসোমশাই যে শেষ পর্যন্ত ছেলের এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ছেলের সেই থিয়েটার রোডের বাড়ির ঐশ্বর্য, তার নার্সিংহোমের সমারোহ, তার পুত্রবধূর ব্যয় বহুল দেখে যেতে পারে নি, সে তাঁর দুর্ভাগ্য। কিন্তু সে দেখা ক'জন বাপই বা দেখতে পায়? দেখতে গেলে পূর্ব জন্মের বহু পুণ্যফল থাকা চাই।

কিন্তু অবনী? অবনী ছিল অতি সাধারণ একজন অল্পবিত্ত, কিন্তু সৎ সরকারী কর্মচারীর ছেলে। অবনীর বাবা যদি দেখতে পেতেন যে তাঁর ছেলে তাঁরই মত কোনও সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক বা সুপারভাইজার হয়েছে, তাহ'লেই ধন্য হয়ে যেতেন। কিন্তু অবনীর বাবার কাছে তাঁর ছেলের এই অর্থ উপার্জন ছিল এক স্বপ্নের ব্যাপার কিম্বা স্বপ্নেরও অতীত। তা অবনীর ব্যাপার দেখে আমার কিন্তু ভয় করতে লাগলো।

অবনী আমার সঙ্গে কথা বলবার সময়টুকু পর্যন্ত পেত না। কিম্বা হয়তো আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে তার সময়ের অভাবের তেতুটা নীরবে প্রচার করতে চাইতো। অবনী চাইতো যে আমি যেন দেখি তার সময়ের কত দাম। দেখি যে লোক কেমন তাকে দিয়ে চিকিৎসা করবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরো দেখি যে সে কত টাকার মালিক। এবং দেখে গিয়ে, কলকাতায় আমাদের বন্ধুমহলের মধ্যে তা প্রচার করি।

অবশ্য অবনীর ঐশ্বর্য হওয়াতে আমি যে অখুশী হয়েছিলাম, তা নয়। আর আমি অখুশী হতে যাবোই বা কেন? মানুষ কারো উন্নতিতে যদি অখুশী হয় তো বুঝতে হবে তার পেছনে তার ঈর্ষার কারণ বিদ্যমান। ঈর্ষাই অপরের উন্নতিতে মানুষকে অখুশী করে। আমার তা হবার কথা নয়। কারণ এত দীর্ঘ জীবনে ঐশ্বর্যও যেমন দেখেছি অঢেল, তেমনি আবার দৈন্যও দেখেছি অপরিসীম। গর্বোদ্ধত মানুষের আকস্মিক পতনও যেমন দেখেছি এবং তা দেখে যেমন আমার সত্য উপলব্ধি হয়েছে, তেমনি অপরিসীম দৈন্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহত্ব দেখে তেমনি আমার শ্রদ্ধারও আবার সীমা থাকে নি।

কিন্তু এসব বড়-বড় দার্শনিক তত্ত্ব কথা থাক। আমি গল্প-উপন্যাস লেখক। এক কথায় আমি সামান্য মানুষ। আমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তবে যেটা রসের কথা সেটা বলবার আমার অধিকারের বাইরে।

মনে আছে, জোড়াসাঁকোর সেই যৌবনের দিনগুলো অতিক্রম করবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে কলকাতা ছাড়তে হলো চিরকালের মত। তার প্রধান কারণ জীবিকা। জীবিকা এমনই এক জিনিস যা মানুষকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমানুষ করে তোলে। আমিও একদিন সেই জীবিকার প্রয়োজনে চিরকালের বাসস্থানকে ত্যাগ করে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু যাবার আগে যা দেখে গেলাম, তা আমার মনে চিরকালের মত দাগ কেটে রেখে দিয়ে গেল। যে রাঙাবৌদিকে একদিন অত ভালবেসেছি, যে রাঙা বৌদির জীবন যাপনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানিয়ে নিতে না পারলেও মনে-মনে রাঙা বৌদির উন্নতিতে

আনন্দ উপভোগ করেছি। যাবার আগে তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে পারলাম না বলে মনে বড়ই আফসোশ থেকে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—কেন এমন হয়? কেন এমন হলো?

কলকাতা ছেড়ে আসবার শেষের দিকে দেখেছিলাম রাঙা বৌদি আর আগের মত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাসীমাকে দেখতে আসতো না।

যতীনদা কথা আলাদা। যতীনদা সময় কোথা পাবে যে মা'কে, ছোট ভাই বা বাড়ির অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে আসবে? আত্মীয়-স্বজন বা মা, মাসি, কাকীমা তো লক্ষ্মী নয়। যতীনদা ছিল লক্ষ্মীর ভক্ত। সারা জীবন সেই লক্ষ্মীরই ভজনা করে গেছে যতীনদা। যতীনদার কাছে তার রোগীরাই ছিল লক্ষ্মী।

কিন্তু রাঙা বৌদি তো তা নয়। রাঙা বৌদির সময়াভাবের কোনও ন্যায্য অজুহাত ছিল না। তার ওই গাড়ি নিয়ে নিউমার্কেটে যাওয়া বা রাঁচী-হাজারীবাগ-কাশ্মীর বেড়ানো ওটা একটা ছলনা। লোকে যেমন পরের সঙ্গে ছলনা করে, তেমনি রাঙা বৌদি করতো নিজেকে। অথচ এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার মধ্যে দিয়ে যে রাঙা বৌদি নিজেকেই ছলনা করতো, সে-বোধটুকু পর্যন্ত তার চলে গিয়েছিল।

এ-সব কথা তখন বুঝি না। তখন যদি বুঝতাম, তা'হলে হয়তো রাঙা বৌদিকে সময়মত সাবধান করে দিতে পারতাম।

রাস্তায় চলতে-চলতে অনেকদিন দেখেছি পাশ দিয়ে হুস্ করে রাঙা বৌদির গাড়িটা বেরিয়ে গেল। সেই সামনে ইউনিফর্ম পরা মাথায় টুপি রাজবাহাদুর রাজার মত গাড়িটা চালাচ্ছে, আর পেছনের প্রশস্ত গদিওয়ালা সিটের ওপর গাড়িটা রাঙা করে হেলান দিয়ে রাঙা বৌদি বসে আছে। মনে হতো ও আমাদের রাঙাবৌদি নয়, যেন রাণী। রাণীর মতই রাস্তাটা রাঙা করতে করতে চলছে।

আরও এ কি একবার? সিনেমায় গিয়েছি, সেখানেও তাই। ভিড়ের মধ্যে রাঙা বৌদিকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারিনি। ধরবার আগেই ভীড়ের মধ্যে থেকে রাজাবাহাদুর কেমন কায়দা করে রাস্তা করে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান গাড়িতে তুলে উধাও হয়ে গিয়েছে।

অনেকে অনেক অনুরোধ করেছে আমাকে। বলেছে—তোর সঙ্গে তো ডাক্তার দাশের স্ত্রী আলাপ আছে, তাকে বলে আমাকে একবার ডাক্তার দাশকে দিয়ে দেখিয়ে দে না—

আমি বলতাম—না ভাই, সে আমি পারবো না—

ডাক্তার দাশকে দিয়ে লোক নিয়মমাফিক টাকা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাবে, তার জন্যেও ধরাধরি করতে হয়। কাকে ধরলে ডাক্তার দাশ একটু তাড়াতাড়ি সময় দিয়ে দেখবেন, সেই ছিল রোগী মহলের সমস্যা। সোজাসুজি গেলে দু'তিন মাসের আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যেত না। প্রথম গিয়ে ডাক্তার দাশের সহকারীর খাতায় নামটা রেজিস্ট্রি করে আসতে হবে। সহকারী যে তারিখ দেবে, সেই তারিখেই যেতে হবে। তার আগে গেলেও চলবে না, তার পরেও না! অথচ যার রোগ দেখানো খুবই জরুরী, সে কী করে দু'তিন মাস অপেক্ষা করে থাকবে?

তাই যখনই কেউ শুনেছে যে ডাক্তার দাশের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তখনই আমাকে এসে ধরছে।

আমি তার জবাবে বলেছি—ভাই এককালে আমার আলাপ ছিল অবশ্য, এককালে ডাক্তার দাশের স্ত্রীর সঙ্গে বসে-বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুডো খেলেছি, কিন্তু এখন তো আর সে-রকম যোগাযোগ নেই, এখন রাঙা বৌদি সে সব দিনের কথা মনে রেখে দিয়েছে?

এই ধরনের যুক্তি দিয়েই সকলের সব অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে গিয়েছি। আর যুক্তিটা যে পুরোপুরি মিথ্যে তাও বলবো না। কারণ আমাদেরও বয়েস বেড়েছে, কলেজ-জীবন অতিক্রম করে আমরাও তখন জীবিকা আহরণের দুর্গম পথে নেমেছি।

তখন লুডো খেলার মধ্যে আগেকার সেই আনন্দ পাবার কোনও অবকাশ আমাদের মধ্যে আর নেই। আর সঙ্গে-সঙ্গে রাঙা বৌদিও তখন আর সেই আগেকার রাঙা বৌদি নেই। রাঙা বৌদিরও তখন সেই লুডো খেলার মধ্যে সহজ আনন্দ পাবার প্রবণতা নিশ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছে। নইলে তো রাঙা বৌদি নিজেও আমাদের ডেকে পাঠাতো। অন্তত নিজে না আসুক রাজাবাহাদুরকে বলে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েও কারলু আর আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। অত যার সময়, যার সময় আজে-বাজে কাজ করেও ফুরোত না, তার যদি সত্যিই আমাদের কথা মনে থাকতো, তাহ'লে আস্তে-আস্তে আমাদের কাছ থেকে এত দূরে চলে যেত না।

তা এসব তো অতীতের ব্যাপার। অবনী সরকারের কাছে যে দু' একদিন ছিলাম তার মধ্যে বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় পেতাম না অবনীর সঙ্গে। তবু তারই মধ্যে একদিন অবনীকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম— হ্যাঁ রে ডাক্তার দাশকে তোর মনে পড়ে?

অবনী ঠিক চিনতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কোন ডাক্তার দাশ? জে এন দাশ?

বললাম—হ্যাঁ।

অবনী বললে—ওরে বাবা, তাকে চিনবো না? তিনি তো বিখ্যাত ডাক্তার। কেন, হঠাৎ তার কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

বললাম—ডাক্তার দাশ ছিল আমার দাদার বন্ধু। তাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশেই আমরা এককালে থাকতুম। ডাক্তার দাশের আরম্ভও আমরা দেখেছিলাম, তারপর তিনি যখন থিয়েটার রোডে প্রথম বাড়ি করেন তখনও জানাশোনা ছিল। শেষকালে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে দু'তিন মাস আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হতো।

অবনী বললে—এখন তার প্র্যাকটিস শুনেছি আরো বেড়েছে—তার সঙ্গে কি আর আমাদের তুলনা। আমি যদি এই মধুবাণীতে প্র্যাকটিশ না করে কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে বসতুম তো এখন আমাকে উপোস করতে হতো। কলকাতায় প্র্যাকটিশ জমানো বড় কঠিন কাজ। এ মধুবাণীর মত জায়গা বলেই আমার গাড়ি-বাড়ি সব কিছু হয়েছে। তা তাঁর কথা তোর হঠাৎ মনে পড়লো যে?

বললাম—মনে পড়লো তোকে দেখে।

—কেন? আমি কি তাঁর মতন?

বললাম—না ডাক্তার দাশকে আমি যতীনদা বলে ডাকতুম। সেই যতীনদার যখন প্র্যাকটিশ ভীষণ জমে উঠলো, তখন তার স্ত্রীর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

—কেন?

বললাম—যতীনদার স্ত্রীকে আমি রাঙা বৌদি বলে ডাকতুম। ছোটবেলায় আমি রাঙা বৌদির সঙ্গে বসে-বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুডো খেলেছি। অথচ যখন সেই রাঙা বৌদি আবার থিয়েটার রোডের নতুন বাড়িতে চলে গেল যখন তার অনেক টাকা হলো, অনেক চাকর-ঝি-বাবুর্চি-খানসামা হলো যখন আর সময় কাটাবার মত কোনও কাজই হাতে রইলো না, তখন কিন্তু আর লুডো খেলবার সময় হতো না রাঙা বৌদির।

অবনী জিজ্ঞেস করলে—তাহ'লে কী করে সময় কাটাতো তার?

বললাম—কী আর করবে রোজ সিনেমায় যেত প্রথম-প্রথম। তারপর তাও একঘেঁয়ে লেগে গেল। শেষকালে নিউমার্কেট ঘুরে-ঘুরে কেবল আজেবাজে জিনিস কিনে কিনে টাকা ওড়াতে লাগলো। আর তারপর তাও যখন একঘেঁয়ে লেগে গেল তখন আজ রাঁচী, কাল হাজারীবাগ, পরশু বোম্বাই, তারপর দিন কাশী এই করতে লাগলো কেবল। বাঁধা ড্রাইভার ছিল, বাঁধা নিজস্ব গাড়িও ছিল, পেট্রল কেনবার টাকার অভাবও ছিল না। এছাড়া আর কী-ই বা করবে বল? অভাব না থাকাটাও তো একটা অভাব। সেই অভাব

না থাকাটাই ছিল রাঙা বৌদির জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

—কেন? ছেলে-মেয়ে? ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি?

বললাম, না।

অবনী বললে—তাহ'লে তো সময় কাটবেই না।

আমি বললাম—তুই একটু প্র্যাকটিস্ কমিয়ে দে, একটু বাড়ির দিকে মনটা দে।

অবনী বললে–তাও যে অসম্ভব।

—কেন? অসম্ভব কেন?

অবনী বললে—তুই তো নিজের চোখেই দেখছিস ভোর থেকে কী ভীড় হয় আমার বাড়ীতে। এক-একদিন তো ওপরে এসে খাওয়ার সময়ও পাই না। তারপর কোনও কোনও দিন গিন্নীকে খবর পাঠিয়ে দিতে হয়, আমার জন্যে যেন আর ওয়েট্ না করে খেয়ে নেয়, আমার যেতে দেরি হবে।

—তোর স্ত্রী খেয়ে নেয়?

অবনী বললে—প্রথম-প্রথম যখন নতুন এসেছিল তখন খেত না। বেলা তিনটে-চারটে পর্যন্ত আমার আশায় উপোস করে বসে থাকতো। ভাবতো, আমি গেলে একসঙ্গে খাবে, কিন্তু শেষকালে এখন আর অপেক্ষা করে না। ঠাকুর-চাকর-ঝি সবাই আমার ভাত ঢাকা দিয়ে খেয়ে-দেয়ে নেয়।

বললাম—যতীনদার বেলাতেও ঠিক এই রকম হয়েছিল। রাঙা বৌদিও প্রথম-প্রথম যতীনদার জন্যে ভাত বেড়ে বসে থাকতো, শেষকালে যতীনদাই একদিন বলে তার জন্যে কারো উপোস করে বসে থাকবার দরকার নেই।

অবনী বললে—আমাদের প্রফেশনই এই রকম। এ প্রফেশনে কোনও ছুটি-ছাটা নেই, কোনও বিশ্রাম-টিশ্রাম নেই, কেবল রোগী দেখা আর টাকা উপায় করা ছাড়া আমরা আর সব কিছু ভুলে গেছি।

কথার মাঝখানেই আবার কে এসে ডাকলে। ডাকতেই অবনী আবার তার চেম্বারে চলে গেল। তখনও চেম্বারে অন্ততঃ পঞ্চাশজন হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। সাধারণতঃ রোগী ফেলে পালিয়ে গেলে অবনীর মুক্তি হয় না। সব রোগীকেই যদি মন দিয়ে দেখতে হয় তা'হলে তার খাওয়া-দাওয়া দূরের কথা, বোধহয় রাত কাবার হয়ে যাবে।

সেদিন হঠাৎ অবনী বললে—জনকপুরে যাবি?

—জনকপুর?

অবনী বললে—হ্যাঁ, সেখানে একটা রোগী দেখতে যাচ্ছি। সেখানকার মোটর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের মালিক মিস্টার শর্মা। তিনিই কল দিয়েছেন।

—কেন? কি হয়েছে?

—হবে আবার কি? বড়লোক মানুষ। সামান্য কিছু হলেই আমাকে ডেকে পাঠায়। আমাকে মোটা ভিজিটও দেয়। আর আমিও চেম্বার থেকে খানিকটা ছুটি পাই। এখানে একলা বসে-বসে তুই কী করবি? তার চেয়ে চল না আমার সঙ্গে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তোরও তো একটা নতুন জায়গা দেখা হবে।

আমি বললাম—জনকপুর কত দূরে?

—এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে। প্রচুর জমি-জমা, বাগান-ক্ষেত-খামার রয়েছে মিস্টার শর্মার। তার ওপর আছে মোটর ট্রান্সপোর্টের বিজনেস। অনেক লোক খাটে তাতে। মিস্টার শর্মা আর মিসেস শর্মা দু'জনে মিলে বিজনেস দেখে, খুব হ্যাপি ফ্যামিলি।

যে-ক'দিন অবনীর বাড়িতে ছিলাম, সে ক'দিন আমার খুব নিঃসঙ্গ লাগতো। অবনীর স্ত্রীর অনেক কাজ থাকতো। স্বামী আর স্ত্রী দু'জনের সংসার হলেও বাড়তি লোকের অভাব ছিল না বাড়িতে। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, তাদের সকলের

খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থার তদারক করাও ছিল একটা মস্ত কাজ। অবনী আমার নিঃসঙ্গতার কথাটা বুঝতো।

বলতো—তুই এলি, তোর সঙ্গে যে একটু মন খুলে গল্প করবো, তারও সময় পাচ্ছি না। আর ঠিক এই সময়েই কিনা আমার কাজের ভীড়টা বাড়লো। দেখছিস, কী অসম্ভব রোগীর ভীড় আজকাল।

কিন্তু এছাড়া তো অবনীর কোনও উপায়ও ছিল না। আগে তো তার রোগী; তার পরে আমি! আমার জন্যে তো সে আর রোগীদের অবহেলা করতে পারে না।

অবনীর বউ বলতো—তা তুমি ওকে নিয়ে ঘুরলেই তো পারো। তুমি তো কত জায়গাতেই যাচ্ছো, সঙ্গে উনি থাকলে তোমারও গল্প করা হবে, উনিও এ দেশটা দেখতে পারবেন।

তা অবনী তাই-ই করতো। মাঝে-মাঝে অবনী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। কোনও দিন দশ মাইল, কোনও দিন কুড়ি মাইল রাস্তা পেরিয়ে কোনও অজ গ্রামের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতাম। এক-একদিন যে-সব দৃশ্য দেখেছি, তাতে মন বড় কষ্ট হতো। ডাক্তার গেছে রোগীর বাড়িতে, রোগীর অভিভাবকরা বাড়ির গরু বেচে ডাক্তারের ভিজিটের টাকা জোগাড় করছে। অবনী তো বাড়ির ভেতরে থাকতো, সে স-সব দেখতে পেত না। কিন্তু আমি তার গাড়ির ভেতরে বসে-বসে সব শুনতে পেতাম, সব দেখতে পেতাম।

ফেরবার পথে যখন অবনীকে ঘটনাটা বলতাম, তখন সে শুনে হাসতো! বলতো—তাই নাকি?

তারপর বলতো—জানিস, এই বিহারে ডাক্তারী করতে এসে এ-সব অনেক দেখেছি। আগে আমারও খারাপ লাগতো, গরু-ছাগল বেচা টাকা নিয়ে নিজের পকেটে পুরতে নিজের মনে কষ্টও হতো। কিন্তু মনেরও বোধহয় এমন একটা স্টেজ আছে, যে-স্টেজে পৌঁছোলে মনেরও কাজ করবার ক্ষমতা চলে যায়। যখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমি অন্যায় করছি, অত্যাচার করছি, তখনও একটা মন-গড়া যুক্তি খাড়া করলে নিজের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অত্যাচারও বেশ সমর্থন করি। তোর যতীনদা ডাক্তার জে-এন-দাশেরও বোধহয় তাই হয়েছিল। ডাক্তার দাশ খুব ভালো করেই বুঝতে পারতো যে স্ত্রীকে অবহেলা করা হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর অন্যায় করা হচ্ছে, কিন্তু তা বুঝলেও নিজের অন্যায়টাকে সমর্থন করবার জন্যে অন্য একটা যুক্তি খুঁজে আবিষ্কার করে বোধহয় নিজের মনেই একটা সান্ত্বনা পেত! এই-ই হয়। সব লোকেরই এমনি হয়। গরু-বেচা টাকাটা এখন আমার পকেটে রয়েছে, তবু টাকাটা এদের ফিরিয়ে দেবার প্রবৃত্তি আমার হচ্ছে না। হবেও না। কারণ আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি যে আমি ওদের যে উপকার করেছি, তার দাম ওই গরু-ছাগলের দামের বেশি। পৃথিবীর তাবৎ মানুষই এই রকম একটা মিথ্যে যুক্তি খাড়া করে নিজের পাপকে ঢাকতে চেষ্টা করে। আমি জানি আমি তার ব্যতিক্রম নই, আমিও সেই একই পাপ করছি।

যাক, অবনী যে পাপ করছে আর সেটা যে সে বুঝতে পারছে, সেটা সে যে মুখে বলছে, সেইটেই যথেষ্ট।

কিন্তু যতীনদা? যতীনদাও কি তা বুঝতো?

যতীনদাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়েও তো নিশ্চয়ই কত লোক নিজেদের সর্বস্ব বেচে দিয়েছে। গরু-ছাগল তো সামান্য জিনিস হয়তো নিজেদের বসত-বাড়িটাকেও বাঁধা রেখে দিয়ে যতীনদার মোটা ভিজিটের টাকা জুগিয়েছে। তার বিনিময়ে সে টাকা কে ভোগ করছে? যতীনদা? না রাঙা বৌদি?

আর পাপ? রোগীদের সর্বস্ব বেচা টাকা নেওয়ার পাপ? সে পাপেরও তো একটা ফল আছে। সেই পাপের ফলই বা কে ভোগ করছে? যতীনদা? না রাঙা বৌদি?

অবনীর কথাগুলো সত্যিই আমায় আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুললো। অবনী জানে যে সে পাপকে ঢাকবার জন্য নানা যুক্তির অবতারণা করে সামাজিক ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা করে। অবনী নিজেই স্বীকার করছে যে সেও পাপী। কিন্তু যদি সে জানেই যে সে পাপ করছে, তাহ'লে কেন রোজ-রোজ সে একই পাপের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে?

করে চলেছে এই জন্যে যে আপাতদৃষ্টিতে সেই পাপের জন্যে তাকে কোনও লোকসান স্বীকার কোথাও করতে হচ্ছে না।

আর শুধু যতীনদা বা অবনীই নয়, ভেবে দেখলে বোঝা যায়, আমরা এই পৃথিবীর যত মানুষ, সবাই এক। একই পাপ করে চলেছি। পৃথিবীর মানুষ কেউ গরু বেচা টাকা দিয়ে, কেউ বা বাড়ি-সম্পত্তি বেচা টাকা দিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আরামের আর সুখ-সমৃদ্ধির খোরাক জুগিয়ে চলেছে। অথচ তার জন্যে আমাদের কোনও বিকার নেই, কোনও অনুতাপ-বোধও নেই। আমরা আমাদের চরিত্রকে এমন করে গড়ে তুলেছি যাতে আমরা নিজেদের ভদ্রসমাজের উপযুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারি, তার বেশি কিছু নয়। আর সেই তথাকথিত ভদ্রসমাজভুক্ত হতে পারলেই আমরা আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হলো বলে মনে করি।

*

হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিতেই আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়লো। অবনী বললে—এইবার এসে গেছি, আয়!

দেখি গাড়িটা একটা বাড়ির বার-উঠোনে এসে থেমেছে। এই সেই জনকপুর। মিস্টার শর্মা এখানকার বাসিন্দা। অবনীর বাঁধা পেশেণ্ট। শর্মা মোটর-ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের মালিক।

বেশ সাজানো-গোছানো বাড়ি। বাড়িটা বাংলো-প্যাটার্ণের। চারিদিকে বড়-বড় ফুলের গাছ। একদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। আস্তাবলের ভেতরে দু'চারটে ঘোড়া তখন গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় দানা-পানি খাচ্ছে। একটা রবারের টায়ার লাগানো চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে রাখা। অবনীকে আসতে দেখেই যে ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মনে হলো তিনিই মিস্টার শর্মা। বেশ মাঝ-বয়েসী ভদ্রলোক।

—আসুন ডাক্তারসাহেব, আসুন!

অবনী তার স্টেথিসকোপটা হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললে—কী হলো মিস্টার শর্মা, আবার কী হলো আপনার? এত জরুরী কল কেন?

মিস্টার শর্মা বললে—আমার তবিয়ৎটা ভালো যাচ্ছে না ডাক্তার সাহেব, দুদিন রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি।

অবনী বললে—তাহ'লে আবার ব্লাডপ্রেসারটা বাড়লো নাকি? কী খেয়েছিলেন?

মিস্টার শর্মা বললে—পরোটা আর মাংস, যা রোজ খাই।

অবনী বললে—কেন, পরোটা খান কেন? আর তা-ছাড়া মাংসটাও আপনাকে ছাড়তে হবে। আমি তো আপনাকে বলে দিয়েছি, শুধু চাপাটি আর সবজি খাবেন। আর মাংস যদি খেতেই হয়, তো সপ্তাহে একবার করে মুর্গী খাবেন, তা-ও স্টু করে। আমি তো মিসেস শর্মাকে সব বলে গেছি। কই, ডাকুন তো মিসেস শর্মাকে।

মিস্টার শর্মার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছবি ফুটে উঠলো।

বললে—না না, আমার বিবিকে বলবেন না, আমাকে বাড়িতে পরোটা মাংস খেতে দেয় না, তাই এবার গয়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে খুব পেট ভরে ওই সব খেয়ে এসেছি।

অবনী ততক্ষণে ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্রটা মিস্টার শর্মার হাতে লাগিয়ে রক্তের চাপের অঙ্কটা জেনে নিয়েছে। মিস্টার শর্মা জিজ্ঞেস করলে—কত দেখলেন ডাক্তারবাবু?

অবনী বললে—সে আপনার জেনে কী হবে? আপনি তো আমার কথা শোনেন না।

মিস্টার শর্মা এবার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললে—না-না ডাক্তার সাহেব, এবার থেকে আমি আপনার কথা শুনবো, আপনি যা খেতে বলবেন তাই-ই খাবো। তবে মাঝে-মাঝে আমার যে লোভ হয়ে যায় ডাক্তারসাহেব, তাই একটু ওই সব খেয়ে ফেলি। আপনি যেন এসব খাওয়ার কথা মিসেস শর্মাকে বলে দেবেন না।

অবনী বোধহয় একটু শান্ত হলো। বললে—ঠিক আছে এবার বলবো না, কিন্তু আমি যা-যা খেতে বলেছি, আপনি কেবল তাই-ই খাবেন আর এই নতুন একটা ওষুধ লিখে দিলুম, এটা আনিয়ে নিয়ে ঠিকমত খাবেন।

মিস্টার শর্মা বললে—ঠিক আছে। আপনি আবার কবে আসবেন?

—সাতদিন পরে আমি আবার এসে দেখে যাবো। কিন্তু এখন আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আজকে এ-ঘরে থেকে আর বেরোবেন না। দরজা জানলা সব বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

মিস্টার শর্মা বললে—কিন্তু আমার যে অনেক জরুরী কাজ আছে ডাক্তারসাহেব, খুব জরুরী কাজ।

অবনী বললে—চুলোয় যাক আপনার জরুরী কাজ। আগে আপনার স্বাস্থ্যখানা, না আপনার কাজ? আর অত কাজ করে আপনার লাভ কী? আপনার এত স্টাফ্ রয়েছে, তারা সব করবে। তারপর মিসেস শর্মা রয়েছেন, তিনিই তো সব দেখেন আপনার, আর তাছাড়া অত টাকা উপায় করে আপনার হবেটা কী? আপনি তো অনেক টাকা কামিয়েছেন। এখন একটু রেস্ট নিন—বলে অবনী বাইরে বেরিয়ে এল। আমিও তার সঙ্গে বাইরে এলাম।

গাড়িটা উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। আমিও সেইদিকে যাচ্ছিলাম।

অবনী বললে—আয়, এদিকে আয় একবার আমার সঙ্গে—একবার মিসেস শর্মার সঙ্গে দেখা করি তাঁকে আড়ালে ডেকে সব কথা বলে যাই।

বলে আমাকে নিয়ে মিস্টার শর্মার বাড়ির উল্টোদিকে চলতে লাগলো। মিস্টার শর্মার বাড়ী থেকে কয়েক পা দূরে। সেখানে মিস্টার শর্মার মোটর সার্ভিসের অফিস। যেতে-যেতে অবনী বললে—শর্মার বউটা খুব কাজের মানুষ, জানিস। মিস্টার শর্মার বউটাই বলতে গেলে এই সব বিজনেসের ব্যাপারগুলো দেখে। খুব কাজের বউ পেয়েছে মিস্টার শর্মা।

মোটর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের সামনে যেতেই দেখি একজন মহিলা অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনা করছে। অবনীকে দেখেই মহিলাটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। বললে—আপনি কখন এলেন ডাক্তার সরকার। আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই একেবারেই জানতে পারিনি। উনি কেমন আছেন দেখলেন?

অবনী বললে, সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি মিসেস শর্মা, ওঁর প্রেসার খুব হাই হয়ে গেছে। দু'শো চল্লিশের ওপর।

মিসেস শর্মা বললে, কেন? আমি তো ওঁকে খুব লাইট-ফুড খেতে দিই, মাখন খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। পরোটা-মাংস ও খুব খেতে চাইতো, সে-সব কিছুই আমি খেতে দিই না। শুধু খিচুড়ি, চাপাটি আর সবজি খেতে দিই।

অবনী বললে, আপনি না খেতে দিলে কী হবে, উনি তো বাইরে গিয়ে সব খান। উনি তো নিজেই স্বীকার করলেন যে গ্যারাজে গিয়ে উনি দেদার পরোটা-মাংস খেয়েছিলেন।

—তাই নাকি? আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে বলছি।

অবনী বললে, না-মা, আপনি কিছু বলবেন না। আমি ওঁকে কথা দিয়েছি, আপনাকে এ-সব কথা কিছুই বলবো না। আপনি যেন আবার বলে দেবেন না, যে. আমি আপনাকে সব বলেছি। আপনাকে উনি ভীষণ ভয় করেন।

মিসেস শর্মা বললে, ভয় করে না ছাই করে। যদি ভয় করতো তো অত অনিয়ম করতো? দেখুন ডাক্তার সরকার, ওকে নিয়ে আমি আর পারি না। এই বয়েসে এত খাওয়ার লোভ কি ভালো? সেইজন্যেই তো আমি ওকে কোথাও একলা বেরোতে দিই না। আমাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে হঠাৎ এক-একদিন বাইরে বেরিয়ে যায় আর পরোটা মাংস, মদ এই সব খেয়ে আসে।

—মদও খান নাকি?

মিসেস শর্মা বললে. আমার সামনে থাকলে খেতে পারে না, কিন্তু বাইরে পালিয়ে গিয়ে গিলে আসে। আর বাড়িতে এলেই আমি মুখে গন্ধ পাই—সেই জন্যেই তো রাজবাহাদুরকে আমি সব সময় চোখে-চোখে রাখি।

রাজবাহাদুর! আমি নামটা শুনেই চমকে উঠেছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিসেস শর্মার দিকে চেয়ে দেখলাম। তাহ'লে এ কি সেই আমাদের রাঙা বৌদি? আর মিস্টার শর্মা কি তাহ'লে সেই ড্রাইভার রাজবাহাদুর?

অবনীর সময় হয়ে এসেছিল। সে বলে উঠল. ঠিক আছে, আমি তা'হলে এখন চলি, আবার সাতদিন পরে আমি আসবো। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গিয়েছি ওঁর কাছে। আপনি ওষুধটা আনিয়ে ওঁকে নিয়ম করে খাওয়াবেন।

বলে অবনী গাড়িতে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। গাড়ি করে খানিক দূরে এসেছি. তখনও আমার মনের মধ্যে ভাবনার কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। সত্যিই কি এ আমার সেই রাঙা বৌদি? আর মিস্টার শর্মাও কি সেই ড্রাইভার রাজবাহাদুর?

অবনী হঠাৎ বললে. জানিস. মিস্টার শর্মার বউ যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললুম এ একজন বাঙালী মেয়ে। আগে মিস্টার শর্মা কলকাতায় ছিল. তখন ওই বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে এখানে এসে বিজনেস করছে। এই যা-কিছু বিজনেস দেখলি সব কিছু ওই বাঙালী মেয়েটার টাকায়। শুনেছি, বাঙালী মেয়েটার বাবার নাকি অনেক টাকা ছিল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। বললাম. না ও-সমস্ত ওই মেয়েটার স্বামীর টাকা। মানে. আগেকার স্বামীর টাকা।

অবনী অবাক হয়ে গেল। বললে. তার মানে?

বললাম—তার মানে মিসেস শর্মার আগেকার স্বামীর অনেক টাকা ছিল।

অবনী জিজ্ঞেস করলে. তুই কী করে জানলি?

বললাম. ও হচ্ছে আসলে আমার রাঙা বৌদি। ডাক্তার-জে-এন-দাশের স্ত্রী। আর ওই মিস্টার শর্মা, ও ছিল রাঙা বৌদির ড্রাইভার রাজবাহাদুর। একদিন রাঙা বৌদি থিয়েটার রোডের বাড়ি ছেড়ে ওই ড্রাইভারের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ডাক্তার দাশের তিন-চার লাখ টাকা আর গয়না-গাঁটি সমস্ত। তার দামও প্রায় অনেক লাখ টাকা।

অবনী বলে উঠলো. তাই নাকি? আমিও একটা গুজব শুনেছিলাম বটে যে ডাক্তার দাশের স্ত্রী ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। তাহ'লে কথাটা সত্যি? তা'হলে এই-ই তোর সেই রাঙা বৌদি? আমি তো. এতদিন আসছি কিছুই তো বুঝতে পারি নি।

আশ্চর্য! আমিই কি প্রথমে কিছু বুঝতে পেরেছি? কলকাতা থেকে এই বিহারে এসে এক অজ পাড়াগায়ের মধ্যে সেই আমার রাঙা বৌদিকে যে আবার এতদিন পরে দেখতে পাবো, এ তো আমি নিজেও কল্পনা করতে পারিনি। কতকাল আগের কথা। রাঙা বৌদি এত মোটা হয়ে গেছে, আমার চেহারাও সেই আগেকার মত আর নেই। আর তা ছাড়া রাঙা বৌদিই বা কি করে কল্পনা করতে পারবে যে, সেই আমিই এতকাল পরে কোন্ সূত্র ধরে তার জনকপুরের নতুন শ্বশুর বাড়িতে এসে হাজির হবো।

কিন্তু মনে আমার ভাবনার সূত্রগুলো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠে কেবল পীড়া দিতে লাগলো। থিয়েটার রোডের সেই বাড়ি আর ঐশ্বর্যের কেন্দ্রে বসে থেকেও কোন্ প্রলোভনে সে তার ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে এসে এই জনকপুরের মত জায়গায় এল। এখানে রাঙা বৌদি কি সুখ পাচ্ছে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটি ক্ষীণ সূত্র আবিষ্কার করলাম। হয়ত ডাক্তার জে-এন-দাশের বাড়িতে সমস্ত কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও আসল জিনিসটার অভাব ছিল রাঙা বৌদির। তার বাড়ি ছিল, টাকা ছিল, গয়না ছিল, আরাম ছিল, ছিল না শুধু প্রভুত্ব খাটাবার ক্ষমতা। হয়তো রাজবাহাদুরকে বিয়ে করে সেই ক্ষমতাই এখন তার আয়ত্তে এসেছে। ডাক্তার জে-এন-দাশ তার অধীনে ছিল না। কিন্তু এই রাজবাহাদুর তার কথায় উঠে-বসে। এটাই কি মেয়েমানুষের জীবনে কম ক্ষমতা নাকি?

কিম্বা হয়ত আমার সেই জ্যোতিষ বন্ধুর কথাই ঠিক। এও হয়ত সেই রাজযোগ। রাঙা বৌদির কোষ্ঠীতে হয়ত বিপরীত রাজযোগের লক্ষণ ছিল। কে জানে!

ষষ্ঠী

অনেক গল্প আছে যার আরম্ভটা পড়লে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু শেষে গিয়ে মেলে না। কিন্তু শেষটাই হল আসল। শেষ না ভেবে লিখলে লেখার ওই দশাই হয়। আমি একজন বিখ্যাত লেখককে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি কি শেষটা ভেবে নিয়ে লেখেন?

তিনি বলেছিলেন, না—

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন? শেষ না ভাবলে আপনি পাঠককে ধরে রাখবেন কী করে? গল্পের চাবিকাঠি তো শেষেই থাকে। গল্পের শুরুতে যে গেরোটা বেঁধে দেবেন, সেই গেরোটা শেষকালে তো খুলতেই হবে। আগে থেকে সমস্তটা প্ল্যানিং করে নিলে, তবেই তো খুলতে পারবেন গেরোটাকে।

সেই বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন—জীবন তো ফরমুলা নয় হে, আগে থেকে শেষটা ভেবে নিয়ে লিখলে গল্পটা ফরমুলা হয়ে যাবার ভয় থাকে।

আমি বলেছিলুম—কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা যে ফরমুলায় চলছে। সূর্য-নিয়ম করে পূর্বে উঠে সন্ধ্যেবেলা পশ্চিমের আকাশে ডুবে যাচ্ছে। নিয়ম করে শীত পড়ছে, গ্রীষ্ম পড়ছে, বর্ষা হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই-ই যখন নিয়ম, তখন গল্প সৃষ্টির মধ্যেই বা কেন এই নিয়ম থাকবে না?

তা যার যা খুশী সে সেইভাবে লিখুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। গল্পের একটা শেষ থাকতে হবে, এটাই আমার নিয়ম।

তাঁর নামটা বলবো না, কিন্তু কোথায় গেল সেই বিখ্যাত লেখক? তাঁর নাম বললেও কেউ আর এখন চিনতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, তিনি সশরীরে বেঁচে আছেন।

কিন্তু এ তো গেল ভূমিকা। যাকে অন্য ভাষায় বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা।

আমার এ গল্প যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এ লাইনগুলো না পড়লেও পারেন। কারণ গল্প ওতে আরম্ভ হয় নি। গল্প আরম্ভ হচ্ছে এইবার। এই আমি যখন পুরীতে গেলাম।

এমন বাঙালী খুব কম আছে যে পুরীতে দু'একবার না গেছেন।

পুরী এমনই একটা জায়গা, যা কোনও দিন পুরনো হয় না। ওখানে আমি প্রায় পনেরো-ষোল বার গিয়েছি। স্বর্গদ্বারের বড়-বড় হোটেল থেকে আরম্ভ করে ছোট প্রাইভেট হোটেল পর্যন্ত সর্বত্র থেকেছি। কোথাও দৈনিক পাঁচশো টাকা রেট, আবার কোথাও দিনে মাথা-পিছু পঞ্চাশ টাকা।

সেবার এমন এক হোটেলে গিয়ে উঠলাম, যার কোনও সাইনবোর্ড নেই। লোকের মুখে যে নামটি চালু, তা হল 'মাসিমার হোটেল'।

মাসিমার হোটেলের ঠিকানা আমাকে আমার এক বন্ধু দিয়েছিল। সেখানে থাকা-খাওয়ার রেট যেমন সস্তা, ব্যক্তিগত সেবা-যত্নও তেমনি পাওয়া যায় অজস্র। ছোট সরু গলির মধ্যে একতলা বাড়ি। ভেতরে সাতটা কি আটটা ঘর। দেখাশোনা করেন একজন মহিলা। তাঁকে সবাই 'মাসিমা' বলেই ডাকে। কী যে তাঁর নাম, তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

মহিলা নিজের হাতে রান্না করেন, নিজে সামনে বসে প্রত্যেককে খাওয়ান। জোর করে আপনাকে পেট ভরে খাওয়াবেন। যতক্ষণ না আপত্তি করবেন আপনি, ততক্ষন আপনাকে জোর করে খাওয়াবেন।

আমি স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা চেপে যখন সেই আসল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সাইকেল রিক্সাওয়ালাও জানতো না যে, সেটা একটা হোটেল। কারণ বাইরে কোন সাইনবোর্ড নেই আড়ম্বর তো নেই-ই। শুধু বাড়ির সামনে একটা ঝাঁকড়া মাথা তুলসী গাছ। তার তলায় একটা বিরাট বেদী। দেখেই বোঝা যায় কেউ যেন সকালবেলা ফুল-বেলপাতা দিয়ে গাছটাকে পূজো করেছে। কারণ গাছটার তলায় কয়েকটা গাঁদা ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে। আর গাছটার গোড়ায় সিঁদুরের কয়েক ফোঁটা তখনও লেগে আছে। গাছটাকে পূজো না করলে অমন সিঁদুরের দাগ আর ফুল-বেলপাতা পড়ে থাকে না।

রিক্সাওয়ালাই আমার স্যুটকেশ আর হোল্ড-অলটা নিয়ে ভেতরের একটা ঘরে তুলে দিলে। আমার আসার খবর পেয়েই একজন মাঝ-বয়েসী মেয়েমানুষ হন্ত-দন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন– কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

আমি বললাম—কলকাতা থেকে—

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—আমার ঠিকানা কোত্থেকে পেলেন?

বললাম—আমার কলকাতার এক বন্ধুর কাছ থেকে—

—তার কী নাম?

বললাম—মহেশ। মহেশ চৌধুরী—

মহিলাটির মনে পড়ে গেল। বললেন—হ্যাঁ তিনি খুব ভালো লোক, আমার মনে আছে। এই পাঁচ-ছ'মাস আগে এসে আমার এই হোটেলে উঠেছিলেন।

বললাম,—হ্যাঁ তার কাছে আপনার প্রশংসা শুনেই আমি এসেছি—

মহিলাটি বললেন—তা'হলে তো আপনার সবই জানা আছে—

বললাম—হ্যাঁ সবই আমার জানা আছে।

বললেন—সকালবেলা ট্রেন থেকে নেমেছেন, চা-টা কিছুই তো পেটে পড়ে নি বোধ হয়। একটু চা করে দিচ্ছি, কিন্তু চা'য়ের সঙ্গে আপনি কী খাবেন? দু'টো পরোটা আর আলু ভাজা করে দেব?

বললাম—না-না, ওসব কিছু করতে হবে না। শুধু চা হলেই চলবে।

মহিলাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা বললেন—তা কখনও হয়। শুধু চা কখনও ভদ্রলোককে দেওয়া যায়? আমি নিজের হাতে তা কাউকে দিতে পারব না। তার আগে আপনি ওই কলতলায় মুখ হাত-পা ধুয়ে নিন—

তারপর বললেন—কোন ঘরটা আপনি বলুন। দু'টো ঘর খালি আছে—

আমি বললাম—যেটা আপনার ইচ্ছে, আমার কোনও ঘরেই আপত্তি নেই।

মহিলাটি বললেন—আমার বাড়িটা খারাপ, কোনও ঘরেই আপনি সমুদ্রের হাওয়া পাবেন না।

বললাম—আমি সব জানি। মহেশ আমাকে সমস্ত বলেছে—

একটা ঘর আমি বেছে নিলাম। ঘরের ভেতরে একটা তক্তপোষ একটা ছোট টেবিল, হাতলহীন চেয়ার।

বললাম—আমি তো ঘরের মধ্যে শুধু রাত্তিরটুকু থাকব। আর সারাদিন বাইরে সমুদ্রের ধারে কিম্বা জগন্নাথের মন্দিরে কাটাব। রাত্তিরে বাড়ি এসে খাব আর ঘুমোব—

মহিলাটি বললেন—রাত্তিরে আপনি কী খান? ভাত না রুটি?

বললাম—যেটা আপনার খুশী, আমার কোনও পছন্দ নেই। যা করতে আপনার কষ্ট হবে না, তাই দেবেন—বলে আমি সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম।

সমুদ্রটা 'মাসিমার হোটেল' থেকে দূরে। গলিটা ঘুরে-ঘুরে গিয়ে দশ মিনিট হেঁটে তবে দেখতে পাওয়া যায়।

সেখানে গিয়ে দেখি তখন ঘাটে মানুষের মেলা বসেছে। মানুষের ভীড়ে সমুদ্রের জল কালো হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধারে মানুষের মাথা গিজ গিজ করছে! বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারতের লোক। গভীর রং-এর শাড়ি পরা. তারা জগন্নাথদেবের দর্শনপ্রার্থী তীর্থযাত্রীর দল।

আমি তাদের পাশ কাটিয়ে সোজা বালি ভেঙে-ভেঙে পূব দিকে চলতে লাগলাম। সেই একই দৃশ্য। প্রত্যেকবারই এসেছি আর একই দৃশ্য দেখেছি। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম দেখি নি। তারপর যখন বেশ বেলা হয়ে এল, তখন ফিরে এলুম।

হোটেলে আর যারা ছিল. তারা সবাই বোধ হয় তখন মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে গেছে। এখানে নিয়ম এই যে. ভোর চারটের সময় গিয়ে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করবার জন্যে যাবে। পুরীতে এসে মন্দিরে দেব-দর্শন না করা অপরাধ।

মাসিমা তখন বাজার করে নিয়ে এসেছে। সংসার করতে ব্যস্ত তখন। হোটেলের দোতলার ওপর ছোট ঘর। যদিও বাড়িটা একতলা। কিন্তু নীচে থেকেই দেখতে পেলাম ওপরে ছাদের পাশেই একখানা ঘর। বুঝতে পারলুম, ওই ঘরেই মাসীমা রাতটা কাটায়। বিধবা মানুষ. তবে স্বাস্থ্য ভাল।

কিন্তু হঠাৎ একটা ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মধ্যবয়সী একজন পুরুষের বুক পর্যন্ত ছবি। বেশ দামী ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। একটা ফুলের মালা ঝুলছে ফ্রেমের ওপর। দেখে মনে হল ফুলের মালাটা টাটকা ঝোলান হয়েছে। আমি অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে আছি. দেখে মাসিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কী দেখছেন?

বললাম—ওই ফটোটা দেখছি—

মাসীমা বললেন—আমার কর্তার ছবি—বলে ফটোটার দিকে চেয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে আবার বললেন—কর্তা বড় ভাল লোক ছিলেন—

আমার বিস্ময় অন্য কারণে। বললাম—মেসোমশাই কী করতেন?

মাসিমা বললেন—কর্তা রেলেই চাকরি করতেন—

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল গোলোক মজুমদারকে। সেই কাহিনী শুনুন।

সেই গোলোক মজুমদার। আমি তার সঙ্গে রেলের অফিসে এক টেবিলে কাজ করতুম। সেই গোলোক মজুমদারই কি এই মাসিমার স্বামী?

অথচ—অথচ আমি তো তা জানতাম না। গোলোক মজুমদারের সঙ্গে প্রায় বারো বছর একসঙ্গে মুখোমুখি বসে চাকরি করেছি। তখন দেখেছি গোলোক কাজে খুব পটু। তাড়াতাড়ি ফাইল ক্লীয়ার করতে পারত।

আমাদের রবিনসন সাহেব খুব ভালোবাসত গোলোক মজুমদারকে।

চাপরাশি দিয়ে ডেকে পাঠাত গোলোককে। গোলোক তাড়াতাড়ি দৌড়ে যেত সাহেবের ঘরে। রবিনসন সাহেব জিজ্ঞেস করত—গোলোক—

গোলোক বলত—ইয়েস স্যার?

হাতের একটা কাগজ দিয়ে বলত—এই স্টেটমেণ্টটা করে দিতে পারবে তুমি? তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিতে আমার ভরসা হয় না। কবেকার মধ্যে তৈরী করে দিতে পারবে বলো তো?

গোলোক জবাব দিত—আজকের মধ্যেই কী করে দিতে হবে স্যার?

সাহেব বলত—না. এখন তো বিকেল চারটে. আর একঘণ্টা মাত্র বাকি আছে ছুটি হতে। আজকে আর এটা শেষ করতে পারবে না। কালকে ফার্স্ট আওয়ারে দিলেই চলবে। এই বেলা বারোটার মধ্যে দিলেই ভাল হয়. রেলওয়ে বোর্ডে পাঠাতে হবে—

—ঠিক আছে স্যার। আমি কালকে বারোটার মধ্যে দিয়ে দেব আপনাকে।

কিন্তু মুখ বড়ই মিষ্টি ছিল গোলোক মজুমদারের। আর ওই মিষ্টি মুখের জন্যই সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিল সে। সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে গোলোক মজুমদার আমাকে বলতো—মিত্তির, বড় বিপদে পড়েছি ভাই—

আমি বলতাম—কী বিপদ?

গোলোক মজুমদার বলত—আরে ভাই, সাহেব আমাকে এই স্টেটমেণ্টটা করে দিয়ে যেতে বলছে—

বলতাম—কখন চাই ?

গোলোক বলতো—কাল সকাল এগারোটার মধ্যে। এখন ঘড়িতে চারটে বাজে, কখন করবো বলো তো ভাই ?

—কী স্টেটমেণ্ট, দেখি?

দেখলাম অন্ততঃ খুব তাড়াতাড়ি করলেও চার ঘণ্টার কম হবে না। ।

গোলোক মজুমদার আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরত। বলতো—ভাই মিত্তির, তুমি একটু হাত লাগাবে? তোমাকে আমি কাল ক্যানটিনে এক প্লেট মাংস আর পরোটা খাওয়াব, আমাকে একটু বাঁচাও ভাই—

আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। গোলক মজুমদারের হাত এড়ানো শক্ত ছিল। আমাকে মাংস-চপ কাটলেট খাইয়ে অনেকবার অনেক কাজ করিয়ে নিয়ে নিজে সাহেবের কাছে বাহাদুরি পেয়েছে। গোলোক বলত—করবে তো ভাই? তুমি কথা দিলে?

আমি বলতাম—তা এখনও তো ছুটি হতে একঘণ্টা সময় আছে। তুমি ততক্ষণ নিজেই হাত লাগাও না।

গোলোক মজুমদার বলত—আরে তা'হলে তো কোনও কথাই ছিল না? আমার যে শ্যামবাজারে একটা জরুরী কাজ আছে।

—শ্যামবাজারে তোমার আবার কী এমন জরুরী কাজ?

গোলোক মজুমদার বলত—আরে তুমি তো আর সংসার করলে না, তুমি সংসার করার জ্বালা বুঝবে কি করে? তোমার বৌদিকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখতে হবে শ্যামবাজারে গিয়ে। সেখানে কি একটা নতুন ছবি এসেছে—

আমি চুপ করে থাকতুম। কিছু বলতে পারতুম না! বলতে গেলে গোলোকদাই আমাকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়েছিল। আমি যখন নতুন অফিসে ঢুকি, তখন কাজের কিছুই জানি না।

ওই গোলোকদাই আমাকে বলেছিল—মন দিয়ে কাজ করবে ভাই, কাজই হলো লক্ষ্মী। এই আজ আমাকে দেখ, সব কাজে সা'হব আমাকে ডাকে। কারণ আমি কাজ জানি। বড়বাবু রয়েছে, সবাই রয়েছে, কিন্তু আমাকে ছাড়া সাহেব কাউকে ডাকবে না, দেখে নিও—

সত্যিই গোলোকদা ছিল কাজের ঘুণ। তা সেদিন বিকেল পাঁচটা বেজে গেল। আর সবাই অফিস থেকে চলে গেল।

দু'-একজন জিজ্ঞেস করলে—কী হে, তুমি এখনও বসে আছো যে?

বললাম—গোলোকদার কাজ করছি—

একজন বললে—গোলোকের পাল্লায় পড়েছ, ওই তোমাকে ডোবাবে!

কী জানি কেন অফিসের লোকের কারোর ভাল ধারণা ছিল না গোলোক মজুমদার সম্বন্ধে। সকলের একই ধারণা গোলোক মজুমদার সম্বন্ধে। আমি রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসে বসেই স্টেটমেণ্টটা শেষ করে ফেললুম। তারপর কাগজপত্র ড্রয়ারের মধ্যে রেখে চাবি দিয়ে বাড়ি চলে গেলুম।

পরের দিন আমি ঠিক সাড়ে দশটায় অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছি। কিন্তু গোলোকদার তখনও দেখা নাই। আধ-ঘন্টা পরে যখন দৌড়তে-দৌড়তে এলো, তখন দেখি একেবারে ভূতের মতন চেহারা।

বললাম—এ কী গোলোকদা, তোমার এ-রকম চেহাবা হলো কী করে?

গোলোকদা বললে—তোমার বৌদির শরীরটা খুব খারাপ ভাই। কাল সারা রাত তাকে সেবা করতে গিয়ে এক মিনিট ঘুমোতে পারি নি। চৌপব বাত জেগে কেটেছে—

বললাম—বৌদির কী হয়েছিল?

—আরে ভাই, তোমাব বৌদি সব যা-তা খাবে, আর ভোগান্তির বেলায় সেই আমিই। রাত দুপুরে তখন ডাক্তারের বাড়ি যাই, তাকে ডেকে আনি, তখন ওষুধ দেওয়াতে ব্যথা কমে। রাত যখন চাবটে তখন একটু ঘুম আসে, আর সে-ঘুম যখন ভাঙে তখন সকাল দশটা। তখন আর চান-করবার, ভাত খাবাব সময় নেই। ঘুম থেকে উঠেই সোজা অফিসে চলে এলুম—

—একেবারে না খেয়ে এসেছ?

গোলোকদা বললে—আসব না? সাহেব স্টেটমেন্ট চেয়েছে বারোটাব মধ্যে সে-কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই দৌড়ে চলে এলুম—

—তা হলে সারা দুপুব আজ উপোস?

—না, উপোস কেন হবে? ক্যান্টিনে গিয়ে পরোটা-মাংস তোমায় নিয়ে খেয়ে নেব।

—আব বাড়িতে? বাড়িতে রান্না কববে কে?

গোলোকদা বললে—বান্না হবে না আজকে—

বললাম—বান্না না হলে চলবে কী করে? বৌদি কী খাবে?

গোলোকদা বললে—আমি সেই সন্ধোবেলা বাড়ি যাবো, তখন রান্না করবো।

—তুমি রান্না কবতে পাবো?

গোলোকদা বললে—আবে, অর্ধেক দিন তো আমিই রান্না করি। আমি ভাত-ডাল-চচ্চড়ি-কুমড়োর ঘন্ট-মাছেব কালিযা সব কিছু বান্না করতে পারি—আমাব বান্না খেলে কেউ ভুলতে পাববে না। তোমাকে একদিন খাওযাব, দেখবে আমার কেরামতি—

এতক্ষণে যেন কাজেব কথা মনে পড়ে গেল।

বললে—যাক্ গে, ভালো কথা, আমাব স্টেটমেন্ট কী হলো?

আমি স্টেটমেন্টটা বাব করে দিলুম। দেখে গোলোকদাব এক গাল হাসি। বললে—ফিনিশড?

বললাম—হ্যাঁ, কাল বাত ন'টাব সময়েই শেষ করে দিয়েছিলুম—

গোলোকদা আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

বললে—তুমি ভাই বাহাদুর ছেলে। তুমি আমাব মান বাঁচালে—

ততক্ষণে ববিনসন সাহেবেব চাপবাশি এসে হাজিব। এসেই বললে গোলোকবাবুকে বড়া সাহেব সেলাম দিযা—

গোলোকদা আমাব হাত থেকে স্টেটমেন্টটা কেড়ে নিয়ে বললে—দাও-দাও, শীগগিব দাও হে। কোনও ভুল-টুল নেই তো হে? দেখো, শেসকালে যেন বিপদে না পড়ি—

বললাম—না-না, ভুল নেই। আমি দু'বাব চেক করে দিয়েছি—

আমার কথা শেষ হবাব আগেই সেটা নিয়ে গোলোকদা রবিনসন সাহেবের ঘরে গিয়ে হাজিব। সাহেব বলে—এই যে গোলোক, আমার স্টেটমেন্ট রেডি?

গোলোকদা বললে—ইয়েস স্যাব, বেডি।

সাহেব স্টেটমেন্টটা খুলে বললে—বাঃ, ভেরি গুড্! কখন করলে তুমি এত বড় স্টেটমেন্ট?

গোলোকদা ঝট্ করে বলে দিলে—আমি স্যার এখানে রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করেছি, তারপর কাগজগুলো রাত্রে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেখানে হোল নাইট জেগে শেষ করেছি, কালকে রাত্রে ঘুমোই নি স্যার—

—হোল নাইট কাজ করেছ ?

গোলোকদা বললে—হ্যাঁ স্যার, হোল নাইট জেগে-জেগে চেকিং করেছি, পাছে যদি কোনও ভুল থাকে।

সাহেব বললে—ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ গোলোক, আমি দেখবো তোমার জন্য কী করতে পারি—

তারপর গোলোকদা হাসতে-হাসতে ফিরে এল। বললাম—কী হলো ?

গোলোকদা বললে—রবিনসন সাহেব খুব খুশী। আমি সাহেবকে বললুম, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিত্তিরই সব করেছে। তোমার নামটাও আমি বলে দিলুম—

বললাম—তুমি আমার নামটা করতে গেলে কেন ?

—কেন করব না ? আমি অমন নেমকহারাম নই। যার যা পাওনা, তাকে তা দিতে হবে। তুমি সব করলে আর ক্রেডিট নেব আমি ? আমি বড়বাবুর মত নই। সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কোন মিত্তির ? আমি তোমার নাম করে দিলুম। বললাম—বিকে মিত্তির খুব কাজের ছেলে, ও এখনও বি-গ্রেডে কাজ করছে পাঁচ বছর ধরে, ওর দিকে কেউ দেখে না। ওকে প্রমোশন দেওয়া উচিত। সাহেব বললে—অল্ রাইট, আই শ্যাল সী টু ইট। আসল সাহেবের বাচ্চা তো, ও ঠিক, তোমাকে এবার নেক্সট গ্রেডটা দেবে—

আমি কৃতজ্ঞতায় হতবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সাহেবকে বললে ওই কথা ?

গোলোক মজুমদার বললে—বলবো না ? আমি কি নেমকহারাম ? তুমি কাজ করবে ক্রেডিট নেব আমি ? আমি এক বাপের ছেলে, কারোর পরোয়া করি না আমি—

কিন্তু আশ্চর্য, রবিনসন সাহেবের চাপরাশি দ্বিজপদের কাছে আমি অন্য কথা শুনলাম। আমি দ্বিজপদকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম বললাম—

—তুমি তো সাহেবের ঘরে তখন ছিলে দ্বিজপদ, সাহেব কী বললে গো ?

দ্বিজপদ বললে—গোলোকবাবুর সব কথা মিথ্যে।

আমি বললাম—কেন, গোলোকবাবু রবিনসন সাহেবকে আমার কথা বলে নি ?

দ্বিজপদ বললে—না বাবু, গোলোকবাবু আপনার নামই উচ্চারণ করে নি। সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন—আমি সারারাত জেগে এটা শেষ করেছি।

আমি বললাম—ওসব কথা ছেড়ে দাও দ্বিজপদ, সব অফিসে এই-ই হয়।

দ্বিজপদ বললে—না বাবু, আমি যে নিজে দেখেছি আপনি কাল রাত্তির সাড়ে ন'টা পর্যন্ত এই চেয়ারে বসে কাজ করেছেন। কাল সাহেব অনেকক্ষণ অফিসে ছিল, তাই আমাকেও থাকতে হয়েছে—

গোলোক মজুমদারকে তবু আমি খুব ভালবাসতুম। দিলখোলা মানুষ। গোলোকদা মাঝে-মাঝে এসে বলত—কাল রাত্রে একটু মাল খেয়েছি ভাই—

—মাল ? মানে ?

গোলোকদা হাসতে হাসতে বলল—তুমি দেখছি একেবারে আনাড়ী। মাল মানেও বোঝ না ? মদ হে, মদ।

আমি বলতুম—তা হঠাৎ মদ খেলে কেন ? ওটা খাওয়া কি ভালো ?

গোলোকদা বলত—আমি তো প্রায়ই খাই। খেলে ঘুমটা ভালো হয়—

বলতুম—কিন্তু শেষকালে যদি নেশা হয়ে যায় তখন ?

গোলোকদা বলত—নেশা হলে ক্ষতি কী ? ও এখন আমার ডাল-ভাত হয়ে গেছে—

—কিন্তু শেষে যদি লিভার পচে যায়? শুনেছি বেশি মদ খেলে নাকি লিভারে ঘা হয়, ক্যানসার হয়।

গোলোকদা বলত—সে তো আলোচালের ভাত খেলেও লিভারে ঘা হয় লোকে বলে। যারা বেশি ফল খায়, প্রোটিন খায় না, তাদেরও লিভারে ঘা হয়। আর তা ছাড়া একদিন তো মরতে হবেই সবাইকে, তার আগে যদ্দিন বাঁচি, একটু মৌজ করে খাই—

আমি বলতুম—কিন্তু টাকা? মদের তো শুনেছি অনেক দাম।

গোলোকদা বলত—তা আমি কি বেশি খাই হে? বেশি মদ খেলে বেশি টাকা খরচ। আর আমি তো বিলিতি খাই না, দিশি খাই, ওতে খরচা কম—

আমি তবু সাবধান করে দিতুম। বলতুম—না-না গোলোকদা, ও-সব ছাই-পাঁস না খাওয়াই ভালো। ওতে নিজের শরীরও খারাপ হয়, আবার পয়সাও নষ্ট হয়—

গোলোকদা বলতো—তুই তো বড়-বড় উপদেশ ঝাড়ছিস, তা'হলে রবিনসন সাহেব খায় কেন? সাহেবরা খেলে কোনও দোষ নেই, আমরা কেরাণীরা খেলেই যত দোষ?

আমি বলতুম—ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা তো গরুর মাংস খায়? ওদের পেটে সব হজম হয়, আমাদের বাঙালীদের পেট কী ওই রকম?

তা সেই গোলোকদার ফটোগ্রাফ এই মাসিমার হোটেলে টাঙানো দেখে বড় অবাক হয়ে গেলাম। গোলোকদার ছবি এই মাসিমার হোটেলে কেন এল?

মনে আছে, হঠাৎ একদিন কামাই করলে গোলোক মজুমদার।

সাধারণতঃ গোলোকদা কামাই বড় করত না। অফিস আসতে মাঝে-মাঝে লেট করতো বটে, কিন্তু তা বলে কামাই?

তার পরদিনও কামাই! রবিনসন সাহেব সেদিন ডেকে পাঠালো গোলোকদাকে। দ্বিজপদ এসে খবর দিয়ে গেল, সাহেব গোলোকবাবুকে সেলাম দিয়েছে।

আমি বিপদে পড়লাম। বড়বাবুকে গিয়ে বললাম, রবিনসন সাহেব গোলোকদাকে ডেকেছে। বড়বাবু বললে—তা গোলোকবাবু অফিসে নেই, তার বদলে তুমিই যাও না—

আমি তখন অফিসে নতুন। সাহেবের ঘরে কখনও যাই নি। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দ্বিজপদ'র পেছনে-পেছনে গিয়ে-গিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকলুম। একেবারে লালমুখো সাহেব মিস্টার রবিনসন। যেতেই সাহেব মুখ ভেঙচে উঠলো—হোয়ার ইজ্ গোলোক?

আমি বললুম—হি হ্যাজ্ নট্ কাম টু অফিস স্যার।

সাহেব রেগে গেল। বললে—হু আর ইউ?

আমি বললুম—আই অ্যাম্ হিজ্ অ্যাসিসট্যান্ট স্যার।

সাহেব খুশী হলো না। যেন বিরক্ত হল খুব গোলোকদাকে না পেয়ে। আমাকে বললে, ইউ, মে গো—

আমি সাহেবের ঘর থেকে চলে এলাম। আমার গায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সেই যে গোলোকদা কামাই করলে, তারপর থেকে তিন দিন কেটে গেল, তবু আসে না।

এমনি করে সাতদিন যখন কেটে গেল, তখন রবিনসন সাহেবও বিরক্ত, অফিসের সবাই বিরক্ত। যেন গোলোক মজুমদার না এলে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। শেষকালে বাড়ি ফেরার পথে একদিন মাঝখানে নেমে পড়লাম! ভাবলাম, যাই গোলোকদার খবরটা নিয়ে যাই—

গোলোকদার বাড়ীর ঠিকানা জানতুম না। কিন্তু জায়গাটার একটা আন্দাজ ছিল। গলির-গলি, তস্য-গলির ভেতরে বাড়িটা। এক-একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে কড়া নাড়ি আর জিজ্ঞেস করি—এ-বাড়িতে কি গোলোক মজুমদার থাকেন?

তারা বলে, কে গোলোক মজুমদার?

এর পরে আর আমার জিজ্ঞেস করার কিছু থাকে না।

আবার আর একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ওই একই প্রশ্ন। কিন্তু কেউ বলতে পারে না। সমস্ত গলিটার সব বাড়ী খুঁজতে-খুঁজতে বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল কর্পোরেশনের গ্যাসওয়ালা। ভেবেছিলাম, ফিরে আসব। কিন্তু পাশের বস্তির কাছে গিয়ে একটা বাড়ির দরজা কড়া নাড়তে লাগলুম।

ভাবলুম, এই-ই শেষবার, আর চেষ্টা করব না।

একটা ছোট তিন বছরের ছেলে দরজা খুলে দিতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম—খোকা, তোমার বাবার নাম কি গোলোক মজুমদার?

ছেলেটা কোনও জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। যেতে-যেতে বলতে লাগল—মা-ওমা, কে বাবাকে খুঁজতে এসেছে—

তার কথা শুনে আর একটা ছেলে বেড়িয়ে এল। তার বয়েস একটু বেশী। আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি কাকে চান?

আমি বললাম—গোলোক মজুমদার তোমার কে হয়?

সে ছেলেটাও আমার কথার জবাব না দিয়ে ভেতরে মা'কে ডাকতে চলে গেল। এবার ময়লা শাড়ি পরা এক মহিলা এসে হাজির হলো।

বললে—আমি বলেছি তোমাকে বাবু বাড়ি নেই, তবু বার-বার টাকার তাগাদা করতে এসেছ? বাবু না এলে টাকা পাবে না!

আমি বুঝতে পারলাম অন্ধকারে আমাকে পাওনাদার ভেবেছেন মহিলা।

বললাম—আপনি ভুল করছেন, আমি পাওনাদার নই—

মহিলাটি আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল—ওরকম সবাই বলে। কর্তা কার কাছে কত টাকা ধার করেছে, তা আমি কি করে জানব? যে টাকা ধার করেছে, তার কাছে যাও— আমি তো মহিলার কথা শুনে অবাক।

মহিলাটি আমার কথা শোনার আগে আমার মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। আমি কি করবো বুঝতে পারলুম না। খানিকক্ষণ বোকার মতো সেখানে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাবলাম, আর দরকার নেই, চলেই যাই। আমার কিসের দায় গোলোক মজুমদারের খবর নেওয়ার? আমি ভেবেছিলুম গোলোকদার অসুখ, তাই শুধু দেখতে এসেছিলুম। বাড়িতে যখন নেই, তখন বুঝতে হবে শরীর ভালই আছে তার।

কিন্তু আবার ভাবলাম একবার যখন এসেছি, তখন খবরটা নিয়েই যাই গোলোকদা কেমন আছে, কিম্বা কোথায় গেছে। আর জেনে যাই শরীর যদি ভাল থাকে, তা'হলে অফিসেই বা যাচ্ছে না কেন?

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা ছেলের কথা শোনা গেল—ও-মা, লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে—

ভেতরে আর কি কথা হলো আমি শুনতে পেলুম না।

অগত্যা আবার কড়া নাড়াতে হল। এবার খটাং করে দরজা খোলার শব্দ হল, আর তার পরেই সেই মারমূর্তি মহিলা। বললে—বার-বার কড়া নাড়াচ্ছো কেন বাপু? আমি তো বলেছি বাবু বাড়ি নেই, তবু কেন জ্বালাচ্ছ?

আমি বললুম—দেখুন ভুল করছেন, আমি পাওনাদার নই—

মহিলাটির যেন ততক্ষণে হুঁশ হল। বললে—তা'হলে আপনি কে?

বললাম—আমি গোলোকবাবুর অফিস থেকে এসেছি।

মহিলাটি বললে—ও, আমি তা বুঝতে পারি নি।

বললাম—সাতদিন গোলোকদা অফিস যান নি, কোনও খবরও দেন নি। তাই ভাবলুম একবার দেখে যাই কেমন আছেন—

মহিলাটি বললে—সাতদিন বাড়িতেও আসেন নি।

বললাম—বাড়িতে সাতদিন আসেন নি আর অফিসেও সাতদিন যান নি। তা'হলে তিনি কোথায়? আপনাদের চলছে কী করে?

মহিলাটি বললে—চলছে না তো! কোথায় যে গেলেন তিনি, বুঝতে পারছি না।

বললাম—জলজ্যান্ত মানুষটা তো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না।

মহিলাটি বললে—যদি আপনাদের আপিসে আসেন তো একবার বলবেন তাকে, আমাদের বড় দুরাবস্থা চলছে। বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে আমি একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

বললাম—তা'হলে আপনাদের বাজার-টাজার কে করছে? আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কী হচ্ছে।

মহিলাটি বললে—কোনওরকমে যা জুটছে, তাই বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি। একটা টাকা হাতে নেই যে, রেশনের দোকান থেকে রেশন নিয়ে আসি। কী বিপদেই যে পড়েছি!

আমার পকেটে গোটা সত্তর টাকা ছিল, তাই বার করে দিলাম মহিলাটির হাতে। বললাম—এই সত্তর টাকা রাখুন, আপনি লজ্জা করবেন না—

মহিলাটি সাতটা দশ টাকার নোট নিয়ে নিলে। বললে—এ টাকা কবে আপনাকে শোধ দিতে পারবো বলতে পারছি না। আরো ত্রিশ টাকা হলে একটু সুবিধে হতো—

বললাম—আর তো টাকা আমার পকেটে নেই এখন কাল ববং এই সময়ে দিয়ে যাব—

বলে চলে এলাম। আমার বড় অবাক লাগল কাণ্ডটা দেখে। গোলোকদাব নিজেব বাড়ির লোকেরাই জানে না যে কোথায় গেছে কর্তা, তা অফিসের লোকেবা জানতে পারবে কেমন করে?

পরের দিন যেতেই অনেক কাজ এসে পড়ল আমার ঘাড়ে।

আমাব নিজের বরাদ্দ কাজ তো ছিলই, তার ওপরে গোলোকদার ভাগের কাজও করতে হল। কাশীনাথবাবু আমাদের বড়বাবু।

তিনি বললেন—মিত্তিরবাবু, আজকে দু'জনেব কাজ শেষ কবতে হবে আপনাকে। রবিনসন সাহেবের অর্ডার।

তখন কেরাণী ছিলুম। হুকুম পালন কবাই ছিল আমার কাজ। যে কোন অপরাধেই চাকরি চলে যেতে পারে। ভয়ে-ভয়ে সব কাজ শেষ করতে আমার সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। পাঁচটার সময় যে-যার বাড়ি চলে গেছে। সমস্ত অফিসে আমি একলা। কাজ করতে-করতে কখন সন্ধ্যে হয়েছে, কখন অন্ধকাব হয়েছে, কখন সাতটা বেজেছে, খেয়াল ছিল না। কাজ শেষ কবে যখন মাথা তুললাম, তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে।

গোলোকদার বাড়ীতে গিয়ে ত্রিশ টাকা দিয়ে আসবো কথা দিয়ে এসেছি, তাই অফিস থেকে উঠে রাস্তায় বাস ধরলুম। সেই বাস খিদিরপুরে নেমে আবার অন্য বাস ধরতে হবে, তবে গোলোকদার বাড়ি পৌঁছতে পাবব।

গোপালনগরের মোড়ে নেমে প্রায় পনেরো মিনিট হেঁটে তবে গোলোকদার বাড়ি পৌঁছতে হয়। গোলোকদার বাড়ির কাছেই একটা বাজাব। বাজাবটা বাঁয়ে রেখে যখন বস্তির মধ্যে ঢুকছি, তখন বেশ ঘন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে। গোলোকদার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি বেশ কথা কাটাকাটি চলছে। একদিকে একটা লোক খুব চোট-পাট করছে, আর অন্য দিকে গোলোকদার বউ।

লোকটাকে দেখে মনে হলো পাওনাদার। সে টাকার তাগাদা করছে, আর গোলোকদার বউ ক্ষীণ মেয়েলী গলায় তার প্রতিবাদ করছে।

লোকটা বলছে—আজ টাকা না পেলে আমি যাবোই না—

আর গোলকদাব বউ বলছে—আমার কাছে টাকা থাকলে তো তবে দেবো। বাবু

বাড়িতে এলে তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।

—তা বাবু কবে আসবে ?

গোলোকদার বউ বলছে—বাবু কবে আসবে, তা আমি কি করে বলবো ? আপিসের কাজে বাবু কলকাতার বাইরে গেছে, বাবু ফিরলে সব কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবে—

লোকটা বলছে—তা বাবু যদি না ফেরে তো পাওনা টাকা পাবো না ?

গোলোকদার বউ বলেছে—আমি মেয়েমানুষ, আমি কোথায় টাকা পাবো ?

—দুধ খাওয়ার সময় তো আপনার কি সে কথা মনে ছিল না ?

লোকটার গলা এবার কঠোর হয়ে উঠলো।

এই সময় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম—এতো চেঁচামেচি কীসের ? মেয়েমানুষের সঙ্গে অত হম্বি-তম্বি করছো কেন ?

লোকটা আমাকে দেখে একটু নরম হলো যেন। বললে—দেখুন না বাবু মাইজী দুধ নিয়েছে আমার কাছ থেকে, দাম চাইতে এসেছি, মাইজী বলছেন বাবু বাড়ি নেই—

আমি বললাম—বাবু বাড়ি নেই, সত্যি কথাই তো ! তোমার কত টাকা ?

লোকটা বললে—তিরিশ টাকা যদি না-ই থাকে তো দুধ খাবার অত সখ কেন ?

আমি তখন পকেট থেকে দশ টাকা বার করে লোকটার হাতে দিতে গেলাম। বললাম—এই টাকা ক'টা এখন নাও, পরে বাবু এলে তোমার পুরো টাকা পাবে। এখন যাও—

হঠাৎ পেছন থেকে গোলোকদার গলা শোনা গেল।

আমি অবাক হয়ে দেখি গোলোকদা এসে হাজির।

গোলোকদা গলা চড়িয়ে দিয়ে বলছে—এখানে এত হল্লা কিসের ? কী হয়েছে এখানে ? তারপর আমার দিকে চেয়ে আমাকে চিনতে পারলে। বললে—আরে মিত্তির, তুমি এখানে ?

বললাম—তোমার খোঁজে—

গোলোকদা বললে—আমি আউটডোর ডিউটিতে গিয়েছিলুম, রবিনসন সাহেব আমাকে সেখানে ওয়াগন চেকিং করতে পাঠিয়েছিল—

বললাম—তা বাড়িতে বলে যাও নি কেন ? সবাই ভাবছিল। তুমি অফিসে সাতদিন ধরে আসছো না দেখে আমি কালকে তোমার বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছিলুম। এসে দেখি, কাল তোমার স্ত্রী'র রেশন তোলবার টাকা নেই, আমি সত্তর টাকা স্ত্রীকে দিয়ে গেলুম—

এতক্ষণে গোলোকদার নজর পড়লো গয়লার দিকে।

গয়লা বললে—আমি টাকা চাইতে এসেছি—

—কত টাকা বাকি বলো ?

গয়লা বললে—তিরিশ—

গোলোকদা বললে—তিরিশ টাকার জন্যে তুমি হামলা করছো ? বলে পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলে।

নোটগুলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল, গয়লা সে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে দশটাকা দিয়ে বাকিটা ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল।

গয়লা চলে যেতেই গোলোকদা বললে—তুই কত দিয়েছিস বউকে, বল—

আমি বললাম—বউদির কাছে রেশন আনবার টাকা ছিল না, তাই একশো টাকার দরকার ছিল, আমি কাল সত্তর টাকা দিয়ে ছিলুম। আজকে আরো ত্রিশ টাকা দেব বলে এসেছিলুম—

গোলোকদা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সত্তর টাকা আমার হাতে দিয়ে দিলে। বললে—এই নে, তোর টাকা— বললে—টাকাই যত নষ্টের দল, জানিস ? সারা পৃথিবী

কেবল টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। যেন টাকাটাই সংসারে সব—

তারপর বললে—তুই যখন এসেছিস, তখন না খাইয়ে তোকে ছাড়বো না—

বলে বউকে ডাকলে। বললে, আজকে মাংস খাব। এই মিত্তিরও আমাদের সঙ্গে খাবে। রান্না চাপাও, এক্ষুনি বাজার থেকে মাংস আনছি—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—চল বাজারে চল, মাংস কিনে নিয়ে আসি—

বলে আমার সঙ্গে বেরোল। তারপর বাজার থেকে দেড় কিলো খাসির মাংস কিনলে। তারপর বললে—অনেক দিন মাংস খাইনি, তাই আজকে মাংস কিনলুম।

বাড়িতে তখন মহা ধূমধাম। মাংস হয়েছে, তাই ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব আহ্লাদ। দেখে মনে হলো, অনেক দিন বাড়ির সকলে ভালো করে খেতে পায়নি বলে তাদের এত আনন্দ হয়েছে।

খাওয়ার পর গোলোকদা আমাকে বাস রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলো।

আমি বললাম—রবিনসন সাহেব আর বড়বাবু তোমার ওপর খুব চটে গেছে—

গোলোকদা বললে—তা চটুক গে, আমি কাল অফিসে গিয়ে ঠিক করে নেব—

তারপর বাস আসতেই আমি বাসে উঠে বাড়ি চলে গেলুম।

*

পরের দিন অফিসে গিয়ে দেখি, গোলোকদা একমনে কাজ করতে লেগে গেছে। আমি হাজিরা খাতায় সই করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলুম। গোলোকদা তখন এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখতেই পেলে না। আমি অবাক হয়ে গেলাম সব ব্যাপার দেখে। এমন তো হয় না। বড়বাবু তো কিছুই বলছে না গোলোকদাকে।

পঞ্চাননবাবু এসে বললে—কী হে গোলোক, তুমি অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? তোমাকে যে বড়বাবু খুব খুঁজছিল! তুমি যে বড় খবর না দিয়ে ডুব মেরেছিলে?

গোলোকদা রেগে গেল। বললে, আমি খবর না দিয়ে ডুব মেরেছিলুম কে বললে? আমি তো ডিউটিতে খড়্গপুরে গিয়েছিলুম!

পঞ্চাননবাবু তবু ছাড়বার পাত্র নয়। সোজা বড়বাবুর কাছে গেল। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বড়বাবু, আপনি যে বলেছিলেন গোলোক খবর না দিয়ে ডুব মেরেছে—

কাশীনাথবাবু বললেন—না-হে, আমি গোলোককে খড়্গপুরে পাঠিয়েছিলুম—ওয়াগনের ফিগার আনতে। খড়্গপুরে সব ওয়াগন আটকে গেছে সাইডিংএ, কিছুতেই জবাব দিচ্ছিল না, তাই গোলোককে ফিগার আনতে পাঠিয়েছিলুম—

টিফিনের সময় আমি আমার সঙ্গে গোলোকদারও চা এনে দিলুম।

বললাম—একটা কথা বল তো গোলোকদা—

—কী কথা?

বললাম—যে বড়বাবু তোমার ওপর এত হম্বি-তম্বি করছিল, যে রবিনসন সাহেব তোমার ওপর এত চটে গিয়েছিল, তারা তো আর কিছু বলছে না। বউদিও তো কিছু জানতো না, যে তুমি খড়্গপুরে গিয়েছিলে। ব্যাপারটা কী?

গোলোকদা বললে—তোর বউদির কথা ছেড়ে দে। তোর বউদি মেয়েমানুষ, তাকে যা-তা একটা বুঝিয়ে দিলেই হলো।

—কিন্তু বড়বাবু? তুমি অফিসে আসবার আগে বড়বাবু তোমার ওপর এত রেগে গিয়েছিল। আর তুমি আসবার পর তো কিছুই বলছে না—

গোলোকদা বললে—বলবার কি মুখ আছে রে?

বললাম—কেন, বলবার মুখ নেই কেন?

গোলোকদা বললে—তা'হলে তোকে চুপি-চুপি বলি, কাউকে বলিস নে যেন। আমি

তো খড়্গপুরে যাইনি যে—

আমি বললাম—সে কী? বড়বাবু যে পঞ্চাননবাবুকে বললেন—তোমাকে ওয়াগন-এর ফিগার আনতে খড়্গপুরে পাঠিয়েছিলেন?

গোলোকদা বললে—বলবেই তো! টাকায় সবাই বশ।

বললাম—তার মানে? তুমি কি বড়বাবুকে ঘুষ দিয়ে এসেছ?

গোলোকদা বললে—না রে, আমি এক কাজ করেছি আজ। ভোরবেলা বাজার থেকে দু'সেরি ইলিশ মাছ বড়বাবুর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছি।

আমি শুনে তো অবাক! বড়বাবু ঘুষ নিলে! বললাম—দু'সেরি একটা ইলিশ মাছ দিয়েই তোমার সাত-খুন মাফ?

গোলোকদা বললে—তা নয় তো কী? চল্লিশ টাকা দামের একটা গঙ্গার ইলিশ কি সোজা কথা নাকি?

তখনকার দিনে দশ টাকার অনেক দাম। সত্যিই তারপর থেকে গোলোকদার ওপর আর কোন শাস্তি হতো না। কত যে কামাই করতো গোলোকদা তার ঠিক নেই। কিন্তু আমরা হলে আমাদের ওপর এতদিন চার্জশীট এসে যেত।

আজ এতদিন পরে মাসিমার হোটেল সেই গোলোকদার ছবি দেখে তাই অবাক হয়ে গেলাম। এই মাসিমার সঙ্গে গোলোকদার কীসের সম্পর্ক?

আরো মনে আছে, সেদিন শনিবার। অফিসের শেষ মুহূর্তে বড়বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কাল রবিবার। কাল তুমি একবার অফিসে আসতে পারবে? একটা জরুরী কাজ আছে।

বললাম—আপনি যদি বলেন তো আসবো—

বড়বাবু বললেন—তা'হলে তোমার গোলোকদাকেও একবার বাড়ি যাওয়ার সময়ে বলে যেও তো, যেন সেও একবার আসে। তার বদলে অন্য একদিন তোমাদের ছুটির ব্যবস্থা করবো সাহেবকে বলে—

আমি নতুন লোক। বড়বাবু যা হুকুম করবে, তাই-ই বাধ্য হয়ে মানতে হবে। তা তাই-ই সই। বাড়ি যাবার পথে আবার সেদিন ঠিক জায়গায় বাস থেকে নামলুম। তারপর হাটিতে-হাটিতে গেলাম, সেই বাজারের পাশ দিয়ে গোলোকদার বাড়ি।

সেদিনকার মতই বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম।

ভেতর দিকের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে একটা ছোট ছেলের গলা শুনতে পেলুম—ওমা, আবার সেই লোকটা এসেছে—

—কোন লোকটা রে?

ছেলেটা বললে—সেই যে আমাদের বাড়িতে লুচি-মাংস খেয়ে গেল।

তারপর সদর-দরজাটা খুলেই দেখি গোলোকদার স্ত্রী মাথায় ঘোমটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি, আবার কি মনে ক'রে?

বললাম—গোলোকদা বাড়ি এসেছে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—কেন তিনি অফিসে যান নি? আজ তো শনিবার—

বললাম—অফিসে এসেছিলেন, কিন্তু ছুটি হবার আগেই চলে গেছেন। কিন্তু কাল রবিবার হলেও কালকে একবার অফিসে যেতে হবে। এইটে বলতেই আমি এসেছি—

গোলোকদার স্ত্রী বললে—আজ শনিবার, আজকে কি আর বাড়ি আসবে? আজকে নাও আসতে পারেন—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—বাড়ি আসবে না?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—না আসাই সম্ভব।

বললাম—রাত্রিরে তা'হলে কোথায় থাকবে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—রাত্রিরে বাড়ি না আসাই সম্ভব। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন তো বাইরে রাত কাটায়।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। রাত্রে বাড়ির মানুষ বাড়ি আসবে না তো, কোথায় যাবে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—রেসের মাঠে যদি আজ বেশি টাকা জিতে থাকে তো সোজা শ্যামবাজারে চলে যাবে।

—শ্যামবাজারে?

বললাম—শ্যামবাজারে গোলোকদার কে-কে আছে?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—কেন আপনারা জানেন না কিছু?

বললাম—না, আমরা তো কিছুই জানি না। শ্যামবাজারের কথা তো গোলোকদার মুখে কখনও শুনি নি।

গোলোকদার স্ত্রী বললে—না শুনে থাকেন তো আর শুনে কাজ নেই। আপনার দাদা মানুষ নয়, একটা জানোয়ার। কিম্বা জানোয়ারের চেয়েও অধম। এমন মানুষের হাতে পড়েছি, বলেই আমার এই দুর্দশা। এই দেখুন আমার হাত—

বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে। বললেন, কী দেখছেন? হাতে কি আমার সোনার চুড়ি দেখছেন?

আমি দেখলাম, ভদ্রমহিলার হাতে শুধু শাঁখা। গয়না-টয়না কিছু নেই। গোলোকদার স্ত্রী বলতে লাগল, অথচ আমার বাবা আমার বিয়ের সময়ে পাঁচ ভরি সোনার চুড়ি দিয়েছিল, দশ ভরির একটা সোনার হার দিয়েছিল। আরো কত কী দিয়েছিল। রূপোর থালা-গেলাস বাটি দিয়েছিল। বাড়ি বন্ধক রেখে আমার বিয়ে দিয়েছিল, আপনার দাদার সঙ্গে। কিন্তু আপনার দাদা সব উড়িয়ে দিয়েছে রেস খেলে আর...

কথা বলতে-বলতে আমার সামনেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগল—আপনার বড় সাহেবকে গিয়ে আপনি একটু বলতে পারেন না, আপনার দাদার হাতে মাইনেটা না দিয়ে আমার হাতে দিলে তবু ছেলেগুলো একটু খেতে পায়—আপনি বলতে পারেন না—

আমি আর ওর কী জবাব দেব! চুপ করে রইলাম।

তারপর আবার বললেন—জানেন, আজ দু'দিন আমাদের বাড়িতে উনুন জ্বলে নি!

বললাম—তাহ'লে আপনারা কী খাচ্ছেন?

—কিছুই না।

বললাম—কিছুই না মানে, ছেলেদের মুখে তো কিছু দিতে হচ্ছে—

—কী খাচ্ছি দেখবেন? দেখবেন আপনি? তাহলে আসুন—

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি আর কী দেখব?

কিন্তু ততক্ষণে গোলোকদার স্ত্রী আমার হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। বাড়ির ভেতরের দৃশ্য দেখে আমারই চোখ দু'টো ভিজে এলো। এই রকম নির্লজ্জ, দারিদ্র্য আগে কখনও কোথাও কোনও মধ্যবিত্ত সংসারে আমি দেখি নি। অথচ গোলোকদাকে দেখে তো এসব কল্পনা করা যায় না। গোলোকদা তো ফর্সা কোট-প্যান্ট পরে থাকে সব সময়। পায়ের জুতোয় সব সময় পালিশ থাকে। গা গিয়ে অনেক সময় আতরের গন্ধ বেরোয়। গোলোকদাকে দেখে কে বলবে তারই ভেতরে এই দারিদ্র্য? গোলোকদা অফিসের ক্যানটিনে গিয়ে রোজ মাংস-চপ-কাটলেট উড়োয়, অথচ তারই সংসারের এই হাল? আমরা হলে তো উল্টো করি। নিজে না খেয়ে বউ, ছেলে-মেয়েকে আগে খাওয়াই। আমাদের কাছে আগে সংসার, পরে আমরা। অথচ এই ক'দিন আগে তো এই বাড়িতেই লুচি-মাংস খেয়ে গিয়েছি পেট ভরে। সে টাকাই

বা কোথা থেকে এল। কোথা থেকে পটাপট্ টাকা বার করে গয়লার দেনা শোধ করে দিলে?

—এই দেখুন কী খেয়েছি আজ দু'দিন।

বলে গোলোকদার স্ত্রী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালে। দেখলাম, একটা কাঁসিতে ছাতু মাখা রয়েছে। তখনও যেন আমার নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কি ছাতু নাকি?

গোলোকদার স্ত্রী বললে—ছাতু ছাড়া আর কী খাওয়া আছে আমাদের। বাচ্চাদের তো কিছু খাওয়াতে হবে! ওরা তো শুনবে না আমার কথা। কাল দু'বেলা আর আজ দু'বেলা শুধু ছাতু খাইয়েছি ওদের। ছাতু খেয়ে কি ছেলেরা থাকতে পারে? ওরা ভাত খেতে চায়। মাছ খেতে চায়। সে-সব কোথায় পাবো? তার জন্য টাকার দরকার।

বললাম—এ সব কথা তো আমাদের জানা ছিল না। গোলোকদা তা'হলে এত ভালো-ভালো জামা-কাপড় কোট-প্যান্ট কোথা থেকে পায়? গোলোকদাকে দেখে তার সংসারের যে এই হাল, তা-তো বোঝাই যায় না—

গোলোকদার স্ত্রী বললেন—আপনার দাদা কত টাকা মাইনে পায় বলতে পারেন?

আমি বললাম—সব কিছু কেটে নিয়ে হাতে প্রায় সাতশো টাকা।

—কিন্তু আমাকে যে বলেছে মাত্র পাঁচশো টাকা। তা পাঁচশো টাকাই হোক আর দেড়শো টাকাই হোক, আমাকে যদি চারশো টাকাও হাতে দেয় তো, তবু বাচ্চাগুলোর মুখে একটু ভাত দিতে পারি!

বললাম—আপনি এক কাজ করুন, আপনি মাসের পয়লা তারিখে বেলা বারোটার মধ্যে আমাদের অফিসে চলে আসুন। আমি রবিনসন সাহেবকে বলে পুরো মাইনেটা আপনার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবো। আমাদের সাহেব খুব ভালো লোক। অবস্থাটা বোঝালে সাহেব গররাজী হবে না—

গোলোকদার স্ত্রী শুনে বললে—আমি আপনাদের অফিসে যাবো?

বললাম—কেন যেতে দোষ কী?

—ও মানুষটা যদি রাগ করে? এখন তো এমনিতেই বাড়ি আসে না, এর পর যদি একেবারেই না আসে আর?

বললাম—বড় সাহেবকে বলে দেব, সাহেব খুব কষে বকে দেবে গোলোকদাকে।

—কিন্তু শেষকালে যদি আপনার দাদার চাকরি চলে যায়? তখন তো এ কূলও যাবে আর ও-কূলও যাবে!

বললাম—না, আমাদের বেলে কারোর চাকরি যায় না!

গোলোকদার স্ত্রী বললে—আমি আপনাদের অফিসটা চিনি না!

বললাম—আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে তিন নম্বর বাস ধরবেন। সে বাসটা খিদিরপুরে গিয়ে শেষ হবে। সেখান থেকে বারো নম্বর বাস ধরে একেবারে গার্ডেনরিচে গিয়ে পৌঁছে যাবেন। দেখবেন একটা তিনতলা বাড়ি, সেটাই আমাদের অফিস—সেইখানেই নেমে পড়বেন!

—আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে?

—হ্যাঁ, সামনে দেখবেন গুর্খা দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তারা কিছু বলবে না। আপনি সোজা ভেতরে গিয়ে শুধু বলবেন ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট! তা'হলেই সবাই আপনাকে দেখিয়ে দেবে। বারোটার মধ্যে কিন্তু যাবেন। সেই সময়ে আমাদের মাইনেটা দেওয়া হয়—

গোলোকদার স্ত্রী খানিকক্ষণ কী ভাবলে।

তারপর বললে—আচ্ছা, পয়লা তারিখেই আমি যাবো—

এই পর্যন্ত বলে আমি চলে এলুম।

রবিবার দিন স্পেশ্যাল ডিউটি করতে গিয়েছি। বড়বাবু ছিল। জিজ্ঞেস করলে—তুমি একলা যে, গোলোক কোথায় গেল? কাল সন্ধ্যাবেলা তার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসোনি।

বললাম—বাড়িতে থাকলে তো খবর দেবো। গোলোকদা তো বাড়িতে ছিল না।

বড়বাবু বললে—তা'হলে তার বউকে বলে এলে না কেন?

বললাম—গোলোকদা তো বাড়িতে রাত কাটায় না!

বড়বাবু বললে—সে-কী? বাড়িতে রাত কাটায় না তো, কোথায় রাত কাটায়?

বললাম—সে-সব অনেক কথা বড়বাবু, গোলোকদার বউ-এর কাছে যা শুনলুম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে—

—কী-রকম?

বড়বাবুকে সব খুলে বললাম। বড়বাবুও শুনে অবাক্ হয়ে গেল।

বললে—ভালোই করেছো পয়লা তারিখে আসতে বলে। আমি নিজে গিয়ে রবিনসন সাহেবকে বলে দেব। অথচ জামা-কাপড়ের এমন বাহার তো কারো দেখা যায় না! তাই ভাবি মাইনে তো মাত্র সাতশো টাকা, এত বাবুয়ানি কোত্থেকে আসে?

বললাম—আমিও তো তাই ভেবে অবাক হই—

—তো গোলোক মজুমদারের বউ কী বললে?

বললুম—গোলোকদার বউ বললে শ্যামবাজারে কোন্ পোড়ারমুখীর কাছে আছে, সে-ই গোলোকদাকে টাকা জোগায়—

কথা এই পর্যন্ত হল। তারপর আবার কাজ করতে বসে গেলুম।

রবিবারের পর সোমবার গোলোকদা অফিসে এলো।

দেখলুম, সে-কি পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার গোলোকদার। নতুন স্যুট তৈরী করিয়েছে। তখন সস্তা-গণ্ডার দিন—তবু মনে হলো, অন্ততঃ শ'চারেক টাকা দামের স্যুট হবে। দেখে অফিসের আমাদের সবাই-এর চোখ বড় হয়ে গেল। পঞ্চাননবাবু এগিয়ে এল প্রথমে। জিজ্ঞেস করলে—ক'টাকা পড়ল ভাই গোলোক, এই স্যুটটা তৈরী করতে?

গোলোকদা বললে—এই চারশো টাকার মতন—

পঞ্চাননবাবু আবার জিজ্ঞেস করলে—তা হঠাৎ স্যুট তৈরী করলে কেন?

গোলোকদা বললে—এমনি ইচ্ছে হলো।

পঞ্চাননবাবু বললে—ধারে-কিস্তিতে কিনলে না নগদে?

গোলোকদা বললে—ধারে আমি কোনও জিনিস কিনি না, ধারের কারবার আমার নেই, সবই নগদে—

সবাই চলে যাবার পর যেই একটু নিরিবিলি হয়েছে, আমি চুপি-চুপি গোলোকদাকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা গোলোকদা, শনিবার রাত্তিরে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

গোলোকদা আমার কথা শুনে চমকে উঠল। তারপর বললে—কেন, তুই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলি নাকি?

বললাম—হ্যাঁ—

—কেন?

বললাম—বড়বাবু রবিবার অফিসে আসতে বলেছিল, আমাকে আর তোমাকে। শনিবার তুমি সকাল-সকাল বাড়ি চলে গিয়েছিলে। তাই তোমাকে খবরটা দিতে গিয়েছিলুম। তার বদলে বড়বাবু একদিন ছুটি দেবে বলেছিল—

গোলোকদা বললে—আমি তো অফিস থেকে বাড়ি যাই নি—

বললাম—আমি কাউকে বলব না, বলো তো কোথায় গিয়েছিলে? মিথ্যে কথা নয়,

সত্যি কথা বলবে—

গোলোকদা বললে—পরে টিফিন-পিরিয়ডে তোকে সব বলবো—

বললাম—এখুনই বলো না। কে আর আসতে পারে?

গোলোকদা বললে—সে একটা গল্প, এখানে ঠিক বললে সুবিধে হবে না। ক্যানটিনে গিয়ে পরোটা আর মাংসের কারি খেতে-খেতে তোকে সব বলবো—

তা সেদিন সত্যিই আমার খুব আগ্রহ হয়েছিল কী এমন বিচিত্র গল্প যে অফিসে বসে বলা যায় না। সেদিন যেন টিফিন-পিরিয়ড আর হয় না। যখন দেড়টা বাজলো, তখন রবিনসন সাহেব তার কোয়ার্টারে চলে গেলেন খেতে। আমরাও সেই ফাঁকে বাইরে গেলাম।

বিরাট জায়গা নিয়ে বাগানের মধ্যে ছিলো আমাদের অফিসের ক্যানটিন। আমরা সেখানে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসলাম। তারপর গোলোকদা অর্ডার অনুযায়ী দু'খানা পরোটা আর দু'প্লেট মটন-কারি এল।

তারপর গোলোকদা তার গল্প বলতে লাগলো।

গোলোকদা বললে—আগে প্রতিজ্ঞা কর, তুই জীবনে কাউকে বলবি না?

বললাম—বলবো না, কাউকে বলবো না প্রতিজ্ঞা করছি—

—মা কালীর দিব্যি কর।

বললাম—মা কালীর দিব্যি কাউকে বলবো না—

গোলোকদা বললে—দেখ্, তুই জানিস না বোধহয়, আমি ছোটবেলা থেকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতাম। ডন-বৈঠক করতুম, বারবেল ভাঁজতুম। মুগুর ঘোরাতুম। আমাদের পাড়ায় ক্লাব ছিলো। এক্সারসাইজের জন্য আমি তিনবার প্রাইজ পেয়েছিলুম সেখানে। প্যারালাল বারে আমার কেউ জুড়ি ছিল না। আমার মাশল্ এখনও যা আছে তা তুই টিপে নরম করতে পারবি না।

তারপর যখন একটু বয়েস হল আর বাবা মারা গেলেন, বিধবা মাকে নিয়ে আমি একলা পড়ে গেলুম। টাকা উপায় করবার দরকার হল। কোথায় চাকরি পাই? কে টাকা দেয়? আমি পাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে খবরের কাগজে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে রোজ দশটা-বারোটা করে দরখাস্ত করতে লাগলাম। কিন্তু সব জায়গা থেকে জবাব আসতে লাগল—'নো ভ্যাকেন্সি, সারি'।

সেই সময়ে মা'র শরীর খারাপ হয়ে গেল। মা আর নড়তে-চড়তে পারে না। তখন আমার একটা বিয়ে দিয়ে দিলে মা।

বললাম—সেই অবস্থায় তুমি বিয়ে করে বসলে?

গোলোকদা বললে—কী করবো? বা'ড়তে তখন ঘর ঝাট দেওয়া, বাসন মাজা, রান্না-বান্না করবার জন্যে একজন বিনে মাইনের ঝি চাই তো! সেই জন্যেই বিয়ে করলাম। বাংলাদেশের মত এত সস্তায় ঝি তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না! কিন্তু বিয়ে তো করলাম, খাওয়াব কী? বাবা তো ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যায় নি যে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবো আর খাবো!

শেষকালে সকলের দরজায় ঘুরছি একটা তিরিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্যে। কেউ চাকরি দিলে না। কে চাকরি দেবে? ম্যাট্রিক পাশ করা গরীব ছেলের ওপর কেন লোকে দয়া করবে? তাতে তাদের স্বার্থটা কী? যাই হোক শেষকালে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। আশি টাকা মাইনেতে একজন আমাকে একটা কাজ দিলে।

—কী কাজ?

—না, লেখাপড়ার কাজ-টাজ কিছু নয়। শুধু এক বড়লোককে ম্যাসাজ করে দিতে হবে। তা আশিটা টাকা কি তখন কম আমার কাছে? আমি রোজ সকালে গিয়ে এক

ঘণ্টা ধরে ভদ্রলোককে গা দলা-মলা করে দিতুম। তার বদলে মাসে কুড়ি টাকা পেতুম।

সে কুড়িটা টাকা তখন আমার কাছে আশি হাজার টাকার মত।

ভদ্রলোকের স্ট্রোক হয়েছিল। আমি ম্যাসাজ করে দেবার পর থেকে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি খুশী হয়ে বললেন—তুমি আর একজনের কাছে কাজ করবে?

বললাম—তিনি কত দেবেন?

তিনি বললেন—তিনি খুব বড়লোক, তিনি তোমায় একশো টাকা করে মাসে দেবেন। আমার কাজটা সকালে করবে আর সেখানে বিকেলবেলা—

তারপর থেকে তাই সকালে বিকেলে দু'টো কাজ করতে লাগলুম। দু'বেলা মিলে আমার আশি আর একশো মিলে একশো আশি টাকা মাসে মিলতে লাগলো। তখনকার দিনে মাসে একশো আশি টাকা উপায় করাই অনেক টাকা। তখন চালের মণ পনেরো টাকা, দু টাকা পাল্লা আলু, সরষের তেল দু টাকায় এক সের। দোকানে এক কাপ চায়ের দাম দশ পয়সা।

পঁয়তাল্লিশ টাকা মাসে হাতে পেয়ে আমি যেন চাঁদ পেয়ে গেলুম।

ক্রমে ম্যাসাজিং-এ আমার খুব নাম-ডাক বাড়ল। একজন আর একজনকে রেকোমেণ্ড করতে লাগল। সবাই বড়-বড় লোক। কেবল টাকার পাহাড়, কোনও শারীরিক পরিশ্রম নেই, কেবল খায় আর টাকার পাহাড়ের উপর ঘুমোয়, আর সেই রকম লোকের সংখ্যা এখনও যেমন তখনও তেমনি ছিল আর চিরকালই থাকবে।

তেমনি একজন লোক জুটে গেল শ্যামবাজারে। ভদ্রলোকের নাম, নন্দকিশোর দত্ত। সবাই তাকে 'নাদুবাবু' বলে ডাকত। তিনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন।

কী রোগ না তাঁর—ঘুম আসে না। আমাকে রোজ রাত্রে সাড়ে ন'টায় গিয়ে ম্যাসাজ করে তাঁকে ঘুম পাড়াতে হবে।

আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ফরসা মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা। কাপড়ের হোলসেল কারবার করে অনেক টাকা করেছেন, কিন্তু শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। খুব ঘি খান। নড়া-চড়া করতে পারেন না। কেবল গদীতে গিয়ে বসা আর বাড়ি এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া। শরীরে ভীষণ ফ্যাট্ জমে গেছে। দেখলে মনে হবে বুঝি পঞ্চাশ বছর বয়েস, কিন্তু চল্লিশ-একচল্লিশের বেশি নয় বয়েস।

আমাকে নাদুবাবু বললেন—আমাকে বিনা ওষুধে ঘুম পাড়াতে পারবেন?

বললাম—নিশ্চয়ই পারব। যদি আমার কথামত চলেন।

—আপনি কি করেন?

বললাম–আমি এই সবই করি। যাদের বসে-বসে কাজ, তাদের আমি ম্যাসাজ করে দিয়ে ভালো করে দিই—

নাদুবাবু বললে—আমার ব্লাড-প্রেসার আছে, কমিয়ে দিতে পারেন বিনা ওষুধে।

বললাম—কিন্তু একটা কাজ করতে হবে আপনাকে—

—কী কাজ?

বললাম—আপনাকে ঘি খাওয়া ছাড়তে হবে—

নাদুবাবু একটু ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—আমি তো জয়পুর রাজস্থান থেকে খাঁটি ঘি আনিয়ে খাই। কলকাতার বাজারের ভেজাল ঘি তো খাই না।

আমি বললাম—ভেজাল ঘি খাওয়া তবু চলতে পারে, কিন্তু খাঁটি ঘি একেবারে চলবে না। তাতে আরও ফ্যাট্ বাড়বে, আরো ব্লাড প্রেসার বাড়বে। আমি আপনাকে তা'হলে ঘুম পাড়াতে পারবো না। আপনি ঠাকুরকে বলে দিন, যেন আপনার খাবারে আর ঘি না দেয়—

নাদুবাবু ঠাকুরকে আমার সামনেই ডাকালেন। ঠাকুর এলো। নাদুবাবু

বললেন—ঠাকুর দেখো, কাল থেকে আমার রান্নায় ঘি মোটে দেবে না। এই আমার হুকুম—

ঠাকুর তো অবাক। জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে কী দিয়ে রান্না করবো হুজুর?

আমি বললাম—শুধু সেদ্ধ রান্না করবে—

ঠাকুর বললেন—কিন্তু ডালে ঘি না দিলে কি খেতে ভালো লাগবে?

আমি বললাম—সরষের তেল মেশাবে দরকার হলে—

—কিন্তু সে কি খেতে ভালো লাগবে?

বললাম—প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট হবে, কিন্তু পরে সহ্য হয়ে যাবে। তা না হলে আপনাকে ঘুম পাড়াতে পারবো না, এই বলে রাখছি।

তা ঠাকুর তখন রাজী হলো। নাদুবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কত নেবেন আপনি?

—এখন কিছু দিতে হবে না। যেদিন থেকে ঘুম আসবে সেদিন থেকে টাকা দেবেন!

নাদুবাবু বললেন—যদি আমার ঘুম আসে, তা'হলে আপনি যা চাইবেন তাই-ই দেব। আমি রোজ ইনজেকশন নিয়ে তবে ঘুমোতে পারি, তা জানেন?

বললাম—ওতে তো আপনার হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে।

নাদুবাবু বললেন—আমি তো সেই ভয় পেয়েই আপনাকে ডেকেছি। আমি শুনেছি, আপনি অনেককে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন—

আমি ভাই ছোটবেলা থেকে পাড়ার ক্লাবে শরীর-চর্চা করেচি। মুগুর ভেঁজেছি, ডাম্বেল ভেঁজেছি, কুস্তি করেছি। আমার মাশ্‌ল দেখে আমার গুরু পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। শরীরের আমাব কোনও গণ্ডগোল নেই, শুধু অভাব ছিল টাকার। এমন টাকা ছিল না যে বউকে দু'মাসের মধ্যে একটা শাড়ি কিনে দিই—

নাদুবাবুর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন নাদুবাবুর বউ পাশের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে দেখছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির অন্দর মহলের দিকে তাকানো উচিত নয়।

নাদুবাবু ডাকল—ওগো শুনছো!

অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে ডাকলেন। দেখলাম, দরজাটা আরো খানিকটা ফাঁক হল। একজন সুন্দরী মহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বুঝলাম, ইনিই নাদুবাবুর স্ত্রী। নাদুবাবু যে অত মোটা-সোটা, তাঁর স্ত্রী কিন্তু তেমন নয়। বেশ দোহারা চেহারা। গায়ের রং দুধে-আলতা। সমস্ত শরীরটা একেবারে সোনার গয়নায় মোড়া।

কাছে এসে দাঁড়াতেই নাদুবাবু বললেন—এই দেখো, ইনি বলছেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। আজ থেকে আমাকে ওই ডাক্তারের বিলগুলো আর খাইও না। ওই ওষুধ আর রোজ-রোজ ওই পেথেড্রিন ইনজেকশন আর নেব না। দিন-দিন আমার শরীর কেবল ভেঙেই যাচ্ছে। কোনও উপকার হচ্ছে না। ইনি বলছেন, রোজ সাড়ে নটার পর এসে আমার গায়ে ম্যাসাজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।

নাদুবাবুর স্ত্রী বললে—তা ভালোই তো, তাই করো না।

নাদুবাবু বললেন—আর একটা কথা, ইনি বলছেন আমাকে আর ঘি খেতে দিও না। আমি ঠাকুরকে বলেছি, তরকারিতে, ডালে ঘি দেওয়া বন্ধ করে দিতে। যদি দরকার হয়, সর্ষের তেল ব্যবহার করবে—

স্ত্রী বললেন—ঠিক আছে, আমিও ঠাকুরকে মানা করে দেব ঘি দিতে—

নাদুবাবু বললেন—হ্যাঁ, তুমি মানা করে দিও, আর ঘিয়ের টিনটা লুকিয়ে রেখে দেবে। বেটারা আমাকে ঘি খাইয়ে-খাইয়েই মেরে ফেলতে চায়। আমি মরে গেলেই তো বেটারা সব লুটে-পুটে খেতে পারবে—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি কবে থেকে আসছেন?

আমি বললাম—আমি আজ রাত থেকেই আরম্ভ করতে পারি—

—তা আজকেই আমার ঘুম আসবে?

বললাম—দু'তিন দিনের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে—

—আপনি গ্যারাণ্টি দিচ্ছেন?

বললাম—হ্যাঁ, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি—

নাদুবাবু বললেন—তা'হলে ঠিক আছে, আজ রাত থেকেই আরম্ভ করে দিন। রোজ কতক্ষণ ম্যাসাজ করবেন?

বললাম—আপনি রাত ন'টার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে রেডি থাকবেন, আমি কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময়ে এসে যাব।

—কতক্ষণ লাগবে?

বললাম—একঘণ্টা সময় লাগবে। রাত সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা। তারপর আমি বাড়ী চলে যাব! আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে যাবো।

—ঠিক আছে, তা'হলে আপনি এখন যান।

তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—ওগো, ওকে কিছু অ্যাডভান্স দাও—

স্ত্রী বললেন—কত দেবো?

—এই পঞ্চাশ টাকার মতন—

আমি বললাম—না, এখন আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে না। আগে আপনাকে ঘুম পাড়াই তবে আমি অ্যাডভান্স নেব—

*

হঠাৎ পঞ্চাননবাবু এসে বললেন—আরে তোমরা টিফিন-রুমে বসে এতক্ষণ গল্প করছ আর এদিকে যে সাহেব তোমাকে ডাকছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আড়াইটে বাজে। গল্প শুনতে-শুনতে কতক্ষণ যে কেটে গেছে, তার খেয়াল ছিল না। আমি বাকিটা শোনবার জন্য ছটফট্ করতে লাগলুম। গোলোকদা সাহেবের ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসে তাইতেই মনযোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলো। একবার জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হলে গোলোকদা?

গোলোকদা বললে—দাঁড়া-ভাই, এখন সাহেবের কাজটা শেষ করি। শালার পাঁচশিকে রোজের চাকরির মাথায় মারি ঝ্যাটা। এবার চাকরিটা ছেড়ে দেব মাইরি—বলে তাড়াতাড়ি আবার ফাইলের ভেতরে ডুবে গেল।

তার পরদিনও গল্প শোনার সুযোগ হলো না। সাহেবের সেই ফাইলের কাজ তখনও শেষ করতে পারে নি। পর-পর কয়েক দিনই আর গল্প শোনাবার ফুরসৎ হল না।

সেদিন মাইনের তারিখ। সকাল থেকে আমরা সবাই হাঁ করে বসে আছি, কখন পে-ক্লার্ক আসবে। হঠাৎ দেখি গোলোকদার বউ অফিসের মধ্যে এসে হাজির। কে বোধহয় আমাদের সেকশানটা দেখিয়ে দিয়েছে তাকে। অফিসের মধ্যে জীবনেও কখনও ঢোকেনি গোলোকদার বউ। সব দেখে শুনে গেরস্থ মেয়েমানুষ ঘাবড়ে গেছে।

আমাকে দেখে যেন আশার আলো দেখতে পেল।

জিজ্ঞেস করলে—আপনার দাদা কোথায়?

বললাম—ওই যে, ওই চেয়ারে বসে আছে—

দৌড়ে গিয়ে গোলোকদাকে বললাম—গোলোকদা ওই দেখ, তোমার কে এসেছে—

গোলোকদা ফাইল থেকে মুখ তুলে বউকে দেখে অবাক।

জিজ্ঞেস করলেন—তুমি? তুমি এখানে?

বৌদি বললে—আজ তোমাদের মাইনের তারিখ, তাই এলুম। বাচ্চাদের মুখে আমি

কী খেতে দিই বল তো?

গোলোকদা বললে—তা বলে এখানে কেন? আজ রাত্তিরে তো বাড়িতে যেতুম—

গোলোকদার বউ বললে—তুমি ছাই যেতে। তোমার কথা আমি আর বিশ্বাস করি না।

ততক্ষণে সেকশানের সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সকলের মুখেই একই প্রশ্ন—কী হয়েছে? এখানে কি হয়েছে? ইনি কে?

কাশীনাথবাবুও এসে হাজির হলেন। তিনি বড়বাবু।

বললেন—এখানে এত গোলমাল কিসের? ইনি কে?

আমি উত্তর দিলাম। বললাম—ইনি গোলোকদার বউ—

কাশীনাথবাবু বললেন—তা অফিসে কেন?

বললাম—আজকে মাইনের দিন, তাই ইনি এসেছেন গোলোকদার মাইনেটা নিজের হাতে নিতে—

গোলোকদা বড় লজ্জায় পড়ে গেল আমার কথায়। বড়বাবু বললেন—তা গোলোক, তুমি কি তোমার বউকে টাকা দাও না নাকি?

জবাবটা দিলে গোলোকদার বউ। বললে—ইনি মাইনেটা নিয়েই অন্য কোথায় চলে যান, বাড়িমুখো হয় না। আমি বাচ্চাগুলোকে কী খাওয়াই বলুন তো? আপনারা বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মাইনেটা আমার হাতে দেন তো বাচ্চাগুলো একটু খেয়ে-পরে বাঁচে—

বড়বাবু এবার গোলোকদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী হে গোলোক, এ-সব কথা কী শুনছি? তুমি বাড়ীতে টাকা দাও না? কী করো টাকা নিয়ে? রেস খেলে আর মদ খেয়ে উড়িয়ে দাও নাকি?

গোলোকদা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বউ-এর দিকে চেয়ে বললে—তুমি আবার অফিসে আসতে গেলে কেন? আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না? আমি কি মাইনের টাকা অন্য লোককে দিয়ে আসব—

গোলোকদার স্ত্রী বললে—তুমি কি কোনও দিন তোমার মাইনের টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছো? তুমি কি কোনও দিন খেয়াল রেখেছ, আমরা খেতে পাচ্ছি কি খেতে পাচ্ছি না? তুমি ক'টা রাত আমার বাড়িতে কাটিয়েছ?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে গিয়ে ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললে।

কাশীনাথবাবু এবার গোলোকদার সামনে এসে বললেন—তুমি এ-রকম করো কেন বলো তো? তুমি রাত্তিরে কোথায় থাকো? মাইনেগুলো নিয়েই বা কাকে দাও?

গোলোকদা বড় মুশকিলে পড়ল। বললে—আপনারা যা পারেন করুন, আমিও যা ইচ্ছে তাই করব।

বড়বাবু বললেন—তা'হলে আজকে তুমি নিজের হাতে মাইনে নিতে পারবে না—

গোলোকদা বললে—আমার মাইনে আমি আলবাত নেব, দেখি কে—কী করতে পারে, আমার বউ আপনাদের যা কিছু বোঝাবে আর আপনারা তাই-ই বুঝবেন! আমার ফ্যামিলির ব্যাপারে আপনারা কেন সবাই নাক গলাতে আসবেন?

কাশীবাবু বললেন—তা'হলে রবিনসন সাহেবের ঘরে যাচ্ছি তোমার বউকে নিয়ে—

গোলোকদার বউ-এর দিকে চেয়ে বড়বাবু বললেন—চলুন তো আপনি, একবার আমাদের সাহেবের ঘরে চলুন তো?

বড়বাবুর পেছন-পেছন গোলোকদার বউও চলতে লাগল।

পঞ্চাননবাবু বললে—কি হে গোলোক? তোমার কি আবার দুটো সংসার নাকি? তুমি এইরকম ডুবে-ডুবে জল খাও নাকি হে—

অফিসসুদ্ধ লোক তখন গোলোক মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। এমন ঘটনা অফিসে আগে কখনও কেউ দেখেনি। এমন মুখরোচক ঘটনা আগে কেউ কখনো শোনেনি। কারো পর্দানশীন বউ এমন করে অফিসে এসে স্বামীর মাইনের দাবী করেনি।

সাহেব তো সাহেব রবিনসন সাহেব। সব শুনলেন মহিলাটির কথা।

জিজ্ঞেস করলেন—গোলোক রাত্রে বাড়ি যায় না?

বড়বাবু বললেন—ইনি তো বলছেন স্যার—

সাহেব বললে—তা'হলে ডাকো তো গোলোক মজুমদারকে—

চাপরাশি এসে গোলোক মজুমদারকে ডাকল। বললে—সাহেব সেলাম দিয়া—

গোলোকদা গিয়ে হাজির হল সাহেবের ঘরে। বললে—গুড্ মর্নিং স্যার—

—গুড্ মর্নিং। ইজ্ দিস্ ইওর ওয়াইফ্?

গোলোকদা বললে—ইয়েস স্যার—

—ইনি যা বলছেন সব সত্যি? তুমি বাড়িতে মাইনের একটি পয়সাও দাও না?

গোলোকদা বললে.—হ্যাঁ স্যার. দিই—

সাহেব বললে—তা'হলে তোমার ওয়াইফ্ কি বলতে চাও মিথ্যে কথা বলছে! ইজ্ শী টেলিং লাই?

বড়বাবু গোলোকদা'র বউকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—কী. আপনাকে মাইনের টাকা দেয় না আপনার স্বামী?

গোলোকদার বউ বললে—কখনও কখনও গিয়ে বাজার করে দেয়. দুধের দাম দেয়। রেশনের টাকা দেয়—

বড়বাবু আবার ইংরিজীতে সাহেবকে সব অনুবাদ করে শোনালে।

সাহেব বললে—আর রাত্রে কোনও দিন তুমি বাড়ি থাকো না কেন?

গোলোকদা বললে–রাতের বেলায় আমি স্যার অনেক লোককে ম্যাসাজ করি। ম্যাসাজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিই। সেইজন্যে অনেক দিন রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারি না। সেখানেই শুয়ে থাকি—

সাহেব দু'পক্ষের সব কথা শুনলে। শুনে বললে—না. এবার থেকে মাইনেটা গোলোকের বউ-এর হাতে দেওয়া হবে. এই আমার অর্ডার—

গোলোকদার বউ বললে—কিন্তু উনি যদি টাকাগুলো হাত থেকে কেড়ে নেন?

সাহেব বললে—তুমি আমায় এসে কমপ্লেন করবে. আমি গোলোকের চাকরিটা খাবো।

তারপর গোলোক মজুমদারের দিকে চেয়ে বকতে লাগলো।

বললে—তুমি এত বড় পাষণ্ড। তোমার ইনোসেণ্ট ওয়াইফ্‌কে তুমি এত কষ্ট দাও? আমাদের সমাজে যদি হতো. তা'হলে তোমার বউ তোমাকে ডিভোর্স করত. তা জানো? আর তাই-ই নয়. তার খেসারতও দিতে হত—

গোলোক মজুমদার মাথা নীচু করে রইল। সাহেবের মুখের ওপর কোনও কথা বললে না। সাহেব বললে—এবার যাও. সেখানে যাও—

সবাই নিজের সেকশানে চলে এলো। খানিক পরেই পে-ক্লার্ক এসে হাজির। এক-একজনের নাম ডাকা হচ্ছে. আর এক-একজন করে মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। গোলোক মজুমদারের নাম ডাকলে পে-ক্লার্ক।

গোলোকদা মাথা নীচু করে পাতার ঠিক জায়গাতে নাম সই করে মাইনেটা নিতে যাচ্ছিল; বড়বাবু বললেন. উঁহু-উঁহু. ওঁকে নয়—ওকে নয়. ওঁর বউকে টাকাটা দিতে হবে—

বলে গোলোকদার বউকে বললে—আপনি টাকাটা নিন—

গোলোকদার বউ প্রথমে দ্বিধা করছিলো। কিন্তু বড়বাবু বললে—ভয় কী, আপনি নিন মাইনেটা। টাকাটা গুণে নিন—ঠিক দেড়'শো টাকা আছে তো?

গোলোকদার বউ টাকাগুলো গুণে নিয়ে মাথা নেড়ে টাকাটা নিল—

বড়বাবু বললেন—যান, এইবার বাড়ি চলে যান। যদি গোলোক মজুমদার আপনার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয় তো আপনি অফিসে আমাকে বলবেন, আমি আপনাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবো। সাহেব গোলোকের চাকরি খেয়ে নেবে—

গোলোকের বউ বললে—আপনারা একটু বলে দেবেন, যেন উনি রাত্রিরে বাড়ি থাকেন। দিনের বেলায় যেখানে খুশী থাকুন রাত্রিরে যেন বাড়িতে আসেন। আর যেন রেস্ না খেলেন—

বড়বাবু বলে দিলেন—সাহেবকে আমি সব বলে দেবো, সাহেব সব ঠিক করে দেবে। সাহেব আমাদের খুব ভালো লোক। রাত্রিরে বাড়িতে না থাকলে গোলোকের চাকরি খেয়ে নেবে সাহেব—

গোলোকদার বউ ভয় পেয়ে গেল।

বললে—ওঁর চাকরি খাবেন না। চাকরি খেলে আমরা খাবো কি?

সেদিন মাইনেটা নিয়ে গোলোকদার বউ বাড়ি চলে গেলো।

আবার অফিসে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। তবে মাইনের দিনে অফিসে টিফিন-রুমে যেমন ভীড় বাড়ে, তেমনি অফিসের কাজ করবার দিকে তেমনি মন থাকে না কারো।

আমি এক ফাঁকে বললাম—তা'হলে তোমার কি হবে গোলোকদা? মাইনেটা তো হাতে পেলে না—

গোলোকদা বললো—মাইনে না পেলুম তো বয়েই গেল।

—সারা মাস তোমার চলবে কী করে?

গোলোকদা বললে—নাদুবাবুর কল্যাণে আমার কি টাকার অভাব আছেরে! এই দেখ! আমার কত টাকা—বলে পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করে তার ভেতর থেকে একগোছা নোট বার করলো। বললে—এই দেখ, আমার কত টাকা আছে—

আমি দেখলাম, এক গাদা নোট।

গোলোকদা বললে—প্রায় পাঁচশো হবে—

জিজ্ঞেস করলাম—এত টাকা কোথা থেকে পেলে—

গোলোকদা বললে—নাদুবাবুর স্ত্রী দিয়েছে—

—নাদুবাবুর স্ত্রী? তা এত টাকা তোমাকে দিয়েছেন কেন?

গোলোকদা বললো—আমি যে নাদুবাবুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি—

বললাম—তা এত টাকা? মাসে হাজার টাকা দেয় তোমাকে?

গোলোকদা বললে—মাইনে তো একশো টাকা মাত্র, কিন্তু নাদুবাবুর বউ আমার ওপর খুশী হয়ে যা চাই, তাই দেয় আমাকে—

আমি তো অবাক। বললাম—কেন?

গোলোকদা বললে—নাদুবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তো নাদুবাবুর বউ-এরই সুবিধে—

—কেন? নাদুবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তার বউ-এর সুবিধে কেন?

গোলোকদা বললে—আছে আছে, সে সব অনেক কথা। তোকে অন্য একদিন বলবো সে-কথা?

জিজ্ঞেস করলাম—আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে বউদির সঙ্গে খুব ঝগড়া করবে তো?

গোলোকদা বললে—আজ রাত্তিরে তো বাড়ি যাবো না।

বললাম—আজ রাত্তিরে বাড়ি যাবে না তো শোবে কোথায়, খাবে কোথায়?

গোলোকদা বললে—নাদুবাবুর বাড়িতেই খাব আর নাদুবাবুর বাড়িতেই শোব—

কথাগুলো বলে গোলোকদা এক রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলো।

আমার কৌতূহল বেড়ে গেল গোলোকদার রহস্যময় হাসি দেখে।

বললাম—অফিসের পর তোমার বাকী গল্পটা শুনবো গোলোকদা—

গোলোকদা বললে—আজকে সময় হবে না রে, আজকে অফিসের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে হবে। খুব তাড়া আছে—

—কীসের তাড়া তোমার এত?

গোলোকদা বললে—নাদুবাবুর বউকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে হবে—

আশ্চর্য! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম গোলোকদার কথা শুনে। অত বড়লোকের বউ গোলোকদার সঙ্গে সিনেমায় যাবে?

আমি বললাম—তুমি যখন এত টাকা পাও, তখন আবার চাকরি করছো কেন? চাকরি না করলেই হয় তোমার!

গোলোকদা বললে—দেখ, ও-চাকরি কবে আছে, কবে নেই। নাদুবাবু যদি কোনও দিন জেনে যায় তো আমাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এ হচ্ছে গভর্মেন্টের চাকরি, এর মার নেই। এর পেনসন আছে, গ্র্যাচুইটি আছে। ফ্রি পাশ আছে। এ আমার সিঁথিব সিঁদুর, এ আমার লক্ষ্মী! এটা কি ছাড়তে আছে?

আমি বললাম—নাদুবাবুর বউ দেখতে কেমন?

গোলোকদা বললে—খুব সুন্দরী। খুব সুন্দরী তো বটেই, তার ওপর ছেলে-মেয়ে নেই বলে খুব আঁট-সাঁট শরীর।

—তা তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে কেন? আর কেউ নেই?

গোলকদা বললে—আর কে থাকবে? কেবল চাকর-ঝি এই সব। তাদের সঙ্গে তো সিনেমা যেতে পারে না। একজন বিশ্বাসী পুরুষ মানুষ তো চাই—

বললাম—তুমি যে নাদুবাবুর বউকে নিয়ে সিনেমায় যাও, তা নাদুবাবু জানে?

গোলকদা বললে—তা জানবে না? নাদুবাবু তো একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করে। আমি ছাড়া কাউকে বিশ্বাসই করে না—

—কেন?

গোলোকদা বললে—আমি আছি বলে তো নাদুবাবু এখনো বেঁচে আছে। আমি যাবার আগে কত ওষুধ খেয়েছে, কত ইঞ্জেকসানও নিয়ে তবে ঘুমোতে পেরেছে। এখন ওষুধও খেতে হয় না, ইঞ্জেকসানও দিতে হয় না। এখন অনেক টাকা বেঁচে গেছে। বলতে গেলে আমি তাঁকে পুনর্জীবন দিয়েছি হে। তাই আমার ওপর খুব কৃতজ্ঞ। তাই আমাকে ছাড়তে চায় না মোটে। এই অফিস থেকে আমি সোজা চলে যাব সেখানে। তারপর সিনেমা দেখে যখন বাড়ি ফিরবো তখন আমরা তিন জনে এক সঙ্গে খেতে বসবো। আমার জন্যে রোজ মুরগী আসবে বাড়িতে। আমার যাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে সেদিকে নাদুবাবুর নজর।

—তারপর?

—তারপর সাড়ে ন'টার পর নাদুবাবু বিছানায় গিয়ে শোবে। আমি তখন তাঁর ম্যাসাজিং শুরু করবো। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ম্যাসাজিং করলে তার ঘুম আসবে। ঘুম আসবার আগে আমাকে বলবে—তুমি আজ আর এত রাত্তিরে বাড়ি যেও না গোলক, তুমি এখানেই শুয়ে থাকো আজ। নইলে তোমায় অত দূর যেতে হবে—

ততদিন গোলকদা বাড়ির গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে। এক সঙ্গে সিনেমা দেখা, এক সঙ্গে খাওয়া, আর এক সঙ্গে—

নাদুবাবু নিজের স্ত্রীকে বলতো—ওকে একটু ভালো করে পেট ভরে খাওয়াবে—

নাদুবাবুর স্ত্রীকে বলতে হতো না। আগে বলতে গেলে বাড়িতে খাবার লোকই ছিল

না। মাত্র তো দুটি প্রাণী! কর্তা আর গিন্নি। নন্দকিশোর চিরকালের রোগী মানুষ। বেশী খেলে পেটে সহ্য হয় না। একলা স্ত্রী আর কত খাবে? তাই জন্যেই রান্না-টান্নার বেশি বালাই ছিল না।

গোলোকদা যাবার পর থেকেই নাদুবাবুর সংসার আবার জম-জমাট হয়ে উঠলো। বিশেষ করে স্ত্রী'র অন্ততঃ একটা কথা বলার লোক হলো। অন্য দিন ভাত-টাত খেয়ে অফিসে চলে যেত গোলোকদা, ন'টা সাড়ে ন'টার সময় ভাত তৈরী করে দিতো ঠাকুর।

সেই ভাত খেয়ে অফিসে দৌড়তো গোলকদা।

যাবার সময় বৌদি বলতো—আজকে একটু সকাল-সকাল আসবে তুমি, একটা সিনেমা দেখতে যাবো—

গোলোকদা বলত—আমি কেন, দাদাকে নিয়ে সিনেমায় যাও না—

নাদুবাবু বলত—না-না, আমি সিনেমায় যাব না, আমার ওসব সিনেমা টিনেমা দেখতে ভালো লাগে না। তুমিই বরং যাও তোমার বৌদিকে নিয়ে—

আর শুধু কি তাই! কাপড়-চোপড় কেনার কাজ থাকে মানুষের। সঙ্গে কে যাবে? ওই গোলোক। গোলোক মজুমদার আছে! কালীঘাটে পূজা দিতে যাবে। সঙ্গে কে যাবে? ওই গোলোক মজুমদার আছে!

একদিন নাদুবাবুর বোধহয় লক্ষ্য পড়ল। বললে—আরে গোলোক, তোমার-সার্ট-প্যান্টের এ কী দশা হয়েছে?

গোলোকদা বললে—কী করবো দাদা, সার্ট-প্যাণ্ট কেনবার পয়সা কোথায়?

নাদুবাবু অবাক হয়ে গেল। বললে—সেকি? তোমার পয়সা না থাকে, আমার পয়সা আছে, তোমার বৌদিকে নিয়ে যাও তুমি, নতুন সার্ট-প্যান্টের অর্ডার দিয়ে এসো—

খাওয়া-পড়াব সমস্ত রকম ঢালোয়া বন্দোবস্ত হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এসেছিল গা-হাত-পা টিপে দিতে, আর কর্তার ঘুম পাড়িয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত কর্তার ঘুম এসে গেল আর গোলোকদা হয়ে গেল বাড়ির ম্যানেজার, আবার বাড়ির মালিক। বাড়ির মালিকের চেয়েও বেশি ক্ষমতা গোলোক মজুমদারের। বাড়ির চাকর-বাকর-ঝি ঠাকুর সবাই হুকুম পালন করতো গোলোকদার।

ঠাকুর যখন গিন্নিকে জিজ্ঞেস করতো—আজ কী রান্না হবে মা?

গিন্নি বলত—আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন জিজ্ঞেস করো ম্যানেজারকে—

ম্যানেজারবাবু মানে গোলোক-দাকে।

এক-একদিন সময় পেলেই গোলোকদা চাকরদের নিয়ে বাজারে যেতো মুরগী-মাছ-আলু-পটল যাবতীয় তরি-তরকারি কিনে আনত গোলোকদা। নাদুবাবু খেয়ে খুব খুশী। বলতো আজকে তো ভালো রান্না করেছে ঠাকুর—

গিন্নি বলতো—ভালো রান্না না ছাই। কে বাজার করেছে তাই জিজ্ঞেস করো—

নাদুবাবু বললে—কে বাজার করেছে?

—তোমার গোলোক!

—তাই বলো। এবার থেকে রোজ বাজার করবে গোলোক—

অফিস থেকে ফেরবার পর নাদুবাবু গোলোক মজুমদারকে ডাকল। বললে—এবার থেকে রোজ তুমি বাজার করবে, বুঝলে? বেটারা সব চোর। আমার টাকায় খাবে, আবার আমার নেমকহারামিও করবে।

*

সেই থেকে গোলোকদার অন্য সংসার, অন্য জীবন। তখন থেকে নাদুবাবুর সংসারটাই হলো গোলোকদার সংসার। নিজের সংসার দেখার আর সময় পেত না। ওই তখনই

নিজের ছেলে-বউ সব পর হয়ে গেল। এই সময়েই গোলোকদা মাঝে-মাঝে বলা-নেই, কওয়া-নেই অফিস কামাই করতে লাগলো।

সেই-ই আমি প্রথম গোলোকদার বাড়ি গিয়ে শুনতে পেলাম গোলোকদা নিজের বাড়ি আসে না। শ্যামবাজারে পড়ে থাকে দিন-রাত। সেই প্রথম জানতে পারলুম কে গোলোকদার স্যুট তৈরি করবার টাকা দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

গোলোকদা বললে—তোকে সব কথা বলছি, যেন কাউকে বলিসনি—

বললাম—না, কাউকে বলব না—

গোলোকদা বললে, না বলিস নি। আমার জীবন ভাই এক অদ্ভুত জীবন। সবাই যেমন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করে, তা আমার কপালে নেই। কারণ, ওই নাদুবাবুর বউ। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই, স্ত্রী হয়েও তার ছেলেমেয়ে নেই। বলতে গেলে আমি একেবারে হয়ে গেলাম তার সব কিছু। এ যে কী করতে কী সব হয়ে গেল, তা আমি নিজেও কল্পনা করতে পারি না। অথচ আমার স্ত্রী তো কোনও অন্যায় করেনি, আমার ছেলে থাকতেও তাদের ওপর আমি বাপের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। মাঝে মাঝে তাদের জন্যে আমার খুবই কষ্ট হয় ভাই, কিন্তু আমি কী করবো বল? আমি শ্যামবাজারের নাদুবাবুর বাড়িতে না থাকলে যে ওদের কিছুই চলে না। ওদের বাড়িতে সব কাজেই আমাকে চাই। রেণু বৌদি আমাকে কিছুতেই রাতে বাড়ি আসতে দেবে না।

আমি বললাম—রেণু বৌদি? রেণু কার নাম?

গোলোকদা বললে—ওই নাদুবাবুর বউয়ের নাম রেণু। আমি ডাকতুম রেণু বৌদি বলে। তা অতবড় বাড়ি। আমি ও বাড়িতে যাবার আগে বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতো, আমি যাবার পর থেকে বাড়ির চেহারাই বদলে গেল।

রেণু বউদি বলতো—তুই আসার আগে এ-বাড়িতে আমার মন টিঁকতো না। এখন যতক্ষণ তুমি অফিসে থাকো, ততক্ষণ আমার খারাপ লাগে। অফিসের পর তুমি বাড়ি এলে আমার আবার সব ভালো লাগতে আরম্ভ করে। তুমি এবার ও-চাকরি ছেড়ে দাও। মাইনে তো মাত্র সাতশো টাকা পাও, ও-চাকরি করে তোমার কী লাভ?

আমি বলতাম—চাকরিটা না থাকলে আমার বউ আর ছেলেরা কী খাবে? বাড়ি-ভাড়া আছে, ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে আছে। আমার বউ এসে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে অফিস থেকে মাইনেটা নিয়ে যায়। সাহেব সেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম—তা বউ ছেলেদের তুমি শ্যামবাজারে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে পারো, তাতে বাড়ি ভাড়াও লাগবে না, আলগা খাই-খরচও লাগবে না—

গোলোকদা বললে—না ভাই, তা করা সম্ভব নয়—

বললাম—তোমার ওপর তোমার বউ-এরও তো একটা দাবী আছে—

গোলোক বললে— না, মেয়েরা আর সব সহ্য করতে পারে, সতীন কিছুতেই সহ্য করবে না। শ্যামবাজারের নাদুবাবুর অনেক টাকা। টাকাটা আমার কাছে বড় না বউ বড়, বল?

আমি আর কী বলবো? গোলোকদা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে! আমার কথা শুনবে কেন?

গোলোকদা বলতে লাগলো—সেখানে আমার কত খাতির তা জানিস? আমি মাংস খেতে ভালোবাসি, তাই আমার জন্য রোজ মাংস আসে। আমার ভাড়াটে বাড়িও তো দেখেছিস, চারদিকে বস্তি, বাজারের দুর্গন্ধ। আর শ্যামবাজারের সে বাড়ি, সে কী আরামের জায়গা। সে কী গদীওয়ালা বিছানা, সেখানে শুতে যে কী আরাম। সেখানকার ওই আরাম ছেড়ে আমি আমার ওই বস্তির বাড়িতে কী করে থাকি বল? আমাকে তো নাদুবাবু ছাড়তে চায় না। রেণু বৌদি আমাকে বলে—তুমি চলে যেও না গোলোক, তুমি

চলে গেলেই আবার যদি কর্তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তখন ?

আমি বললাম—কিন্তু তুমি তো তাহলে খুব স্বার্থপর গোলোকদা—

গোলোকদা বললে—আমাকে স্বার্থপর বলছিস তুই ? ধর, নাদুবাবুর তো ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, যদি এখন নাদুবাবু মারা যায়। তখন তো ওই সব সম্পত্তি আমি পাবো ! নাদুবাবু তো রোগী মানুষ, কতদিনই বা আর বাঁচবে। সারা জীবন বড়বাজারে গদিতে বসে শরীরটাকে ভেঙেছে ! নাদুবাবু মারা গেলে তখন তো রেণু বউদির আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন সেই টাকা দিয়ে আমি ছেলেদের মানুষ করবো। তারা টাকার অভাবেই তো অত কষ্ট করছে, তখন আর সে-কষ্ট করতে হবে না—

আমি বললাম—নাদুবাবুর তো এখন ঘুম হচ্ছে, এখন তো তাড়াতাড়ি আর মরছে না—

গোলোকদা বললে—তাড়াতাড়ি না-ই বা মরলো। কিন্তু বয়েস তো হয়েছে। রেণু বউদির সঙ্গে নাদুবাবুর কুড়ি বছর বয়সের তফাৎ। নাদুবাবু তো রাত সাড়ে দশটা বাজতে না-বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমি যদি না থাকি, তো রেণু বউদির রাত কী করে কাটতো ?

গোলোকদার কথা শুনে আমার অবাক লাগলো। জীবনে কত রকম চরিত্র দেখেছি। কিন্তু এ-রকম চরিত্র আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। তারপর থেকে প্রতি মাসে গোলোকদার বউ এসে গোলোকদার মাইনেটা নিয়ে যেত। কিন্তু তাতে গোলোকদার কোনও অসুবিধা হতো না। দিন-দিন ভালো-ভালো সার্ট-প্যান্ট পরে অফিসে আসতো গোলোকদা। টিফিন রুমে গিয়ে আমাকে মাংস খাওয়াতো, চপ কাটলেট খাওয়াতো।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—আচ্ছা গোলোকদা, তোমার রেণু বউদি যে তোমাকে এত টাকা দেয়, তা নাদুবাবু জানে ?

গোলোকদা আমার প্রশ্ন শুনে হাসতো।

বলতো—না, নাদুবাবু কিছুই জানতে পারে না। নাদুবাবুর সব টাকা তো রেণু বউদির হাতে থাকে কিনা। আমি যত টাকা চাইবো, তত টাকা দেবে। আমার কোনও টাকার অভাব নেই। এই দেখ-বলে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে আমাকে খুলে দেখাতো।

বলতো—এই দেখ, গুণে দেখ, কত টাকা আছে—

আমি দেখতাম। কখনও দেখেছি তিনশো টাকা, কখনো দেড়'শো, আবার কখনও হাজার টাকাও রয়েছে। দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। বলতাম—এত টাকা যখন পাচ্ছো, তখন আর কেন মিছিমিছি চাকরি করছো ? চাকরি ছেড়ে দিলেই তো পারো—

গোলোকদা বলতো—দূর, সেই ভুল কখনও করতে আছে ? চাকরি হলো লক্ষ্মী ! আর এ-টাকাগুলো হচ্ছে ফাউ। এ কবে আছে, কবে নেই। নাদুবাবু যদি কখনও জানতে পারে, তখন তো আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে—

—কী জানতে পারবে ? তুমি তো কোনও অন্যায় করো না—

গোলোকদা বলতো—আমি যে রেণু বউদির সঙ্গে এক বিছানায় শুই, এটা তো জানতে পারে না। নাদুবাবু তো তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় !

আমি আর কী বলবো ! এ-কথা শোনবার পর আর কিছু বলবার থাকতো না।

এ জীবনে কোটিপতির সঙ্গে মিশেছি, আবার ভিখিরীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়েছে আমাকে। তাদের অনেকের কথা নিয়ে অনেক গল্প উপন্যাস লিখেছি। রাজা-জমিদার-নবাব নিয়ে যখন অনেক লিখেছি, আবার গুণ্ডা-মাতাল-চোরদের নিয়েও অনেক লিখতে হয়েছে।

কিন্তু গোলোকদার মত চরিত্র নিয়ে আগে কখনও লেখবার অবকাশ আমার হয় নি। এবার পুরীর 'মাসিমার হোটেলে' না উঠলে আজ গোলোকদার কথা হয়তো লিখতুমও না।

মনে আছে, হঠাৎ একদিন গোলোকদা চাকরি ছেড়ে দিলো। দেখে আমাদের

অফিসসুদ্ধু লোক সবাই অবাক হয়ে গেলো। বাঙালীর ছেলে হয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়া একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। অফিসে শেষ দিনটায় আমাকে আড়ালে ডাকলে গোলোকদা।

আমি বললাম—চাকরিটা ছাড়তে গেলে কেন গোলোকদা? বেশ তো চলছিলো। এই রকম করে বরাবর চালিয়ে যেতে পারতে।

গোলোকদা তার শ্যামবাজারের ঠিকানাটা আমাকে দিলো।

আমি আমার নোট বইতে সেটা লিখে রেখে দিলাম।

বললে—তুই সময় পেলে যদি এই ঠিকানায় যাস্ তো আমার সঙ্গে দেখা করিস, তোকে আমি সব বলবো।

বললাম—ঠিক আছে। গোলোকদাকে সবাই সেদিন বিদায় দিলো। সবাই জানতো গোলোকদার চরিত্র, কেউ-কেউ নিন্দা করতে লাগল গোলোকদাকে, কেউ-কেউ আবার হিংসে করতেও লাগলো। পঞ্চাননবাবু বললেন, আমাদের কপালে এ-রকম একজন মেয়ে মানুষ জোটে না রে, কী মন্দ কপাল নিয়ে আমরা জন্মেছি—

গোলোক মজুমদারের ভাগ্য দেখে অফিসসুদ্ধু লোক হিংসে করতে লাগলো। কিন্তু লোক আবার 'ছি-ছি' ও করতে লাগল। কোথায় সাতশো টাকা মাইনের একজন কেরাণী, আর কোথায় একেবারে লক্ষপতি মানুষের প্রিয়পাত্র। তখনকার দিনে লক্ষপতি মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে খুঁজলে একজন দু'জন লক্ষপতি পাওয়া যেতো।

সেই রকম একজন লক্ষপতি মানুষের প্রিয়পাত্র হতে পেরেছে গোলোক মজুমদার, এটাতে হিংসে হওয়া স্বাভাবিক। হোক না সে লোকটা চরিত্রহীন, হোক না সে লোক নিজের সংসার দেখে না, কিন্তু তার নিজের তো ষোল আনা আরাম। নন্দকিশোর দত্ত'র ছেলে-মেয়ে কিছু নেই। ছেলেমেয়ে থাকলে বা একটা কথা ছিল। তার ওপর নাদুবাবুর অসুখ সারিয়েছে, তাতে একটা কৃতজ্ঞতাবোধ তো থাকবেই। সেই কারণেই ও-বাড়িতে তার এত্তো খাতির, এতো প্রতিপত্তি! এ রকম ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?

কাশীনাথবাবু বুড়ো মানুষ, গোলোক মজুমদার চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে তিনিও যেন কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন খানিকক্ষণের জন্যে। বললেন—গোল্লায় যাবে গোলোকটা, দেখে নিও তোমরা, ও ঠিক গোল্লায় যাবে। পাপ ওর কপালে সইবে না। ওর ছেলে-বউ উপোস করে মরবে এবার, তাদের অভিশাপ লাগবে না মনে করেছো—

আমার নিজের একটু অসুবিধে হলো গোলোকদা চলে যাওয়াতে। গোলোকদার সঙ্গেই আমিই যা কিছু গল্প-টল্প করতাম। টিফিন রুমে নিয়ে গোলোকদাই আমাকে খাওয়াতো। নইলে নিজের জীবনের গোপনীয় কথাগুলো আমাকেই বা বলতো কেন?

এর পর একদিন রবিবারে শ্যামবাজারের দিকে গিয়েছিলাম। তাও অনেকদিন পরে। ঠিকানা খুঁজে গেলাম সেই নন্দকিশোর দত্তের বাড়িতে। ভাবলুম, যদি দেখা পাই গোলোকদার। বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়াতেই কে একজন এসে দরজা খুলে দিলো।

জিজ্ঞেস করলাম—গোলোক মজুমদারবাবু বাড়িতে আছেন?

লোকটা জিজ্ঞেস করলো—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম—গিয়ে বলো গে যাও, বি-এন-আর অফিস থেকে মিত্তির এসেছে, ওই বললেই তিনি আমাকে চিনতে পারবেন—

লোকটা ভেতরে খবরটা দিতে চলে গেলো।

আর খানিক পরেই দৌড়তে দৌড়তে গোলোকদা নিজে এসে হাজির। এসেই আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আমাকে টানতে-টানতে ভেতরে নিয়ে চললো। চলতে-চলতে আমাকে বলতে লাগলো—এখনও তোর মনে আছে আমাকে?

বললাম—মনে থাকবে না? তোমাকে কি ভুলতে পারি? তুমি কত খাইয়েছো আমাকে। কত চপ-কাপলেট খাইয়েছো আমাকে—

গোলোকদা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। খুব সাজানো ঘরটা। চারিদিকে সোফা-সেট, গদি দেওয়া ডিভান।

গোলোকদা বললো—কত বছর পরে তুই এলি? এখন কোথায় কাজ করছিস্?

বললাম—সেই একই চেয়ারে আর একই টেবিলে—

গোলোকদা জিজ্ঞেস করলো—আর বড়বাবু, সেই কাশীনাথবাবু?

—তিনি তো রিটায়ার করে গেছেন, তার জায়গায় বসেছেন পঞ্চাননবাবু—

—আর রবিনসন সাহেব?

—রবিনসন সাহেব বিলেত চলে গেছে, তার জায়গায় এখন কাজ করছেন বি, কে মজুমদার সাহেব।

তারপর সকলের খোঁজ-খবর নেবার পর বললাম—এইবার বলো, তুমি কেমন আছো?

—আমি ভালোই আছি।

জিজ্ঞেস করলাম, আর তোমার সেই নন্দকিশোর দত্ত? নাদুবাবু?

গোলোকদা বললো—নাদুবাবু তো এক বছর হলো মারা গেছে—

বললাম—সে-কী? তুমি এত চেষ্টা করে তাঁর ঘুম পাড়িয়ে দিতে তবু কী অসুখ হলো শেষকালে?

গোলোক বললো—কী আবার হবে কিছুই হয়নি। হঠাৎ-হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করলুম। অনেক লোক খাইয়েছি। প্রায় দেড় হাজার লোক নিয়ম-ভঙ্গের দিন খেয়ে গেছে—

—আর তোমার সেই বউদি?

—বউদি সেই রকমই আছে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—সারাদিন তুমি সময় কাটাও কী করে।

গোলোকদা বললো—মামলা!

—মামলা? কার সঙ্গে মামলা—কী নিয়ে মামলা?

গোলোকদা বললো—জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা। তারা সব দূর সম্পর্কে আত্মীয়। তারা হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দিয়েছে; আমি সারাদিন কোর্টে গিয়ে উকিল-অ্যাটর্নী-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে দেখা-শোনা করি। তদবির-তদারক না করলে কি মামলায় জেতা যায়? মামলার আসল কাজই তো তদবির—

জিজ্ঞেস করলাম—আর তোমার বউ আর ছেলেরা?

গোলোকদা বললো—আমি বউকে ডাইভোর্স করে দিয়েছি, আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে—

আমি চমকে উঠেছি খবরটা শুনে। বললাম—সে-কী? কেন?

গোলোকদা বললো—ডাইভোর্স না করে যে উপায় ছিলো না।

—কেন?

গোলোকদা বললো—উকিল-ব্যারিস্টাররা যে আমাকে বললো, ডাইভোর্স করতে। না-হলে তো সেই যে রেণু বউদির কথা বলেছিলুম, তাকে তো বিয়ে করতে পারতুম না—

গোলোকদার কথায় আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—

বললাম—তুমি রেণু বউদিকে বিয়ে করেছ নাকি?

গোলোকদা বললো—না করে যে উপায় ছিলো না। উকিল-ব্যারিস্টাররা আমাকে সেইরকম উপদেশ দিলো যে! তা-না করলে বিধবার সম্পত্তি সব সাত ভূতে লুটে-পুটে

খাবে যে!

—তুমি তা'হলে এখন এই বাড়ির মালিক?

গোলোকদা বললো—সেই জোরেই তো এই মামলা লড়ছি, নইলে জ্ঞাতিরা সব লুট-পাট করে এতোদিনে নিয়ে নিতো।

বললাম—তাহ'লে তোমার আগেকার বউ-ছেলেরা কী করছে? তাদের অবস্থা কেমন? তারা কী করে চালাচ্ছে।

গোলোকদা বললো—তারা আরামেই আছে। আমি তাদের হাজার টাকা করে মাসোহারা দিই খোর-পোশ হিসেবে। তাদের কোনও অভাব রাখিনি আমি।

বলতে-বলতে ভেতর থেকে আমার জন্যে জল-খাবার এলো। বড় বড় রাজভোগ চারটে আর তার সঙ্গে দু'টো কাটলেট আর চা এক কাপ।

আমি ইতস্তত করে বললাম আবার এ-সব খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলে কেন?

গোলোকদা বললো—ফোকটের খাবার খেয়ে নে-না। এ-কি আমার নিজের উপায় করা টাকা? এ-তো আমি সব ফোকটে পেয়েছি। আমি যদি এবাড়িতে না-থাকতুম, তা'হলে তো নাদুবাবুর জ্ঞাতি-গুষ্টিরাই তো সব একা-একা ভোগ করতো!

বললাম—কতদিন এ মামলা চলবে?

গোলোকদা বললো—অনন্তকাল ধরে। হাইকোর্টের সিভিল মামলা কি অল্প দিনে মেটে? এ মামলা অনাদিকাল ধরে চলবে!

আমি সব শুনে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, গোলোকদার কী বিচিত্র ভাগ্য। ছিলো রেলের সামান্য একজন কেরাণী, সেই মানুষ হয়ে গেলো লাখপতি। সঙ্গে আবার পরের বউও পেলে।

সেদিন আর বেশিক্ষণ বসিনি সেখানে। বেলা হয়ে যাচ্ছিল। আমি উঠে পড়লাম।

আসবার সময় গোলোকদা বললো—আবার আসিস একদিন। ছুটির দিন দেখে আসবি, তা'হলে আমাকে পাবি। অন্য দিন আমাকে হাইকোর্টে যেতে হয়। এখন হাইকোর্টকেই আমি আমার ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছি।

আর দাঁড়াই নি সেখানে। সারা রাস্তাটা বাসে আসতে-আসতে আমার কেবল গোলোকদার কথা মনে পড়ছিল।

সত্যিই, মানুষের ভাগ্য কাকে যে কখন কোন দিকে নিয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। নিজের বউ ছেলেরা পড়ে রইলো, আর কী অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে কত টাকার মালিক হয়ে বসলো। গোলোকদার চেহারাটা পর্যন্ত বদলে গেছে। আগে রোগা-রোগা চেহারা ছিল, এখন ঘি-মাছ-মাংস খেয়ে খেয়ে কত মোটা হয়ে গিয়েছে।

এরপর আর বহুদিন শ্যামবাজারের দিকে যেতে পারি নি। আর তখন আমার নিজেরও অনেক সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।

সেবার কী একটা কারণে আমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম—যাই, একবার গোলোকদার সঙ্গে দেখা করে যাই। সেটা ছুটির দিন। ছুটির দিনে কোর্ট খোলা থাকে না, সুতরাং গোলোকদা নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবে। আবার সেই আগেকার মতো চারটে রাজভোগ, আর দু'টো কাটলেট আর চা আসবে।

গোলোকদার বাড়িতে যাবার রাস্তায় ভাবছিলাম—কী ভাগ্য সঙ্গে আবার সুন্দরী বউ। এ আবার ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে উত্তর এলো—কে?

—আমি গোলোক মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দরজাটা খুলে গেলো। দেখি, একজন বাড়ির কর্মচারী। আমার দিকে চেয়ে বলল—কে আপনি?

আমি বললাম—বলো আমি বি. এন. আর. অফিসে চাকরি করি, মিস্ত্রির।

কর্মচারীটি বললে—তিনি তো নেই—

—নেই মানে? কোর্টে গিয়েছেন বুঝি? আজ তো কোর্ট বন্ধ।

লোকটি বললেন—না, তিনি মারা গেছেন—

আমি হতবাক হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। জিজ্ঞেস করলাম, কবে মারা গেছেন—

লোকটি বললে—এই দিন পনেরো আগে—

—কী হয়েছিল তার?

লোকটি বললেন—তিনি কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, একদিন পরেই তিনি সেখানে মারা যান।

*

এর পরের ঘটনা সামান্য। পৃথিবীতে কত মানুষের জন্ম হয় প্রতিদিন! আবার প্রতিদিন কত মানুষের মৃত্যু হয়, তা নিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মনে আছে, গোলোকদার এই অপঘাত-মৃত্যু আমাকে বড়ই বিচলিত করেছিল। তাই নিয়ে অফিসেও কিছু আলোচনা হয়েছিল।

কিন্তু সব মৃত্যুর পরেই যা হয় গোলোকদার মৃত্যুর পরও তাই হয়েছিল। অন্য ঘটনার চাপে গোলোকদার এই অপঘাত-মৃত্যুর ঘটনাটা চাপা পড়ে গিয়েছিলো। তা-নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। বলতে গেলে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম গোলোকদার কথা। কিন্তু এত বছর পরে পুরীতে এই মাসিমার হোটেলে উঠে দেওয়ালে টাঙানো গোলোকদার ছবিটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম—এই ছবি এখানে কেন?

কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞেস করবো। সেদিন আমার ফিরে আসার দিন। রাত দশটায় জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরবো।

সকালবেলাই মাসিমাকে বললাম—আজকে আমি চলে যাচ্ছি—

মাসিমা বললে—আজকেই চলে যাবে বাবা। আরো দু'দিন থাকলে না কেন? জগন্নাথ দেবের কৃপা তো সহজে মেলে না। যখন একবার এসেছো, তখন আরো দু'দিন থাকলে পারতে—

বললাম—অফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল, আর তো থাকা যায় না, আজ ফিরে যেতেই হবে। তারপর আবার বললাম—এ ক'দিন খুব আরামে কাটলো আপনার জন্যে—

মাসিমা বললে—আবার যদি আসো তো, এখানেই উঠো, তুমি খুশী হয়েছো এতেই আমি খুশী। তোমাদের সেবা করেই যেন আমার জীবনটা কেটে যায়। শেষ জীবন এই জগন্নাথ দেবের চরণে এসে ঠাঁই নিয়েছি, সেইজন্যেই।

আমি বললাম সত্যি আপনার হোটেলটা খুব ভালো। এ-রকম সেবাযত্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না—রেটও সস্তা। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে সকলকে পুরীতে এসে আপনার এখানেই উঠতে বলবো—

মাসিমা বললে—আমার তো বেশি টাকা-কড়ি নেই বাবা নইলে আমি সমুদ্রের ধারে একটা হোটেল করতাম। আমার বড় ছেলে খুব চেষ্টা করছে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করতে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনার বড় ছেলে?

—হ্যাঁ, তাকে তুমি দেখ নি বাবা সে আমার বড় ভালো ছেলে, আমাকে 'মা' বলতে একেবারে অজ্ঞান!

বললাম—তাকে তো আমি একদিনও দেখি নি।

মাসিমা বললে—তাকে তুমি দেখবে কি করে বাবা। তার মাছের কারবার, ভোরে উঠেই সে চলে যায় সমুদ্রের ধারে। সে মাছের কারবার করে, নুলিয়াদের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে, তারা যত মাছ ধরবে, সে-তা দাদন দিয়ে রেখেছে, মাছ কিনে নিয়ে বড়-বড় কোম্পানী আছে তাদেরকে বেচবে!

—আপনার কটি ছে'লে?

—দু'টি। বড় ছেলে মাছের কারবার করে, আর ছোটটি ভুবনেশ্বর কলেজে পড়ে। শনিবার রাত্রে আসে, রবিবারটা বাড়িতে থাকে, আবার সোমবার ভোরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর চলে যায়। ওই দু'টো ছেলেই খুব মাতৃভক্ত, আমাকে দু'জনেই বড় ভক্তি করে।

আমি বললাম—আজ তো শনিবার, আজই আসবে?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ, আজকেই সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই আসবে, আর সোমবার ভোরবেলা চলে যাবে।

বললাম—তা'হলে তো আমার সঙ্গে আজই দেখা হবে—

—হ্যাঁ, বড় ছেলের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে—

এর পর আর দাঁড়ালাম না সেখানে।

সকালবেলা চা-জলখাবার খেয়েই মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলাম। যে ক'দিন পুরীতে ছিলাম, রোজই দু'বার করে মন্দিরে যেতাম জগন্নাথ-দর্শন করতে। মন্দিরটা আমার খুবই ভালো লাগত। ভোরবেলা রাত থাকতে উঠে সমুদ্রের সূর্যোদয় দেখতে যেতাম। আর তারপর বাড়িতে চা আর জলযোগ করে চলে যেতুম মন্দিরে। অনেকক্ষণ থেকে বেলা বারোটার সময় হোটেলে এসে ভাত খেয়ে বিকেল চারটে নাগাদ আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতম মন্দিরে। নাট-মন্দিরে চারটে নাগাদ আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম মন্দিরে। নাট-মন্দিরে অসংখ্য লোকেব ভিড়ের মধ্যে ধূপ-ধুনো আর ঘি-এর প্রদীপের আলোর প্রভাবে আমি যেন আত্মহারা হয়ে যেতাম।

সেদিন শেষবারের মত পুরী বাস! মন্দির থেকে যখন উঠলাম তখন রাত আটটা প্রায়। আর দেরি করা চলবে না। হোটেলে গিয়ে খাওয়া আছে। বিছানা বাঁধা আছে। স্যুটকেশ গুছানো আছে। অনেক কাজ রয়েছে সেদিন। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম।

মাসিমা তাড়াতাড়ি খেতে দিলে। পেট ভরে জোর করে করে আমাকে খাইয়ে দিয়ে বললে—আবার এসো বাবা, মাসিমাকে ভুলে যেও না যেন সেবারেও এখানে উঠো—

বললাম—নিশ্চয়ই উঠবো—বলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলাম। একটা রিক্সাকে বলা ছিল, সে এসে পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ একটা তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এসে ঢুকলো। বললো—মা, আমি এসে গেছি—এই বলে মাসিমার পায়েব ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

মাসিমা বললে—এই আমার ছোট ছেলে বাবা, প্রত্যেক শনিবার এখানে আসবে, তারপর সোমবার ভোরের বাসে ভুবনেশ্বরে চলে যাবে।

বাইরে থেকে আর একজনের গলা শোনা গেলো। তার গলা শুনেই মাসিমা বললো-এই যে বাবা প্রশান্ত, এসেছিস? আয়—

একটি নবীন যুবক কাছে এসে দাঁড়ালো।

মাসিমা বললে—এই আমার বড় ছেলে। এই আমার দুই ছেলে বাবা, এরা আমার বড় মাতৃভক্ত, মা বলতে এরা একেবারে অজ্ঞান। আমার পুত্র ভাগ্যটা খুব ভাল—

তারপর বলতে লাগলো—কলকাতায় আমার অনেক সম্পত্তি ছিল বাবা, আত্মীয়দের সঙ্গে মামলায় আমার সর্বস্ব গেছে। শ্যামবাজারে আমার মস্ত দু'তলা বাড়ী ছিল। সব উকিল-অ্যাটর্নী-ব্যারিষ্টারের পেছনে নষ্ট হয়েছে। সে-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ভোগ করছে

এখন! আর আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমি বাবা জগন্নাথের চরণে এসে আশ্রয় নিয়েছি—এখন আমার এই ছেলে দু'টিই ভরসা। এরা না থাকলে আজ আমি না খেয়ে মারা যেতুম!

বললাম—আপনার চেহারার সঙ্গে ছেলেদের চেহারার কোন মিল নেই কিন্তু...

মাসিমা বললে—এরা তো আমার নিজের ছেলে নয়, সতীনের ছেলে—

—আপনার সতীনের ছেলে? তা'হলে মেসোমশাই কি দু'টো বিয়ে করেছিলেন?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ বাবা, সে অনেক কথা। এবার যখন আসবে তখন সব শুনো। ভাগ্য আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এখনও যে বেঁচে আছি, এই জগন্নাথদেবের অনেক করুণা?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—আমার বড় ছেলেব নাম হলো প্রশান্ত, আর ছোট ছেলের নাম হলো জয়ন্ত।

আর তারপর দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—উনি হচ্ছেন এদের বাবা। ও রকম মানুষ আমি দেখি নি, একবারে যাকে বলে দেবতা। একেবারে দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি—

আমি বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাবার নাম কী?

প্রশান্ত বললে—শ্রীগোলোক চন্দ্র মজুমদার—

আমি স্তম্ভিত হযে চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। সেই গোলোকদা। আমার গোড়া থেকে তখন সমস্ত কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। তা হলে এই মাসিমাই কি শ্যামবাজারের নন্দকিশোর দত্তের স্ত্রী।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলাম মাসিমার কথায়। বললেন—গিয়ে চিঠি দিও।

জিজ্ঞেস করলাম—কী নামে চিঠি লিখবো।

মাসিমা বললে—আমার নামেই চিঠি লিখবে।

আমি পকেট থেকে নোট-বই আর কলম বার করলাম।

মাসিমা বললে—লিখো রেণু মজুমদার, মাসিমার হোটেল, স্বর্গদ্বার, পুরী।

মনে আছে, রিকশায় চড়ে যখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, তখন কোনও দিকে আমার দৃষ্টি নেই। শুধু ভাবছি এ কি করে হয়ে? রেণু দত্ত যদি রেণু মজুমদার হয়ে থাকে, তা'হলে এমন আন্তরিক হয়ে তা হতে হয়? গোলোক মজুমদার তাহলে কি যাদু জানতো? কে জানে?

*

সপ্তমী

মাথায় যখন গল্প থাকে না তখন যদি কেউ গল্প লিখতে পীড়াপীড়ি করে, তখনকার অবস্থা বোঝাতে পারব এমন ক্ষমতা আমার নেই। তখন ওষুধ খেতে হয়, ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে হয়। তখন সমস্ত পৃথিবীটাই আমার কাছে তেতো লাগে। সারা জীবন এই রকমই চলছে। বিশেষ করে যেদিন থেকে লেখক হয়েছি। মানুষের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেই ক্ষমতার অপব্যবহারে যে বদনামের ভাগী হতে হয় সে সম্বন্ধেও আমি সচেতন। তবু সামাজিকতা বলে একটা জিনিস আছে সেটা সব সময়ে এড়ানো যায় না।

এ বছরে এই রকম অবস্থাতেই আমি পড়েছি। মাথায় কিছুই নেই, অথচ লিখতে হবে। কেমন করে কোথা থেকে কী নিয়ে তুমি লিখবে, তা আমার ভাববার দরকার নেই, আমি তোমার লেখা চাই-ই চাই।

এও বোধহয় বর্তমানের গতির যুগের এক অবধারিত অভিশাপ।

হ্যাঁ, অভিশাপই বটে! এ-রকম অভিশাপের দায় আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। অথচ আমি তো জেনে-শুনেই এই বিষ পান করেছি। কতবার যে খারাপ লেখা লিখেছি, তার ঠিক নেই। সে সব লেখা পড়ে আমার নিজেরই লজ্জা হয়েছে। ভেবেছি যা হয়েছে তা হয়েছে, এবার থেকে আর এ-পাপ করব না।

'কিন্তু যেই নতুন বছর শুরু হয় আর তখনই অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়ির পালা শুরু হয়। তখন আর কারো মুখের ওপর 'না' বলতে পারি নি।

বন্ধু-বান্ধব যারা বাড়িতে আসে তাদের জিজ্ঞেস করি। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনি। তাতে যদি কোন গল্পের সন্ধান পাই।

সেদিন আমার এক বন্ধু বাড়িতে এলো। পরিতোষ। পরিতোষ সরকার। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, কী হে, তোমার চেহারা এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

বললাম, গল্পের ভাবনায়—

বন্ধু পরিতোষ নানান্ রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। হাই সোসাইটিতে মেশে। দশ-বারোটা ক্লাবের মেম্বার। মাসের মধ্যে আটাশ দিন পার্টিতে যায়। সমাজের যারা মাথা, অর্থাৎ ভি-আই-পি, তাদের সঙ্গেও যেমন মেলামেশা আছে, তেমনি আবার মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একজন গোঁড়া পাণ্ডা। আমার সমস্যার কথা শুনে বন্ধু পরিতোষ বললে, 'তাহ'লে তুমি মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে লেখ না'।

—মিষ্টার গাঙ্গুলী কে?

পরিতোষ বললে, আরে, তুমি চিনবে না তাকে, তিনি আমাদের ক্লাবে আসেন বটে, কিন্তু এক ফোঁটা মদও খান না, এক বাজিও তাসও খেলেন না। যাকে বলে পুরোপুরি চরিত্রবান লোক।

বললাম, তেমন লোককে নিয়ে গল্প হবে?

পরিতোষ বললে, কেন, মদ না খেলে, তাস না খেললে, তাদের নিয়ে গল্প হয় না?

বললাম, না, তা বলছি না। কিন্তু সাধারণত যারা সাতে-পাঁচে থাকে না তাদের জীবনে তো কন্‌ফ্লিক্ট থাকে না। কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তাই জন্যেই বলছি।

পরিতোষ বললে, মিস্টার গাঙ্গুলী নয়, তার মেয়েই এ গল্পের আসল নায়ক।

—সে কী রকম? মেয়েমানুষ নায়ক? মেয়েরা তো নায়িকা হয়।

পরিতোষ বললে, গল্পের যদি কেউ কেন্দ্র-চরিত্র হয়, তাকেই আমরা বলি নায়ক। সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক।

বললাম, তাহ'লে গোড়া থেকে বলো। শুনে নিই। শুনে যদি ভালো লাগে, তাহ'লে মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়েই গল্প লিখব।

পরিতোষের একটা গুণ আছে, সে গল্প বলে ভালো। এক-একজন মানুষের এক-এক রকমের নেশা থাকে। কারো নেশা থাকে রেস খেলার, কারো থাকে সিগারেট খাওয়ার নেশা; আবার কারো নেশা থাকে মেয়েমানুষের বা মদ খাওয়ার।

নেশার কি অভাব আছে মানুষের সংসারে?

যাদের টাকা-কড়ি নেই, তারাই শুধু টাকা উপায়ের ধান্দায় জীবনপাত করে। সারাদিন কোন অফিসে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমোয় আর বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয়। গরীবদের যে নেশা নেই তা নয়। তাদের আবার অন্য রকম।

একবার পুরীতে গিয়েছিলাম। পুরীতে অবশ্য বারো-তেরোবার গিয়েছি।

একবার গিয়ে দেখি নৌকা ভর্তি চিংড়ি মাছ। প্রায় দশটা নৌকার জেলেদের খুব আনন্দ। তখনই গাড়ি আসবে সব মাছ-কোম্পানির। তারা মণ-মণ মাছ পাইকিরি হারে কিনে নিয়ে সারা পৃথিবীতে এক্সপোর্ট করবে। জাপানে যাবে, ইংলণ্ডে যাবে, আমেরিকায় যাবে সে সব মাছ। মোটা দামে বিক্রি হবে সে সব মাছ। ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট সেই মাছ বিক্রির টাকার ভাগ পাবে। আর গরীব জেলেরাও মোটা দাম পাবে।

আমার মনটা খুব খুশি হলো জেলেদের কথা ভেবে। গরীব লোক তারা। কাপড়-জামা কেনবার পয়সা নেই তাদের। তারা সেই কোন্ ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়েছিল, বেলা বারোটার সময় পাড়ে এসে ঠেকেছে। মহাজনরা তাদের মোটা টাকা দাম দেবে।

আমি খবরটা দিলাম আমার এক বন্ধুকে। আমার বন্ধুর গেস্ট-হাউসেই উঠেছিলাম। কথায়-কথায় তাকে বললাম, যে আজকে খুব মাছ উঠেছে।

বন্ধু মদ্য ব্যবসায়ী। বিহার, উড়িষ্যার বাজারে মদ বিক্রি করা তার ব্যবসা। সে শুনে খুব খুশি হলো। বললে, যাক একটা ভাল খবর দিলে তুমি।

বন্ধুর মদের কারবারের সঙ্গে চিংড়ি মাছের বিক্রীর যে কী সম্বন্ধ, তা বুঝতে পারলাম না। বন্ধু বললে, আজকে আমাদের খুব মদ বিক্রি হবে।

—কেন? মদ বিক্রি বেশি হবে কেন?

বন্ধু বললে, জেলেদের যত মাছ উঠবে, আমাদের মদ ততো বিক্রি হবে।

এতক্ষণে বুঝলাম খবরটা শুনে বন্ধুর এত আনন্দ হলো কেন? জেলেরা যতো টাকা উপায় করে, সেই টাকা চলে যায় মদের দোকানে।

আর সেই দিনই বুঝলাম যে, গরীব লোকই হোক আর বড়লোকই হোক, নেশা সকলেরই আছে। তবে বড়লোকেরা বড় নেশা করে, আর গরীব লোকেরা ছোট নেশা।

এই যেমন আমার লেখার নেশা। কবে একদিন লেখার নেশা শুরু করেছিলুম, সে আজ মনেও পড়ে না। আজ এতদিনেও সেই নেশা ছাড়তে পারলাম না। এখন আমি আর লিখতে চাই না, কিন্তু আমার নেশাই আমাকে দিয়ে লেখায়। এখন না লিখে থাকতে পারি না বলেই লিখি।

পরিতোষের নেশা কলকাতার বড়-বড় ক্লাবের মেম্বার হওয়া। কারণ, তাতে বড়-বড়

লোকেদের সঙ্গে মেশা যায়। লোকেদের বলাতে পারা যায় যে, আমার অমুক লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। এও এক রকমের নেশা কি।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী যেমন মদ খান না, তাস খেলেন না, অথচ ক্লাবে যান সস্ত্রীক। পরিতোষ যেমন অন্য ভি-আই-পিদের সঙ্গে মেশে, মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলির সঙ্গেও তেমনি মেশে।

মিস্টার গাঙ্গুলী ভি-আই-পি, এই তাঁর কোয়ালিফিকেশন। মিস্টার গাঙ্গুলীর একমাত্র নেশা তাঁর মেয়ে। মেয়েই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন।

এককালে মিস্টার গাঙ্গুলী ছিলেন আই-সি-এস। ব্রিটিশ আমলের আই-সি-এস হওয়া ছোট ব্যাপার নয়। বলতে গেলে তাঁরাই তখন দেশ চালাতেন। যখন তিনি গৌহাটিতে পোস্টেড ছিলেন, তখন কংগ্রেসের গুণ্ডাদের পিটিয়ে ঘায়েল করেছেন। তাঁর ওপর অর্ডার ছিল কংগ্রেসী দেখলেই তিনি যেন তাঁদের ধরে যে-কোন ছুতোয় জেলে পোরেন। কোন অপরাধ থাকার দরকার নেই। খদ্দর-পরা লোক দেখলেই বোঝা যেত সে দেশভক্ত কংগ্রেসী। দেশভক্ত হওয়াটাই সে-যুগে ছিল মস্ত অপরাধ।

মিস্টার গাঙ্গুলী তখন কত যে কংগ্রেসীদের পিটিয়ে মেরেছেন, তার গোণাগুন্তি নেই। তখনকার দিনে আই-সি-এস-রা যত লোক খুন করতে পারত, ততো তার চাকরিতে উন্নতি হতো। মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলীর তাই খুব উন্নতি হয়েছিল জীবনে।

কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যখন ১৯৪৭ সালে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেল তখনই হলো বিপদ। তখন আর তেমন খাতির রইল না কংগ্রেস আমলে।

যে সব কংগ্রেসীদের জেলে পুরেছিলেন, গাঙ্গুলী সাহেব, যাদের বেত মেরে একদিন ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন, তখন থেকে তাদেরই সেলাম দিতে হলো গাঙ্গুলী সাহেবকে। স্যার বলে সম্বোধন করতে হতো। বিমলা প্রসাদ চালিহা তখন গৌহাটির চিফ্ মিনিস্টার। ব্রিটিশ আমলে তাঁর ওপর কত অত্যাচার করেছেন গাঙ্গুলী সাহেব, কিন্তু সেই আসামীই যখন আবার আসামের চিফ্ মিনিস্টার হলেন, তখন তাঁকে সেলাম করতে বাধত না গাঙ্গুলী সাহেবের।

কিন্তু গাঙ্গুলী সাহেবের একলারই বা দোষ কী। যারা ইংরেজ আই-সি-এস ছিল, তারা দেশ স্বাধীন হবার পর আবার নিজেদের দেশে ফিরে গেল। রয়ে গেল শুধু তারাই, যারা ইণ্ডিয়ান। তাদেরই হলো যত বিপদ!

কিন্তু গাঙ্গুলী সাহেবের কোন অসুবিধে হলো না। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বাড়ির দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেলের ছবি টাঙিয়ে দিলেন। বাড়ির জানলা-দরজায় খদ্দরের পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। রাতারাতি রং বদলাতে গাঙ্গুলী সাহেবের একটুকুও কষ্ট হলো না। তখন থেকে অফিসার্স ক্লাবে তিনি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসতে লাগলেন। আর ইংরেজীয়ানা চলতে লাগল শুধু অফিসে।

সেখানে তিনি পুরোপুরি সাহেব। তবে দিশী মিলের কাপড়ের কোট প্যাণ্ট। বাড়িতে দেশের সব বড় বড় কংগ্রেসী নেতাদের ফটো দেখে অনেকে জিজ্ঞেস করত, আপনি আই-সি-এস হয়েও এঁদের ছবি টাঙিয়েছেন যে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, চাকরির জন্যে এতদিন এঁদের ফটো আমি বাড়ির দেয়ালে টাঙাতে পারিনি। নইলে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, প্যাটেলজী ওঁরাই বরাবর ছিলেন আমার কাছে আদর্শ। আমি বরাবর অহিংসায় বিশ্বাসী।

স্বাধীনতার পর মিস্টার ডি গাঙ্গুলী রাতারাতি যে দেবব্রত গাঙ্গুলী হয়ে গেলেন, এতে বাইরের আদলটা যেমন বদলালো, মিসেস গাঙ্গুলীরও তেমনি সব কিছু আমূল বদলালো।

মিসেস গাঙ্গুলী মানে রমা গাঙ্গুলী। রমা গাঙ্গুলী আগে বেশীর ভাগ সময় ইংরেজী কায়দায় চলাফেরা করতেন। ইংরেজী কায়দায় পার্টিতে যেতেন, ইংরেজী দোকান থেকে

মার্কেটিং করতেন, নিউ মার্কেট ছাড়া অন্য কোথাকার জিনিস পছন্দ করতেন না।

বলতেন, আর সব বাজার তো নোংরা। নোংরা বাজারে যেতে আমার খুব খারাপ লাগে। সমস্ত ডার্টি নেটিভদের এ্যাট্‌মোসফিয়ার। আমার মোটেই ভালো লাগে না।

বাড়িতে যখন পার্টি দিতেন, তখন যত সাহেব-সুবোদের নেমন্তন্ন করতেন। দিশি নেটিভ বলে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই আধা-বিলিতি আদমী। তাছাড়া ছিল গভর্ণমেন্ট সেক্রেটারি বা ডেপুটি র‍্যাঙ্কের লোক। ডেপুটি কমিশনারদের নিচের পোস্টের ঠাঁই ছিল না মিসেস গাঙ্গুলীর পার্টিতে।

কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পরে যত পার্টি দিতেন তিনি, তাতে আসত যত সব পা-ফাটা খদ্দরধারী কংগ্রেসীরা।

মিস্টার গাঙ্গুলীর যা কিছু প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সব কিছু ওই তাঁর স্ত্রী রমা গাঙ্গুলীর জন্যেই। রমা গাঙ্গুলীই বলতে গেলে স্বামীকে আই-সি-এর থেকে একেবারে ডেপুটি সেক্রেটারির র‍্যাঙ্কে তুলেছিলেন। মিস্টার গাঙ্গুলী তা জানতেন। তখন থেকেই তিনি সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এক-একজন লোকের আসল বৃত্তিটার পাশাপাশি আর একটা নেশা থাকে। কারো নেশা থাকে গলফ্-খেলার, কারোর বা তাসের নেশা। কিংবা কারো আবার পোশাক-পরিচ্ছদের নেশা। দিল্লী কালীবাড়ির একবার প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি। দফতরের বাইরে একটা গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত হতে গেলে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তাতে ইজ্জৎ ডবল হয়ে যায়।

অফিসে তো একটা আলাদা ইজ্জৎ আছেই, তার ওপর বাড়তি ইজ্জৎ থাকলে ভালো লাগে। নন্-পলিটিক্যাল ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে ভেতরে-বাইরে ইজ্জৎ। কালীবাড়ি এমনই একটা ইজ্জৎদার জায়গা, যার প্রেসিডেন্ট হলে সমাজের নামজাদা লোকেরা তোমাকে খাতির করবে।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী তাই-ই হলেন। সেখানে মাঝে-মাঝে ফাংশান হয়। সেই ফাংশানে গান-বাজনা-নাচ থিয়েটার হয়। সেই ফাংশানের আগে সবাই এসে ধরে মিস্টার গাঙ্গুলীকে। বলে, আপনার মেয়ের নাচ হবে তো? সেবার যা বিউটিফুল নেচেছিল আপনার মেয়ে, এখনও ভুলতে পারিনি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর মেয়ের নাম বুলা। স্কুলের নাম শবরী।

সারা দিল্লীময় লোকের মুখে শবরীর নাচের প্রশংসা। কেউ-কেউ বাড়িতে এসে পর্যন্ত শবরীর নাচের প্রশংসা করে যায়। বলে, শবরী একটা জিনিয়াস মিস্টার গাঙ্গুলী। দেখবেন ও একদিন খুব ফেমাস্ হয়ে উঠবে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, বরাবর ছোটবেলা থেকেই ওর নাচের নেশা।

আসলে খুব খোসামোদ করতো লোকে। সেটা মেয়ের নাচের জন্যে খোসামোদ, না মিস্টার গাঙ্গুলীর চাকরির জন্যে খোসামোদ, তা বোঝা যেত না। কিন্তু বাইরের লোকের তাতে কার্যোদ্ধার হতো। কেউ চাকরিতে যদি প্রমোশন চান, তাকে তাঁর মেয়ের নাচের প্রশংসা করতে হবে। এইটেই ছিল নিয়ম।

যখন সাহিত্য সম্মেলন হল দিল্লীতে, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শবরী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত হাততালি পেয়ে যেত। যারা মিস্টার গাঙ্গুলীর কৃপা-প্রসাদ পাবার প্রত্যাশী, তারা মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলীকে দেখিয়ে-দেখিয়ে হাততালি দিত।

তাতে কাজ হতো। মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী তাদের চিনে রাখতেন। ভবিষ্যতে তাদের চাকরিতে প্রমোশন হতো আর যারা চাকরি করত না, তারা রাস্তায় দেখা হলে নমস্কার করত।

মিসেস গাঙ্গুলী কনট্‌প্লেসের দিকে গেলে কত লোক যে তাঁকে নমস্কার করত তার ঠিক নেই। সকলকে তিনি চিনতেও পারতেন না।

তারা জিজ্ঞেস করত, আমায় চিনতে পারছেন তো?

মিসেস গাঙ্গুলী না চেনবার মুখের ভঙ্গিই করতেন। তারা বলত সেই সেদিন আপনার মেয়ে শর্বরী নেচেছিল, আপনি তো তারই মা।

বড় কৃতার্থ হয়ে যেতেন মিসেস গাঙ্গুলী।

আসলে সবাই জেনে গিয়েছিল যে কার্যসিদ্ধি করতে কিংবা চাকরি পেতে গেলে মেয়ের প্রশংসা করতে হবে। তা হলেই দেবা-দেবী খুশি হবেন। মিস্টার গাঙ্গুলী হলেন সেই দেবতা যাকে খুশি করতে পারলে সেক্রেটারীয়েটে একটা ছোটখাটো কিংবা বড় গোছের একটা চাকরি পাওয়া যায়।

কিন্তু হঠাৎ মিস্টার গাঙ্গুলীর সাহিত্য করবার ইচ্ছে হলো। শুধু কালীবাড়ির প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি ঠিক তুষ্ট হতে পারছিলেন না। সাহিত্যিক হবার বাসনা তাঁর ছোটবেলা থেকে, সেটা এতকাল পূর্ণ হয়নি। এবার চাকরিতে পাকা হয়ে বসে তিনি খাতির, মর্যাদা, সেলাম সব পেয়েছেন। কিন্তু যাকে বলে যশ সেটা তাঁর কপালে তখনও জোটেনি। তিনি ভাবলেন, ওটা চাই।

সাহিত্যিক হতে গেলে খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় চাকরি পাবার পর থেকেই ছিল! তারা তাঁর অফিসে আসত। রিপোর্ট নেবার জন্যে তাঁর সহায়তা দরকার। একদিন ইন্দ্রনাথ তরফদার এলো কিছু খবর নিতে।

খবরের কাগজের লোক এলে সেক্রেটারি হিসেবে তাদের একটু বেশি খাতির করতেন মিস্টার গাঙ্গুলী। কারণ তিনি জানতেন খবরের কাগজ হলো প্যারালাল গভর্ণমেন্ট। তারা ইচ্ছে করলে দেশের মিনিস্ট্রি বদলাতে পারে। ইচ্ছে করলে পার্টিরও ক্ষতি করতে পারে, গভর্মেণ্টকেও নাস্তানাবুদ করতে পারে। সেদিন ইন্দ্রনাথ তরফদার আসতেই তিনি বললেন, আমি একটা উপন্যাস লিখেছি ইন্দ্রনাথবাবু।

ইন্দ্রনাথবাবু তো শুনে থ'। বললেন, উপন্যাস লিখেছেন আপনি নিজে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সাহিত্যের ওপর আমার চিরকালের ঝোঁক। ছোটবেলা থেকে আমি সাহিত্যিক হবো। এই ছিল আমার এ্যামবিশন, কিন্তু সাহিত্যিক হতে গিয়ে আমি হয়ে গেলুম আই-সি-এস। আই-সি-এস হবার পর আর সাহিত্য করার সময় পেলুম না! কিন্তু বাড়িতে বসে রাত জেগে আমি এই উপন্যাসটা লিখেছি কেবল, কেউ তা জানতে পারেনি।

—কত দিন লাগল লিখতে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তা প্রায় দশ বছর।

—দশ বছর!

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন,তার বেশি হবে তো কম হবে না।

অবাক হয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথবাবু! বললেন, তাহ'লে বইটা ছাপিয়ে ফেলুন।

মিস্টার গাঙ্গুলী এই জবাবটাই চাইছিলেন। বললেন, আগে কোন পত্রিকায় ছাপাতে চাই। আপনাদের তো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে কলকাতায়, তারা ছাপাবে না?

ইন্দ্রনাথ তরফদার বললেন, ছাপাবে না মানে? পেলে লুফে নেবে।

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যা বলছি? একে আপনার লেখা, তার ওপর আপনি দশ বছর ধরে রাত জেগে উপন্যাস লিখেছেন, এ খবর যদি কোন সম্পাদক জানতে পারে তো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপরে। আপনি ওটা কাউকে দেবেন না। ও

আমাদের কাগজে আমি ছাপাব। আমি নিজে আপনাকে কথা দিচ্ছি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর তবু সন্দেহ হলো। বললেন, একটা কথা কিন্তু তার আগে আপনাকে বলে রাখি। যদি পড়ে খারাপ লাগে, না তাহ'লেই যেন ছাপাব।

ইন্দ্রনাথ তরফদার বললে, ভালো লাগতে বাধ্য। কালিবাড়িতে সেদিন যে লেকচারটা আপনি দিয়েছিলেন, তা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার কত জ্ঞান। আপনি নির্ভয়ে কপিটা আমাকে দিতে পারেন, আমি আমাদের কলকাতার 'দেশ-দর্পণ' কাগজে ছাপিয়ে দেব, আপনার পুরোটা লেখা হয়ে গেছে তো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হ্যাঁ পুরোটাই লেখা হয়ে গেছে।

—তাহ'লে আজ সন্ধ্যেবেলাতেই লেখাটা দিয়ে দিন, আমি রাত জেগে পড়ে নেব।

সেই দিনই মিস্টার গাঙ্গুলী পাণ্ডুলিপিটা ইন্দ্রনাথ তরফদারকে দিয়ে দিলেন। ইন্দ্রনাথ তরফদার জানতেন, যে লেখাটা ততো ভালো হবে না। তবু যদি কোন রকমে তাঁদের 'দেশ-দর্পণে' ছাপানো যায়, তাহ'লে তাঁর মাইনে বেড়ে যাবে। ইন্দ্রনাথ তরফদার কলকাতার খবরের কাগজের দিল্লীর প্রতিনিধি। তার খবর পাঠানোর ওপরেই কাগজের বিক্রি বাড়ে।

সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। গিয়ে সম্পাদককে ধরলেন। বললেন, এটা যে কোন রকমে যদি ছাপেন তো আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

ইন্দ্রনাথ বললেন, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কমিউনিকেসান মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি, মস্ত বড় পোস্ট। এর লেখা যদি ছাপেন তো আমাদের পেপারেরও খুব ভালো হবে। এঁর হাতে অনেক ক্ষমতা।

সম্পাদক শেষ পর্যন্ত ছেপেছিলেন। তারপর বিজ্ঞাপনেও অনেক কিছু প্রশংসা করা হয়েছিল। মিস্টার গাঙ্গুলী ভীষণ খুশি। এতদিন তিনি ছিলেন সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি। তারপর কালীবাড়ির প্রেসিডেণ্ট। সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন সাহিত্যিক।

কিন্তু বই তো লিখলেন। সাপ্তাহিক 'দেশ-দর্পণে' তা ছাপাও হলো। কিন্তু বই? বই ছাপবে কে?

মিস্টার গাঙ্গুলী ডিউটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। এদিকে অফিস থেকে টি-এ। পাবেন আবার নিজের বই ছাপানোর ব্যবস্থাও হবে।

তিনি তখন জেনে গিয়েছেন যে তিনি নামজাদা হয়েছেন। তার ওপর ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের আই-সি-এস সেক্রেটারি। তিনি মনে-মনে এক ফন্দি আঁটলেন। একজন প্রকাশকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আপনি আমার 'দেশ-দর্পণে' ছাপা উপন্যাসটি ছাপাবেন?

প্রকাশক নিজেও সাহিত্য-টাহিত্য করেন। আই-সি-এস দেখে সম্মান করে না এমন লোক ইণ্ডিয়ায় নেই। বেশ খাতির করলেন, চা খাওয়ালেন।

বললেন, আপনার উপন্যাসের নামটা কী যেন?

—'মানব-সুন্দরী'। 'দেশ-দর্পণে' ছাপার সময় খুব নাম হয়েছিল।

প্রকাশক বললেন, কাগজের দাম বড্ড বেড়ে গেছে, এখন ছাপা মুশকিল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, এবার রাজস্থানে আমাদের নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্যের সম্মেলন বসছে, আপনাকে মূল সভাপতি করে দিতে পারি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর কথায় চিঁড়ে ভিজল। প্রকাশক বললেন, তা হতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বই ছাপাবার কাগজের দামটা দিতে হবে আপনাকে—

তা তাই-ই সই। টাকা তো অঢেল আছে মিস্টার গাঙ্গুলীর। কাগজের দামটা সবই

দিলেন তিনি। 'মানব-সুন্দরী' ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল সুভাপতি এর আগে অনেক বড়-বড় সাহিত্যিক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদ সেন, সবাই। এবার সেই পোস্টে গেলেন 'মানব-সুন্দরীর' উপন্যাসের প্রকাশক।

মিস্টার গাঙ্গুলীর লেখা পড়ে দিল্লীতে তাঁর বাড়িতে বহু লোক গিয়ে হাজির। সবার মুখেই ওই এক কথা। সবাই-ই বললেন, আপনার নতুন প্রতিভাকে দেখতে এসেছি, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বড়-বড় সাহিত্যিকেরা অভিনন্দন-পত্র পাঠাতে লাগলেন এই নতুন প্রতিভাকে। কিন্তু কেউই জানতে পারলে না কী ভাবে 'মানব-সুন্দরী' লেখা, কী ভাবে সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ছাপানো, এবং কী ভাবে বই প্রকাশ করা হলো। মাঝখান থেকে মিস্টার গাঙ্গুলীর খ্যাতি আরো বেড়ে গেল।

এবার পরিতোষ থামল। আমি বললাম, তোমার মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কী করে গল্প লিখব? এতক্ষণ যা বললে তুমি, এত গল্পের এলিমেন্ট কোথায়?

পরিতোষ বললে, এতদিন তো অন্য ধরনের গল্প অনেক লিখেছ। এবার আরো একটু অন্য ধরনের গল্প লেখ না।

বললাম, কিন্তু এ-গল্পের নায়কই বা কে তার নায়িকাই বা কে?

পরিতোষ বললে, সব গল্পতে কী নায়ক-নায়িকা থাকতেই হবে? মানুষের তো অন্য অনেক সমস্যাও থাকতে পারে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মিস্টার গাঙ্গুলীর কী সমস্যা?

পরিতোষ বললে, সেই সমস্যার কথা এবার আসছে। এতক্ষণ তো কেবল গল্পের ব্যাকগ্রাউণ্ড হলো। এবার হবে আসল গল্প। বলে পরিতোষ আবার বলতে লাগল—

- আসলে মিস্টার গাঙ্গুলীর কোন আপাতত সমস্যাই ছিল না। স্বামী-স্ত্রী আর একটিমাত্র মেয়ে বুলা, মানে শবরী। আর টাকার কথা যদি বলো তো সেটা কোন সমস্যাই ছিল না মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে। সেকালের আই-সি-এস যারা, তারা এত খাতির পেত সব জায়গায়, আর এত উপরি পেত যে বলতে গেলে মাইনের টাকাতে হাতই পড়ত না।

ধর, কোন নেটিভ স্টেটে বেড়াতে গেলে তো রাজাদের গেস্ট-হাউসে রইলো। সেখানে তাদের জন্যে গাড়ি থেকে আরম্ভ করে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সবই ফ্রি। এমন কী সঙ্গে যে চারপাশি বা সেক্রেটারি যেত, তাদেরও কোন খরচ পত্র হতো না। অথচ সবাই টি-এ বিল করত।

এ হেন জীবেরা যখন রিটায়ার করত, তখন তাদের অবস্থা হতো প্রায় শোচনীয়। কেউ তাদের আর আগে কার মতো সেলাম দিত না কেউ ভেট দিত না। পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও কেউ চিনতে পারত না।

তখন আর কোন উপায় না পেয়ে বড় বড় ক্লাবে গিয়ে ভর্তি হতে হতো। শুধু বড়-বড় মেম্বারদের কাছে নিজেদের অতীত জীবনের ঐশ্বর্যের গল্প করা ছাড়া আর কোন কাজই থাকত না।

সত্যিই তাদের অবস্থা হতো বড় প্যাথেটিক। দেদার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেও কোন সুখ নেই। সেই টাকা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চাকরি করবার সময় উপন্যাস যারা লিখেছেন, সে উপন্যাসের ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রশংসা বেরিয়েছে কাগজে। রিটায়ার করবার পর আর কেউ তাদের পরোয়া করবে না! আগে বাড়িতে সকাল থেকে অতিথি অভ্যাগতদের ভিড় লেগে থাকত। অফিসেও দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যাও ছিল অঢেল। একটু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেই তারা খুশিতে গলে যেত।

কিন্তু সব জিনিসেরই তো একটা শেষ আছে। চিরকাল তো কারোর চাকরি থাকে না। তাই মিস্টার গাঙ্গুলীর আই-সি-এসের চাকরির মেয়াদও একদিন শেষ হলো।

একটিমাত্র সন্তান মিস্টার গাঙ্গুলীর। যখন চাকরি ছিল, তখন সেই সন্তানেরও কত খাতির, কত সুখ্যাতি। শবরী বলতে সব কৃপাপ্রার্থীরা অজ্ঞান। তখন শবরীর নাচের ছবি উঠত কাগজে। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, আমেদাবাদ সব জায়গার যত পত্র-পত্রিকা সব কাগজেই শবরীর নাচের ভঙ্গির ছবি ছাপা হতো। কলকাতার কাগজের ইন্দ্রনাথ তরফদার নিজের ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে ছবি তুলিয়ে নিত। আর কাগজকে চিঠি লিখে দিত, এ ছবি ছাপতেই হবে; নইলে মিস্টার গাঙ্গুলী আগেকার মতন আর ভেতরকার খবর দেবেন না। সেক্রেটারিয়েটে যে সব ঘটনা ঘটে, তার খবর মিস্টার গাঙ্গুলী জোগাড় করে ইন্দ্রনাথ তরফদারকে দিয়ে দেন। তাতে পত্রিকাওয়ালাদের যেমন লাভ, মিস্টার গাঙ্গুলীরও তেমনি লাভ। মিস্টার গাঙ্গুলীকে খুশি করতে গেলে তাঁর মেয়েকে আগে খুশি করত হবে, এটাই ছিল সকলের পলিসি।

কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী মনে করতেন, তাঁর মেয়ে বুঝি সত্যিই ভালো নাচে।

খবরের কাগজওয়ালার জিজ্ঞেস করতেন, আপনার মেয়ের এত প্রতিভা, এত ভালো নাচ শিখল কোথা থেকে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, উদয়শঙ্করের কাছ থেকে।

উদয়শঙ্কর! নামটা শুনে সবাই শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠত।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আর কত্থক নৃত্য শিখিয়েছি তামিলনাড়ুর বাল্য সরস্বতীর কাছ থেকে।

শ্রোতারা বলত, তাই বলুন! অনেক টাকা আপনি খরচ করেছেন মেয়ের জন্যে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলতেন, শবরীর বয়েস তো মাত্র তের বছর, এরই মধ্যে শুধু নাচের জন্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছি।

—আর লেখা-পড়াতেও তো আপনার মেয়ে খুব ভালো।

মিসেস গাঙ্গুলী বলতেন, প্রত্যেক বছরই তো স্কুলে ফার্স্ট হয় শবরী।

সবাই বলে সত্যিই মিসেস গাঙ্গুলী রত্নগর্ভা। মেয়ে তো অনেকেরই আছে দিল্লীতে। কিন্তু এমন প্রতিভা-সম্পন্ন মেয়ে ক'জনের আছে? আরো তো অনেক সেক্রেটারি আছে, কই, তাদের মেয়েরা তো এমন নয়। তারা স্কুলে পড়ে, তারপর কলেজে ওঠে, তারপর তাদের বিয়ে দিতেই নাকাল হয়ে যায় বাপ-মায়েরা।

ভাগ্য বটে মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলীর। সুন্দরী মায়ের সুন্দরী মেয়ে। ভগবান যাকে দেন তাকে এমনি করেই দেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন মিলন বড় একটা দেখা যায় না! সবই মিসেস গাঙ্গুলীর ভাগ্য।

তার ওপর আবার মিস্টার গাঙ্গুলী আই-সি-এস হয়েও মস্ত বড় সাহিত্যিক। তাঁর 'মানব-সুন্দরী' উপন্যাসের কত সমালোচনা কাগজে বেরিয়েছে। সকলেই বইয়ের প্রশংসায় মুখর। সবাই বলতো—এবার নতুন কী উপন্যাস লিখেছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, উপন্যাস লেখার সময় কোথায় পাচ্ছি। আজকাল মিনিস্টার আমাকে খাটিয়ে-খাটিয়ে মারছে। তবু যখনই একটু সময় পাই, একপাতা দু'পাতা লিখে ফেলি।

—কখন লেখেন?

—রাত জেগে-জেগে।

সবাই ধন্য-ধন্য করত। বলতো, আর কেন চাকরি করছেন? চাকরি ছেড়ে দিন না। আপনি যদি হোল-টাইম লেখক হতেন, তাহ'লে এর থেকে অনেক বেশী টাকা উপায় করতে পারতেন।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আমি তো চাকরি ছাড়তেই চাই। কিন্তু মিনিস্টার চায় না

যে আমি চাকরি ছাড়ি। মিনিস্টার বলে, গাঙ্গুলী তুমি চলে গেলে আমাদের সেক্রেটারিয়েটের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ভালো সেক্রেটারি পাওয়াও তো শক্ত। আজকাল তো আই-এ-এস অফিসাররা আই-সি-এসদের মতো অত কাজের নয়, আমরা সব কাজ শিখেছি ঝানু ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে। আমাদের সঙ্গে আজকালকার আই-এ-এসদের তুলনা হয়?

লোকে মন দিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলীর কথাগুলো শুনত। বলত, তা-তো বটেই, তাই-তো।

*

পরিতোষ বললে, তারপরই কাণ্ডটা ঘটল। আমি বললাম—কী কাণ্ড?

তারপর মিস্টার গাঙ্গুলী রিটায়ার করলেন। তখনই বিপদ ঘনিয়ে এলো মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলীর জীবনে। শর্বরী তখন বি-এ পাশ করেছে। ল' পাশ করেছে। হঠাৎ একদিন সে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড! সেদিন রিটায়ারমেন্টের দিন। তাঁকে অফিসের স্টাফরা ফেয়ার-ওয়েল দিচ্ছে। মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী দু'জনেই সেখানে গেছেন। প্রায় পঞ্চাশটা ফুলের মালা তাঁর গলায়। একটা ব্রোঞ্জের ফ্রেম বাঁধানো মানপত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিনি বিদায়-ভাষণ দিলেন।

ভাষণে বললেন, আমি ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করে সারা জীবনে দেশসেবা করেছি। চাকরিকে কখনও আমি চাকরি বলে মনে করিনি। আমি বরাবর ভেবেছি আমি দেশসেবা করছি। ব্রিটিশ আমলে আমি যে চাকরি করেছি, সেটা ছিল আমার সত্যিকারের চাকরি, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমি ভেবেছি এ আমার চাকরি নয়, এ আমার দেশসেবা। দেশের কল্যাণের জন্যে আমি প্রাণ দিয়ে কাজ করেছি। আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তা আমার প্রাপ্য নয়, আপনাদের এ সম্মান আমি সেই দেশমাতৃকার কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, যিনি এই সম্মানের প্রকৃত অধিকারী...

যথারিতে চটাপট করে হাততালি পড়ল। তিনি সকলের কাছে সবিনয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। বাড়ি মানে কোয়ার্টার। এই কোয়ার্টার ছেড়ে তিনি কলকাতায় নতুন তাঁর বাড়িতে চলে যাবেন। ভবিষ্যতে সেখানেই বসে-বসে শেষ জীবনটা তিনি সাহিত্য করে কাটাবেন। সমস্ত প্ল্যান হয়ে আছে। অন্য সব বাঙালী আই-সি-এস-রা সাহিত্যিক হয়েছে, তাহ'লে তিনিই বা কেন সাহিত্যিক হবেন না?

বাড়িতে এসে ডাকলেন, বুলা—বুলা—

কোন সাড়া শব্দ পেলেন না। মিসেস গাঙ্গুলীও ডাকলেন, বুলা কোথায় রে?

চাকর-বাকরেরা সবাই দৌড়ে এলো। বেবী কোথায়?

সবাই ভয়ে অস্থির। সাহেব-মেম সকলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় গেল বেবী! বাবা-মায়ের কাছে যে বুলা বা শর্বরী, কিন্তু চাকর-বাকর-আয়া-বাবুর্চির কাছে সে বেবী।

মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে, বাড়িতে কেউ এসেছিল?

আয়া বললে, না মেমসাহেব, কেউ তো আসেনি।

—তাহ'লে কী উড়ে গেল সে?

কারোর মুখেই কোন জবাব নেই। কেউ জানে না বেবী গেল কোথায়?

একজন বেয়ারা বললে, আমি তো দেখেছিলুম বেবী পড়ছেন।

না, শেষ পর্যন্ত বুলাকে পাওয়া গেল না। অনেক জায়গায় টেলিফোন করলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে খোঁজ করলেন। কারোর বাড়িতেই যায়

নি। তবে গেল কোথায় ?

মিসেস গাঙ্গুলী তাঁর নিজের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতেও টেলিফোন করতে লাগলেন। তারাও বললে, বুলা তাদের বাড়িতে যায়নি।

শেষকালে টেলিফোন করা বন্ধ করলেন। মিছিমিছি মেয়ে পালানোর খবরটা বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো। সেদিন তাঁর ফেয়ার-ওয়েল সভা হয়ে গেছে। সমস্ত আনন্দটা তাঁর বিস্বাদ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা অন্য ভাবনাও ছিল। ভাবনাটা প্রত্যেক রিটায়ার্ড লোকেরই হয়। আর আগেকার মতো তিনি সেলাম পাবেন না, খাতির পাবেন না। সেক্রেটারিয়েটে গেলে কেউ আর তাঁকে তেমন করে মাথা নিচু করে সম্মান করবে না। আরো কতজন তাঁর আগে রিটায়ার করে গেছে। কত লোক তাঁদের ভয় করত। আর ঠিক রিটায়ার করবার দিন থেক অন্য রকম। জামা-কাপড়-কোট-প্যান্ট আগেকার মতোই আছে, কিন্তু কোথাও যেন কিছুর মিল নেই। স্টাফ সেই একই আছে, অথচ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব বদলে গেছে। হঠাৎ সামনে মুখোমুখি হলে কেউ অবশ্য অপমান করে না। কিন্তু সে রকম ভক্তিতে গদগদ হওয়া আর আগেকার মতো নেই।

ফেয়ার-ওয়েল থেকে ফেরবার পথে সারা রাস্তাটা তিনি কেবল এইসব কথাই ভাবছিলেন। তাঁরও সেই একই দশা হবে। সেক্রেটারিয়েটে এলে তাঁকেও আর কেউ ভক্তি করবে না। তখন তাঁকেই ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কি গো সরকার, কেমন আছো সব ?

সরকার তার ডিপার্টমেন্টের হেড। সেই সরকার কতদিন খোসামোদ করেছে, তার জামাইয়ের একটা চাকরির জন্যে। চাকরি একটা তার জামাই এর করেও দিয়েছিলেন। তার জন্যে মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে তার চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু তা নয়। তাঁর জায়গায় যে এসে বসবে, তখন তাকেই খাতির করবে তারা। এই-ই জগৎ, এই-ই নিয়ম পৃথিবীর। একজন আসে, আর সে চলে গেলে তখন আবার আর একজন এসে তার জায়গাটা নিয়ে নেয়।

আর এ তো চাকরি। চাকরিটাই তো সব নয়। এর পরে আছে জীবন। জীবনেরও এই নিয়ম। এই পৃথিবী থেকেও এমনি করে একদিন চলে যেতে হবে। মিনিস্টার চলে যাবে, সেক্রেটারি চলে যাবে, হেড ক্লার্ক চলে যাবে, আজকের যারা স্টাফ তারাও একদিন চলে যাবে। থাকবে শুধু 'সেক্রেটারিয়েট' নামক বাস্তব বাড়িটা। এই বাড়িটাও কি চিরকাল থাকবে ? তাও থাকবে না।

তিনিও একদিন থাকবেন না। তারপর যদি কিছু থাকে, তো তাঁর উপন্যাস 'মানব-সুন্দরী'টা হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। কারণ বিক্রি কিছু না হোক, প্রশংসা করেছে সব পত্রিকাই।

কিংবা এও হতে পারে, প্রশংসা যেটা করেছে লোকে সেটা হয়তো তাঁর আই-সি-এর চাকরির জন্যে। আজ তাঁর চাকরি গেল, সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো তাঁর বইটার কথাও লোকে ভুলে যাবে। গাড়িতে যখন আসছিলেন, তখন এই সব কথাই মনে পড়ছিল কেবল।

মিসেস গাঙ্গুলীও পাশে বসেছিলেন। তিনি কি ভাবছিলেন কে জানে! স্বামীর জন্যে তাঁরও একটা খাতির ছিল সমাজে। সব পার্টিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁরও নেমন্তন্ন হতো। তাঁর ঐশ্বর্য দেখাবার একটা সুযোগ মিলত। এর পরে যখন কলকাতায় যাবেন তখন হয়তো আর পার্টিতে এমন নেমন্তন্ন হবে না।

কিন্তু যেদিন চাকরিতে ঢুকেছিলেন সেদিনই তো জানতেন যে, এ চেয়ার চিরকাল থাকবে না। একদিন তাঁকে চেয়ার থেকে বিদায় নিতে হবে। সুতরাং দু'জনেই এই অবস্থার জন্যে তৈরি ছিলেন মনে মনে। কিন্তু সে-দিনটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা

কল্পনা করতে পারেন নি।

হঠাৎ মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, বুলার বিয়ে তো দিতে হবে এবারে।

মিস্টার গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক ছিলেন। ফেরার-ওয়েলে কে কী বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই সবই ভাবছিলেন। হঠাৎ স্ত্রী'র প্রশ্ন শুনে বললেন, তা-তো দিতেই হবে।

স্ত্রী বলেছিলেন, তোমার চাকরিতে থাকতে-থাকতেই দিয়ে দিলে ভালো হতো, এখন কি আর কেউ আমাদের কথা শুনবে?

—কেন শুনবে না?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, আর আমরা তো দিল্লীতে থাকছিই না। কলকাতায় কে আর আমাদের চিনবে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তা হলেও সেক্রেটারির খাতির কলকাতায় নাই-বা পেলাম, কিন্তু সাহিত্যিক মহল তো আমায় খাতির করবে। কত জায়গায় সাহিত্যিকদের সভাপতিত্ব করার চান্স দিয়েছি।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, সাহিত্যিকদের কথা ছেড়ে দাও, তারা বেচারা গরীব মানুষ, ওদের দিয়ে আমাদের কী উপকার হবে। ওদের নিজেদের কে উপকার করে তার ঠিক নেই।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তবু যা-ই হোক একটা উপন্যাস তো লিখেছি। বইটার প্রশংসাও তো কিছু হয়েছে, বিক্রি না-ই বা হলো।

সে তুমি এই চাকরিতে ছিলে বলে লোকে প্রশংসা করেছে। সেটা তো তাদের মনের কথা নয়, ওটা তোমাকে খোসামোদ করার জন্যে করেছে।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, সে যা-ই হোক, বুলার বিয়ের কথা আমি ভাবছি না। তুমিও ভেবো না। নেচেও তো ওর খুব নাম হয়েছে। তারপর বি-এ পাশ করেছে, ল পাশ করেছে

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, ছি-ছি, লোকে বলবে কী? আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেব? আর তা ছাড়া, আমাদের তো একমাত্র মেয়ে। যে বিয়ে করবে সে তো আমার সব টাকা পাবে। সেটার কি কম দাম? সেই লোভও তো অনেকের আছে।

মিস্টার গাঙ্গুলী আগে ভেতরে-ভেতরে চেষ্টা করছিলেন। মিস্টার মহেশ সাকসেনার ছেলে আই-এ-এস হয়েছিল। আই-এ-এস মানে আগেকার আই-সি-এস। মহেশ সাকসেনার ছেলে গোবিন্দ সাকসেনা।

মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলের বাপ কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, বাপ মহেশ সাকসেনা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভিশনের হেড। মাইনে বেশি পায় না, কিন্তু তার ছেলেটা ভালো। ছেলে এখন ভালো চাকরিতে পোস্টিং পেয়েছে।

—কত মাইনে পায়?

—এখন আটশো টাকা পাচ্ছে। পরে ভাগ্য ভালো হলে আমার মতো কোন ডিপার্টমেন্টে সেক্রেটারি হয়ে যাবে।

মিসেস গাঙ্গুলীর বরাবর সাধ মেয়ের সঙ্গে কোন আই-এ-এস অফিসারের বিয়ে দেওয়া। আই-সি-এস-এর জামাতা অন্ততঃ আই-এ-এস হওয়া চাই। নইলে সোসাইটিতে ইজ্জৎ থাকে না। লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, আপনার জামাই কী করে? তখন কী জবাব দেবেন মিসেস গাঙ্গুলী?

আপার ডিভিশন ক্লার্ক চরিত্র ভালো, প্রমোশন পেয়ে একদিন হয়তো হেড ক্লার্ক

হবেন. এ-রকম পাত্রের সঙ্গে তো বিয়ে দেওয়া যায় না। লোকে তাহ'লে বলবে কী ? দিল্লীর সমাজে তাহ'লে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তখন আর লজ্জায় কাউকে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যদি শোনে আই-সি-এস পাত্র তাহ'লে গাঙ্গুলী পরিবারের ইজ্জৎ বাড়তে বই কমবে না।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী বললেন, গোবিন্দকে তাহ'লে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াই।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, তাই করো। আমিও দেখি তাকে, বুলাও দেখুক।

তাই-ই ঠিক হলো। সব কিছুর ব্যবস্থা হলো। একদিন রাত্রে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করা হলো গোবিন্দ সাকসেনাকে।

সাকসেনারা হলো কায়স্থ আর গাঙ্গুলীরা হলো ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না আজকাল। আজকালকার যুগ হচ্ছে টাকার যুগ। কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, ও-সব বিচার উঠে গেছে সমাজ থেকে। আজকাল দেখতে হয় পাত্র কত মাইনে পায়। বাপ গরীব হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। পাত্র ভালো মাইনে পেলেই মেয়ের বাপের জাত, কুল বজায় থাকে। তা তাকেই একদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন। যাতে মেয়ে পাত্রকে দেখতে পায়। গাড়িতে আসতে-আসতে সেই সব কথাই ভাবছিলেন।

মনে আছে একদিন গোবিন্দ সাকসেনা নিজেই গাড়ি চালিয়ে এলো মিস্টার গাঙ্গুলীর বাড়িতে। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে গোবিন্দ। নিজের চেষ্টায় কাউকে ধরাধরি না করে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় এক চান্সে পাশ করেছে সে। অর্ডিনারি হেড ক্লার্কের ছেলে হয়েও নিজের প্রতিভায় বড় হয়েছে। মিস্টার গাঙ্গুলী, মিসেস গাঙ্গুলী এলেন। দরোয়ান অভ্যর্থনা করে গোবিন্দ সাকসেনাকে ড্রয়িং-রুমে বসিয়েছিল।

মিসেস গাঙ্গুলী একটা শান্তিপরী তাঁতের শাড়ি পরে নিয়ে মুখে পাউডার-স্নো মেখে তৈরি হয়েই ছিলেন। বুলা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কোন শাড়িটা পরবো মা ?

—কেন ? তুমি তোমার কালো জর্জেটটা পরবে বলেই তো আমি শান্তিপুরী ড়ুরে শাড়ি পরেছি। তাতে আমার পাশে তোমাকে কনট্রাস্ট দেখাবে। মনে রেখো, যে আসছে সে যে-সে লোক নয়, আই-এ-এস অফিসার।

বুলা বলেছিল কিন্তু তুমি তো বলেছিলে ওর বাবা সেক্রেটারিয়েটের হেড অ্যাসিসটেন্ট ?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তাতে কী হয়েছে ? তুমি তো আর শ্বশুর বাড়িতে ঘর করছো না।

—কেন বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে না ?

মা বলেছিলেন সে কথা তোমাকে বলতে কে বললে ? গোবিন্দ আই-এ-এস, কোয়ার্টার পাবে। সেখানেই থাকবে তোমরা।

—কিন্তু যতদিন কোয়ার্টার না পায়, ততদিন ?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন বিয়ের কথা পাকা হলেই কোয়ার্টার পেয়ে যাবে। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে তোমার বাবা। তোমার বাবা আই-সি-এস সেক্রেটারি ভুলে যাচ্ছ কেন ? আই-সি-এস-রাই যে ইণ্ডিয়া চালাচ্ছে এটা তো তুমি ভালো করেই জানো। মিনিস্টাররা চালায় কে ? তুমি জানো না যে তোমার বাবাই মিনিস্টারদের চালায়। মিনিস্টাররা কি লেখাপড়া জানে তোমার বাবার মতো ? মিনিস্টাররা জেল খেটেছে বলেই তো ভোট পেয়ে মিনিস্টার হয়েছে। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু তোমার বাবা রীতিমত লেখাপড়া করে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে বিলেতে গিয়ে সেখানকার পরীক্ষায় পাশ করে তবে চাকরি পেয়েছে।

মেয়েকেও সাজিয়ে দিয়েছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। কালো জর্জেটের ওপর সোনালি

ব্রোকেডের ব্লাউজ। তারপর মুখে, কানে-ঘাড়ে ক্রীম দিয়ে গ্রাউণ্ড তৈরি করে তার ওপর ম্যাক্স-ফ্যাক্টর লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, তুমি বেশি কথা বলবে না। শুনে রাখো, বেশি টকেটিভ মেয়েদের পছন্দ করে না আই-সি-এস-রা। তারা চায়, কথা বলবে তারা আর বাকি অন্যরা শুনবে।

সব রকম রিহার্সাল দেওয়া ছিল মেয়েকে। যেই গোবিন্দ সাকসেনা আসার খবর দিয়ে গেল বয়, সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে এসেছিলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। পেছনে-পেছনে এসেছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

—হ্যাল্লো গোবিন্দ, কেমন আছ? বাড়ি চিনতে তোমার কষ্ট হয়নি তো?

গোবিন্দ খুব লাজুক প্রকৃতির ছেলে। বেশি কথা বলে না। চিরকাল লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়েছে। হঠাৎ আই-সি-এস-এর বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে সে বর্তে গেছে। বললে, না, আমার কোন কষ্ট হয়নি।

এই সময় বুলা এসে ঘরে ঢুকল। আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া ছিল। বলা ছিল যে, কথা আরম্ভ হওয়ার একটু পরে সে ঘরে ঢুকবে।

—এই দেখ আমার মেয়ে শবরী। ও বি-এ পাশ করে ল' পড়ছে। নমস্কার কর বুলা, তুমি এটিকেট জানো না?

বুলা নমস্কার করলে, গোবিন্দ সাকসেনাও নমস্কার করলে তাকে।

কালো জর্জেট পরে মুখে ম্যাক্স-ফ্যাক্টর মেখে বুলাকে লোভনীয় দেখাচ্ছিল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, নতুন চাকরি কেমন লাগছে তোমার?

গোবিন্দ বললে, মন্দ নয়।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তোমরা তো ব্রিটিশ আমলে চাকরি করনি, সে ছিল রাজার চাকরি। কাজ করে সুখ ছিল। আমি যখন আসামে পোস্টেড তখন ম্যাক্ফার্সন আমাকে যে কী ভালবাসতেন জানো। আমি যা করতুম সব কাজে বলত—ইয়েস ভেরি গুড, ইউ আর এ ভেরি ক্লেভার চ্যাপ। আমার কাজ খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করত। তোমরা কংগ্রেস আমলে জন্মেছ, সে-সব দিনের কথা তোমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না।

তারপর গল্প চলল অনেকক্ষণ ধরে। সেকালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা। মিসেস গাঙ্গুলী মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা শুধু গল্পই করবে? গল্প করলেই পেট ভরবে? মিস্টার সাকসেনার হয়তো খিদে পেয়ে গেছে।

তারপর বুলাকে বললেন, বুলা, খানসামাকে বলো টেবিল সাজাতে।

খানসামা আবদুল টেবিল সাজাল। অনেক রকম আয়োজন করেছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ভাবী জামাই, তাকে ভালো করে খাতির করতে হয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন গোবিন্দ চলে গেল তখন মিসেস গাঙ্গুলী মেয়েকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, গোবিন্দ সাকসেনাকে তোর পছন্দ হয়েছে? বল্?

বুলা চুপ করে রইল। মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানিস, গোবিন্দ যে-সে পাত্র নয়, আই-এ-এস। তোর বাবার মতন।

বুলা বললে, কিন্তু মা, ও যে বড় কালো।

মা বললে, কালো তো কী হয়েছে, তোর বাবাও তো কালো। পুরুষ মানুষ কালো হলে ক্ষতি কী? ইণ্ডিয়ায় তো সবাই কালো।

তবু মেয়ের মন ভিজল না। মিস্টার গাঙ্গুলী মিসেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললে বুলা? গোবিন্দ সাকসেনাকে পছন্দ হয়েছে তো?

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, না।

—কেন?

—বললে আই-সি-এস হলেও কালো ছেলেকে ও মেয়ে বিয়ে করবে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তা বললে না কেন যে আমিও কালো। কালো রঙ দিয়ে কি মানুষের বিচার হবে? পোস্টটা দেখতে হবে না? কত লোক সেলাম করেবে, কত বড় গাড়ি পাবে, কত জায়গায় সভাপতি হবে, কত ফুলের মালা পাবে! যেমন আমি পাচ্ছি।

তা মেয়েও তেমনি একগুঁয়ে। কালোকে কিছুতেই বিয়ে করবে না।

এমনি করে আরো দশটা পাত্রকে বাড়িতে ডেকে ডিনার খাওয়ালেন। কত ডাক্তার, কত ইঞ্জিনিয়ার, কতো বড়-বড় ফ্যামিলির ছেলে, কত এম্ব্যাসির নতুন সার্ভিস পাওয়া ছেলে। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি মিস্টার গাঙ্গুলী।

কেউ কালো, কেউ রোগা, কেউ বেঁটে, আবার কেউ বা গরীব। কাউকেই পছন্দ হলো না বুলার। মেয়ে বড় হয়েছে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছু করা যায় না! গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে হলে তাকে যার-তার গলায় ঝুলিয়ে দিলে চলে, কিন্তু এ তো তা নয়। এমনি করে চলতে-চলতেই একদিন মিস্টার গাঙ্গুলী রিটায়ার করলেন।

সেই রিটায়ারমেন্টকে উপলক্ষ্য করেই আজ এই ফেয়ার-ওয়েল হলো।

সেখান থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এই দুঃসংবাদ!

রাত আটটা বাজল, রাত ন'টা বাজল, শেষকালে রাত দশটাও বাজল।

মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী খেয়েও নিলেন। তাঁরা না খেলে চাকর-বাকর-খানসামা-বাবুর্চি কেউইল খেতে পারে না।

শেষকালে খেয়ে-দেয়ে উঠে তিনি থানায় গেলেন। সেখানে ও-সি খুবই খাতির করে বসালেন। ডায়েরী লেখা হলো মেয়ের ঘটনা দিয়ে।

ও-সি বললে, কিন্তু স্যার, পেছনে কোন লাভ-টাভ ছিল না তো কারো সঙ্গে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, না-না, মেয়ে আমার সে রকম নয়। যে গাড়িতে ওর কলেজে যেত সে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে আসত। কারো সঙ্গে মেশবার সুযোগই তার ছিল না।

—অন্য সময়ে মিস গাঙ্গুলী কী করত?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, বই পড়ত আর আমাদের সঙ্গে মার্কেটিং বা পার্টিতে যেত।

—চিঠি-পত্র?

—না-না, কোনো চিঠি-পত্র তার নামে বাড়িতে আসতে দেখিনি কখনও। আমার মেয়ে অন্যরকম, সে-রকম নয়।

ও-সি বললে, ঠিক আছে স্যার, আমি নিজে এন্কোয়ারি করবো এ ব্যাপারে।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, দেখবেন, যেন বেশি জানাজানি না হয়ে যায়। জিনিসটা বেশি ছড়াক, এটাও আমি চাই না।

ও-সি অভয় দিলে। বললে, না-না, সে আমাকে বলতে হবে না। আমি জিনিসটা খুব সিক্রেট রাখব। একটা কাজ করবেন, একটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটোগ্রাফ শুধু আমাকে দিয়ে যাবেন। আর যদি বলেন তো আমিই কাল ফোটোগ্রাফটা আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারি।

আই-সি-এস হওয়ার অনেক সুবিধে। বাস্তব জীবনে অনেক কাজে লাগে। পুলিশও তাদের সম্মান জানায়। অথচ সাধারণ লোক তাদের কাছে যাক, তখন তারা তেমন খাতির করবে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী জানতেন এ-সব কথা। তাই সমস্ত ব্যাপারেই তার সুযোগ নিতেন। সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর যে নামডাক তা ওই জন্যেই। তিনি যে একজন লেখক,

তার পেছনেও ওই একই কারণ। তিনি জানতেন, যতক্ষণ তিনি তাঁর চেয়ারে থাকবেন, ততক্ষণ বিশ্বসুদ্ধ লোক তাঁর কৃপা পাবার জন্যে উৎসুক থাকবে। তিনি এতদিন সেই সুযোগ-সুবিধেই পেয়ে এসেছেন।

কিন্তু এবার থেকে আর তা হবে না। এবার তাঁর চেয়ার গেল। ফেয়ার ওয়েল পার্টিতে তিনি যত ফুলের মালাই পান না কেন, এ ফুল কাঁটা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পর থেকে তাঁকে আর অফিসে যেতে হবে না। তাঁর অভাবে অফিসও অচল হবে না। সেক্রেটারিয়েট যেমন চলছে, তেমনিই চলবে। তাঁর চেয়ারে এখন থেকে নতুন যে বসবে, তাঁকেই সবাই সেলাম করবে।

জীবনের নিয়মই এই। একজন যায় আর একজন আসে। কারোর অভাবে সংসারে কিছুই অচল হয় না। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ চলে গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক চার্চিল চলে গেছে, জার্মানির হিটলার চলে গেছে, মহাত্মা গান্ধী চলে গেছে, জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত চলে গেছে, তবু কারোর কিছু অসুবিধে হয়নি, তাদের জায়গায় আবার অন্য লোক এসে তাদের চেয়ারেই বসেছে। তবু পৃথিবী চলছে। আগেও যেমন চলেছে, এখনও তেমনি চলছে, এর পরেও তেমনি চলবে।

এসব চিন্তা তিনি রিটায়ার করার আগে থেকেই করছিলেন। এখন আবার নতুন চিন্তা করে লাভ নেই। ভেবেছিলেন ব্যাঙ্কে যা টাকা আছে, তাতে তাঁর জীবনটা চলে যাবে। আর যদি তিনি সে টাকাটা বাড়াতে চান তো ইনভেস্ট করবেন। সবচেয়ে ভালো ইনভেস্টমেণ্ট হচ্ছে শেয়ার মার্কেট। বাজার যখন শেয়ারের দাম কমবে তখন কিনবেন, আর যখন দাম বাড়বে, তখন বেচবেন। বুড়ো বয়সে একটা মোটা পেনসনও পাবেন। তাঁর তো ওই একটাই মেয়ে। মেয়েটার একটা ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।

মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন মেয়েও বুদ্ধিমতী। দেখতেও সুন্দরী। সেদিক থেকে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, যেদিক থেকে দুশ্চিন্তা আসবার কথা নয়, সেই দিক থেকেই চরম দুশ্চিন্তা এলো। এও এক আশ্চর্য ঘটনা।

পুলিশে খবর দেওয়ার পর অনেক দিন কেটে গেল, তবু কোন খবর পেলেন না। মিসেস গাঙ্গুলী সেই দিন থেকেই শয্যা নিয়েছেন আর ওঠেননি।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, ও রকম ভেঙে পড়লে কি চলে? সংসারে দুঃখ-শোক যন্ত্রণা তো আসবেই, যা প্রতি মানুষেরই আসে।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, ভেঙে পড়ব না? তুমি বলছ কী? এতদিন খাইয়ে-পরিয়ে তাকে এতদিন ধরে মানুষ করলুম, আর সে কি না আজ এই রকম করলে? আমি সোসাইটিতে মুখ দেখাব কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে, সোসাইটির কার সঙ্গেই বা এবার থেকে আমাদের দেখা হচ্ছে? আমরা তো আর দিল্লী থাকছি না।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, কিন্তু কলকাতাতেই বা কী করে মুখ দেখাব? সেখানেও তো আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা তো খবরটা শুনলে আহ্লাদে-আটখানা হয়ে নাচবে।

মিস্টার গাঙ্গুলী সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তাদের সঙ্গে না মিশলেই হলো। কোনোদিন তো আত্মীয়-স্বজনদের আমল দিইনি, এবার থেকেও আর তাদের আমল দেব না। চুকে গেল ল্যাঠা।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, আমরা না হয় তাদের আমল দেব না, কিন্তু খবরটা শোনার পর তারা তো নিজে থেকেই আমাদের বাড়ি আসবে, তখন? তারা যদি জিজ্ঞেস করে বুলা কোথায়?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, বলবো বুলার বিয়ে হয়ে গেছে।

—যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় বিয়ে হয়েছে?

—বলবে লণ্ডনে বিয়ে হয়েছে। লণ্ডনে তো আর কেউ দেখতে যাচ্ছে না!

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, দেখ খারাপ খবর আগুনের মত ছড়ায়। তুমি যখন আই-সি-এস হয়েছিলে, তখন তো আত্মীয়-স্বজনের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কোন খারাপ খবর শুনলে দেখবে সকলের মুখে আবার হাসি বেরিয়েছে।

কথাগুলো এত সত্যি যে আর মিস্টার গাঙ্গুলীর মুখে এর কোন জবাব বেরোল না।

পর দিন তিনি আবার পুলিশ স্টেশনে ফোন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন কোনও ট্রেস্ পেলেন আমার মেয়ের?

ওধার থেকে জবাব এলো, না স্যার এখনও হদিস পাইনি, ট্রেস পেলেই জানাব।

মিস্টার গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন যে আর সে-মেয়ের ট্রেস পাবেন না। এখন সে মেজর, এখন আর তাঁর মেয়ের ওপর কোন অধিকার নেই। এখন সে যাকে বিয়ে করতে পারে ম্যারেজ-রেজিস্টারের কাছে গিয়ে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। শুধু তিনজন সাক্ষী হলেই চলে যাবে। হয়তো তাই-ই করে ফেলেছে সে। তার নিজের ইচ্ছে মতো কাউকে হয়তো বিয়ে করেছে।

সাতদিন কেটে গেল। দেখতে-দেখতে একটা মাসও কেটে গেল। এবার তাঁকে কোয়ার্টার ছাড়তে হয়। কোয়ার্টার ছাড়বার নোটিশও এসে গেছে। তিনি ঠিক করলেন কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন।

পরিতোষ একটানা গল্প বলে যাচ্ছিল। এবার একটু থামল। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল?

পরিতোষ বললে খবর পাওয়া গেল কলকাতায়। মিস্টার গাঙ্গুলী দিল্লীর পাট উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। যেখানে একদিন রাজার হালে কাটিয়েছেন সেখানে প্রজার হালে থাকতে তাঁর লজ্জা হবে। তাই চলে এলেন। এসে এখানে আমাদের ক্লাবের মেম্বার হলেন। তখন পেনসনটুকুই যা ভরসা। তবু ঠাট বজায় রাখার জন্যে গাড়িটা রেখে দিলেন। ক্লাবে আসেন স্ত্রীকে নিয়ে। ঠিক যেমন ভাবে দিল্লীতে অফিসার্স ক্লাবে যেতেন তেমনি।

কিন্তু দিল্লী আর কলকাতা আলাদা। দিল্লী হচ্ছে রাজধানী। সেখানে উঁচু-নীচুর মধ্যে অনেক প্রভেদ। সেখানে অফিসারদের বেশি খাতির। কলকাতায় রাজায় আর প্রজায় কোন প্রভেদ নেই। এখানে তুমি বড় হতে পারো কিন্তু আমিও ছোট নই। এখানে মিনিস্টারই হও আর সেক্রেটারিই হও আমি তোমাকে থোড়াই কেয়ার করব। আমিও ট্যাক্সো দিই আর তুমিও ট্যাক্সো দাও। তুমি বেশি ট্যাক্সো দাও আর আমি হয়তো কম ট্যাক্সো দিই এই যা তফাৎ। কিন্তু তাতে কী? কলকাতা হলো সাম্যবাদী শহর। এখানে তুমি যদি গাড়ি চালিয়ে যাও আমি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেমন গল্প করছিলাম তেমনি গল্প করতে থাকবো। তোমার গাড়ি আসছে দেখে আমি আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করবার অধিকার ছাড়ব না। তোমার গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাক। তোমার গাড়ি আছে বলে তোমার বেশি অধিকার, এ-কথা আমরা মানি না।

মিস্টার গাঙ্গুলী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিলেন।

কিন্তু মুশকিল হলো মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে। এখানে এই কলকাতায় এসে তিনি অসুখে পড়লেন। অসুখ মানুষের হয় আবার একদিন সে ওষুধ খেয়ে সেরেও ওঠে।

ক্লাবে সবাই জিজ্ঞেস করলে, কী হলো, মিসেস এলেন না যে? তাঁর কী হয়েছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তাঁর শরীরটা একটু খারাপ।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমন হলো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, কলকাতার জল-হাওয়া মিসেস গাঙ্গুলীর সহ্য হচ্ছে না।

দিল্লীর জল-হাওয়া ভালো।

দিল্লীর জল-হাওয়া যে কলকাতার চেয়ে ঢের ভালো, এ সম্পর্কে সকলেই একমত হলেন। তারপর উঠল সাধারণভাবে জল-হাওয়া নিয়ে আলোচনা। কেউ নাম করলে মধুপুর, কেউ নাম করলে রাজস্থানের, আবার কেউ নাম করলে ভুবনেশ্বরের। জল-হাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে-করতেই সন্ধ্যেটা কেটে গেল। সব ক্লাবে এই রকমই হয়। যারা ড্রিঙ্ক করে, তারা অনেক রাত পর্যন্ত ক্লাবে থাকে। তারপর আছে তাস। তাস খেলায় আবার জয়-পরাজয় আছে। অর্থাৎ টাকা-পয়সার লেনদেন আছে।

মিস্টার গাঙ্গুলীর ও-সব রোগ নেই। তাঁর শুধু সময় কাটানো। তাও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন না বলে কিছু দুঃখ থাকে।

প্রথম দিকে শুধু জ্বর। জ্বর লোকের হয়ে আবার সেরেও যায়। মানসিক আঘাত পেলে সামান্য জ্বরও গিয়ে বেশি জ্বরে দাঁড়ায়। রাত্রে ঘুম আসে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। বলেন, মনে করে নাও না যে তোমার বুলা মরে গেছে। যে আমাদের ওপর এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে, তার কথা আমাদের না ভাবাই ভালো।

কিন্তু ভাবা না-ভাবা কি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে?

তারপর সেই জ্বর একটু কম আসে তো আবার বাড়ে। ডাক্তার ডাকা হয়, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথিই হোক আর কবিরাজীই হোক।

ঘুম থেকে উঠেই মিস্টার গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করেন, আজ কেমন আছ?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, কাল রাত্তিরে এক মিনিটও ঘুম হয়নি। কেবল বুলার কথা মনে পড়ছে। কোথায় আছে কী খাচ্ছে, কী পরছে, সেই কথাই কেবল ভাবছি।

—ও-সব আর ভেবো না। সে এখন মেজর হয়েছে, তার মনে একটা স্বাধীন হবার ইচ্ছে জেগেছে, এখন সে যা খুশি করতে পারে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, বুলা এমন করবে যদি জানতুম, তা'হলে তো আগেই ধরে-বেঁধে তার বিয়ে দিয়ে দিতুম।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেন, সে চেষ্টা তো আমরা কতবার করেছি, সেই গোবিন্দ সাকসেনার মতো পাত্রকেও সে কালো বলে রিজেক্ট করে দিলে। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে।

মিসেস গাঙ্গুলী বিছানা থেকে উঠতেন না তখন। কেবল মনে পড়ত মেয়ের কথা। কোথায় না জানি সে কত কষ্টে আছে। সকালবেলা এক কাপ দুধ খাওয়া ছিল তার অভ্যেস। চান করবার আগে দুধের সর আর কমলালেবুর খোসা একসঙ্গে বেটে সারা শরীরে মাখত গায়ের চামড়া ভালো থাকবে বলে। কলেজ থেকে এসে পেস্তা-বাদাম-আঙুর-আপেল ছিল তার দৈনিক জলখাবার। মেয়ের জন্যে কত কী করেছে বাপ-মা। সেই সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল?

ক্লাবে একলা এসে বসতেন মিস্টার গাঙ্গুলী। ড্রিঙ্ক করবার অভ্যেস কোনদিনই ছিল না তাঁর। থাকলে ভালো হতো। তিনি অন্ততঃ মদ খেয়েও সমস্ত ভুলে থাকতেন।

কলকাতার পুলিশ একদিন এসে খবর দিয়ে গেলে, আপনার মেয়েকে পাওয়া গেছে, আপনার ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিলে গেছে।

চমকে উঠলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, কোথায় আছে?

পুলিশের ও-সি বললে, কড়েয়ার একটা বস্তিতে।

—সে কী! আমার মেয়ে বস্তিতে আছে?

পুলিশ বললে, আপনি একবার চলুন স্যার সেখানে।

—সঙ্গে কে আছে?

পুলিশ বললে, একটা মোটর মেকানিক্ক। একটা কারখানায়—

—সে কত টাকা মাইনে পায় যে, আমার মেয়েকে নিয়ে সংসার চালায় ?

পুলিশ বললে, কোন রকমে চালায়, মাইনে তো বেশি পায় না। আর আপনার মেয়ে তো হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে।

—হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে ? অবাক কাণ্ড!

সেদিন পুলিশ মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কড়েয়ার বস্তিতে গেলেন। ঠিক বস্তির সামনে একটা ছোট পুরানো একতলা বাড়ি। সেখানেই তাঁর মেয়ে থাকে ভেবে চোখ দিয়ে তাঁর জল এসে গেল। যে-মেয়েকে তিনি অত আদরে মানুষ করেছিলেন, অত আরামে যে-মেয়েকে রেখেছিলেন, সেই মেয়ে কিনা এই রকম বাড়িতে থাকে! এটা ভাবতেও তাঁর লজ্জা হলো। দরজার কড়া নাড়তেই একজন ঝি ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে।

পুলিসের লোকের সাদাসিধে পোশাক। পুলিশ বলে চেনা যায় না।

জিজ্ঞেস করলে, বিজনবাবু বাড়িতে আছেন ?

ঝি-টা বললে, বাবু তো অফিসে গেছেন।

—কখন আসবেন ?

—বাড়ি আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

—আর তোমার মা ?

—মা কোর্টে গেছেন।

—তুমি কি এ বাড়িতে কাজ করো ?

—হ্যাঁ।

—তোমার মা কখন কোর্টে যান ?

ঝি-টা বললে, সকাল সাড়ে দশটার পর।

—এ-বাড়ির ভাড়া কত ?

ঝি-টা বললে, তা জানি না আমি।

মিস্টার গাঙ্গুলী এতক্ষণ কিছুই বলছিলেন না। তিনি শুধু চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এই পাড়া, এই বস্তি, এই কষ্ট—এ কেমন করে সহ্য করলে বুলা! এর পর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

পুলিশের সঙ্গে মিস্টার গাঙ্গুলীও চলে এলেন। জীবনে তিনি অনেক লোককে কষ্ট দিয়েছেন, অনেক কংগ্রেস নেতাকে জেলে পুরেছেন। আসামে থাকবার সময় কত মানুষের ওপর অত্যাচার করেছেন। কত লোক কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় তাদের গুলি মেরে খুন করেছেন। কত স্ত্রীকে বিধবা করেছেন, তখন কান্না আসেনি। কিন্তু আজ নিজের মেয়ের এই দুর্দশা দেখে তাঁর কান্না পেল।

সন্ধ্যেবেলায় বিজন কারখানা থেকে ফিরল। সাধারণতঃ সে-ই আগে আসে। সারাদিন কারখানা কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এই সময় বাড়িতে এসে চান করে নিয়ে আবার সেজে-গুজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

তারপর বাড়ি আসে বুলা। সারাদিন হাইকোর্টে মক্কেল আর জজদের এজলাসে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বাসে চড়ে বাড়িতে এসে পৌঁছোয়।

সেদিন বিজন সরকার বাড়িতে আসতেই অচলা খবরটা দিলে। বললে, আজকে সকালে দু'জন বাবু এসেছিল আপনাকে খুঁজতে।

—আমাকে ? বিজন সরকার একটু অবাক হয়ে গেল। বললে, আমাকে খুঁজতে এসেছিল, না তোমার দিদিমণিকে ?

অচলা বললে, দু'জনের নামই করলে। দু'জনকেই খুঁজছিল, আর জিজ্ঞেস করছিল

এ বাড়ির ভাড়া কত?

—তুমি কী বললে?

—আমি বললুম দাদাবাবু কারখানায় আর দিদিমণি হাইকোর্টে গেছে।

—আর কিছু বললে না? বাড়ির ভাড়া তুমি কত বলেছ?

—আমি বলেছি আমি জানি না।

খানিক পরে বুলাও এসে গেল। যেদিন থেকে সে হাইকোর্টে যেতে আরম্ভ করেছে, সেইদিন থেকেই তার ভালো সিনিয়র জুটে গিয়েছিল।

সমীর ব্যানার্জী হাইকোর্টের নাম করা এ্যাডভোকেট। তিনি বিশেষ সুনজরে দেখেছিলেন শবরী সরকারকে। তিনি বলে দিয়েছিলেন, প্রথমেই কিছু আশা করো না মা। প্রথম-প্রথম তোমার খুবই অসুবিধে হবে, কিন্তু হতাশ হয়ো না। আমি যখন হাইকোর্টে প্রথম ঢুকি, তখন বাসে-ট্রামের ভাড়াটাও এক-একদিন উঠত না। কিন্তু হতাশ হইনি আমি। তুমিও ধৈর্য ধরে থেকো, একদিন সাক্সেস আসবেই। সাক্সেস এলে তখন আরো সাবধানে থাকতে হবে। এ বড় পরিশ্রমের কাজ।

সত্যিই প্রথম দু'বছর খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছিল শবরী সরকারকে। দিনেবেলা সিনিয়ার এ্যাড্ভোকেট সমীর ব্যানার্জীর সঙ্গে কোর্টে ঘুরতে হতো। তারপর তাঁর বাড়িতে যেতে হতো সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করে অনেকদিন রাত দশটা-এগারোটার আগে উঠতে পারেনি। তারপর ফাইল নিয়ে বাড়ি যেতে হয়েছে। রাত জেগে-জেগে আইনের বই ঘাটতে হয়েছে।

তখন অনেক রাত। বিজন বলত, এখনও জেগে আছ? শোবে না তুমি?

শবরী বলেছে, আজকে একটু বেশী খাটতে হবে, বড় শক্ত কেসটা।

সে-সব দিনের কথা মনে ছিল শবরীর। তখন সবে বিজনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। বাবা-মা তাকে খুঁজবে, পুলিশে দেবে, সবই সে জানত। জানত, বাবা তার প্রতিশোধ নেবেই একদিন।

প্রথমে ভেবেছিল তারা দু'জনে ইণ্ডিয়ার বাইরে চলে যাবে। কিন্তু টাকা? পাসপোর্ট? সে-সব ব্যবস্থা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। জানাজানিও হবে যাবে। অনেক ধকল, অনেক হয়রানি তাতে। তার চেয়ে কলকাতায় চলে যাওয়া ভালো। সেখানে মানুষের ভিড় সবচেয়ে বেশি। সেখানে লুকিয়ে থাকা সহজ। মানুষের ভিড়ে কেউ তাদের দেখতে পাবে না। বিজন একটু ভয় পেয়েছিল। বলেছিল, যদি আমাকে জেলে পুরে দেয় তোমার বাবা? তোমার বাবা তো আবার আই-সি-এস।

শবরী বলেছিল, আমি তো আছি, আমি তোমাকে বাঁচাব।

বড় ভীতু মানুষ বিজন সরকার। দিল্লীর এক মোটরের কারখানায় সামান্য একটা মিস্ত্রীর কাজ করত সে। সামান্য চার টাকা রোজের চাকরি।

প্রথম যেদিন দেখা সেদিনই ভালো লেগেছিল শবরীর। কলেজ থেকে ফেরবার পথে মাঝরাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার গাড়িটা ঠেলতে-ঠেলতে কারখানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল।

গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে গেলে কারখানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিগড়ানো গাড়িটা ঠেলতে-ঠেলতে যখন কারখানায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন বিজন সরকারই প্রথম দৌড়ে এসেছিল সাহায্য করতে। ড্রাইভার ইব্রাহিম একলা ঠেলে তুলতে পারছিল না কারখানার ভেতরে। বিজনকে ডাকতে হয়নি। সে নিজে থেকে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, কার গাড়ি?

বিজন বুঝে নিয়েছিল, ভেতরে যে বসে আছে সে আই-সি-এস গাঙ্গুলী সাহেবের

মেয়ে। গাড়ির বনেট খোলবার আগেই বিজন বলেছিল, আপনি গরমে বসে থাকবেন কী করে? আপনার কষ্ট হবে।

শবরী বলেছিল, না, আমার কষ্ট হবে না।

বিজন বলেছিল, না, এই গরমে অতক্ষণ গাড়ির ভেতরে বসে থাকবেন কী করে? তার চেয়ে আমি একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি, আপনি সেখানে বসুন, পাখার তলায় আরাম করতে পারবেন—বলে কারখানার টিনের শেডের তলা থেকে একটা গদি মোড়া হ্যাণ্ডেলওয়ালা চেয়ার এনে দিলে। তারপর মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা খুলে দিলে। শবরীর বেশ আরাম হলো হাওয়ার তলায় বসে।

বিজন বললে, একটু ঠাণ্ডা জল খাবেন?

শবরী বললে, না।

বিজন বললে, তা'হলে একটু সরবৎ খান—বলেই সে উধাও হয়ে গেল। আর তারপর একটা ঠাণ্ডা থামস্-আপের বোতল এনে বললে, এটা খান।

শবরী বললে, এটা আবার আনতে গেলেন কেন? এর দাম কত? বলে নিজের ব্যাগ থেকে দু' টাকা বার করে দিতে গেল।

বিজন সরকার মাথা নাড়ল। বললে, দাম আপনাকে দিতে হবে না, ওটা আপনি ঘামছেন দেখে এমনিই দিলাম।

শবরী তবু আপত্তি করতে লাগল। বললে, না তবু আমি এ খেতে পারব না—

বিজন সরকার বললে, তা'হলে মনে করে নিন কোম্পানি আপনাকে খাওয়াচ্ছে।

শেষকালে পাখার তলায় বসে শবরী সরবৎটা খেয়ে নিলে। আর বসে-বসে দেখতে লাগল বিজন সরকারকে।

বিজন সরকারের পরণে তখন চিট্ ময়লা একটা শার্ট-প্যাণ্ট, আর খালি গা। সে তখন গাড়ির বনেট খুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে। তার শরীরের নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাস্‌লগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে। আগে বিজনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শবরী, এবার মুগ্ধ হয়ে গেল তার শরীরের গড়ন দেখে।

প্রায় আধ ঘণ্টা শবরীকে সেই পাখার তলায় ধুলো-ময়লার মধ্যে বসে থাকতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু এক পলকের জন্যেও বিজনের স্বাস্থ্যের দিক থেকে তার নজর সরে যায়নি। তারপর গাড়ি সারানো শেষ হলে বিজন সরকার এসে বললে, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, আপনাকে কষ্ট দিলুম।

শবরী বললে, কত লাগবে।

বিজন সরকার বললে, টাকা এখন দিতে হবে না।

—কখন দিতে হবে?

বিজন সরকার বললে, আমি বিল দিলে তখন টাকা দেবেন।

—কবে বিল দেবেন?

বিজন সরকার বললে, সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক সময় মতো বিল নিয়ে আপনার বাড়ি যাব।

ইব্রাহিম তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। বিজন সরকার বললে, আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, গরমের মধ্যে আপনার খুব কষ্ট হলো।

শবরী বললে, না, কষ্ট আর কিসের? গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে।

—আচ্ছা নমস্কার। এবার থেকে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল আমার কারখানায় দেবেন। এটা আমারই কারখানা।

শবরী বললে, বাবাকে তাই-ই দিতে বলব, আচ্ছা নমস্কার।

তারপরে একদিন কলেজ যাবার মুখে শর্বরী ইব্রাহিমকে বললে, ইব্রাহিম সেই মোটরের কারখানায় একবার চল্ তো।

ইব্রাহিম গাড়ি নিয়ে সেই কারখানায় গিয়ে উঠল। গাড়ি দেখেই দৌড়ে এলো বিজন সরকার। সে তখন অন্য গাড়ি মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিল। সে কাজ ছেড়ে এসে বললে, নমস্কার। গাড়ির আবার কী খারাপ হলো?

শর্বরী বললে, নমস্কার। গাড়ির কিছু খারাপ হয়নি, শুধু বলতে এসেছি আপনি বিল তো পাঠালেন না?

সেদিনও বিজন সরকারের সেই পোশাক। শুধু একটা চিট্ ময়লা শার্ট-প্যান্ট আর মাস্‌লভর্তি দেহ। সে বললে, তাড়াতাড়ি কিসের? একটু হাত খালি হলেই আমি নিজে গিয়ে আপনাদের বাড়িতে বিল দিয়ে আসব।

শর্বরী বললে, আমি ভাবলাম আপনি হয়তো ভুলে গেছেন।

বিজন সরকার বললে, না, মাসকাবার হলে তখন যাব ভাবছিলাম।

শর্বরী বললে, মাসকাবার হবার দরকার কী? আমি টাকা এনেছি আজ। নেবেন?

বিজন সরকার বললে, না, এখনও বিল তৈরি করবার সময় পাইনি। দিনে-দিনে কাজ বাড়ছে। সেই সকাল ন'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করতে হয় আমাকে।

শর্বরী বললে, আমার ঠিকানা জানেন তো?

বিজন সরকার বললে, আপনাদের ঠিকানা কে না জানে! আই-সি-এস মিস্টার গাঙ্গুলীর নাম বললে একবাক্যে সবাই বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে, আসবেন একদিন—এই বলে শর্বরী কলেজ চলে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ বিজন সরকার বাড়িতে এসে হাজির। আয়ার কাছে খবর পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো শর্বরী। দেখলে বিজনের একেবারে অন্য রকম চেহারা। পরণে সেই চিট্ ময়লা শার্ট-প্যান্ট নেই। বেশ লম্বা ডোরা-ডোরা দাগের টেরিকটের প্যান্ট, গায়ে লাল রঙের স্পোর্টস শার্ট।

—ও আপনি? আমি চিনতেই পারিনি।

হাসতে লাগল বিজন সরকার। বললে, আই-সি-এস দের বাড়ি ওই পোশাক পরে আসতে লজ্জা করে।

শর্বরী বললে, সেদিন সেই পোশাকটাই কিন্তু দেখতে বেশি ভালো লেগেছিল।

বিজন সরকার বললে, আমরা মিস্ত্রী মানুষ, কালি-ঝুলি ময়লা নিয়ে আমাদের কাজ। তাই কারখানায় যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ ওই বিশ্রী পোশাক পরে থাকি। কিন্তু ওই পোশাকে এখানে আসতে লজ্জা করল।

শর্বরী বললে, কী খাবেন বলুন? চা না কফি?

বিজন সরকার বললে, কিছুই খাব না।

শর্বরী বললে, তা হতে পারে না। আপনি সেদিন আমাকে থামস্-আপ খাইয়েছিলেন, সে কি আমি ভুলে গেছি মনে করেছেন? কিছু খেতেই হবে। চা-কফি না খান একটা থামস্-আপ আনিয়ে দিই।

বিজন আবার হাসল। বললে, ধার শোধ দিচ্ছেন? সেদিন ভাগ্যিস আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই তো আজ এত বড়লোকের বাড়িতে ঢোকবার সুযোগ হলো। নইলে মোটর-মিস্ত্রীদের কেউ মানুষই মনে করে না।

শর্বরী ততক্ষণে আয়াকে থামস্-আপ কিনে আনতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বললে, এইবার আপনার বিলটা দিন।

বিজন সরকার বললে, অত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? আমাকে বুঝি

শীগগির-শীগগির তাড়িয়ে দিতে চান?

শবরী বললে, না-না, সে কী! আপনি থামস্-আপ খেয়ে তবে যাবেন, আমি আয়াকে আনতে দিয়েছি।

বিজন সরকার পকেট থেকে বিলটা শবরীর দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

শবরী বিলটা দেখে অবাক। বললে, এ কী? মাত্র দশ টাকা চার্জ।

বিজন সরকার বলল, দশ টাকাই হয়েছে, তাই দশ টাকা চার্জ করেছি।

শবরী কথাটা বিশ্বাস করলে না। বললে আপনি আধঘণ্টা খাটলেন গাড়ির পেছনে আর চার্জ করলেন মাত্র দশ টাকা। জানেন না, আই-সি-এস বা বড়লোক। এত কম চার্জ করলে তাদের যে খারাপ লাগে?

বিজন সরকার বললে সে কী।

—হ্যাঁ। তাতে তাদের ইজ্জতে ঘা লাগে। আই-সি-এস-দের যদি পেটের অসুখ হয়, তো সেটা তাদের লজ্জা। পেটের অসুখ হবে গরীব লোকদের। কারণ তারা গরীব লোক, আজে-বাজে জিনিস খায়। আর বড়লোকদের রোগ হলে হবে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, কিংবা ডায়াবেটিস কিংবা ব্লাডপ্রেসার। বড়লোকদের বড়-বড় রোগ না হলে তাতে তাদের লজ্জা করে। আপনি আমাদের কী বলে মোটর সারানোর চার্জ করলেন দশ টাকা?

বিজন সরকার বলল, এ আমি নতুন কথা শুনছি আপনার মুখ থেকে।

শবরী বললে, কেন আপনি জানেন না ডাক্তাররা বড়লোকদের অসুখ হলে দামী-দামী ওষুধ প্রেসক্রাইব করে আর সেই একই রোগ গরীব লোকদের হলে কম দামী সস্তার ওষুধ লিখে দেয়?

বিজন সরকার বললে, এ আমি আপনার কাছ থেকে এই প্রথম শুনলুম।

শবরী বললে তা এর সঙ্গে থামস-আপের দামটা তো যোগ করেন নি।

ততক্ষণে ট্রেতে করে আয়া একটা থামস-আপ এনে সামনে ধরল।

বোতলটি নিয়ে বিজন সরকার বললে এই তো তার দাম শোধ হয়ে গেল। তারপর একটু থেমে বললে যাক আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না মিস্টার গাঙ্গুলী কোথায়? বাড়ি আছেন?

—না তিনি তো এখন অফিসে।

বিজন সরকার বললে তাহ'লে বিলটা তাঁকে দিয়ে দেবেন। আমি অন্য আর একদিন এসে টাকা নিয়ে যাব।

শবরী বললে বাড়িতে মিস্টার গাঙ্গুলীও নেই, মিসেস গাঙ্গুলীও নেই। তিনি গেছেন মার্কেটিং করতে। এখন শুধু মিস গাঙ্গুলী বাড়ি আছে। মিস গাঙ্গুলীই আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে—বলে সে ভেতরে চলে গেল।

তারপর খানিকক্ষণ পরেই একটা দশ টাকার নোট এনে বিজন সরকারের হাতে দিলে। নোটটা নিয়ে বিজন সরকার দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর দরজার দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল। বললে একটা কথা রাখবেন?

—কী?

বিজন সরকার বললে আপনার গাড়ি যখনই খারাপ হবে তখনই কারখানায় পাঠাবেন।

শবরী বললে, আর যদি গাড়ি খারাপ না হয়?

বিজন সরকার হেসে বললে, তাহ'লে এখন আমার দুর্ভাগ্য। গাড়ি খারাপ না হলে তো আর শুধু-শুধু আপনাকে কারখানায় যেতে বলতে পারি না।

শবরী বললে, গাড়ি ঘন-ঘন খারাপ হলে তো আমারও ভালো।

—কেন?

শবরী বললে, তাহ'লে এক বোতল থাম্‌স্‌-আপ ফ্রি খেতে পারব।

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

তারপর বিজন সরকার তার স্কুটারে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তারপর মজা এই যে তারপর থেকে গাড়িটা প্রায়ই খারাপ হতে লাগল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, শবরী, তোমার গাড়িটা রোজ-রোজ খারাপ হয় কেন?

শবরী বললে, আমি তা কী করে বলব?

ইব্রাহিমকে ডাকলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, দিদিমণির গাড়ি খারাপ হয় কেন ভালো করে সারাও না কেন? কোন্ ওয়ার্কশপে দাও তুমি?

ইব্রাহিম বললে, হুজুর, গাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে, নতুন মডেল কিনলে ভালো হয়।

মিস্টার গাঙ্গুলীও তাই বললেন মেয়েকে। বললেন, তোমায় একটা নতুন গাড়ি কিনে দিতে হবে বুলা। ওটা পুরনো হয়ে গেছে। ইব্রাহিম বলছিল।

শবরী বললে, না-না বাবা, নতুন গাড়ি কিনো না। পুরনো গাড়ি হলেও এই গাড়িটা পয়া।

—কেন, কী করে বুঝলে এ গাড়িটা পয়া?

শবরী বললে, এই গাড়িটা করে আমি যেখানে গিয়েছি, সেখানেই সাক্‌সেসফুল হয়েছি। আই-এ, বি-এ যত পরীক্ষা দিয়েছি, সবগুলোতে ভালো রেজাল্ট করেছি।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, তা পয়া হলে কি চিরকাল এই গাড়িটাই রাখতে হবে? গাড়িটারও বয়েস হচ্ছে। নতুন একটা গাড়ি ওকে কিনে দাও।

শবরী বললে, না মা, আগে ল'টা পাশ করে নিই। তখন গাড়ি বদলাব। এটা সত্যিই খুব পয়া গাড়ি।

আসলে সে গাড়ি নিয়ে সারাতে যাবার নাম করে বিজন সরকারের সঙ্গে দেখা করাটাই শবরীর উদ্দেশ্য ছিল, সেটা প্রকাশ করা যায় না। শবরী গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই ইব্রাহিমকে বলত, ওই শব্দটা কিসের হচ্ছে ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম বুঝতে পারত না। বলতো, কিসের শব্দ? কোথায় শব্দ? আমি তো কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

গাড়িটা নিয়ে ইব্রাহিম কারখানায় যেত। বিজন বলত, আবার কী হলো?

শবরী বলতো, গাড়ির চাকায় কী রকম একটা শব্দ হচ্ছে।

ইব্রাহিম ধরতে পারতো না কিছুই।

বিজন সরকার বলতো, তাহ'লে তো গাড়িটা চালিয়ে দেখতে হবে।

ইব্রাহিম কারখানায় বসে থাকতো। আর বিজন সরকার শবরীকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত। গাড়ি চালাতে-চালাতে অনেক দূর চলে যেত। বিজন সরকার বলতো, কই, কোথাও শব্দ পাচ্ছি না তো?

শবরী বলতো, ইব্রাহিম যখন চালাচ্ছিল তখন কিন্তু শব্দ হচ্ছিল, আরো একটু জোরে চালান তো।

বিজন সরকার আরো জোরে চালাতো। তারপর দিল্লী ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর গ্রামের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যেত গাড়িটা।

পরিতোষ গল্প বলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, তারপর?

তারপর যা হয় তাই-ই হলো। বাবা-মা কেউই কিছু জানতে পারলে না।

একদিন শবরী বললে, আজকে সেক্রেটারিয়েটে আমার বাবার ফেয়ারওয়েল। চলো, আজকেই পালিয়ে যাই। বিকেলের আগে না গেলে সবাই জানতে পারবে। তখন বাড়িতে বাবাও থাকবে না, মা-ও থাকবে না।

বিজন সরকার আগে থেকেই তৈরি ছিল। তার অতদিনকার নিজের হাতে-গড়া কারখানাটা বিক্রি করে সব টাকাটা পকেটে রেখে দিয়েছিল। সত্যিই অনেক দিনের অমানুষিক পরিশ্রম করা টাকা। বেচে দিতে একটু কষ্ট হয়েছিল তার। টাকা তো নয় যেন নিজের গায়ের রক্ত। গায়ের রক্ত বললেও কম বলা হবে। একদিন খালি হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। বাঙালী ছেলে, বিজন সরকার। না কেউ সহায়, না কেউ সম্বল। ময়লা প্যান্ট পরে মোটর সারাতো। আর প্রথম-প্রথম অল্প টাকায় মোটর সারাতো। তাতেই কয়েকটা বাঁধা খদ্দের জুটে গিয়েছিল। তাতেই তার পেট চলতো।

কিন্তু যেদিন থেকে শর্বরীর গাড়ি এসে তার কারখানায় ঢুকলো, সেই দিন থেকেই সে রোজ-রোজ দাড়ি কামাতে লাগলো। সেই দিন থেকেই দু-একটা জামা-প্যান্ট কিনতে লাগলো। বিজন সরকার যেদিন বিল নিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলীর বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন নতুন টেরিলিনের শার্ট আর প্যান্ট কিনে নিয়ে তাই পরেই গিয়েছিল। সেই দিনই বোঝা গিয়েছিল শর্বরী মরেছে। আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

তারপর থেকে শর্বরীর গাড়ি কারণে-অকারণে তার কারখানায় আসতে লাগলো। তখন থেকেই তার নিজের দারিদ্রের জন্যে লজ্জা হতে লাগলো।

বিজন সরকার জিজ্ঞেস করেছিল, পালিয়ে কোথায় যাবে?

শর্বরী বলেছিল, কোথায় আর যাবো, কলকাতায়, সেখানে গেলে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। তুমি সেখানে গিয়ে একটা কারখানায় কাজ নেবে, আর আমি হাইকোর্টের প্র্যাকটিশ করবো।

বিজন সরকার বলেছিল, কোথায় গিয়ে উঠবো? বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে?

শর্বরী বলেছিল, কেন পাওয়া যাবে না? পয়সা দিলে কোথায় কী না পাওয়া যায়? যতদিন বাড়ি না পাওয়া যায় ততদিন হোটেলে থাকবো। টাকা তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে অনেক।

হ্যাঁ, শর্বরীর অনেক টাকা ছিল ব্যাঙ্কে। সে সেদিনই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়েছিল। বিজন সরকারের কাছেও কারখানার বিক্রির টাকা রয়েছে।

তারপর দিল্লী স্টেশনে ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা। ট্রেনে উঠে শর্বরী বললে, আর খানিক পরেই বাবা-মা এসে খোঁজাখুঁজি করবে।

বিজন সরকার বলেছিল, তারপর তাঁরা পুলিশে খবর দেবেন।

শর্বরী বলেছিল, পুলিশে এখনই খবর দেবে না। কারণ তাতে জানাজানি হয়ে যাবে। খবর যদি পুলিশকে দেয় তো দু-তিন দিন পরে। ততক্ষণে আমরা কলকাতায় পৌঁছে হোটেলে উঠে পড়েছি। হোটেলে আমাদের আসল নাম লিখাবো না।

বিজন সরকার বললে, তার মধ্যেই বিয়েটা সেরে নিতে হবে।

শর্বরী আইন পাস করা মেয়ে। তাকে আইন শেখাতে হবে না কাউকে। সে জানে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে এমন একজন মানুষকে যার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। বাবা-মা জীবনে কখনও তাকে জামাই বলে গ্রহণ করবে না। সে জানতো সে নাবালিকা নয়। তার বয়েস হয়েছে। সে যা করতে যাচ্ছে, তার সব দিক ভেবেচিন্তেই করছে।

অনেক সময়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে মেয়েরা একটা চিঠি লিখে রেখে যায়, 'আমাকে তোমরা খোঁজ করো না। আমি নিজের ইচ্ছেয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' কিন্তু এক্ষেত্রে তারও দরকার নেই।

জীবনে যে বাবা-মার কাছে কখনও সে অনাদর পেয়েছে তা নয়, বরং উল্টে বাবা-মার চোখের মণি সে। তার ভবিষ্যৎ নিয়েই ছিল বাবা-মার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা। অনেক সম্ভাব্য পাত্র সে দেখেছে, কিন্তু বিজন সরকারের মতো এমন স্বাস্থ্য, এমন ভালো

ব্যবহার আর কারো কাছ থেকে পায়নি।

এতক্ষণ আমি পরিতোষের গল্প শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, এরপর তুমি তার মানসিক অবস্থা নিয়ে অনেক পাতা লিখতে পারবে। সেগুলো আমি তোমায় বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু বলি যে তাদের দু'জনের ভাগ্যটা খুব ভালো। তাদের মাত্র দু'দিন হোটেলে কাটাতে হলো। তারপরেই একশো কুড়ি টাকা ভাড়ায় করোয়াতে একটা পাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল।

তারপর বিয়ে। বিয়েতে তিনজন সাক্ষীর দরকার। তা তাও জোটাতে বেশি বেগ পেতে হলো না। যে কারখানায় বিজন সরকার চাকরি পেলে সেখানকারই তিনজন সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালো। একটা উৎসব নেই, একটা সানাই-বাজনা নেই, কিংবা আলোর লাল-নীল রোশনাইও নেই। এমন কি খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাটও নেই। এ বিয়ে শুধুই বিয়ে।

বলতে গেলে বিয়ে তাদের আগেই হয়ে গিয়েছিল, যখন শর্বরীকে নিয়ে গাড়ি চালাতে-চালাতে দিল্লী ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামে কোন গাছের তলায় বসে-বসে তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প বলতো। এবার সরকারী ছাপ-মারা বিয়ে। সুতরাং এর মধ্যে যেমন বাইরের আড়ম্বর থাকে, তা নেই। শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান। আর সে অনুষ্ঠান যত সহজ, যত সরল হতে পারে তাই। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর বিজন সরকার যেমন চাকরি করতে লাগলো, তেমনি একজন সিনিয়ার উকিলের জুনিয়ার হয়ে শর্বরী হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে লাগলো।

এ সেই সময়ের কথা। শর্বরী কোর্ট থেকে সিনিয়ারের বাড়িতে কাজ করে বাড়ি আসতে রাত হয়ে গেল সেদিন। আসতেই বিজন বললে, জানো, আজকে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

শর্বরী বললে, কী কাণ্ড?

বিজন বললে, অচলা বলছিল বিকেলবেলা দু'জন এসেছিল আমাদের খুঁজতে।

শর্বরী বললে, আমার কোন নতুন মক্কেল নয়তো?

বিজন বললে, মক্কেল কেন বিকেলে আসতে যাবে? তাহ'লে সে কোর্টে যেত।

—তাহ'লে কে?

বিজন বললে, আমার মনে হচ্ছে তোমার বাবা!

—আমার বাবা? রিটায়ার করে কলকাতা এসেছেন?

বিজন বললে, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

শর্বরী বললে, তাহ'লে তো ভালোই হয়েছে। এইবার সোজাসুজি বোঝাপড়া হয়ে যাবে। এতদিন যে ভয় ছিল তা কেটে যাবে। কী বলে গেছেন অচলাকে?

—বলে গেছেন আবার কালকে তাঁরা সকাল-সকাল আসবেন।

সমস্ত রাতটা উদ্বিগ্নতায় কাটলো দু'জনেরই। ভোর হবার আগেই দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে তৈরি হয়ে নিলে।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে না বিজন। তার কারখানায় সকাল আটটার মধ্যে হাজিরা। রইল শুধু শর্বরী। অচলা রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

একজন মক্কেল এল সকাল ন'টার সময়। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে শর্বরী। এমন সময়ে বাবা হঠাৎ এসে হাজির। বাবাকে দেখে শর্বরীর মনে হলো এই ক'টা বছরেই বাবা যেন একটু বেশি বুড়ো হয়ে গেছে।

—বুলা! বাবার সেই অনেক কাল আগের আদরের ডাক।

বাবা বললেন, তুমি এখানে? আমি কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি তা জানো? বলে বাবা চারিদিকে দারিদ্র্যের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, তোমার একটু দয়া-মায়া নেই বুলা? তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। তিনি আর

বেশি দিন বাঁচবেন না। আমি তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।

বুলা বললে, আমি তোমার বাড়িতে গেলে আমার বাড়ি কে দেখবে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে, কিন্তু তোমার নিজের মা, তার অসুখে একবার দেখতে যাওয়া কী তোমার উচিত নয়?

—মা'র কী অসুখ হয়েছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হজম হয় না, ঘুম হয় না, আর বেশিদিন বোধহয় বাঁচবেনও না। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, তো এখনই একবার চলো।

—তুমি ডাক্তার দেখাচ্ছো তো?

—ডাক্তার তো দেখছেই। কিন্তু অসুখটা তোমার জন্যেই—

—আমার জন্যে কেন?

—তোমার জন্যে না তো কী? তুমি না বলে-কয়ে আমাদের ছেড়ে চলে এলে, মনের ওপর কতখানি চাপ পড়েছে বলো তো? তুমিই তো আমাদের একমাত্র সন্তান। তুমি চলে গেলে কষ্ট পাবো না আমরা?

বুলা বললে, আমি যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তখন একদিন না একদিন আমাকে পরের বাড়িতে বউ হয়ে চলে যেতে হতোই, তখন?

—কিন্তু এই কী আমার মতো একজন আই-সি-এসের মেয়ের যোগ্য শ্বশুরবাড়ি? আমি কী তোমাকে এই রকম একজন লোফারের সঙ্গে বিয়ে দিতুম? তোমাকে আই-এ-এস কি ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিতুম।

বুলা রেগে বললে, তুমি কী আমাদের গালাগালি দেবার জন্যই এখানে এসেছ?

—আমি তো তোমাকে গালাগালি কিছু দিইনি।

বুলা বললে, গালাগালি তুমি আমাকে দাওনি বটে, কিন্তু আমার স্বামীকে গালাগালি দিলেও তো সেটা আমার গায়েই লাগে।

মিস্টার গাঙ্গুলী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উত্তেজনায় তিনি থর-থর করে কাঁপছিলেন। এবার একটা খালি চেয়ার দেখে তাতেই বসে পড়লেন তিনি। বললেন, তুমি যাকে তোমার স্বামী বলছো সে কী তোমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়ের যোগ্য? আমি তোমাকে যে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, তার কী এই ফল?

বুলা বললে, আমি তোমাকে আবার বলছি, আমার স্বামীকে গালাগালি দিলে সেটা আমার গায়েই লাগে।

—তেমন স্বামীর মতো স্বামী হলে আমি কিছু বলতুম না, কিন্তু এ যে একজন অশিক্ষিত মোটর মেকানিক!

বুলা বললে, কে শিক্ষিত, কে অশিক্ষিত তা বোঝবার মতো বয়েস আর শিক্ষা আমার হয়েছে। নইলে নিজের ইচ্ছেয় আমি তাকে বিয়ে করতুম না।

—তাহ'লে বুঝতে হবে তোমার বয়েসও হয়নি আর উচিত শিক্ষাও হয়নি। তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মনে হয়, আমি শুধু টাকাই নষ্ট করেছি।

বুলা বললে, তোমার কী মনে হয় না-হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

—যাক্ এ বিষয়ে তর্ক করে সময় নষ্ট করবো না; আর তর্ক করে কোন লাভও নেই। আমি চাই তুমি আমার বাড়িতে ফিরে এসো। আর ডিভোর্সের ব্যবস্থা যদি করতে হয়, তাহ'লে তার ব্যবস্থাও আমি করে দিতে পারি।

বুলা বললে, বাবা তুমি ভুলে যাচ্ছো যে, আমি একজন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ডিভোর্স করবার দরকার হলে আমি নিজেই তা করতে পারি। কিন্তু তার দরকার হবে না। আমার স্বামী মোটর মেকানিক হতে পারে, কিন্তু সে সত্যিকারের ভালো মানুষ।

—কী যা তা বকছো তুমি?

বুলা বললে, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আই-সি-এস তো তোমার কল্যাণে অনেক দেখেছি। তারা সবাই শিক্ষিত মানুষ আর মোটর মেকানিক হলেই তারা অমানুষ, এ আমি বিশ্বাস করি না। ভুলে যেও না যে মানুষের পেশা দিয়ে মানুষের বিচার হয় না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, এখন বুঝেছি তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি ভুল করেছি। কিন্তু যা করেছি, তা করেছি, এখন আমার অনুরোধ তুমি তোমার মাকে একবার দেখতে চলো।

বুলা বললে, তা আগে যদিও-বা যেতাম, কিন্তু এখন তোমার এইসব কথা শোনবার পর আর যাবো না। সেখানে গেলেও মা আমাকে এইসব কথাই বলবে। তুমি শুধু মাকে গিয়ে এই কথাই বোলো যে, আমার স্বামীর হাতে তোমার মতো টাকা নেই, আমার স্বামী তোমার মতো আই-সি-এসও নয়। কিন্তু আমার স্বামীর সংসারে আমি খুব সুখেই আছি, এখানে আমার কোনরকম কষ্ট নেই।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, আর একটু বয়স হলে বুঝবে যে এ-সুখ সুখ নয়। এ এক রকমের আত্ম-প্রবঞ্চনা। যৌবনের নেশা যেদিন কেটে যাবে সেদিন তোমাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে, তাও বলে রাখছি।

বুলা বললে, তুমি যে যুক্তিই দেখাও, আমাকে তুমি আমার সংকল্প থেকে নড়াতে পারবে না। তোমাদের নকল ভদ্রতা আমি দিল্লীতে থেকে অনেক দেখেছি। সে-সব মেকি জিনিসে আমি আর ভুলছি না। তোমাদের সমাজে যারা মানুষ নামের যোগ্য নয়, তাদের মধ্যেই যে সত্যিকারের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়, তার সন্ধান আমি পেয়েছি।

—কিন্তু ধরো, ভগবান না করুন, যদি তোমার একটা শক্ত অসুখ হয় তার জন্যে ভালো নার্সিং হোমে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারবে তোমার স্বামী?

বুলা বললে, তুমি বোকার মতো এ-সব কী বলছো? যারা দিনে তিনশো টাকা খরচ করতে পারে না, তারা বুঝি এই কলকাতায় বেঁচে নেই?

মিস্টার গাঙ্গুলী এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তোমার সঙ্গে আর তর্ক করবো না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা তাই বলে দাও।

বুলা বললে, না।

—মা-বাবার জন্যে কী তোমার মনে একটুকু মায়া-দয়াও হয় না?

বুলা বললে, যে সস্তা মায়া-দয়ার কোন মানে হয় না সেই মায়া-দয়া আমার নেই। মনে করে নাও তোমাদের মেয়ে মারা গিয়েছে। তা মনে করতে পারো না?

—কিন্তু একটা কথা মনে রেখে দাও যে যে-ছেলেটি তোমাকে বিয়ে করেছে, সে কেবল আমার টাকার লোভে।

বুলা বললে, টাকার লোভ মানে?

—মানে আমি মারা গেলে আমার টাকা-কড়ি সমস্তই সে পাবে।

বুলার মুখে ঘৃণা ফুটলো। বললে, বাজে কথা। আমি তা বিশ্বাস করি না। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি। বরং আমি তাকে বিয়ে করতে বলেছি, তবে সে আমাকে বিয়ে করেছে। তোমার ধারণা ভুল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, আমি বলে রাখছি একদিন কিন্তু এর জন্যে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। তুমি অত আরাম ছেড়ে এই কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছো, এরজন্যে একদিন কিন্তু আমার কাছে গিয়ে আশ্রয়ের জন্যে কেঁদে পড়বে। সেদিনের কথা যেন তোমার মনে থাকে।

বুলা বললে, আমি যদি উপোস করেও মরি তাহ'লেও তোমার কাছে আমি হাত পাততে যাবো না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মিস্টার গাঙ্গুলী মেয়ের কাছ থেকে এ-সব কথা শুনবেন আশা করেননি। বললেন,

তোমার তো দেখছি বড় অহঙ্কার। এত অহঙ্কার ভালো নয়।

—এতে তুমি অহঙ্কার কোথায় দেখতে পেলে বুঝতে পারছি না।

—চিরকাল কারো সমান যায় না, এটা তুমি মনে রেখো।

বুলা বললে, চিরকাল তোমারও সমান যাবে না, এটা তুমিও ভুলো না।

—যাক, তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করতে চাই না, এখন তুমি তোমার মা'কে একবার দেখতে যাবে কিনা তাই বলো। তোমাকে দেখলে হয়তো তোমার মা একটু সেরে উঠতো।

বুলা বললে, আমার সময় নেই আজ, আমাকে এক্ষুণি কোর্টে যেতে হবে, আজকে আমার একটা জরুরী আপিল কেস আছে।

—তাহ'লে কি কাল যাবে?

বুলা বললে, কালকের কথা কাল বলতে পারবো।

—তাহ'লে পরশু?

বুলা বললে, দেখ বাবা যেদিন তুমি আমার স্বামীকে নিজের জামাই বলে স্বীকার করবে সেইদিনই আমি তোমার বাড়ি যাবো।

—তুমি কি বলতে চাও যে, একজন লোফারকে আমি আমার জামাই বলে স্বীকার করবো? এত অধঃপতন আমার হয়নি।

বুলা বললে, তোমারও তো দেখছি এখনও অহঙ্কার যায়নি। তুমি কী ভাবছো তুমি এখনও আই-সি-এস আছে, আর তোমার আণ্ডারে আমরা চাকরি করি? আমরা তোমার চাকরি করি না, এটা মনে রেখে কথা বলবে।

এরপর মিস্টার গাঙ্গুলীর পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চল্লে না। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এত অপমান তিনি নিজের মেয়ের কাছ থেকে পাবেন, এটা আশা করেননি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, ভাগ্যের চাকা যে কার কখন কোনদিকে ঘোরে, তা স্বয়ং ভগবানও বোধহয় বলতে পারেন না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বাড়িতে এলেন। স্ত্রী বিছানায় শুয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে, কী হলো? দেখা হলো বুলার সঙ্গে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, দেখা না হলেই বোধহয় ভাল হতো।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে ., ন?

—তোমার মেয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

—তার মানে?

—সে তোমাকে আর কী বলব? জীবনে আমাকে কেউ এমন করে অপমান করেনি, আমি ঠিক করেছি আর তার মুখদর্শন করব না।

—তুমি আমার অসুখের কথা বলেছিলে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন বলেছিলুম, কিন্তু তার উত্তরে সে কী বললে জানো? বললে যেদিন আমি বুলার স্বামীকে জামাই বলে স্বীকার করব, সেইদিনই সে আসবে, তার আগে নয়। তা সেই লোফারটাকে কিনা আমি জামাই বলে কোনদিন স্বীকার করবো বলতে চাও?

—তা-তো বটেই। সে তো একটা লোফারের চেয়েও অধম, একটা মোটর-মিস্ত্রী বই তো কিছু নয়।

—তুমিই বলো, আমি কী কিছু অন্যায় বলেছি?

—আমি হলেও তাই-ই বলতুম।

—যাক্‌গে, বুলার কথা ভুলে যাও, মনে করে নাও সে মরে গেছে।

মিসেস গাঙ্গুলীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। শুধু দু'চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল। মিস্টার গাঙ্গুলী রুমাল দিয়ে তার চোখ দু'টো মুছিয়ে দিলেন।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, কী রকম অবস্থা দেখলে তার?

—আরে রাম-রাম, সে এমন একটা বাড়ীতে আছে যাকে বস্তি বাড়ি বললেই ঠিক হয়। একটা ভাঙা টেবিল, আর দু'খানা হ্যাণ্ডেল-ভাঙা চেয়ার। না আছে ঘরের মেঝেতে একটা কার্পেট, না আছে ফ্যান। বোধহয় ইলেকট্রিক লাইনও নেই।

মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে, তাহ'লে কী করে আছে সে বাড়িতে? ও তো আমাদের কাছে ইলেকট্রিক ফ্যান ছাড়া ঘুমোতেই পারত না। চব্বিশ ঘণ্টা পাখার তলায় থাকত—সে বাড়িতে চাকর-বাকর কিছু আছে?

—আরে কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। শুনছো সে একটা লোফার। সে তোমার মেয়েকে অত আরামে রাখতে পারবে?

—তা সেই ছোঁড়াটাকে কেমন দেখলে?

—সে ছোঁড়াটা বাড়িতে থাকলে তবে তো তাকে দেখতে পাব। সে তো সকাল সাতটার মধ্যে কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করতে বেরিয়ে যায়।

—আর বুলা?

—সে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে বললাম তো।

—প্র্যাকটিশ কী রকম করছে?

—ছাই-ছাই, আমি জানি না নতুন এ্যাডভোকেটদের প্র্যাকটিশের কথা। অর্ধেকদিন ট্রাম-বাসের ভাড়াটাও জোটে না?

—তোমায় কিছু খেতে দিলে না?

—খেতে দেবে? আর দিলেও আমি তার পয়সায় খাবো? আমার এত অধঃপতন হয়নি যে সেই লোফারটার পয়সায় আমি খাব? তুমি বলছো কী?

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, খাও না খাও, সে পরের কথা। কিন্তু তার তো অফার করা উচিত ছিল, তুমি এতদিন পরে গেলে?

—আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি সেইটেই তার মহাসৌভাগ্য বলে মনে করা উচিত। আমি বলে এসেছি যে চিরকাল কারো সমান যায় না একদিন তাকে আমার কাছে এসেই হাত পাততে হবে।

—তাতে কী বললে সে?

—বললে আমারও নাকি চিরকাল সমান যাবে না। আরো বললে আই-সি-এস বলে আমার নাকি খুব অহঙ্কার। তারা আমার আণ্ডারে চাকরি করে না যে আমি যা বলবো তাই-ই তাদের করতে হবে!

মিসেস গাঙ্গুলী শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে, তাহ'লে সে তোমায় অপমান করলো বলো।

—অপমানই তো করলে। সেই জন্যেই তো ওই কথা শোনবার পর আমি আর সেখানে এক মিনিটও দাঁড়ালুম না, সোজা বেরিয়ে চলে এলুম।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, ঠিক করেছ আমি হলে তো তাকে জুতো-পেটা করতুম। আমার শরীরটা খারাপ তাই যেতে পারলুম না। নইলে আমি রাগে কী যে করতুম, বলা যায় না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, যাক গে! ওসব কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না আমিও মাথা ঘামাব না। মাথা ঘামালে মিছিমিছি তোমার প্রেসার বেড়ে যাবে। তার চেয়ে মনে করো আমাদের মেয়ে-জামাই নেই।

মিসেস গাঙ্গুলী আর কী বলবে চুপ করে রইল।

কিন্তু মানুষের সমস্যা কী একটা? কলকাতায় আসার পরই মিস্টার গাঙ্গুলী কয়েকটা ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেলেন। প্রথম-প্রথম মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু স্ত্রীর অসুখ হওয়ার পর আগের মতো নিয়ম করে আসতে পারেতেন না। মাঝে-মাঝে একলা আসতেন আর পরিতোষের সঙ্গে গল্প করেই উঠে পড়তেন। বলতেন, আজকে উঠি।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করত, মিসেস কেমন আছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী গম্ভীর মুখে বলতেন, ভালো নয়।

রোজই ওই এক কথা। মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, সারা জীবন চাকরি করে শেষ জীবনটায় যে একটু আরাম করে দিন কাটাব, তার উপায় আর রইল না। এখন যদি মিসেস মারা যায় তো আমার কী হবে বলুন তো? বাড়িতে একলা কী করে কাটবে?

কথাটা শুনে পরিতোষ বলত, আপনি অত ভাবছেন কেন? মিসেস তো ভালোও হয়ে যেতে পারেন।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, ডাক্তাররা যে সে-ভরসা দিচ্ছে না। তা ছাড়া এখন তো শুধু সাতশো টাকা পেনসনের ওপরই ভরসা।

পরিতোষ বলত, মাত্র সাতশো টাকা?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আরো একটা নতুন ঝামেলা হয়েছে। আগে যে-বাড়িটা কলকাতায় তৈরি করেছিলুম, তার ভাড়া পাই আড়াইশো টাকা। এখন যে ভাড়া বাড়িতে আছি তার ভাড়া গুণি মাসে পাঁচশো টাকা। অথচ আমার নিজের বাড়ি রয়েছে সেখানে ঢুকতে পারছি না। এখন সেই ভাড়াটের সঙ্গে মামলা চলছে। তিন বছর হয়ে গেছে, এখনও মামলার কোন ফয়সালা হচ্ছে না। মাঝখান থেকে যেদিন মামলার দিন পড়ছে, সেইদিন দু'শো করে টাকা নষ্ট হচ্ছে।

পরিতোষ বলত, তা আপনারা নতুন বাড়ি তখন ভাড়া দিয়েছিলেন কেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তখন দিল্লীতে থাকি, ভাবলাম বাড়িটা খালি পড়ে আছে—ভাড়া দিয়ে দিই। ভাড়া দিলে বাড়িটা অন্ততঃ ভালো থাকবে। বাড়ি খালি পড়ে থাকলে তো ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। এখন যদি এই বাড়ি নতুন করে ভাড়া দিই তো কম করে হাজার টাকা ভাড়া আসবে।

শেষকালে ঝঞ্চাট আরো বেড়ে গেল মিস্টার গাঙ্গুলীর। একদিকে মিসেস গাঙ্গুলীর অসুখের খরচা, তারপরে মামলার খরচা। তার ওপর অনেকে টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। শেয়ারে টাকা খাটিয়ে মোটা ডিভিডেণ্ড পাওয়ার লোভে। সেই শেয়ারের দামও সব একসঙ্গে কমে গেল। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে কম সুদ আর শেয়ারে টাকা খাটালে লাভ বেশি। তাই শেয়ারেই তিনি বেশি টাকা খাটিয়েছিলেন।

এতগুলো বিপর্যয় একসঙ্গে আসবে, বিশেষ করে রিটায়ার করবার পর, সেটা তিনি আগে কল্পনা করতে পারেন নি। ভরসার মধ্যে ভরসা শুধু এই পেনশনের সাতশো টাকা! তাতে গাড়ি চালিয়ে ইজ্জৎ রাখা যায় না।

সেদিন দেখলুম মিস্টার গাঙ্গুলী ট্যাক্সি করে ক্লাবে এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি কী হলো?

—গাড়িটা বেচে দিলুম।

—সে কী! তাহ'লে আপনার চলবে কী করে?

—ড্রাইভার আমার তিনশো টাকা মাইনে চায়, অত টাকা দেব কোত্থেকে? আর নিজে তো ড্রাইভ করতে পারি না। তারপর পেট্রলের দাম ঠিক এই সময়েই কিনা বেড়ে গেল। দশ লিটার পেট্রল কিনেছিলাম, সত্তর টাকা নগদ দিতে হলো। এত টাকা আমি কোথা থেকে জোগাবো?

মিস্টার গাঙ্গুলীর অবস্থা দেখে আমার বড় দয়া হলো ভাই। চোখের সামনে একটা

লোককে ধাপে-ধাপে কেবল নেমে যেতেই দেখলাম। অথচ আই-সি-এস মানুষ—এককালে কত লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। প্রথম-প্রথম যখন ক্লাবে আসতেন তখনও দাপট দেখেছি, তখনও স্যুটের বাহার দেখেছি। দু'হাতে বেয়ারাদের বখশিস্ দেওয়ার বহর দেখেছি। তখনও এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি তখনও আই-সি-এস। তারপর আবার সেই লোকেরই অন্য চেহারা দেখলাম। পুরনো স্যুট, মামলা, স্ত্রীর অসুখ, গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া। তারপর অনেকদিন আর তাঁর পাত্তা নেই।

পরিতোষ বললে, অনেকদিন পরে হঠাৎ আবার একদিন এলেন। দেখলুম, চেহারাটা শুকনো-শুকনো। অনেক রোগা হয়ে গেছেন। জিজ্ঞেসা করলাম, এ রকম চেহারা হলো কেন? অনেক দিন আসেন নি। ব্যাপারটা কী? অসুখ হয়েছিল নাকি?

—আমার স্ত্রী মারা গেলেন।

—শেষকালে কী হয়েছিল?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হার্ট তো আগে থেকেই খারাপ ছিল, এবার হঠাৎ থার্ড স্ট্রোক হলো। একদিন ভোরবেলা দেখলাম তখনও ঘুমোচ্ছেন। ভাবলুম ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। ঘড়িতে সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজতে চললো, তখন ভাবলুম ডেকে তুলে ওষুধটা খাইয়ে দিই। গায়ে হাত দিতেই দেখি একেবারে ঠাণ্ডা গা। তখনই ডাক্তার ডাকলুম, কিন্তু সে অবস্থায় ডাক্তারই বা কী করতে পারবে। তার অনেক আগেই সে মারা গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েকে খবর দিয়েছিলেন?

—খবর দিয়েছিলুম, কিন্তু মেয়ে আসেনি।

—তারপর?

—তারপর আর কী? লোকজন ডেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। সতী-লক্ষ্মী চলে গেল। শেষ পর্যন্ত মেয়েই তার চরম শত্রু হয়ে রইল। আসলে বলতে পারা যায়, মেয়ের জন্যেই অকালে তার প্রাণটা গেল। মেয়ে যেদিন দিল্লীর বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেইদিন থেকেই তার হার্ট খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমরা সব ক্যালকুলেশান ভুল হয়ে গেল।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক বোঝালাম। বললাম, যার যা নিয়তি তা কে রোধ করতে পারে? মেয়ের বদলে যদি ছেলে থাকতো তাহলেও হয়তো এই রকমই হতো।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তাই তো এখন নিয়তিকেই বিশ্বাস করি। আগে ওকে বিশ্বাস করতুম না। তখন ভাবতুম, জীবনটা যেমন চলেছে, সেই রকমই বুঝি চলবে। তা যে কত বড় ভুল, তা স্ত্রীর মৃত্যুতে যেমন করে বুঝলুম, এর আগে কখনও তা বুঝিনি। আমি ব্রিটিশ আমলের আই-সি-এস, তখনকার আমিতে আর এখনকার আমিতে যে কত তফাৎ, আমাকে যারা আগে দেখেছে আর এখন দেখছে তারা তা বুঝতে পারবে। কে বলবে যে এককালে আমি 'মানবসুন্দরী' উপন্যাস লিখে কত নাম করেছিলুম। তখনকার দিনে আমার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে পারলে যে কতজন ধন্য হয়ে যেত, তা আমার এখনও মনে আছে। অথচ এখনও তারা বেঁচে আছে। আমি কত সাহিত্যিককে যে তখন কত সম্মেলনে সভাপতি করেছি, তা আজ তাদেরও মনে নেই। আমি যাতে তাদের সভাপতি করি, তার জন্যে তারা যে কত খোসামোদ করেছে, তা আমার সব মনে আছে। অথচ এখন দেখা হলে তারা আমার সঙ্গে কথাই বলে না।

বললাম, এটাই তো নিয়ম।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, ভাবতে পারেন, এখন আমি ট্যাক্সি চড়ছি, আর আমার

মেয়ের এখন দু'টো গাড়ি। একটা আমার সেই লোফার জামাই চড়ে, আর একটা আমার মেয়ে!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, দু'টো গাড়ি হলো কী করে?

—এখন তো প্র্যাকটিশ করে মেয়ের খুব পশার হয়েছে। সাদার্ন এ্যাভিনিউতে একটা তিনতলা বাড়ি করেছে শর্বরী।

—কিন্তু কোথা থেকে এ রকম হলো?

—আমার জামাই একটা মোটর মেরামতের ওয়ার্কশপ করেছে। এখন তার কারখানায় চল্লিশজন লোক খাটে।

—আপনি এ সব জানলেন কী করে?

—আমি যে শ্রাদ্ধের আগে মেয়েকে বলতে গিয়েছিলুম।

—মেয়ে শ্রাদ্ধতে এসেছিল?

—আসবে যে তার সময় কোথায়? দিন-রাত ক্লায়েন্ট নিয়েই ব্যস্ত। তার ক্লায়েন্টরাই যে তাকে আসতে দেবে না। এমন কী সেই বখাটে লোফার জামাই, যাকে আমি মানুষ বলেই মনে করিনি কখনও, সেও কিনা শুনলুম দেড় লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে লাস্ট ইয়ারে।

পরিতোষ গল্প বলতে বলতে থামলো। আমি বললাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, যাবার সময় বেয়ারা একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে। তিনি তাতে চড়ে বাড়ি চলে গেলেন। ক্রমেই মিস্টার গাঙ্গুলীর ক্লাবে আসা কমে গেল। তারপর অনেকদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বুঝলাম, মিসেস গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর তিনি মুষড়ে পড়েছেন। তার ওপর বয়েস হচ্ছে। বাড়িতে বসে-বসেই হয়তো সময় কাটান। সব মানুষেরই একদিন বয়েস বাড়বে, বার্ধক্য আসবে। তখন সকলেরই বাইরে বেরুনো কমে যাবে—এটাই নিয়ম। আগেও ক্লাবে কত লোক আসত। তারপর তারা আস্তে-আস্তে আসা বন্ধ করেছেন। তাদের কথা সবাই ভুলে গেছে। এইটেই এতকাল দেখে এসেছি। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। সেই ঘটনাটা বলি।

সেদিনও আমি ক্লাবে বসে গল্প করছি অন্য মেম্বারদের সঙ্গে। হঠাৎ দেখি একটা বিলিতি গাড়ি এসে থামল। মনে হলো নতুন কোন ইমপোর্টেড কার। এ-গাড়িটা আগে কখনও ক্লাবে আসেনি। উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিতেই নেমে এলেন মিস্টার গাঙ্গুলী।

আমি ওই রকম গাড়িতে মিস্টার গাঙ্গুলীকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর চেহারাটা বদলে গেছে। পরণে গ্যাবার্ডিনের নতুন স্যুট। আমি তাঁকে দেখেই এগিয়ে গেলাম। বললাম, কী হলো, এতদিন আসেন নি যে?

—এখন আর আগেকার মতো সময় পাই না।

আমি বললাম, এত ব্যস্ত কীসে?

—সমস্ত দিন নাতনিকে নিয়ে কেটে যায়।

—নাতনি?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হ্যাঁ, খুব সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে বুলার। বুলা আমাকে মেয়ের নাম রাখতে বলেছিল, আমার দেওয়া নামটা বুলার খুব ভালো লেগেছে, নিজনেরও নামটা খুব পছন্দ হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম রেখেছেন?

—বল্লরী। ভালো নাম নয়?

বললাম, বাঃ চমৎকার নাম দিয়েছেন তো আপনি। আপনি দেখছি বাংলা

ভাষাতেও এক্সপার্ট!

খুব খুশি হলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, বুলার নামেরও প্রথম অক্ষর ব আর বিজনের নামের প্রথম অক্ষর ব—এমন নামের মিল কারো নেই।

বললাম, এ গাড়িটা কার?

—মেয়ের। আজ তো কোর্ট ছুটি তাই বুলা বললে, বাবা, তুমি আমার গাড়িটা নিয়েই ক্লাবে যাও।

আমি বললাম, আপনি কী এখন মেয়ের কাছেই থাকেন নাকি?

—হ্যাঁ কী আর করি বলুন, মেয়ে এসে একদিন আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। জামাইও বললে, বাবা, আপনি একলা-একলা এ বাড়িতে থাকবেন কী করে? আমাদের বাড়িতে অনেক ঘর, আপনি সেখানেই চলুন। ওরা দু'জনেই আমাকে খুব যত্ন করে, জানেন?

বললাম, আপনার সেই ভাড়াটের মামলা? সেটার কী অবস্থা?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সে অনন্তকাল ধরে চলছে আবার অনন্তকাল ধরে চলবে। তবে আমার মেয়ে তো নিজেই উকিল সেই এখন সে -মামলার ভার নিয়েছে। কিন্তু আমার আর সে-বাড়ির ওপর কোন লোভ নেই। কারণ আমার স্ত্রীর জন্যেই বাড়িটা করেছিলুম সেই স্ত্রীই যখন চলে গেল তখন আর কার জন্যেই বা মামলা আর কোন কাজেই বা সে বাড়ি লাগবে? বাড়ির মালিকানা যদি কোনদিন আমার কাছে ফিরেও আসে তো ও-বাড়ি নিয়ে করবোই বা কী? ওতে তো আবার ভাড়াটেই বসাতে হবে।

বললাম তা ভাড়াটেরা কী বলছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন ভাড়াটেরা আর কী-ই বা বলবে? তারা নিজেরাই একটা বিরাট বাড়ি করেছে। সে-বাড়িটা মোটা টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজেরা সস্তা ভাড়াতে বাস করছে। সে-বাড়ির মামলা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবে। আমার মেয়ে সেই রকম কথাই বলছে। মাঝখান থেকে উকিল-মহুরি-পেশকার সকলেই মোটা ঘুষ খাচ্ছে তার কাছ থেকে।

তারপর একটু হেসে বললেন এবার যে কাজের জন্য এসেছি সেই কথাটাই বলি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি সেই জন্যেই।

বললাম বলুন—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন আসছে রবিবার আমার নাতনী বল্লরীর অন্নপ্রাশন আপনাকে কিন্তু দয়া করে একবার ধুলো দিতে হবে এই কার্ডেই ঠিকানা লেখা আছে। এই দেখুন—

বলে একটা ছাপানো কার্ড দিলেন আমার হাতে।

দেখলাম কার্ডে সাদার্ন এ্যাভিনিউ-এর ঠিকানা লেখা।

বললাম নিশ্চয়ই যাবো আপনি কিছু ভাববেন না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, একটু সকাল-সকাল যাবেন, গল্প করব।

রবিবার দিন যথারীতি গেলাম মিস্টার গাঙ্গুলীর মেয়ের বাড়িতে।

যেতেই দেখি বিরাট তিনতলা একটা বাড়ি। চারদিকে আলোয় আলো। সমস্ত বাড়িটা জুড়ে লাল-নীল টুনি-বাল্ব জ্বলছে নিভছে। বাড়ির সামনে লন। প্রায় দু'হাজার লোকের ভিড়। উর্দি-পরা খানসামারা সিগারেট আর কোলড ড্রিংস্-এর ট্রে নিয়ে চারদিকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মিস্টার গাঙ্গুলী এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, এত লোক নেমন্তন্ন করেছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সব আমার জামাই-এর ফ্যাক্টরির লোক আর বন্ধুবান্ধব। জামাই-এর অটোমোবাইল ওয়ার্কস্ এ কী কম লোক চাকরি করে? আর আমার মেয়ের

এ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার আর জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে।

তারপর বললেন, চলুন, আমার নাতনী বল্লরীকে দেখবেন চলুন।

ভেতরে নিয়ে গেলেন তিনি আমাকে। অন্দর-মহলে মহিলাদের ভিড়। সেখানে একটা ঘরের মধ্যে মিস্টার গাঙ্গুলীর মেয়ে বুলা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আমি উপহার দেবার জন্যে একটা জাপানী খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা মিস্টার গাঙ্গুলীর নাতনীর হাতে দিলাম। মেয়েটি সেটা নিয়ে খেলতে লাগল। বড় সুন্দর নাতনী মিস্টার গাঙ্গুলীর। দেখলেই মনে হয় যেন একটা রঙীন মোমের পুতুল।

মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, ইনি আমাদের ক্লাবের ফ্রেণ্ড পরিতোষবাবু।

মেয়ে হাত তুলে নমস্কার করলে। আমিও প্রতি-নমস্কার করলুম। জামাই দি‥ন সরকারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। ক্যালকাটা অটোমোবাইল ওয়ার্কস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। দেখলাম, ছেলেটি ভারি ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান। শ্বশুরের বন্ধু আমি, তাই আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। অতবড় কোম্পানীর মালিক তবু এতটুকু অহঙ্কার নেই তার। সামান্য কিছু খেয়ে উঠে পড়লাম।

বিদায় নেবার সময় মিস্টার গাঙ্গুলী আমার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন আমার নাতনীকে?

বললাম, এক-কথায় চমৎকার!

তিনি বললেন, মেয়ে সকালবেলা হাইকোর্টে চলে যায়, আর জামাইও ফ্যাক্টরিতে বেরিয়ে যায়, তখন আমি ওই নাতনীকে নিয়ে কাটাই।

তারপর একটু থেমে বললেন, একটাই শুধু দুঃখ রয়ে গেল পরিতোষবাবু, আজকে আমার মেয়ের এত ঐশ্বর্য রয়েছে, আমার স্ত্রী এ-সব কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।

আমি গাড়িতে করে আসবার সময় ভাবতে লাগলাম সেই সব পুরনো কথাগুলো। একদিন ওই মিস্টার গাঙ্গুলীই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আর মেয়ের মুখ-দর্শন করবেন না। একটা সামান্য মোটর-মিস্ত্রীকে বিয়ে করেছিল বলে সেদিন তিনি মেয়েকে কত কথা শুনিয়েছিলেন, কত ভয় পেয়েছিলেন মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সেদিন যদি সত্যি-সত্যিই মেয়ের সঙ্গে গোবিন্দ সাকসেনা আই-এ-এস-এর বিয়ে হতো! তাহলে কী এত বড় বাড়ি হতো? এত বড় বিলিতি গাড়ি হতো? না এত প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মান হতো? আসলে মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে ভালোবাসা-টালোবাসা সমস্তই তুচ্ছ, তার কাছে একমাত্র খাঁটি জিনিস হচ্ছে টাকা। আজ যে মিস্টার গাঙ্গুলী এত হাসি-খুশী, সেও তো মেয়ে জামাইয়ের টাকা হয়েছে বলে। নাতনী যদি সুন্দরী না হয়ে কালো-কুৎসিত হতো, তাহলেও তিনি হয়তো ঠিক এমনিই আদর করতেন! কারণ ওই—মেয়ে জামাই-এর টাকা……

পরিতোষ গল্প শেষ করে বললে, তুমি যদি ভাই এই মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কখনও উপন্যাস লেখ তো সে উপন্যাসের নাম দিও, 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত'।

আমি বুঝলাম না তার কথাটা। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

পরিতোষ বললে, মিস্টার গাঙ্গুলী হলেন অতীত, আর মেয়ে শবরী হলো বর্তমান, আর ওই নাতনী বল্লরী হলো ভবিষ্যৎ। আবার এমন একদিন আসবে যেদিন মেয়ে শবরী হবে অতীত, আর ওই নাতনী বল্লরী হয়ে যাবে বর্তমান, আর, আর-একজন যে জন্মাবে, সে হয়ে যাবে ভবিষ্যত। এই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের আবর্তেই পৃথিবী অনাদিকাল থেকে গড়িয়ে চলেছে, আর চিরকালই গড়িয়ে চলবে। এই হলো ঘূর্ণাবর্তের আসল তাৎপর্য।

*

এক

মিসেস সেন-এর কথা আমার সত্যিই মনে ছিল না। টেলিফোন তুলে জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

—চিনতে পারছেন না? আমি মিসেস সেন—প্রভা।

বললেন—আজকে সময় হবে একবার? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল—

বললাম—কখন?

বোধহয় তখন সিগারেট টানছেন। একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—মিষ্টার সেন মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয়।

বললাম—কখন? শুনিনি তো!

সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। সুব্রত সেন মারা গেছে এ-খবর তো জানা ছিল না।

মনে আছে একদিন এক ভদ্রলোক সকালবেলা একটা চিঠি দিয়ে গেলেন।

বললাম—কার চিঠি?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছেন— তিনি একবার দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।

তখনও জানিনা সাহেব কে! মস্ত বড় কোন্ সরকারী অফিসের আরো বড় হোমরা-চোমরা সাহেবের নাম-ধাম-পরিচয়-টীকা লেখা প্যাডে একখানা চিঠি। লিখেছে সুব্রত সেন। কুড়ি বছর পরে আমার ঠিকানা খুঁজে বার করে অফিসের বাবুকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। কখন আমার অবসর, কখন বাড়িতে থাকি না-থাকি বা তার অফিসে গিয়ে দেখা করতে অসুবিধা হবে কি না জানতে চেয়েছে। রীতিমত আপ্যায়ন করে ভদ্রলোককে বিদায় দিলাম। বললাম—তাঁর সাহেব সত্যিই আমার সহপাঠি এবং তাঁর সঙ্গে আমি যে কোন দিনই দেখা করবো!

কিন্তু তারপর যা সচরাচর হয় তাই হয়েছিল। দেখা করা তো হয়ই নি, এমন কি চিঠি দেওয়াও হয়নি। কেন যে হয়নি তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। দেখা হয়নি, হয়নি। আরো নানান্ জরুরী কাজ অবহেলা করার মত ও কাজটাও অবহেলিত হয়ে-হয়ে শেষে আর সমাধা হয়নি। শেষকালে এমন দেরী হয়ে গেল যে ও-প্রসঙ্গ আমি ভুলেই গেলাম।

শেষে এক সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মিসেস সেনের সঙ্গে।

সভা থেকে বেরোবার সময় দেখি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা। জর্জে শাড়ি, এলো খোঁপা, সিঁদুরের টিপ! আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। আ-কাছে যেতেই আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—আমায় চিনতে পারেন?

এক নিমেষে যেন আমার বারো বছর বয়স কমে গেল। বললাম—প্রভা না?

প্রভা বললে—মিষ্টার সেনের চিঠি পাননি?

—মিষ্টার সেন?

প্রভা বললে—মিষ্টার সেনের অফিসের ক্লার্ক আপনাকে চিঠি দেয়নি ?

বললাম—সে তো সুব্রত, আমরা একসঙ্গে পড়েছি এক কলেজে—তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

প্রভা হেসে ফেললে। বললে—ভেবেছিলাম চমকে দেব আপনাকে, তা আপনি এলেনই না সেদিন :

বললাম—এখন কী করতে ?

প্রভা বললে—কাগজে খবর দেখে এসেছি আপনার লেক্‌চার শুনতে।

বললাম—মাসীমা কেমন আছেন ?

ভাল করে চেয়ে দেখলাম আর একবার। মনে আছে মাসীমার কথাগুলো। মাসীমা বলতো—ওসব পদ্য-লেখা-টেখা ছাড়ো দিকিনি, গরীবের ছেলে, ওসব রোগ কেন—

মাসীমার ছোট ছেলে খোকাকে তখন পড়াতাম আমি। গরীবের ছেলেকে শুধু সাহায্য করার জন্যেই ছেলে পড়ানোর কাজটা দিয়েছিলেন। নিয়ম করে রোজ সকালে-বিকেলে খোকাকে পড়াতাম। কিন্তু মাসীমা সামনে বসে থাকতেন। বলতেন বাড়ী যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও।

তারপর যখন দেখা করতে যেতাম, বলতেন—বসো—

সোফাটায় বসিয়ে বলতেন—খোকার সামনে কথা বলে তোমাকে লজ্জা দিতে চাই না তাই আড়ালে ডেকেছি—

বললাম—বলুন—

মাসীমা বললেন—আমি অনেকদিন থেকে দেখে আসছি, তুমি বড় খারাপ জামা-কাপড় পড়ে পড়াতে আসো, সার্ট-ট্রাউজার পরে আসতে পারো না—

আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম—বরাবর ধুতি পরেই কাটিয়েছি তাই.....আর তাহলে ট্রাউজার আমায় কিনতে হয়—

—হ্যাঁ কিনবে। ট্রাউজারে কত স্মার্ট দেখায় জানো। এ সার্টের কাপড়ের গজ কত ?

বললাম—বারো আনা করে কিনেছিলাম তখন, এখন একটু দাম বেড়েছে, অনেক দিন হয়ে গেল—

—ছি, ছি—

মাসীমা যেন দর শুনে মর্মাহত হলেন। বললেন—খোকা কী ভাবে বল দিকিনি। আড়াইটাকা গজের চেয়ে কম দামী কাপড় ব্যবহার করতে লজ্জা হওয়া উচিত তোমার! তুমি খোকার টিউটর, তোমার কাছে তো শুধু লেখাপড়াই শিখবে না, তোমার চালচলন, ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সবই ওর ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে—

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন— এই দেখ না, আমি সিগারেট খাই—

মাসীমা নিজেই বললেন—আমি তো প্রথমে খেতাম না, খেলে কাশি আসতো—কিন্তু খোকা-খুকুর শিক্ষার কথা ভেবেই ধরলাম, ভাবলাম ওরা তো অন্ততঃ স্মার্টনেস্ শিখবে, —এতে খরচও একটু বাড়ে বটে, কিন্তু কত লাভ হয় জানো ?

লাভটা কী হয় তা আমি সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু কথাটা বলবার পর থেকে বার-বার লক্ষ্য করে দেখেছি—ওই ট্রাউজার সার্ট, এই সিগারেট, ওই চাল-চলনের একটা লাভ আছে। দেখতাম জামসেদপুরের যত বড় বড় লোক সবাই আসতেন মাসীমার বাড়ী। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সি-রোডের বাংলো বাড়ীতে প্রত্যেক দিনই পার্টি বসতো। জেনারেল্ ম্যানেজার থেকে সুরু করে, ওয়ার্কস্ সুপারিন্টেণ্ডেট ফোরম্যান—জামসেদপুরের যত গণ্যমাণ্য অফিসার সব আসতেন। মাসীমার তখন কী উৎসাহ। মেসোমশাই তেমন স্মার্ট ছিলেন না। এককোণে বসে বসে চুরোট টানতেন। কিন্তু মাসীমা সর্বত্র। বলতেন—মিষ্টার ভাণ্ডারী, আপনাকে আজ ভারী ইয়াং দেখাচ্ছে।

মিষ্টার ভাণ্ডারী বলতেন—এ আপনার চোখের গুণ মিসেস নন্দী।

মাসীমা বলতেন—না-না, নিশ্চয়ই সাদেক আলী আপনার স্যুট তৈরী করেছে—ভারী চমৎকার ফিট্ করেছে আপনাকে—

সাদেক আলী ব্রাদার্স ছিল জামসেদপুরের সব চেয়ে বড় টেলার্স। জেনারেল ম্যানেজার স্যুট তৈরি করতেন সাদেক আলির কাছ থেকে। আর সেই জন্যেই মিষ্টার নন্দীকেও সেখান থেকেই স্যুট করতে হতো। মাসীমার বাড়ীর সকলের জামা-ব্লাউজ তৈরী হতো ওখান থেকেই। শুধু টেলার্স নয়, সব কিছু। সব কিছুই কিনতে হতো সব চেয়ে ফ্যাশানেবেল্ দোকান থেকে, যেখান থেকে জামসেদপুরের বড়-বড় অফিসাররা কেনেন। আর মাসীমা তাঁর বাড়ীর সান্ধ্য পার্টির জন্যেই কি কম খরচ করতেন! মিষ্টার নন্দী একটু শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বেশি নড়া-চড়া, বেশি সাজ-গোজ পছন্দ করতেন না। তাঁকে দেখলেই মনে হতো যেন খালি গায়ে থাকলেই তিনি বেশি আরাম পান। পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়েই যেন স্বস্তি পান বেশি।

আর তার ওপর ছিল মিষ্টার নন্দীর ভালো মন।

সকালবেলাই মিসেস নন্দী ধরেছে ঠিক। বললেন—এ কী, চুরোট কই তোমার?

মিষ্টার নন্দী আমতা-আমতা করে বললেন—চুরোট ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়—

কেন? আগে থেকে বলোনি কেন? ষ্টোর থেকে নিয়ে আসতো। কী যে তোমার নেচার, তোমাকে বারবার বলেছি না, চুরোট মুখে না-দিয়ে থাকবে না চুরোট ছাড়া তোমাকে ভালো দেখায় না, এখন যদি কেউ এসে পড়ে?

মিষ্টার নন্দীকে বলতে গেলে মাসীমাই মানুষ করেছেন। একটা আস্ত লেখাপড়া জানা গাধা ছিলেন মিষ্টার নন্দী, যখন প্রথম তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়। মিসেস্ নন্দীই মিষ্টারকে ভাল স্যুট পড়াতে শেখালেন। চুরোট ধরালেন, পার্টিতে ড্রিঙ্কস্ খেতে শেখালেন। তখন মিষ্টার নন্দী ছিলেন সামান্য এ্যাসিষ্টেন্ট্ ফোরম্যান। কিন্তু মিসেসে নন্দী তখন থেকেই স্মার্ট, সেই মিষ্টার নন্দীর অল্প মাইনে থেকেই টাকা বাঁচিয়ে , না খেয়ে, ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন, বাড়ীতে চায়ের পার্টি দিলেন, মিষ্টার নন্দীর বার্থ-ডে উৎসব করলেন, বড়-বড় অফিসারদের তাঁর নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে লাগলেন। কী কষ্টের জীবন ছিল মাসীমার তখন! বাড়ীতে বাসি রুটি, পান্তাভাত খেয়ে পার্টিতে সকলকে কেক্ ওম্‌লেট্ কফি খাওয়াতে লাগলেন। আগে থাকতেন জামসেদপুরের এল্-রোডে, পরে উঠে এলেন সি-রোডে বেশী ভাড়ার কোয়ার্টারে। ক্রমে গণ্য-মান্য লোক আসতে লাগলো মিসেস নন্দীর পার্টিতে। মিসেস নন্দীর পার্টির সুনাম ছড়িয়ে পড়লো জামসেদপুরের হোমরা-চোমরাদের মহলে। মিষ্টার ভাণ্ডারী এলেন। মিসেস্ ভাণ্ডারী এলেন। মিষ্টার দেশমুখ এলেন, মিসেস্ দেশমুখ এলেন। মিষ্টার সুন্দরম্ আয়ার এলেন মিসেস্ সুন্দরম আয়ার এলেন। শেষে মিসেস নন্দীর পার্টি সোসাইটিতে ক্রেজ্ হয়ে উঠলো।

মিসেস্ নন্দীর সে সব দিনের ইতিহাস বড় করুণ! মিষ্টার নন্দী রাত্রে আণ্ডারওয়ার পড়ে শুতেন। মিসেস্ নন্দীও ছেঁড়া শাড়ি পরে শুতেন। বিছানায় ফরসা চাদর তুলে ছেঁড়া চাদর বেরোত রাত্রে। শুধু চা খেয়ে ব্রেক ফাষ্ট করেছেন দু'জনে। মাছ-মাংস খাবার টেবিল থেকে বাদ। সাবান দিয়ে কাপড় কেচেছেন নিজের হাতে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে। ঘরের মধ্যে শুধু সেমিজ পরে কাটিয়েছেন, ঘর ঝাট দিয়েছেন। ঘুঁটের ছাই দিয়ে বছরের পর বছর দাঁত মেজেছেন। কিন্তু কেউ এসে গেলেই জর্জেটটা জড়িয়ে নিতেন। খাবার সময় চারদিকে দরজা জানলা বন্ধ করে খেয়েছেন। নইলে কী দিয়ে তাঁরা খাচ্ছেন তারা দেখতে পাবে। বাড়ীতে একটা চাকর রেখেছেন, সে শুধু কাজ করে

দিয়ে চলে যেত। খেত না। সেই চাকরই পাগড়ি-পাজামা পরে একবার খানসামা, একবার বয়, একবার বাবুর্চি, একবার দারোয়ান সাজতো। বহুরূপী।

মিস্টার নন্দী বলতেন—এ রকম করলে তোমারও শরীর খারাপ হবে।

মিসেস্ নন্দী বলতেন—তা হোক্, কিন্তু এ রকম না করলে প্রোমোশনটা যে হবে না তোমার—

মিস্টার কাশ্যপ ছিলেন এসটাবলিশমেন্ট অফিসার। তাঁর হাতেই সব। মিস্টার নন্দী বলতেন—মিস্টার কাশ্যপ যদি চান তো একদিনে ফোরম্যান হতে পারি—

তখন ফ্যাক্টরীতে আরো অনেক এসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান রয়েছে। মিঃ নন্দী সকলের জুনিয়র। মাসীমা এক পার্টিতে গিয়ে মিসেস কাশ্যপের সঙ্গে ভাব জমালেন। তারপর নেমন্তন্ন করলেন নিজের বাড়ীতে। এলেন মিঃ কাশ্যপ, মিসেস কাশ্যপ দু'জনেই। সিফন শাড়ী পরে খুব তোয়াজ করলেন দু'জনকেই। দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে নানারকম খাবার আনলেন। চা, কফি, লেমনেড কোকো সব কিছু আয়োজন হয়েছিল। আর তার পরের মাসেই প্রমোশন হয়ে গেল মিঃ নন্দীর। তিনশো টাকা মাইনে বাড়লো।

কিন্তু শুধু ফোরম্যান করেই তৃপ্তি হলো না মাসীমার। সমাজে মিঃ নন্দীর প্রমোশনের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মর্যাদাও বাড়াতে হবে। ওয়ার্কস ম্যানেজারের গৃহিণীও হতে হবে একদিন। লক্ষ্যটা রইল সেইদিকেই। আবার এলেন মিঃ আর মিসেস ভাণ্ডারী।

এমনি করে মিঃ নন্দী অল্প ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। কী করে বড় হতে হয় তার চাবিকাঠির সন্ধান জানতেন মাসীমা। আমার ভালোর জন্যেই আমাকে সেই সব উপদেশ দিতেন। তাই সেদিন যখন জামা-কাপড় নিয়ে অনুযোগ করলেন, উত্তরে আমি কিছুই বলিনি। চুপ করেছিলাম।

মাসীমা বলেছিলেন—সাদেক আলীর দোকান থেকে স্যুট করিয়ে নাও—

বললাম—আমি অত টাকা কোথা থেকে পাবো বলুন—বাড়ীতে ভাইবোন আছে, বাবা-মাকে টাকা পাঠাতে হয়—

মাসীমা বললেন—তোমার মেসোমশাই এর কী করে প্রমোশন করিয়েছি জানো? —ছিলেন ক্লার্ক—এখন সবাই দেখছো ওয়ার্কস ম্যানেজার কিন্তু কী করে হলো ?

বললাম না—

মাসীমা বললেন—চুরুট খাইয়ে। প্রথমে কিছুতেই খেতে চাইবেন না, বিশ্রী গন্ধ লাগে। বললাম—গন্ধ লাগে লাগুক, অফিসারদের সঙ্গে মিশতে গেলে তারা যেমন ভাবে চলে তেমনি করে চলতে হবে তারা যে দোকান থেকে জামা করায় সেই দোকান থেকে জামা করাতে হবে, যে ক্লাবে যায় সেই ক্লাবে যেতে হবে—

তারপর আবার একটু থেমে বললেন—নইলে মন দিয়ে শুধু ঘাড় গুঁজে অফিসের কাজ করে গেলে সেই ক্লার্কই থাকতে হতো বরাবর, এই প্রমোশনও হতো না, এই গাড়ী-বাড়ী কিছুই হতো না। আবার বলতেন—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, তোমাকেও ফ্যাক্টরীতে ভালো চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারি ওঁকে বলে, কিন্তু আমি যেমনভাবে বলি তেমনভাবে চলতে হবে, ও ধুতি-টুতি চলবে না—

মাসীমা তখন পদোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মোটাও হয়েছিলেন খুব। ফরসা বরাবরই ছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে মেদ বাড়লো। জর্জেটের জৌলুশ ভেদ করে মাসীমার মেদ ফেটে পড়তো। সেই মেদই ছিল মাসীমার গর্ব। নইলে অমন করে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখবার মত করে কেন তা প্রকাশ আর প্রচার করতেন। সিল্কের শাড়ীর ব্লাউজের ওপর এঁটে বসতো না, বার বার খসে পড়তে চাইতো। একবার-একবার মনে হতো শাড়ীর আঁচলটা কাঁধ আর বুক আর পিঠ থেকে ইচ্ছে করে খসিয়ে দিয়েই বুঝি মাসীমা বেশী আনন্দ পেতেন। মিঃ কাশ্যপ, মিঃ ভাণ্ডারী, মিঃ দেশমুখদের বোধ হয়

ওইভাবেই আকর্ষণ করাতেন। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, মেসোমশাই-এর পদোন্নতির তার প্রমাণ।

অথচ মেসোমশাইকে দেখেছি অন্যরকম। নন্দী মাসীমার পীড়াপীড়িতেই গায়ে জামা দিতে হতো তাঁকে, মাসীমার কথাতেই চুরোট কামড়ে, ট্রাউজার পরে দলের মধ্যে বসে থাকতে হতো। মাসীমা বললেন—কাল মিঃ ভাণ্ডারীদের পার্টি দিচ্ছি, মনে আছে তো?

মেসোমশাই তখন ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে একটু গড়াচ্ছেন সবে। ভয়ে-ভয়ে বললেন—আবার? এই যে সেদিন পার্টি হয়ে গেল!

মাসীমা বলতেন—তুমি আর বকো না, এখনও কনফার্মেশন হয় নি, জানো না?

মেসোমশাই বললেন—আর ভাল লাগে না, একদিন যে একটু নিরিবিলিতে বাড়ীতে থাকবো....

মাসীমা বললেন—একবার ওয়ার্কর্স ম্যানেজার হও, তখন যত ইচ্ছে নিরিবিলিতে থেকো—আমি বারণ করতে আসবো না—আমারই কি খুব সাধ? খরচও কি কম হয় ভেবেছো?

মেসোমশাই হতাশ হয়ে পড়তেন—আর নিরিবিলি হয়েছে। ওরা এলেই জোর করে হাসতে হয়, কথা বলতে হয়—অফিসেও ওরা, বাড়ীতেও ওরা—সব সময় কি ভালো লাগে?

মাসীমা বলতেন—আমারই কি খুব ভালো লাগে মনে করেছো?

—তাহলে, কেন করো? আর প্রমোশনের কী দরকার? বেশ তো চলে যাচ্ছে।

মাসীমা বলতেন—তুমিতো বললে বেশ চলে যাচ্ছে। বেশটা চলে যাচ্ছে কোথায়? ওই পুরোনো গাড়ীটায় চড়ে আর মান থাকে? মিঃ ভাণ্ডারীর গাড়ীটা দেখেছো ?

তা মেসোমাশাইও অস্বীকার করতেন না। আগে তো সেই হেঁটে-হেঁটে ফ্যাক্টরীতে যেতে হয়েছে। ঘেমে নেয়ে উঠতেন তখন অফিস যাবার সময়। একটু দেরী হলে বকুনি খেতে হতো, ফাইন হতো। সেই অবস্থা থেকে তো আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। এখন তবু দশজনে মানে, খাতির করে, সম্মান করে। রাস্তায় দেখা হলে ডেকে নমস্কার করে। জেনারেল ম্যানেজারের বাড়ীতে নেমন্তন্ন হয়। পোষাকে-পরিচ্ছদেও যে কিছু হয়, তিনি নিজেই তো তার প্রমাণ! সেই মাসীমা যিনি একদিন দোয়ায় বসে রান্না করতে গিয়ে চোখের জলে ভেসেছেন, নিজের হাতে শুধু রান্নাই নয়, বাসনও মেজেছেন, সেই মাসীমাই এখন এত চেষ্টার পর সমাজে জাতে উঠেছেন। মিসেস ভাণ্ডারীর সঙ্গে মিসেস নন্দীর নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। জেনারেল ম্যানেজারের পাশের চেয়ারে বসতে পান, এটাই কি কম। সেই মাসীমাই এখন সি-রোডের বাড়ী ছেড়ে নিজের কেনা বাড়ীতে উঠেছেন, নিজের গ্যারেজে নিজের গাড়ী আছে তাঁর, রান্নাঘরে বাবুর্চি আছে, টেবিলে বয় আছে বাগানে মালী আছে। এটাই কি কম করা নাকি! আর সংসারে থাকার মধ্যে একটি শুধু ছেলে আর একটি মেয়ে।

ঠিক এমনি অবস্থাতেই আমি এসে হাজির হয়েছিলাম খোকার প্রাইভেট টিউটর হয়ে। তাও কি কম তদ্বিরের পর!

আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা বলেছিলেন—মিঃ নন্দীকে বললে তোমার চাকরি হবে না—যদি কোনও রকমে মিসেস নন্দীকে ও পাকড়াতে পারে তাহলে হতেও পারে।

আমার তখন ছেলে-পড়ানো প্রধান উদ্দেশ্য নয়! তারপর কোনও রকম ভাবে আস্তে-আস্তে ঘনিষ্ঠতা হলে ফ্যাক্টরিতে একটি চাকরি জোগাড় করা। মিঃ নন্দীর হাতেই সব। মিঃ নন্দীই একমাত্র বাঙালীদের মধ্যে জামশেদপুরে বড় চাকরি করেন। ইচ্ছে হলে তিনিই চাকরি দিতে পারেন।

একদিন একলা পেয়ে মিঃ নন্দীকে বললাম আমার অভাবের কথা।

বললাম—আপনি যদি একটা চাকরি করে দেন ফ্যাক্টরিতে, বড় উপকার হয়—যে কোনও রকমের একটা চাকরি......

ফ্যাক্টরিতে মিঃ নন্দী কাজের লোক হিসেবে নাম ছিল। যোগ্যতার সঙ্গে মাসীমার তদ্বির মিলে ধাপে-ধাপে তাঁর উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন বাঙালী, ডিনার খেতেন, স্যুট পরতেন, চুরোট কামড়াতেন, সে কেবল স্ত্রীর অদম্য উচ্চকাঙ্ক্ষার তাগিদে। নইলে সরষের তেল গায়ে মেখে চান করতেই পছন্দ করতেন, ডাল দিয়ে ভাত মেখে খেতেই ভালোবাসতেন। ধুতি পরেই আরাম পেতেন। তাই আমার কথায় একটু সহানুভূতি হলো যেন তাঁর। বললেন—চাকরি করবে? ফ্যাক্টরিতে?

আবার বললাম—হ্যাঁ যে কোনও চাকরি—

কী জানি কী রকম মেজাজ ছিল। বললেন—তুমি জানো না, জীবনে চাকরি কখনও করোনি, সবে আরম্ভ করছো জীবন, আমরা চাকরি করলাম এতদিন, মর্মে-মর্মে বুঝলাম চাকরির জ্বালা—বলে একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—চাকরির অপমান, বড় মর্মান্তিক অপমান, জানো যে চাকরি করেনি সে বুঝবে না ... তোমার চাকরি না করলেই কি চলে না?

সেদিন বুঝেছিলাম মেসোমশাইর সে সব কথা ছলনা নয়। বাইরে থেকে সামাজিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাই আমরা দেখতাম। ভেতরের অন্তরঙ্গ মানুষটা যে অন্যরকম সেদিন তারই পরিচয় পেলাম। বললেন—এক-এক সময় মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বনে চলে যাই—মনে হয় এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো—

আমি আর কী বলবো! সেদিন তাঁর সামনে চুপ করেই বসে ছিলাম।

মেসোমশাই আবার বললেন—ভাবি আমার জীবনটা তো একরকম গেল, আমার ছেলেকে যেন এ দুর্ভোগ না ভুগতে হয়—যেমনই একটা ছোট-খাটো দোকান করলেও এর চেয়ে ঢের সুখী হওয়া যায়—

সেদিন জামসেদপুর ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কস ম্যানেজার মিঃ নন্দীর মুখ থেকে অমন কথা শুনবো, সত্যিই আশা করিনি। বলতে গেলে ঠিক সেইদিন থেকেই জীবন সম্বন্ধে আমার এক নতুন দৃষ্টি খুলে গেল।

প্রভা তখন ছোট, খোকা আরো ছোট। আমি খোকাকে পড়াতে যেতাম সন্ধ্যেবেলা। যাবার আগে যথাসাধ্য ফিটফাট হয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। নিয়মিত চুল ছাঁটতাম, সাদেক আলীর দোকান থেকে স্যুট করিয়ে পরতাম, কিন্তু তবু মাসীমাকে খুশী করতে পারতাম না। মাসীমা আমার সব জিনিষেই খুঁত ধরতেন।

বলতেন—এ ট্রাউজার কি বদলাবে না তুমি? তোমাকে তো বলেছিলাম একটা স্যুট দু'দিনের বেশী পরবে না—আর বাড়ীতে বিছানার তলায় ভাঁজ করে রাখবে—

কখনও বলতেন সু পরতে পারো না এখানে বড়-বড় লোক আসে সব যদি মিসেস ভাণ্ডারী কোনওদিন জিজ্ঞেস করেন—এ কে? তখন কী উত্তর দেব বলো তো?

হয়ত মাসীমার বাড়ীর বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে আমার বেরনো পছন্দ করতেন না তাই যেদিন পার্টি থাকতো সেদিন খোকাকে সকালে পড়িয়ে আসতাম। তাতে মাসীমারও ইজ্জৎ থাকতো, আমারও দুর্ভোগ পোয়াতে হতো না।

কিন্তু সব চেয়ে বেশ রেগে গেলেন সেদিন, জানতে পারলেন—আমি গল্প লিখি।

বললেন—ও-সব বদ্ নেশা হলো, কবে থেকে তোমার কোত্থেকে? তোমাকে তো ভালো ছেলে বলেই জানতাম—।

আমি আর কী বলবো, আমি সেদিন চুপ করেই ছিলাম।

বললেন—লেখাপড়া জানা ছেলেরা ও-সব লিখতে যাবে কেন। তুমি না ফ্যাক্টরিতে চাকরির জন্য মিষ্টার নন্দীকে বলেছিলে? যদি কেউ জানতে পাবে তুমি ওই সব রাবিশ লেখো, তা হলে কি তোমার চাকরি হবে কোনও দিন ভেবোছো? ছি—ছি—

বললেন—ভেবেছিলাম, মিষ্টার নন্দীর মতন তোমাকেও জীবনে কেমন করে দাঁড়াতে হয় শেখাবো—তারপর একটু ভেবে বললেন—কিন্তু সাবধান, খোকাকে যেন ও-সব পড়িও না, শিখিও না—

তা যা হোক, ওখানে আমার আর বেশিদিন চাকরি করা সম্ভব হয়নি। ফ্যাক্টরিতেও আমার চাকরি হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়নি বলে কোনও ক্ষতি হয়নি আজ বুঝেছি।

কিন্তু এই প্রভা?

এই প্রভার জন্যে মাসীমার কি কম চিন্তাই ছিল। যখন মেসোমশাইকে প্রতিষ্ঠার উঁচু শিখরে উঠিয়ে দিয়েছেন, তখন প্রভার পালা। আই-সি-এস থেকে সরু করে গেজেটেড্ অফিসার পর্যন্ত সমস্ত পাত্র যখন একে-একে নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন একদিন।

কিন্তু সে সব আমি দেখিনি। আমি তখন কলকাতায়। কিছু-কিছু কানে আসতো। শুনেছিলাম মেসোমশাই অনেক পাত্রের খবর এনেছিলেন। কিন্তু মাসীমার সে-সব পছন্দ হয়নি। অনেক রকম বায়নাক্কা ছিল মাসীমার। বিলেত-ফেরৎ হওয়া চাই। স্যাটপরা চেহারা চাই। আই-সি-এস হওয়া চাই, অন্ততঃ কিছু না হোক, গেজেটেড অফিসার।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে। গেজেটেড অফিসারই বটে। এই বিয়েতেও মাসীমা মস্ত পার্টি দিয়েছিলেন। মিঃ-মিসেসরা সবাই এসেছিলেন সে-পার্টিতে। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল পাত্র নাকি বড় বেশি মদ খায়, রেস খেলে, স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলে। এ-সব খবর আমি কলকাতা থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই পাত্র যে আমাদের সুব্রত তা-ও জানতাম না। এবং যখন সুব্রত তার অফিসের ক্লার্ককে দিয়ে আমায় চিঠি পাঠিয়েছিল তখনও জানিনা যে তারই সঙ্গে মিসেস নন্দীর মেয়ে প্রভার বিয়ে হয়েছে।

জানলাম পরে। অনেক পরে। যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে আমিও তখন অন্যভাবে অন্যজগতে ভীষণ ব্যস্ত অবস্থায় আছি। তখন মিঃ নন্দী, মিসেস নন্দী জামসেদপুর, সেই সমাজ কোনও কথাই মনে নেই। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন মিসেস নন্দীর চিঠি পেলাম যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। এ-ঘটনা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি কৌতুকপ্রদ। মনে আছে, আমি সে-চিঠি পেয়ে সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম।

মিসেস নন্দী যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ দেখেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খদ্দরের শাড়ি পরেছেন, খদ্দরের ব্লাউজ।

বললেন—খুব খুশী হয়েছি তোমার সাকসেস্ দেখে—যেখানে যাই সেখানেই তোমার নাম শুনি, তবে তোমার বইটা এখনও পড়া হয়নি, তা এতো লোকে যখন ভালো বলছে তখন নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে—শুনলাম নাকি সিনেমাতেও হচ্ছে তোমার বই?

আসল উদ্দেশ্যটা পরে বললেন। বললেন—যে জন্য তোমার কাছে এসেছি—

বলে একটু থামলেন। মিসেস নন্দী মনে হলো যেন আরো বুড়ি হয়েছেন এখন। মেদ যেন সব ঝরে গেছে। চুলেও পাক ধরেছে। একটু যেন হতাশ-ভাব মুখে চোখে।

বললেন—দেখো কী রকম সব কিছু বদলে গেল। তোমার তো এখন বহুলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, এখানকার মিনিষ্টার-মহলের সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দিতে পারো?

বললাম—মিনিষ্টার মহলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন কেন ?

বললেন—খোকাকে তো বিলেত পাঠিয়েছি. জানো বোধহয়—সেই তারই একটা চাকরির জন্যে—ওই ছেলেটার জন্যেই যা কিছু ভাবনা. খুকুরতো বিয়ে হয়েই গেছে।

সেদিন মাসীমাকে আমি সাহায্য করতে পারিনি বলে দুঃখ যে না পেয়েছিলাম তা নয়. কারণ তিনি যে কেমন করে ভাবতে পেরেছিলেন গল্প-লেখক হলে মিনিষ্টার মহলের সঙ্গে আলাপ থাকা সম্ভব, তা আমি বলতে পারবো না। সেদিন ক্ষুণ্ণ মনেই মাসিমা বিদায় নিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ছেলের চাকরি শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কি না, তাও আর খবর রাখবার সময় পাই নি। এর পরই এসেছিল সুব্রত সেনের চিঠি।

এবং তার পরেই সেই মিটিং-এ প্রভার সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—মাসীমা কেমন আছেন প্রভা ?

প্রভা বলেছিল—মা তো মারা গেছেন আপনি জানেন না ?

—আর মেসোমশাই ?

প্রভার বলেছিল—বাবার বড় অসুখ. সেবা করবার তো কেউ নেই—বড় কষ্ট তাঁর--

—কেন. খোকা কোথায় ? বিলেত থেকে ফেরে নি ?

প্রভা বললে—না খোকা নাকি সেখানেই এক মেম বিয়ে করেছে. চিঠিপত্র দেয় না. খোকার জন্যেই ভেবে ভেবে মা অত তাড়াতাড়ি মারা গেলেন।

সুব্রতর কথা আর জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ সুব্রতকে আমি ভালো করেই জানতাম কলেজে। বড়লোকের ছেলে। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু সেই বয়স থেকেই অবাঞ্ছিত দলের সঙ্গে মিশে গোল্লায় গিয়েছিল। শেষে রেস্-এ যেত, আরো কোথায় কোথায় যেত যে তার উল্লেখ না-করাই ভালো।

একটু থেমে প্রভা বললে—আর কী বই লিখছেন ?

বললাম—লিখতে আর পারছি কই—লেখা আর আসছে না।

প্রভা হাসলো। বললে—এবার আমাদের নিয়ে একটা বই লিখুন না—

আমিও হাসলাম। বললাম—তোমার কাকে নিয়ে ?

—এই আমার মা'কে নিয়ে।

কথাটা বলে প্রভা হাসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু আমার মনে হলো প্রভার হাসিটা যেন কান্নার মত দেখালো। আমিও হাসতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন প্রভাদের বাড়িতে একদিন যাবো বলে চলে এসেছিলাম। কিন্তু যথারীতি সে-কথাও রাখতে পারি নি।

তারপর আজ এতদিন পরে হঠাৎ টেলিফোনে সুব্রত সেনের মৃত্যুর খবরটা শুনে সত্যিই ভারি দুঃখ হলো। দুঃখ হলো সকলের জন্যে। দুঃখ হলো সুব্রতর স্ত্রী মিসেস সেন-এর জন্যেও। মিসেস সেন তখনও টেলিফোন ধরে আছেন। আবার বললেন—আজকে আপনার সময় হবে একবার ? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল--

মনে পড়লো প্রভার সেদিনের কথাটা ! প্রভা বলেছিল—এবার আমাদের নিয়ে বই লিখুন না।

হয়ত আমার সঙ্গে এই কথাই বলবে প্রভা। হয়ত বলবে মাসীমার কথা. মেসোমশাই-এর কথা. খোকার কথা আর তার নিজের আর সুব্রতর কথা। সুব্রত মদ

খাওয়ার কথা, সুব্রতর অসংযমের কথা, সুব্রতর রেস খেলার কথা। সব কথাই হয়ত অকপটে বলে যাবে। আর হয়ত ওদের ওই সংসারের কথা নিয়ে বই লিখতে পীড়াপীড়িও করবে।

কিন্তু মাসীমাকে আমি কেমন করে আমার গল্পের বিষয়-বস্তু করবো! মাসীমা যে সেদিন আমায় স্যুট পরতে বলেছিলেন, আমায় সাহিত্য রচনা করতে বারণ করেছিলেন, সে তো আমার ভালোর জন্যেই! আমার ভালোর জন্যেই তো সেদিন তিনি আমাকে ইংরিজি শিখতে বলতেন, সাদেক আলির স্যুট পরতে বলতেন! আমার ভালোর জন্যেই তো! আমি তাঁর কথামত চললে আমাকে তিনি একটা চাকরি সেদিন করেই দিতেন। এতদিন সে চাকরিতে থাকতে হয়ত মেসোমশাই-এর মত ফোর-ম্যানও হয়ে যেতাম। চিরজীবনের জন্যে নিশ্চিন্তও হতে পারতাম। পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড—সবই পাকা হয়ে থাকতো। তা হলে আর এই পাঠকদের কৃপাকণার জন্যে লোলুপ হয়ে থাকতে হতো না। রাত জেগে লিখে লিখে শরীর খারাপও করতে হতো না। এত ঈর্ষা, এত শত্রুতা, এত দলাদলির গ্লানি থেকে মুক্তি পেতাম। সাহিত্য করে আমাক কী-ই বা হয়েছে। সেই চাকরিই তো আমার পক্ষে ভালো ছিল।

মিসেস সেন আবার বললেন—আজ সময় হবে আপনার?

বললাম—না।

এবং, না, বলেই টেলিফোনটা ছেড়ে দিলাম।

হয়ত প্রভা খুব আঘাত পেল। কিন্তু তা হোক, নন্দী মাসীমাকে নিয়ে গল্প লিখলে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

দুই

আমার প্রাত্যাহিক একটি বিশেষ কাজ হলো একটা ডাক্তারখানায় বসে-বসে আড্ডা দেওয়া। ডাক্তারখানাটা আমার বাড়ির পাশেই। ডাক্তারখানায় অনেক রোগী আসে। রোগীরা তাদের নিজেদের শরীরের অসুখের কথা বলে। কথাগুলো ডাক্তারবাবুও শোনেন, তার সঙ্গে আমিও শুনি। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু কোন কোনও রোগীকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গোপনে তার রোগ-বিবরণ শোনেন।

আমার সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে আড্ডা দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য বিভিন্ন চরিত্র দেখা। গল্প মানেই চরিত্র আবার চরিত্র মানেই গল্প। আমার মতে যে গল্পে চরিত্র-সৃষ্টি নেই সে-গল্পকে গল্প বলা যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য বলা যেতে পারে না।

এ-সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক করা চলে কিন্তু তাতে কোনও সমাধানে পৌঁছান যায় না বলেই আমি সে-সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে চাই না। কারণ এ-গল্পে তা অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমি শুধু গল্প শোনাতে বসেছি, তাই গল্পই বলি।

এককালে যখন আমি চাকরি করতাম তখন সেই অফিসটাই ছিল আমার জগৎ। সেই জগতেরও একটা নিজস্ব সৌরমণ্ডল ছিল। সেখানেও সূর্য উঠতো সূর্য ডুবতো, আর তার ওপর এই জগতের মত সেখানেও ঋতু পরিবর্তন হতো নিয়ম করে। যারা আমার সহকর্মী ছিল তারাই ছিল সেই জগতের অধিবাসী। আমি তাদের নিয়েই আমার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে সুখে-দুঃখে-আনন্দে-হতাশায় সেখানে আমার দিন কাটাতাম।

চাকরি ছেড়ে দেবার পরে আমি সেই জগতের কথা এতদিন ভুলেই গিয়েছিলাম। আরো বৃহত্তর এক জগতের অধিবাসী হয়ে বৃহত্তর সমস্যায় এবং গভীরতর দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো।

আমি সেদিন যথারীতি ডাক্তারখানায় বসেছিলাম রোগী আসছে, রোগী যাচ্ছে। কত লোকের কত রকমের সব অসুখ, আর কত রকমের সব ওষুধ। যে-ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরই আবার তার শরীরের ভেতরে ধ্বংসের বীজও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বসে-বসে সব দেখে শুনে আমার তখন সেই কথাই মনে হচ্ছিল।

এমন সময় আর একজন রোগী ঢুকলো। আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোক খুবই দুর্বল, হাঁটতে-চলতেও যেন বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। ভদ্রলোক ডাক্তারখানায় ঢুকতেই ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—আসুন শম্ভুবাবু, রোগী কেমন আছে এখন?

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোল।

বললে—এখনও ব্যথাটা কমেনি ডাক্তারবাবু, পেটটা কন-কন করছে সব সময়ে—

শুনে ডাক্তারবাবু বললে--আসুন চেম্বারের ভেতরে আসুন---বড় অসুখ বাধিয়ে বসেছেন--

বলে শম্ভু নামক ভদ্রলোককে নিয়ে তাঁর নিজস্ব চেম্বারের ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আমার কী রকম সন্দেহ হলো। শম্ভু নামটা তো চেনা চেনা লাগছে। এই ভদ্রলোক কি সেই শম্ভু নাকি! সেই আমাদের অফিসের শম্ভু, শম্ভু সরকার! কিন্তু সেই শম্ভুই যদি হবে তো এ চেহারা কেন? সে শম্ভুর তো ছিল গাট্টাগোট্টা পালোয়ানের মত শরীর।

অফিসে পাশাপাশি আমরা তিনজন বসতাম। আমি, নৃসিংহ আর শম্ভু।

নৃসিংহ বাড়ি থেকে টিফিন আনতো বাক্স করে। কিন্তু শম্ভু বেলা দেড়টার সময় টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ক্যান্টিন্ থেকে চাপরাশিকে দিয়ে টিফিন কিনে আনতো।

পরেশ ছিল আমাদের চাপরাশির নাম। পরেশ এসে দাঁড়াতো শম্ভুর টেবিলে। জিজ্ঞেস করতো—আজকে কি টিফিন আনবো শম্ভুদা?

শম্ভু বলতো—ক্যান্টিনে গিয়ে দেখে আয় আজকে কী খাবার বানিয়েছে—

পরেশ এক-একদিন আগেই ক্যানটিনে গিয়ে দেখে আসতো কী কী রান্না হয়েছে।

বলতো—আমি দেখে এসেছি। চিংড়ির কাটলেট্, পরোটা, ধোঁকার ডাল।, আলু-মটরের ঘুগ্নি, মটন-চপ আর মিষ্টির মধ্যে দরবেশ, পান্তুয়া, রাজভোগ আর অমৃতি জিলিপি—

শম্ভু খানিকক্ষণ ধরে ভাবতো আর তারপর বলতো—ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর, দু'টো পরোটা নিয়ে আয়, তার সঙ্গে এক প্লেট আলু-মটরের ঘুগনি, আর দু'টো চিংড়ির কাটলেট। দেখিস, কাটলেট যেন গরম থাকে—

পরেশ বলতো—চা আনবো না, চা?

শম্ভু বলতো—এখন চা কী হবে? আগে খাবারগুলো নিয়ে আয় তারপর চা আনবি, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না? তুই কি নতুন লোক হলি নাকি আজ?

শম্ভুর এই টিফিন খাওয়ার দৃশ্য ছিল দেখবার মত। আগে পরোটা দিয়ে ঘুগ্নি খেয়ে এক গেলাস ভর পেট জল খেত, তারপর চা এলে একবার কাটলেট কামড় দিত আর একবার চায়ের কাপে চুমুক দিত—

আমরা তার খাওয়া দেখতাম। সে তো খাওয়া না। যেন গেলা।

অথচ বাড়ি থেকে পেট ভরে রোজ ভাত-ডাল-মাছ খেয়ে আসতো। শম্ভু বলতো—সে কি খাওয়া ভাই? তখন মন পড়ে রয়েছে অফিসের দিকে, সেই সময়ে ভালো করে খাওয়া হয়? তখন ভাত খাচ্ছি কি ছাই খাচ্ছি বোঝা যায় না। তাই অফিসে এসে এই টিফিন খাওয়াটাই হচ্ছে আমার আসল খাওয়া—

শম্ভু একবার করে কাটলেট কামড় দিত আর চায়ে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে কথা বলত।

তারপর নৃসিংহের দিকে চেয়ে বলতো—তুমি কী টিফিন এনেছ দেখি ভাই?

নৃসিংহ তখন টিফিনের কৌটো বার করে খাচ্ছে। বলতো—কী আর খাবো, এই ছানা আর দু'টুকরো আপেল—খাবে?

শম্ভু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে বলতো—দূর, ওই সব বিধবার খাবার কারো মুখে রোচে?

ফল আর ছানাকে শম্ভু বিধবার খাবার বলতো।

বলতো—একবার কাটলেট খেয়ে দেখ না, আমি পয়সা দেব খাও যদি তো বলো, তাহলে পরেশকে দিয়ে কাটলেট আনিয়ে দিই—

নৃসিংহ বলতো—না ভাই, ও-সব আমার খেয়ে দরকার নেই, আমার এই ছানা আর ফলই ভালো—

শম্ভু বলতো—আমার ছানা খেলে বমি আসে—

নৃসিংহ বলতো—আমি বিধবা মানুষ, আমার এই বিধবার খাবারই ভালো—

শম্ভু বলতো—কিন্তু তা বললে তো শুনবো না। এই চাকরিটা করছো কী জন্যে শুনি? খাওয়ার জন্যেই তো? মানুষ হয়ে জন্মে যদি না-ই খেলুম তো বেঁচে থেকে লাভটা কী? তুমিই বলো লাভটা কী?

নৃসিংহ বলতো—আমি তো তোমার মত খাওয়ার জন্যে বাঁচি না, বাঁচার জন্যে খাই। তোমার থিওরি নিয়ে তুমি থাকো, আমি আমার থিওরি নিয়েই থাকবো। শেষকালে যখন তুমি পেটের অসুখে কষ্ট পাবে, তখন আমার কথার দাম বুঝবে—

—পেটের অসুখ?

পেটের অসুখের কথা শুনলেই শম্ভু চটে গিয়ে বলতো—কী বলছো? পেটের অসুখ?

বলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের সার্টের আস্তিনটা ঝট্‌-পট্‌ খুলে ফেলতো। বলতো-এ দেখছো আমার বা হাতের মাশ্‌ল, দেখ টিপে দেখ, একেবারে লোহার মতন! দেখেছো?

আমরা শম্ভুর হাতের মাশ্‌ল্‌ টিপে দেখতুম। সে একেবারে লোহার মতন। জোর করে টিপেও হাতের গুলটা নরম করতে পারতুম না।

শম্ভু নিজের স্বাস্থ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে উঠতো। বলতো—এই সব খেয়েই এই রকম মাশ্‌ল্‌ তৈরি করেছি, জানো হে। তোমাদের মতন ছানা আর ফল খেলে আমার মাশ্‌ল্‌ও তোমাদের মত তুলতুলে নরম হয়ে যেতো—

এক-একদিন শম্ভু রসিকতা করে নৃসিংহকে একটা গরম সিঙাড়া হাতে নিয়ে তার নাকের ডগার কাছে তুলে ধরতো।

বলতো—সিঙাড়া খাও-না-খাও সিঙাড়ার গন্ধটা অন্তত শোঁকো—ঘ্রাণেও অর্ধ ভোজন হয়ে যাবে, দেখবে তাতেও তোমার স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে যাবে—

নৃসিংহ তাতেও কিছু রাগ করতো না। শুধু হাসতো শম্ভুর কথায়।

বলতো—খেয়ে নাও ভাই দু'দিন বেশি দিন নয়—

তাতেও শম্ভু দমতো না। বলতো—বাঙালীদের এই জন্যেই তো কিছু হলো না। দেখে এসো পাঞ্জাবে গিয়ে। দেখে এসো তারা কী খাওয়াটা খায়। যা খায় তাই-ই হজম করে ফেলে। লোহা খেলেও তাদের হজম হয়ে যায়—

এই রকম রোজ। রোজ টিফিন-টাইমে এই খাওয়া নিয়ে নৃসিংহ আর শম্ভুতে কথা কাটাকাটি হতো। শম্ভু চিংড়ির কাটলেট, পরোটা, আলু-মটরের ঘুগ্‌নি এই সব খেতো আর নৃসিংহ টিফিন কৌটো খুলে ছানা আর একটা ফল খেতো।

অথচ শম্ভু যে মাইনে বেশি পেত তা নয়। যে-মাইনে পেত তাতে তার ঠিকমত কুলোত না। কো-অপারেটিভ্‌ থেকে টাকা ধার করতে হতো তাকে।

যখন তাকে আমরা এই টাকা খরচ করার ব্যাপারে একটু সদুপদেশ দিতে যেতাম সে হেসে উড়িয়ে দিত। বলতো—আরে রাখো তোমাদের উপদেশ, সবাই-ই তো একদিন মরে যাবো, তারই মধ্যে যে ক'টা দিন বাঁচি আরাম করে খেয়ে সুখ করে নিই—

শেষকালে নৃসিংহ একদিন আর থাকতে পারলে না। বললে—দাঁড়াও, শম্ভুকে এবার জব্দ করি—

সেদিন সবে নৃসিংহ আর শম্ভু দু'জনেই টিফিন খাওয়া শেষ করেছে, এমন সময় পরেশ এসে খবর দিলে যে ক্যানটিনে গিয়ে সে দেখে এসেছে যে সেখানে মাংসের বিরিয়ানি রান্না হয়েছে।

শম্ভু বললে—দূর, এখন রান্না হলে কী হবে? এখন তো খাওয়া হয়ে গেছে—

নৃসিংহ বললে—তুমি বিরিয়ানি খাবে তো বলো শম্ভু—

সঙ্গে-সঙ্গে শম্ভুর জিভ্‌ দিয়ে জল পড়বার উপক্রম হলো।

জিজ্ঞেস করলো কে খাওয়াবে?

নৃসিংহ বললে—আমি খাওয়াবো—

শম্ভু বললে—ঠিক আছে, খাওয়াও—

সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার চলে গেল ক্যানটিনে। মাংসের বিরিয়ানি এল। তার সঙ্গে এল মাংসের কারি।

শম্ভুর তখন টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে। তার পেট ভরা। তবু সেই ভরা-পেটের ওপরেই শম্ভু সেই এক প্লেট বিরিয়ানি আর এক প্লেট মাংস চেটে-পুটে খেয়ে ফেললে।

নৃসিংহ জিজ্ঞেস করলে-কী রকম লাগলো খেতে?

শম্ভু একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে উঠলো—ফাস্ ক্লাশ—

এর পর নৃসিংহরও জেদ চেপে গেল। রোজই নৃসিংহ শম্ভুকে ভাল-ভাল খাবার খাওয়াতে লাগলো ক্যানটিন থেকে আনিয়ে। আর শম্ভুও পেট ভরে খেতে লাগলো।

আমি একদিন নৃসিংহকে বললাম—কীহে, তুমি গাঁটের পয়সা খরচ করে শম্ভুকে অত খাওয়াচ্ছো কেন?

নৃসিংহ বললে—দাঁড়াও না তুমি, দেখ না শম্ভুর কী করি আমি—

জিজ্ঞেস করলাম—কী করবে তুমি শম্ভুর?

নৃসিংহ বললে—আমি ওর লিভারটা খারাপ করিয়ে তবে ছাড়বো। রোজ-রোজ ভাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ও চপ-কাটলেট খাবে আর আমাকে বিধবা বলবে, এ আর সহ্য হয় না—আমি ওর সর্বনাশ করে ছাড়বো, দেখ তুমি—

তারপর থেকে নৃসিংহ খাওয়াতে লাগলো শম্ভুকে। অফিসের ছুটির পরও নৃসিংহ শম্ভুকে বলতো—ওই দেখছো, তেলে-ভাজা ভাজা হচ্ছে, খাবে নাকি?

শম্ভু বলতো—খাওয়ালেই খাবো।

নৃসিংহ বলতো—শেষকালে পেট খারাপ হলে কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

পেট খারাপের কথা শুনে বরাবর হাসতো শম্ভু। শম্ভু বলতো—পেট-খারাপ জিনিষটা যে কী, তা একবার ভুগে দেখতে ইচ্ছে করে আমার! চোঁয়া ঢেকুর জিনিসটা যে কী, তাও কোনও দিন জানতে পারলাম না—

যখন কিছুতেই আর শম্ভুর পেট খারাপ হতো না তখন নৃসিংহ বলতো—শম্ভু দেখছি একেবারে হিরণ্যকশিপু হে, একে তো দেখছি কিছুতেই মারা যাবে না—

আমি বললাম—তবু তুমি ভাই হাল ছেড়ে দিও না, তুমি চালিয়ে যাও—

শেষকালে নৃসিংহ কো-অপারেটিভ্ থেকে মোটা টাকা ধার নিলে। আস্তে-আস্তে সেই সব টাকা গুলো ঢালতে লাগলো হিরণ্যকশিপুর পেটের ভিতর। অফিসের টিফিন-রুম থেকে তো খাওয়াতো, তার ওপর রেষ্টুরেণ্টে ঢুকেও কষে খাওয়াতো। সেখানে যত কিছু দুষ্পাচ্য খাবার আছে সব খাওয়াতো। আর শম্ভুও পরের পয়সায় বেশ আয়েশ করে পেট পুরে খেত। একদিন সন্দেহ হলো নৃসিংহের।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি কোনও হজমি-বড়ি-টড়ি খাও নাকি হে?

শম্ভু বললে—দূর, হজমি-বড়ি কেন খেতে যাবো? আমার অত পয়সা কোথায়?

—তাহলে সকালে কি বাড়ি থেকে ভাত-টাত না খেয়ে অফিসে আসো নাকি?

শম্ভু বললে—ভাত না খেয়ে অফিসে আসবো কেন, তাহলে তো অফিসে এসেই ক্যানটিনে ঢুকতে হতো?

অগত্যা নৃসিংহ বলতো—হজমি-বড়িও খাও না, বাড়িতেও ভাত খেয়ে অফিসে আসো, তাহলে এত ক্ষিধে কোত্থেকে হয় তোমার? আর হজমই বা করো কী করে?

শম্ভু এ-কথার জবাবে শুধু আত্মগর্বে হাসতো মুচকে-মুচকে।

আড়ালে নৃসিংহ আমাকে বলতো—আমার পাশে-বসে গপ্-গপ্ করে ওই সব মুখরোচক খাবার খাবে, এ আমার আর সহ্য হয় না ভাই। হয় আমি আমার চেয়ার এখান থেকে বদলাবো, আর না-হয় তো ওর পেট খারাপ করিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।

নিজের চেয়ারটা অন্য জায়গায় বদলাবারও অনেক চেষ্টা করেছে নৃসিংহ। বড় সাহেবকে দরখাস্তও করেছিল সেই মর্মে। কিন্তু বড় সাহেব রাজি হয়নি। পাশে একজন

সহকর্মী চপ-কাটলেট খায়, সেই কারণ দেখিয়ে বদলি হবার প্রার্থনা কোন্ কড়সাহেব শোনে। আসল কারণটা তো আবার প্রকাশ্যে কাউকে বলাও যায় না। তাই তার সেই কামনাও মেটেনি। আসলে ট্র্যাজেডিটা হলো এই যে প্রতিদিন নৃসিংহকে অফিসে আসতেও হতো, আবার সেই শম্ভুর অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার অস্বস্তির দৃশ্যও তাকে দেখতে হতো। আর এ যে নৃসিংহর মত সংযমী পুরুষের পক্ষে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণা তা আমি ছাড়া কেউ বুঝতেও পারতো না।

ততদিনে নৃসিংহের অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে কো-অপারেটিভে। তার ফলে টিফিনের মোটা খরচটা বেঁচে গেছে শম্ভুর। কো-অপারেটিভ থেকে তাকে আর টাকা ধার করতে হয় না। আমি নৃসিংহকে আড়ালে বলতাম—কেন তুমি এমন বোকার মত কাজ করছো ভাই? ওতে তোমার কী লাভ হচ্ছে, মাঝখান থেকে তো শম্ভুরই খরচ বেঁচে যাচ্ছে, আর তোমার শুধু তার গুণোকার দিয়ে যেতে হচ্ছে—

নৃসিংহ বলতো—না, তুমি বোঝ না, আমার যত টাকাই লোকসান হোক, এত অনাচার আমার সহ্য হয় না—

ঠিক এই রকম যখন অবস্থা আমি তখন হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলাম। অনেক দিন আগে থেকেই ছাড়বো ছাড়বো করছিলাম কিন্তু তেমন কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

শেষকালে ভাবলাম সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকলে সুযোগ কোনদিনই আসবে না। বরং সুযোগ আমাকেই তৈরি করে নিতে হবে। সমুদ্রের ঢেউ থামবে আর তখন আমি স্নান করবো—এ কথা যে ভাবে সে বর্বর। শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

তারপর কথা দিয়ে কী ঘটলো আমি জানি না। আগে অফিসে আমার চালক ছিল একজনই মাত্র। পরে লক্ষ-লক্ষ চালকের অধীনে আমি গলিত হতে লাগলাম। সে এমন এক দুর্নিবার জীবন-যাত্রা যে তাতে শনিবারের হাফ হলিডে বা রবিবার নেই, পুজোর ছুটি নেই, ক্যাজুয়েললিভ বলে কোনও পদার্থ নেই, আমি পরাধীন, তাও যেমন সত্যি নয়, আবার আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন তা বললেও মিথ্যে বলা হবে—

তখন কোথায় রইল নৃসিংহ আর কোথায়ই বা রইল শম্ভু। আর তাদের সেই দুজনের খাওয়া নিয়ে সেই রেষারেষি সব কিছুই তখন তুচ্ছ হয়ে গেল আমার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতার কাছে।

হঠাৎ ডাক্তারবাবুর চেম্বারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই ভদ্রলোক। ভদ্রলোক চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, এমন সময় আমি গিয়ে তাকে ধরলাম।

বললাম—আচ্ছা, আপনার মুখটা যেন আমার চেনা-চেনা লাগছে খুব, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—আপনার নাম কি

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম শম্ভুচরণ দাশগুপ্ত—

বললাম—আরে, তুমি শম্ভু, তাই বলো না যাকে আমরা হিরণ্যকশিপু বলতুম—আমাকে চিনতে পারছো না আমি

শম্ভু আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বললে আরে তাই বলো, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছিল—তুমি ডাক্তারের কাছে কী করতে? তোমার আবার কী অসুখ?

বললাম—আমার কোনও অসুখ নেই, আমি ডাক্তারের কাছে আড্ডা দিতে আসি—

শম্ভু বললে—তুমি তো শ্যামবাজারের দিকে থাকো, তা সেই অতদূর থেকে তুমি এই যাদবপুরে আসো আড্ডা দিতে?

বললাম—আমি তা আজকাল এই যাদবপুরে থাকি—

শম্ভু বললে—তাই নাকি? তা বেশ ভালোই হলো। তোমার সঙ্গে এবার ঘন-ঘন দেখা হবে। খুব গল্প করা যাবে দুজনে। কিন্তু তোমার কি আর এখন সময় হবে সেই আগেকার মতন? তুমি ভাই এত বড় হয়ে গেছ—

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম। পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অনেক কথা জমা ছিল মনে। সকলের ব্যক্তিগত খবর দিতে লাগলাম। অনেকেই রিটায়ার হয়ে গেছে।

শম্ভু বললে—আমিও রিটায়ার করে গেছি, তুমি জানো বোধহয়?

বললাম—রিটায়ার করাটাই তো স্বাভাবিক। তা কেমন লাগছে? ফাঁকা-ফাঁকা?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ ভাই খুব ফাঁকা লাগে। তবে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী নিয়ে সময় একরকম কেটে যাচ্ছে আর তুমি?

বললাম—আমার কথা ছেড়ে দাও। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরং আমি বেশি পরাধীন হয়ে গিয়েছি—

শম্ভু বললে—সে কী, কেন?

—সে তুমি বুঝবে না। আমার এখন লক্ষ-লক্ষটা মনিব। এখন তাদের হুকুম তামিল করতে করতেই আমি একেবারে ক্লান্ত। এর চেয়ে তোমাদের অফিস আমার পক্ষে ঢের ভালো ছিল। থাক, অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। যেদিন তোমার একটু সময় হবে এসো না আমার বাড়িতে—

শম্ভু বললে—নিশ্চয় আসবো। সে তোমাকে আর বলতে হবে না। শেষকালে এমন যেতে আরম্ভ করবো যে তোমার লেখা-টেখা মাথায় উঠবে—

বললাম—তাহলে সেই নৃসিংহ অবতারকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে—

শম্ভু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—সেই নৃসিংহের কথা বলছো? কিন্তু সে তো আর নেই আমি বললাম—নেই মানে? সে কি বাইরে চলে গেছে?

শম্ভু বললে—নেই মানে সে মারা গেছে।

—তাই নাকি? কী হয়েছিল তার? সে তো খুব সাত্ত্বিক জীবন-যাপন করতো। খুব সাবধানে থাকতো, কোনও অনিয়ম-অনাচারও করতো না। তার আবার কী অসুখ হলো শেষকালে? স্ট্রোক?

শম্ভু বললে—না ভাই, তা নয়। তুমি চাকরি ছেড়ে দেবার পরই মারা যায়। পুরো টার্ম চাকরিও করতে পারেনি। রিটায়ার করতে তখনও তার কুড়ি বছর বাকি ছিল—

—কিসে মারা গেল সে?

শম্ভু বললে—সিরোসিস অব্ লিভার। ওই ছানা, কাঁচকলা আর আলোচালের ভাত আর ফল খেয়েই তার লিভার যা তা হয়ে গিয়েছিল—

আমি অবাক হলাম তার কথা শুনে। শম্ভু আবার বলতে লাগলো—অথচ দেখ ভাই, তখন আমি তার পাশে বসে ওই রকম অখাদ্য-কুখাদ্যগুলো খেতুম বলে আমাকে কত ভয় দেখাতো, তবু আমি তো এখনও আজ বেশ বহাল-তবিয়তে বেঁচে আছি—

—তাহলে তুমি ডাক্তারের কাছে এসেছিলে কেন?

শম্ভু বললে—ও আমার ছেলের অসুখের কথা বলতে—

আমি তখনও হাঁ করে, শম্ভুর চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখছি। বললাম—এখনও তুমি সেই রকম চপ্-কাটলেট-ঘুগ্‌নি খাও।

শম্ভু বললে—টাকার অভাবে তেমন আর আগেকার মতন খেতে পাইনা বটে, কিন্তু কেউ খাওয়ালে এখনও খেয়ে দেখিয়ে দিতে পারি—

আমি তার কথা শুনে আরো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পৌরাণিক কালে একবার নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিল। কিন্তু এই কলিকালে কি সবই উল্টো হতে হয়? এ-কালে তাই বোধহয় হিরণ্যকশিপুরাই নৃসিংহ অবতারদের বধ করছে!

সত্যিই, আশ্চর্য! আশ্চর্য এই কলিকাল!

*

তিন

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে লিখলেই লেখক হওয়া যায় না। কোনও অলৌকিক দুঃখ যিনি না পেয়েছেন তিনি হাজার-হাজার বই লিখলেও লেখক হতে পারবেন না, কিম্বা হাজার-হাজার বই পড়লেও পাঠক হতে পারবেন না। 'কাম-মোহিত' ক্রৌঞ্চমিথুনের হত্যা না দেখলে রত্নাকরও বাল্মিকী হতে পারতেন না, রামায়ণও লিখতে পারতেন না।

Our sweetest songs arc those
That tell of saddest thoughts.

এই কথাটা লিখেছিলেন শেলী। আমি কী করে লেখক হতে পেরেছি (তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক) তার পেছনে একটা ঘটনা আছে।

জীবনের কয়েকটা বছর আমাকে পুলিশের গুপ্তচরের চাকরি করতে হয়েছিল। সে এক বিচিত্র চাকরি। মাসের মধ্যে সাতাশ-আঠাশ দিন আমি বাড়ি ছাড়া। ট্রেনে চড়ে আমাকে সারা দেশে-দেশে ঘুরতে হতো। ট্রেনের মধ্যে আমার ঘুম, আমার আহার পর্ব নির্বাহ হতো। এই অবসরে যে আমি কত মানুষ দেখেছি, কত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছি, কত দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

আমার বয়স তখন কম, উৎসাহ তখন অদম্য, উচ্চকাঙ্ক্ষা তখন অভ্রভেদী। আমার সামনে তখন সুদূর ভবিষ্যৎ। জীবন দেখবার কৌতূহল তখন অদম্য এবং যা যা দেখি যা-যা ভাবি, যা-যা করি, যার-যার সঙ্গে মেলামেশি করি, তা সমস্ত আমাকে আমার হেড-অফিসে রিপোর্ট করতে হয়।

এক-কথায় বলতে গেলে আমার কোনও নির্দিষ্ট ধরা-বাঁধা কাজ নেই। অফিস আমার জব্বলপুর আর আড়াইশো মাইল দূরে বিলাসপুরে আমি থাকি। এই সময়কার কোনও ঘটনা নিয়ে আমি কখনও কিছু লিখিনি, কিন্তু আজ মনে পড়ছে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটা যা আমার জীবনের যাত্রা পথের একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটা অত্যন্ত সামান্য, কিন্তু আমার কাছে তা আজও অসামান্য হয়ে আছে। এই ঘটনাটাই আমাকে লেখক হতে সাহায্য করেছে। ঘটনাটি এই—

অফিসের কাজে আমাকে সেবার নাগপুরে যেতে হয়েছিল। কাজ শেষ করতে সমস্ত দিনটা কেটে গেল। পরের দিন দুপুর এগোরোটা পাঁচ-এর ট্রেন। যখন স্টেশনে এসে পৌঁছোলাম, তখন ঘড়ির কাঁটায় এগোরাটা পাঁচ। ট্রেন ছাড়ে—ছাড়ে। ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখি কোনও কামরায় একেবারে তিল ধারণের জায়গা নেই। আরাম করে বসে যাবার মত জায়গা কোনও কামরাতেই নেই। বড় ভাবনায় পড়লাম। অনেক দূরের রাস্তা। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো আর অত দূরের রাস্তা যাওয়া যায় না। শেষে এমন একটা কামরায় উঠলাম যেখানায় মানুষের ভিড় অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু খানিক পরেই লক্ষ্য করলাম ট্রেনের কামরায় কোণের দিকে একজন মহিলা কেঁদে-কেঁদে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। আর একজন ভদ্রলোক তার পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

প্রথমটায় কেউ ওদিকে মন দেয়নি। এ-রকম কত ব্যক্তিগত দুঃখ অহরহ মানুষকে পীড়া দিচ্ছে কে তার খবর রাখে আর কারই বা অত সময় আছে? দুঃখ তো এ-সংসারে চিরস্থায়ী জিনিস। আর সুখ? সুখের কথা তো কেবল অভিধানেই লেখা থাকে।

পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম—মহিলাটির কী হয়েছে মশাই?

সকলেরই নিজের নিজের সমস্যা আছে। ভদ্রলোক বললেন—কী জানি কী হয়েছে?

এবার মহিলাটির দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তার বয়েস আর কতই বা হবে। বড় জোর কুড়ি কি বাইশ। কিন্তু পরনে বিধবার পোষাক। তার পাশে বসে যিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁর বয়েস ষাটের বেশি নয়। হয়ত মেয়েটির বাবাই হবে।

ট্রেন ছেড়ে দিলে। ট্রেন ছাড়বার মুখে আরো কিছু প্যাসেঞ্জার কামরার মধ্যে হুড়মুড় করে উঠে পড়লো। যারা নতুন উঠলো তারা আর বসবার জায়গা পেলে না। কোনও রকমে লোহার রড্ ধরে দাঁড়িয়েই রইল। আমার কাছে অবশ্য বিশেষ কার্ড-পাশ আছে তখন। আমি ইচ্ছে করলে যে-কোনও কামরায় উঠতে পারতাম। কিন্তু মহিলাটির ওই কান্না দেখে বড় কৌতূহল হলো। কেবল মনে হতে লাগলো—ও মেয়েটি কাঁদছে কেন?

আমি ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ মশাই। এই মেয়েটি আপনার কে হয়?

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো তিনি খুব বিষণ্ণ।

বললেন—এ আমার মেয়ে—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কী হয়েছে?

ভদ্রলোক বললেন—আমার জামাই মারা গেছে—

ভদ্রলোকের দুঃখে আমার নিজের মনটাও কেমন ভিজে উঠলো।

নিজের মেয়ে বিধবা হলে বাপের মনে যে কষ্ট হয়, তা যে ভুক্তভোগী সেই বুঝতে পারে। সে ছাড়া বাইরের লোক আর কে বুঝবে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনার জামাই-এর কি অসুখ হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন—ক্যানসার—

ভদ্রলোকের বোধহয় বেশি কথা বলতে ভালো লাগছিল না। তিনি তাঁর মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। কেবল বলছিলেন—আর কাঁদিস নে মা, কেঁদে আর কী করবি, তোর কপালে দুঃখু আছি তুই কী করবি বল্?

কিন্তু সদ্য বিধবা মেয়ের মন কি কারো সান্ত্বনায় ভোলে? সে একই ভাবে কেঁদে-কেঁদে সারা হচ্ছিল। কাঁদতে-কাঁদতে কেবল বলছিল—আমি আর বাঁচবো না বাবা, আমাকে তুমি কেন বাঁচালে? আমি তো মরতেই চেয়েছিলুম—

ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বাবা অতি কষ্টে তাকে ধরে ফেলে নিজের বাড়ি বিলাসপুরে নিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের আর কোনও সন্তান নেই ও-ই একমাত্র মেয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কতদিন আগে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন—এই মাত্র বছর খানেক আগে।

বললাম—হঠাৎ ক্যানসারই বা হলো কেন?

ভদ্রলোক বললেন—কী করে বলবো বলুন, সবই ভগবানের ইচ্ছে—

ট্রেন একটার পর একটা ষ্টেশনে আসছে আর খানিকক্ষণ থেমে আবার ছাড়ছে। প্রথমে ভাণ্ডারা রোড ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। কিছু লোক ট্রেনে উঠলো, আবার কিছু লোক নামলো।

তারপর গণ্ডিয়া জংশন, সেখানেও ওই রকম, পাঁচ মিনিট স্টপেজ, লোকজন ওঠানামা করলো। তারপর আবার ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু মেয়েটির কোনও দিকে নজর নেই। সে একটানা কেঁদে চলেছে। আর মাঝে মাঝে তখনও বলে চলেছে—তুমি কেন আমাকে বাঁচালে বাবা? আমি এখন কী নিয়ে বাঁচবো? কার মুখ চেয়ে বাঁচবো?

তারপর আবার গলা ফাটিয়ে হাউ-হাউ করে কান্না।

ট্রেনের অন্য প্যাসেঞ্জাররা প্রথমে একটু সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির কান্না শুনছিল। সবারই মুখের কথায় সহানুভূতির সুর, কিন্তু শেষের দিকে সবাই-ই বিরক্ত হয়ে গেল।

কান্না কে শুনতে চায় সংসারে? হাসি-ঠাট্টা করো, আমি বরাবর তা শুনে যাবো। কিন্তু কান্না কার শুনতে ভালো লাগে বেশিক্ষণ?

আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম। সবারই মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ভাব। যেন কান্না তাদের আর সহ্য হচ্ছে না কারো।

কিন্তু ওদিকে মেয়েটের কান্নারও আর বিরাম নেই। সে তখনও কাঁদতে-কাঁদতে বলে চলেছে—আমি এখন কী করবো বাবা? আমাকে তুমি কেন বাঁচালে? আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচবো?

ট্রেনটা ঠিক দুটো চৌত্রিশ মিনিটে এসে থামলো ডোংগরগড় স্টেশনে। সেখানেও কিছু লোক নামলো। আর কিছু লোক উঠলো। সেখানে দশ মিনিট স্টপেজ। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তখন দুটো বেজে চুয়াল্লিশ। ট্রেনটা ছেড়ে দিলে।

মেয়েটি তখনও একটানা কেঁদে চলেছে।

বাবা-মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কিছু মুখে দিবি মা? ক্ষিধে পেয়েছে? কদিন ধরে তো কিছুই খেলি নে? না খেলে তোর শরীর টিকবে কী করে?

জবাবে মেয়ে বললে—তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল, আমার বেঁচে কী লাভ?

শেষ পর্য্যন্ত গাড়ির সকলেরই মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। সবাই ভাবছিল—এ কী উৎপাত! হোক শোক, শোক প্রকাশও স্বাভাবিক, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি হলেই লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কে কার কথা শোনে;

তারপরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রায়পুর ষ্টশনে ট্রেনটা আসতেই কাণ্ডটা ঘটলো। তখন ঘড়িতে বেলা সাড়ে চারটে। অন্য প্যাসেঞ্জারবা তখন খেতে ব্যস্ত। কেউ খেতে নামলো। কেউ গাড়িতেই পুরি-কচৌরি, আলুর সবজি খেতে লাগলো গপ্-গপ্ করে।

কিন্তু মেয়েটি আর তার বাপের খাওয়ার কোনও প্রশ্নও নেই, সে বিষয়ে উদ্যোগও নেই। মেয়েটি একটানা কেঁদেই চলেছে গলা চড়িয়ে।

হঠাৎ প্ল্যাটফরমের উপর থেকে একজন ভিখিরির গাওয়া গানের শব্দ ভেসে এল। ভিখিরিটি গান গাইছে ঃ

> কাম কিয়ে যা,
> রাম ভজে যা
> না কাল্‌কা ডব হ্যায়—
> ইস্ নগরীমে সভি মুসাফির
> না কাল্‌কা ঘর হ্যায়—

যেমন সুরেলা গলা, তেমনি গানের কথাগুলোর মানে। অর্থাৎ কাজ করে যাও, রাম-নাম ভজনা করে যাও, কাউকে ভয় করবার দরকার নেই। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই যাত্রী, ঘটনা চক্রে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছি, এখানে কারোর ঘর-সংসার নেই।

ভিখিরিটা ঘুরিয়ে গানটা বার বার গাইছে--"কাম কিয়ে যা,

রাম ভজে যা
না কাহুকা ডর হ্যায়—
ইস্ নগরীমে সভি মুসাফির
না কাহুকা ঘর হ্যায়—"

হঠাৎ মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলাম মেয়েটি আর কাঁদছে না। একমনে গানটা শুনছে। ট্রেনটা আবার ছেড়ে দেয়। মেয়েটি তখনও আর কাঁদছে না। মনে হলো যেন মেয়েটির মনে গানটা মন্ত্রের মত কাজ করেছে। শুধু মেয়েটির মনেই নয়, ট্রেনের প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারের মনেই যেন গানটা তার প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইস্ নগরীমে সভি মুসাফির
না কাহুকা ঘর হ্যায়।

আমরা সবাই যাত্রী। সবাই আমরা পোটলাপুটলি বেঁধে প্ল্যাটফরমে ট্রেনের জন্যেই অপেক্ষা করছি। ট্রেন এলেই আমরা তাতে চড়ে বসবো। আমাদের ঘর-সংসার আত্মীয় পরিজন কেউ কারো নয়। তাই শুধু আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করবো আর নিজের নিজের কাজ করে যাবো। আমদের কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। মেয়েটির চোখ দুটো তখন শুকনো। গত কয়েকদিন ধরে যে কান্না সে কেঁদেছে, বাবার হাজার সান্ত্বনাতেও যা থামেনি, রায়পুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর একটা ভিখিরির ভিক্ষে করতে করতে গাওয়া গান শুনেই সেই কান্না থেমে গেল।

পকেট থেকে একটা সিকি বার করে ভদ্রলোক ভিখিরিটাকে দিলেন।

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে।

তখনও যেন আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে সেই গানের কথাগুলো ভাসতে লাগলো।

কাম কিয়ে যা,
রাম ভজে যা
না কাহুকা ডর হ্যায়।
ইস্ নগরীমে সভি মুসাফির
না কাহুকা ঘর হ্যায়।।

চার

আমার মনে হলো আমি যেন সামনে মহারাজ নন্দকুমারকেই দেখছি। কিন্তু সেই সাজ-পোশাক কোথায়? সেই জাঁক-জমকই বা কোথায় গেল? সেদিনকার সেই হুগলীর ফৌজদারের চেহারা হঠাৎ এমনই বা হয়ে গেল কেন?

একটা ময়লা কালো রং-এর ট্রাউজার আর গায়ে একটা বুশ-সার্ট। পায়ে কাবলি জুতো। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এতদিন পরে কোত্থেকে আসছেন?

লোকটা বললে—সেটেলমেণ্ট অফিস থেকে।

—কালিগঞ্জে সেটেলমেণ্ট অফিস?

লোকটা হাসলো। বললে—হ্যাঁ স্যার—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন ধরে আমিই তো কালিগঞ্জ সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে-গিয়ে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। আজ সাত বছর এই-ই করেছি কেবল। সামান্য ন' হাজার পাওনা টাকার ব্যাপার। ন' হাজার পাওনা টাকার জন্য সাত বছর ঘুরে ঘুরে এখন যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, ঠিক এই সময়ে এ এল। এই সাত বছরে আমাকে অন্ততঃ ছিয়াত্তরবার কালীগঞ্জে যেতে হয়েছে। সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে ধরনা দিতে হয়েছে ভিখিরের মত। আর তা ছাড়া কি টাকাই কিছু কম খরচ হয়েছে? প্রত্যেকবার অন্ততঃ পনেরোটা করে টাকা খরচ হয়েছে যাতায়াত বাবদ। এক পিঠের ট্রেন ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। তারপর আছে খাওয়া খরচ। তারপর ট্যাক্সি-ভাড়া, রিক্‌শা ভাড়া। তারপর পান সিগারেট।

কিন্তু এত করেও কিছু হয়নি। প্রত্যেকবার গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি—কী হলো স্যার? কদ্দূর? কবে টাকাটা পাচ্ছি?

অফিসার ভদ্রলোক খুব মিষ্টভাষী। গেলেই বসতে বলেন। বলেন—বসুন বসুন—আপনাকে খুবই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে—

আমি বলি—একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন স্যার। দেখছেন তো ক' বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছি—

অফিসার ভদ্রলোক বলেন—গভর্মেণ্টের অফিস, বুঝতেই তো পারছেন। একটা ফাইল এ টেবিল থেকে ও-টেবিলে যেতেই দেড়মাস লাগে—

আমি বলি-তা এ-রকম হয়ই বা কেন?

অফিসার বলেন—কেউ যে কাজ করে না আমাদের অফিসে।

—তা কাজ করে না কেন? আপনারা কিছু বলতে পারেন না?

অফিসার হাসেন। বলেন—বলা কি অত আজকাল সহজ মশাই। আজকাল ইউনিয়নের যুগ, কে কাকে কী বলবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা? বলতে গেলেই তো ঘেরাও করবে।

আমি একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচু গলায় বলি—যদি কাউকে কিছু দিলে কাজ হয় তো বলুন, তা আমি দিতে প্রস্তুত—

—কী? ঘুষ?

অফিসার ভদ্রলোক যেন সাপ দেখে দশ হাত পেছিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, না-না, ঘুষ নয়। এই পান-সিগারেটের নাম করে যদি কিছু দিই?

ভদ্রলোক অফিসার মানুষ! বললেন—না-না ওদের ওত প্রশ্রয় দেবেন না। প্রশ্রয় পেলে একদিন আবার আপনাদেরই গলা কাটবে। এখন হয়ত পান-সিগারেট খেতে দিলেন, তারপর একদিন টাকা-কড়ি চেয়ে বসবে। তখন আর আমি অফিসের ডিসিপ্লিন রাখতে পারবো না—

ভাবলাম খুব ভালো কথা। প্রত্যেক অফিসের বড়-সাহেব যদি এই রকম হয় তো ইণ্ডিয়ায় তো সুদিন ফিরে আসবে!

—তাহলে কবে আসবো বলুন?

ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তার চেয়ে বরং ফাইলটা তৈরি হলেই আমি নিজেই আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব—

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। বললাম—তা যদি করেন তো খুব উপকার হয়! বার-বার আসা-যাওয়া করছি, সাত বছর ধরে এই হয়রানি, দেখতেই পাচ্ছেন!

ভদ্রলোক সহানুভূতি জানালেন—সত্যিই আজকাল যে কী হয়েছে—

কিন্তু সহানুভূতিতে তো মানুষের পেট ভরে না। ন' হাজার টাকার ব্যাপার। পিতৃপুরুষের জমি-জমা ছিল একদিন। সেকালে তাতেই তাঁদের চলে যেত। তারপর সরকার থেকে সব জমি নিয়ে তার খেসারত দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে। দর দাঁড়িয়েছে ন' হাজার টাকা! আমারও যেমন উড়ে আসা টাকা, গর্ভমেণ্টেরও তেমনি উড়ো খৈ। কার টাকা কে দিচ্ছে!

আসবার সময় বললাম—তাহলে কবে নাগাদ আপনার চিঠি আশা করবো?

ভদ্রলোক বললেন—বড় জোর একমাস। একমাসের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবেন—

আমি চলে এলাম। এক মাস তো দূরের কথা, তার পরেও দু' মাস কেটে গেল, কোনও চিঠি-পত্র নেই। একদিন আবার গেলাম কালীগঞ্জে। অফিসারের ঘরে গিয়ে দেখি ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। জিজ্ঞেস করলাম—তিনি কোথায়?

একজন বাবু বললেন—তিনি ছুটিতে গেছেন, তাঁর ভাগ্নির বিয়ে—

এত পরিশ্রম করে গিয়েছি, এতগুলো টাকাও খরচ হয়ে গেল। অথচ কোনও কাজ হলো না। অফিসের যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে—আমি কিছু জানি না, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন—

তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেন—আমি তো কিছু জানি না, ওঁকে বলুন—

এই রকম ওর কাছ থেকে ওর কাছে ঘুরে-ঘুরে শুধু হয়রানিই হলো, কাজের কাজ কিছু হলো না। এই নিয়ে অন্ততঃ ছিয়াত্তরবার এসেছি কালীগঞ্জে। ফাইল যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে আছে। আমার তদ্বির-তাগাদায় এক চুল নড়েনি সে!

শেষে বিরক্ত হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। আর কালীগঞ্জে গেলাম না। ভাবলাম এ পৃথিবীতে সাতবার জন্ম হলেও ও-টাকা পাবার আর কোন আশাও নেই।

এমন সময় হঠাৎ আমার বাড়িতে স্বয়ং কালিগঞ্জ সেটেলমেণ্ট-অফিসের লোক সশরীরে হাজির হওয়াতে চমকে উঠলাম। লোকটাকে দেখে প্রথমে কিছু সন্দেহ করিনি। কিন্তু তার প্রস্তাব শুনে মনে হলো যেন স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার এসে হাজির হয়েছে!

লোকটা বললে—আপনি ন' হাজার টাকা পাচ্ছেন স্যার, কিন্তু একটা অনুগ্রহ করলেই আঠারো হাজার টাকা পেতে পারেন—

—কী রকম?

আমি কথাটা শুনে তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। না, কোনও সন্দেহ নেই। এ পুরোপুরি তো সেই নন্দকুমার! ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলি।

আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত 'বাঙলার ইতিহাস' বইখানা পড়ছিলাম। সে কতকাল আগেকার কথা! আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে! ইংরেজরা এসে কলকাতায় গেড়ে বসেছে। চারদিকে অরাজকতা। নবাবকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। সবাই একজোট হয়ে নবাবকে তাড়িয়ে ইংরেজদের এনে বসাতে চায়!

সেই সময় একদিন রাত্রে উমিচাঁদের আবির্ভাব! শয়তান উমিচাঁদ।

নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার। উমিচাঁদকে যথারীতি খাতির করে বসালে! জিজ্ঞেস করলে—কী খবর? আপনি এত রাত্তিরে?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—একটা কাজ করতে হবে দাদা, আপনিই করতে পারেন। আপনি ছাড়া আর কারো করবার ক্ষমতা নেই। টাকা যা চান তা দেওয়া যাবে—

—টাকা! নন্দকুমারের মুখে কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল। কে টাকা দেবে?

—কেন, ফিরিঙ্গি কোম্পানী দেবে!

—কত টাকা দেবে?

—যা চান আপনি!

নন্দকুমার বললে—কী করতে হবে আমাকে?

—আপনাকে এমন কিছু কঠিন কাজ করতে হবে না। ইংরেজরা সেপাই নিয়ে চন্দননগর দখল করতে যাবে, আপনি মোট কথা বাধা দিতে যাবেন না—

নন্দকুমার কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, এত ভাববার কিছু নেই। এমন হাতী-ঘোড়া কিছু নয় এটা। আসলে আপনার নবাবও যা, ও ক্লাইভ সাহেবও তাই—

—সে কী রকম?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, চারদিকের হাল-চাল দেখেছেন না? ওদিক থেকে পাঠান আহ্‌মদ-শা-আবদালী তো এসে পড়লো বলে। এই তো এবার কলকাতা থেকে ফিরে নবাবকে যেতে হবে আজিমাবাদের দিকে, শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ, তা শুনেছি!

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তা নবাব কি তাকে আটকাতে পারবে ভেবেছেন?

—কেন পারবে না?

—কেন পারবে শুনি? সেপাইরা কি নিয়ম করে মাইনা পায়? আর যা পায় তাতে কি তাদের পেট ভরে? আপনার দফতরের কথাই ধরুন না। আপনার দফতরের লোকেরা, আপনার ফৌজের সেপাইরা কি নিয়ম করে পেট-ভরানোর সব মাইনা পায়? খেতে পরতে পায়?

নন্দকুমার বললে—অনেক লিখে-লিখে তবে মাইনে আদায় হয়।

—আদায় হয় শেষ পর্যন্ত?

—ওই ন' মাসে ছ' মাসে আসে কোনও রকমে! তাও মাইনে বাড়াবার জন্যে কত তাগিদ দিচ্ছি, তারও কোনও জবাব নেই। জিনিস-পত্তোরের দামও বাড়ছে দিন দিন—

—আপনার মাইনে?

নন্দকুমার বললে-নিয়ম করে মাইনে পেলে কি আর ভাবনা?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তা আমি জানি। ও দেখবেন এ নবাবি টিকবে না। এই চাকরিতে যে-কটা দিন আছেন কাজ গুছিয়ে নিন, আখেরের কাজ গুছিয়ে নিন—নইলে পরে পস্তাতে হবে। তাই তো বলছিলুম বড় গাছে নৌকো বাঁধুন। এরা সব বনেদী

মানুষ, এই ইংরেজ বেটারা এদের কারবারের কায়দা-কানুনই আলাদা। আমিও তো কারবার করি, আর ও-বেটাদের দেখছি। কথার খেলাপ করে না মশাই, যার যা পাওনা-গণ্ডা তাকে তা আগে মিটিয়ে দিলে তবে ওদের ভাত হজম হয়। আমার কারবারের একটা পয়সাও ওরা বাকি ফেলেনি, তা জানেন?

—তা কী করতে হবে আমাকে, বলুন?

—ওই যে আপনাকে বললুম। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আপনি যত টাকা চাইবেন ও-বেটারা দেবে। দু হাজার চান দু হাজার, চার হাজার চান চার হাজার। ও-বেটাদের মশাই হক্কের টাকা। কিছু দুয়ে নিন না!

নন্দকুমার একটু ভেবে বললে—তা কত নিই বলুন তো ঠিক-ঠিক?

—যা আপনার খুশী!

—পাঁচ হাজার চাইলে দেবে?

—তা দেবে না কেন, পাঁচ হাজারই দেবে ক্লাইভ সাহেব।

নন্দকুমার বললে—তা যদি হয় তাহলে ছ' হাজার চাই, কী বলেন?

—তা তাই-ই চান!

নন্দকুমারের সাহস বেড়ে গেল। লোভও বেড়ে গেল। বললে—দাঁড়ান, ছ হাজারই বা কেন? যখন মাগ্‌না পাওয়া যাচ্ছে তখন আট হাজারই চাই। আট হাজার হলেই আমার ভালো হতো। আমার তো অনেক ঝুঁকি, নবাব যদি জানতে পারে তাহলে তো বুঝতেই পারেছেন.......

উমিচাঁদ বললে—ঝুঁকির কথা যদি বলেন তাহলে আট কেন দশ হাজারই চান না পুরোপুরি—

নন্দকুমার আর পারলে না। বললে—তাহলে দাঁড়ান, আমি একবার ঠাকুরঘর থেকে আসি—

উমিচাঁদ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুরঘর? ঠাকুরঘব কেন?

নন্দকুমার বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছু করিনে কিনা, বড় জাগ্রত ঠাকুর আমার, কালী মূর্তি—

বলেই চলে গেল ভেতরে। আর তার একটু পরেই হাসতে-হাসতে এল।

বললে—কিন্তু উমিচাঁদ সাহেব, ঠাকুর বলছেন—তুই বারো হাজার নে—

উমিচাঁদ জিজ্ঞেস করলে—আপনার ঠাকুর নিজের মুখে বলেছে? তাহলে বারো হাজারের এক দামড়ি কম নেবেন না, বারো হাজারই নিয়ে নিন—

—দেবে তো?

উমিচাঁদ বললে—দেবে না কেন? ইংরেজ-বেটাদের বাপ দেবে। টাকা না দিলে আপনি কাজে হাত দেবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমরা ঘর করি, টাকা না পেলে আমরা কাজ করবো কেন? আপনি এক কাজ করুন। আপনি আমার কথার ওপর বিশ্বাস করবেন না। আমি সোজাসুজি লোক পাঠাচ্ছি ক্লাইভ সাহেবের কাছে। ক্লাইভ সাহেব যদি লিখে পাঠায় 'গোলাপ ফুল' তাহলে বুঝে নেবেন সাহেব আপনরা কথায় রাজি, আর যদি কিছু উত্তর না আসে তো বুঝবেন গররাজি—

—আমাকে তাহলে কী করতে হবে?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ফরাসীদের কাছে নবাবের দেওয়া টাকাটা পাঠাতে হবে না। ইংরেজরা যখন চন্দনগরে হামলা করতে যাবে তখন শুধু আপনি আপনার ফৌজ নিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবেন, বুঝলেন? আমি তাহলে চলি—

উমিচাঁদ চলে গেল। বারো হাজার টাকা! বারো হাজার টাকা মবলক পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল নন্দকুমার। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে এমন চাকরি হবে, এত টাকা হবে, তা তার বাপ-মা-ই কি ভাবতে পেরেছিল?

হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হলো——হুজুর!

—কৌন?

—ফিরিঙ্গি কুঠি থেকে হরকরা এসেছে—

দিশি হরকরা। এসেই ফৌজদার সাহেবকে মাটি পর্যন্ত নিচু হয়ে সেলাম করলে। তারপর একটা লেফাফা এগিয়ে দিলে। দিয়ে আবার চলে গেল কুর্ণিশ করে। হুকুম-বর্দারও চলে গেল।

ফাঁকা ঘরখানার মধ্যে নন্দকুমার লেফাফাখানার মুখ ছিঁড়ে ফেললে। ভেতরে একটা সাদা কাগজ শুধু। তার ওপর বড়-বড় হরফে ফার্সিতে লেখা—'গুলাব কে ফুল'।

কে লিখেছে, কেন লিখেছে, কোথা থেকে লিখেছে, কিছুই লেখা নেই। না থাক ফৌজদার সাহেব লেফাফাখানা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। জয় মা কালী, জয় মা জগদম্বা, ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি দিয়েছিলে। নইলে তো চার হাজার টাকা লোকসান হয়ে যেত? জয় মা বগলামুখী, আজ তোমায় সোনার রেকাবিতে সিন্নী চড়াবো। হীরের চামর দিয়ে তোমার বাতাস করবো। গঙ্গাজলের বদলে আজ খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে তোমায় চরণামৃত বানিয়ে দেব। জয় জয় করালবদনী, জয় হোক তোমার—

পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেও মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাস করছি। মানুষের টাকার লোভের কথাটা তখনও মাথা থেকে যায় নি।

তাই লোকটার কথা শুনছিলাম আর অবাক হয়ে সেই ফৌজদার নন্দকুমারের কথাগুলো মনে পড়েছিল। লোকটাব বোধহয় একবার কেমন সন্দেহ হলো।

বললে—আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো?

বললাম—না—

লোকটা বললে—কেন, এ তো সোজা কথা। আপনি তো কম্‌পেনসেশন পাচ্ছেন ন' হাজার টাকা, আপনি যদি আমাদের ওপর একটু অনুগ্রহ করেন তো আঠারো হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। অথচ তার জন্যে আপনাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে না—

—কী রকম?

লোকটা খুব চতুর। বললে—বুঝতেই তো পারছেন, সবই আমাদের হাতে। আমরা ইচ্ছে করলে হ্যাঁ-কে 'না' করতে পারি আপনার তিনশো বিঘে জমিতে দুশো বিঘে করে দেখাতে পারি। কারো সাধ্যি নেই যে ধরে। খতিয়ান-নম্বর দাগা নম্বর সব একেবারে কাটায়-কাটায় মিলিয়ে দেব—

—তাতে আপনার স্বার্থ?

লোকটা হাসতে লাগলো সিরোপের মত। বললে—বুঝতেই তো পারছেন আপনার মত আমরাও কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, যা মাইনে পাই তাতে মশাই চলে না। জিনিস-পত্তোরের দাম তো দিন-দিন বেড়েই চলেছে। সংসার কেমন করে চালাই তা কেবল ভগবানই জানে। আর আপনিও তো এই সাত বছর ঘুরে-ঘুরে দেখালেন ফাইল কি নড়লো? আপনার যাতায়াতে এই সাত বচ্ছরে মবলক কত টাকা গচ্চা গলেছে হিসেব করে বলুন তো! আর সাত বচ্ছর ঘুরুন, তাতেও ওই ন' হাজার টাকা পাবেন না।

আমি চুপ করে আছি দেখে লোকটার যেন আরো উৎসাহ পেয়ে গেল।

বলতে লাগলো—তাই কালিগঞ্জ থেকে রেল-ভাড়া খরচ করে আপনার কাছে এলাম। ভাবলাম আপনার কাছে নিজে এসে নিরিবিলিতে বুঝিয়ে দিলে আপনি হয়ত

সব জিনিসটা বুঝবেন। অফিসের মধ্যে জিনিসটা ঠিক খুলে বলা যায় না—কার মনে কী আছে কে বলতে পারে? আর সকলের সামনে তো সব কথা বলাও যায় না। আপনিই বলুন না, বলা যায়?

আমি চুপ করে আছি দেখে লোকটা আরো উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বললে—অবশ্য আপনি বলতে পারেন আরো অনেক পার্টি তো আছে? তা আছে বৈকি! অনেকেরই জমি-জমা আছে! তাঁরাও দেন। দেখুন, আপনার লোকসান করে তো আমরা নিচ্ছি না। আপনাকেও তেমনি পাইয়ে দিচ্ছি আমরা। আপনাকে যা পাইয়ে দিচ্ছি তার ওয়ান পার্সেণ্টিও যদি আমাদের দেন তো আপনার কোনও লোকসান নেই, কিন্তু আমরা একটু ভদ্রস্থ হয়ে.......

লোকটা অনেক কিছু বলে যেতে লাগলো, আমি কোনও কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে শুধু শুনতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম। আমার মনে হলো যেন হুগলীর সেই ফৌজদার দুশো বছর পরে আবার সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। নন্দকুমারদের যেন ফাঁসি হলেও মৃত্যু নেই। নন্দকুমাররা সেবারে এমনি করে ফিরিঙ্গিদের এখানে ডেকে এনেছিল, এবারে এরা আবার কাকে ডেকে আনবে?

পাঁচ

গল্পের জন্যে ছোটবেলায় যে কত মাথা খুঁড়েছি। গল্প আমার সহজে আসতে চায় না। আজ যে মোটা-মোটা বই লিখেছি সে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে গল্প মাথায় এসেছে। কখন কী ভাবে যে গল্প পেয়েছি সে সব কাহিনী লিখলে আরো মোটা-মোটা বই হয়ে যেত।

গল্প মানে যে-সে গল্পের কথা বলছি না। সব গল্পই গল্প হয় না। বহুদিন গল্প লিখে—লিখে এই ধারণা হয়েছে যে বাইরের জগতে যা কিছু দেখি শুনি তার শতকরা নব্বুইটা ঘটনাই বাদ দিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ নীর বাদ ক্ষীরটুকু।

আসল কথা কীসে গল্প হয় আর কীসে গল্প হয় না. তা বোঝার মত বোধ থাকতে হবে। এমন অনেকবার হয়েছে যখন অনেক শ্রোতার মধ্যে আমিও একজন। আমি শুনে রস পাচ্ছি, কিন্তু আর কেউই রস পেল না। কথায় আছে, রসের গরজ বড় গরজ। কিন্তু রস যে পরিবেশন করবে আর রস যে গ্রহণ করবে তাদের দুজনের মধ্যে যোগ সেতু চাই। যেমন গান! যে গায় তাকে বলে গায়ক। কিন্তু গান যে শোনে সেওতো গায়ক। সে গান না গাইলে গায়কের গান কেমন করে উপভোগ করবে? গায়ক গলার শব্দে গান গায়, আর শ্রোতা গান গায় নিঃশব্দে! দু'জনের পারস্পরিক সহ-অনুভূতি হলে তবেই গান জমে ওঠে। গল্পও তাই। গল্প জমে ওঠে পাঠকের সহানুভূতিতে।

যখন প্রথম জীবনে গল্প লিখতাম তখন আনন্দ পেতাম আমি. কিন্তু পাঠকের ভাগ্যে ছিল শূন্য। তারপরে এমন দিন এল যখন পাঠক কিঞ্চিৎ আনন্দ পেতে সুরু করলো, কিন্তু আমার আনন্দের ভাগে ঘটলো কমতি। আর এখন! এখন পাঠকের আনন্দের ভোগ পরিপূর্ণ, আর আমার ভাগ্যে কেবল অমানুষিক পরিশ্রম।

এই অমানুষিক পরিশ্রমের কথা ভাবলেই স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে হয়।

কিন্তু শিল্পীর জীবনে স্বাস্থ্যটা বড় কথা নয়। শিল্পীর শারীরিক স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় কথা হলো গল্পের স্বাস্থ্য। মানুষের মত গল্পেরও জন্ম হয়, সে বেড়ে ওঠে, বড় হয়. তারপর এক-জায়গায় এসে সে পরিণতি লাভ করে।

এখানে গল্পের জন্মের কথাটা আমি বলবো।

গল্পের জন্ম কখনও স্বপ্নে, কখনও বাস্তবের পটভূমিকায়, কখনও বা কল্পনার রঙে। এককথায় কখন কেমন করে যে কোথায় জন্ম নেয়. তা কেউ বলতে পারে না। সন্তানজন্মের মত সেই অদৃশ্য গল্পের জন্মও একাধারে বড় কষ্টদায়ক আর আনন্দদায়ক। গল্পের জন্মের সময় ঠিক মানুষের জন্মের মতই মনের ঠাকুর-ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে ওঠে। তাকে আনন্দ-ঘোষণা দিয়ে আদর অভ্যর্থনা করতে হয়। কারণ গল্পও এক আবির্ভাব। প্রতিদিনকার সূর্যোদয়ের মতোই তার আবির্ভাব স্মরণীয়।

আমি ঠিক এমনি এক আবির্ভাবের জীবন্ত সাক্ষী ছিলাম একবার।

এমন কিছু আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিল বিভূতি। সে একটু গল্পবাজ। গল্পবাজ বন্ধু থাকলে আমি কথা বলার হাত থেকে একটু মুক্তি পাই।

বন্ধু বলছিল তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। ডাক্তারি পাশ করে একটা হাসপাতালের সঙ্গে সে জড়িত আছে। সুতরাং গল্পের খনি বলতে পারা যায় তাকে।

ওগুলো ঠিক গল্প নয়, ঘটনা। সব ঘটনাকেই যে গল্পে রূপান্তরিত করা যাবে এমন নয়। সংসারে যেমন দেখা যায় মানুষ জন্মালো কিন্তু সে সংসারের কোনও কাজে এল না, ঘটনাও তেমনি। ঘটনা ঘটলো কিন্তু কারো মনের ওপর বা কোনও কিছুর ওপর তার প্রভাব পড়লো না।

ঘটনা-ভিত্তিক গল্প যে লেখা হয়নি তা নয়। প্রচুর লেখা হয়েছে। সাধারণ ভাষায় তাকে বলা হয় ডিটেকটিভ গল্প। সে-গল্পও চলে। তারও পাঠক আছে। কিন্তু পড়ার পরই তার প্রভাব শেষ। পড়ার সময়টুকুতেই তার যা-কিছু আবেদন।

এতদিন ধরে গল্প লিখছি, এতদিন ধরে গল্প পড়ে আসছি, কিন্তু কখনও ডিটেকটিভ গল্প পড়েছি বলে মনে করতে পারি না। ওতে আমার মন ভরে না। ওটা নিছকই ঘটনা। ঘটনার ঘন-ঘটা।

বিভূতি বললে—এক-একটা কেস দেখে কিন্তু খুব কষ্ট হয়—

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

বিভূতি বললে—কারো এক ছেলে গাড়ি চাপা পড়ে মাথা ফেটে গেছে। এসেছে চিকিৎসার জন্যে বাপ-মায়ের সেই কান্না.......

বললাম—যে-কান্নাতে চোখে জল আসে, সেইটেই মহৎ কান্না নয়—

বিভূতি অত-শত বোঝে না। জিজ্ঞেস করলে—তার মানে?

আমি বললাম—যে-কান্না পৃথিবীর সমস্ত মানমের কান্না হয়ে ওঠে, সেই কান্নাই মহৎ কান্না, সাহিত্যে আমরা সেই কান্নাকেই মহৎ স্থান দিই—

বিভূতি বললে—অতশত বুঝিনে ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ, যা অনুভব করি তাই বলে ফেলি—

আমরা দু'জনে কথা বলতে বলতে চলেছিলাম, হঠাৎ একজন ভিখিরি এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালো।

—বাবু, অন্ধ-অনাথকে দু'টো পয়সা দিন, -ভগবান আপনাদের ভালো করবেন—

সাধারণতঃ কলকাতার রাস্তায় ভিখিরিদের এ-রকম উৎপাতের ঘটনা এমন কিছু নতুন নয়। এ অতি সাধারণ ঘটনাসমূহের একটা। আমি অন্ধ-লোকটাকে একটু এড়িয়েই যাচ্ছিলাম।

বিভূতিও এড়িয়ে যাচ্ছিল। গল্পের মধ্যেখানে বাধা দিলে যা হয়। কিন্তু বিভূতির কী খেয়াল হলো হঠাৎ। বললে—তোমার চোখ অন্ধ, কই, দেখি?

কথাটা শুনে অন্ধ-লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল।

বিভূতি সত্যি-সত্যিই লোকটা অন্ধ কিনা দেখবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেল।

ততক্ষণে অন্ধটা সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। বললে—না বাবু থাক্—

—থাক্ কেন, দেখি না—

—না বাবু, না বাবু—

বলে লোকটা সত্যিই পালাতে আরম্ভ করলো।

অবাক কাণ্ড দেখে আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। বিভূতি কিন্তু ছাড়লে না। লোকটাকে পালাতে দেখে বিভূতিরও যেন কী সন্দেহ হলো—

লোকটা পালিয়ে যেতেই বিভূতিও তার পেছন-পেছন চললো।

অন্ধ লোকটা তখন দৌড়তে আরম্ভ করেছে—

বিভূতিও দৌড়াতে সুরু করলে তার পেছনে-পেছনে। লোকটাও যত দৌড়য়, বিভূতিও তত। শেষকালে গিয়ে এক-জায়গায় ধরে ফেললে অন্ধটাকে।

আমিও তাড়াতাড়ি মজাটা দেখতে গেলাম সেখানে।

বিভূতি তখন লোকটাকে বলছে—দেখি, চোখ খোল, দেখি—

কিন্তু কিছুতেই লোকটা চোখ খুলবে না।

—খোল, চোখ খোল।

শেষ পর্যন্ত ভয়ে-ভয়ে লোকটা চোখ খুললো।

বিভূতি তখন তার মুখের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চোখটা দেখছে।

তারপর অনেকক্ষণ দেখার পরে বললে—কই তুমি তো অন্ধ নও বাপু—

লোকটা বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি অন্ধ—আমি সত্যি কথা বলছি আমি অন্ধ—

বিভূতি বললে—না বাপু অন্ধ নও তোমার চোখে ছানি পড়েছে দেখতে পাচ্ছি—

লোকটা বললে—তা হোক বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন—

বিভূতি বললে—এ ছানি তো অপারেশান করলেই সেরে যায়—অপারেশান করাবে?

লোকটা কাঁদতে লাগলো। বললে—আমি গরীব লোক কে আমার চোখ অপারেশান করিয়ে দেবে? আমাকে আপনি ছেড়ে দিন—

বিভূতি বললে—আমি তোমার অপারেশান করিয়ে দিতে পারি— তোমার কিছু পয়সা লাগবে না—

লোকটা হাত-জোড় করে কাকুতিমিনতি করতে লাগলো। বিভূতি বললে—আমি নিজে একজন ডাক্তার, আমি হাসপাতালে চাকরি করি তোমার কিছু কষ্ট করতে হবে না—

লোকটা বিভূতির পায়ে হাত দিয়ে অঝোর-ধারায় কাঁদতে লাগলো। বললে—আপনার পায়ে পড়ি বাবু, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন,—আমি অপারেশান করাবো না—

বিভূতি আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—অপারেশান করালে তোমার ক্ষতিটা কী? তোমার কিছছু ব্যথা লাগবে না—

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলাম আর শুনছিলাম। লোকটার বোকামি দেখে আমার অবাক লাগছিল। পয়সা খরচ হবে না, ব্যথা লাগবে না, তবু লোকটা নিজের রোগ সারাতে চাইছে না। এ কী ধরনের বোকামি!

আমি এবার নিজেই এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে বললাম—তুমি অত ভয় পাচ্ছে কেন, ইনি একজন ডাক্তার—

ততক্ষণে গোলমাল শুনে রাস্তার কিছু লোকও জড়ো হয়ে গেছে। তারাও এবার সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলে

তাদের মধ্যেও একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—ইনি তো ভালো কথাই বলেছেন। চোখটা তুমি সারিয়ে নাও না—তোমার তো পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না, কাউকে খোসামোদ করতেও হচ্ছে না—

বিভূতি বললে—চোখ ভালো হয়ে গেলে তখন তুমি কোথাও চাকরি করতে পারবে, এই রকম করে রাস্তায়-রাস্তায় আর ভিক্ষে করতে হবে না—

—না হুজুর, আমাকে মাপ করুন। আমাকে ছেড়ে দিন—

বিভূতি জিজ্ঞেস করলে—কেন? কেন?

লোকটা বললে—না, ছানি সারালে আমাকে আর কেউ ভিক্ষে দেবে না—

বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পোঁ-পোঁ করে দৌড়াতে সুরু করলো।

কাণ্ড দেখে সমস্ত লোক হতবাক। কিন্তু তখন কে আর তার পেছনে দৌড়বে!

যারা দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ তারা শুধু হাঁ করে সেইদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

আমি নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম এই তো গল্পের জন্ম। এমনি করেই তো গল্পের জন্ম হয় মানে। গল্পের জন্ম হয়, তারপর আস্তে-আস্তে বেড়ে ওঠে। তারপর একদিন একটা সুষ্ঠু পরিণতিতে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

আর আসলে গল্প মানেই তো জীবন। জীবনেরওতো একদিন এমনি করে জন্ম হয়। তারপর আস্তে-আস্তে বেড়ে ওঠে। আর তারপর একদিন একটু সুষ্ঠু পরিণতিতে গিয়ে সম্পূর্ণ হয়।

*

ছয়

ভবতোষ আমাদের বহুদিনের পুরোন বন্ধু। কুড়ি বছর আমরা একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে আসছি। বলতে গেলে ভবতোষ শুধু আমার প্রতিবেশী নয়, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। তার বিয়ের সময় আমি তার পাত্রী পছন্দ করতে গিয়েছি। আমার বিয়ের আগেও সে আমার পাত্রী পছন্দ করেছে। হঠাৎ সেই ভবতোষ, সেদিন মুখ কালো করে আমার বাড়িতে এসে হাজির। ঘড়িতে বেলা বারোটা।

আমি ভবতোষ এই অসময়ে আমার বাড়িতে আসাটাতে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তোমার কি হলো? হঠাৎ এই অসময়ে? অফিস নেই আজ?

ভবতোষ মুখখানাকে আরো গম্ভীর করে বললে—আমি খুব বিপদে পড়েছি ভাই—

বিপদ! বিপদের কথা শুনে আমিও গম্ভীর হয়ে গেলাম।

বললাম—কি বিপদ? কারো অসুখ-বিসুখ?

ভবতোষ বললে—না ভাই, অসুখ-বিসুখ হলে তোমার কাছে আসবো কেন? সে-রকম হলে ডাক্তারের কাছে যেতুম। আমার এ বিপদ অন্য রকম। আমি এসেছি আমার ছেলের জন্যে—

—কে? তোমার ছেলে? প্রদীপ? প্রদীপের কী হয়েছে?

ভবতোষের ওই একই ছেলে প্রদীপ। ভবতোষ ওই একই সন্তানের বাবা। প্রদীপ যখন হলো তখন ভবতোষের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো। মনে আছে ভবতোষ আমাকেই এসে প্রথম সুসংবাদটা দিলে।

বললে—ভাই, তুমি শুনে খুশী হবে আমার ছেলে হয়েছে—

বাঙালীর সংসারে প্রথমে ছেলে হওয়া বাপ-মায়ের কাছে যে কী শুভ ঘটনা, তা আমরা সবাই জানি। ভবতোষ বললে—ওজন হয়েছে আট পাউণ্ড—

অর্থাৎ নতুন শিশুর পক্ষে ওজনটা স্বাস্থ্যকর।

তারপর বললে—তুমি একটা ওর নাম দিয়ে দাও ভাই—বেশ ভালো দেখে নাম দিয়ে দাও, যাতে বড় হয়ে ছেলে বলতে না পারে যে বাবা আমার খারাপ নাম রেখেছে—

মনে আছে আমি নাম দিয়েছিলাম প্রদীপ! প্রদীপ নামটা এমন কিছু একটা মৌলিক নাম নয়। কিন্তু এই ভেবেই ওই নামটা দিয়েছিলাম যে একদিন ওই ছেলে প্রদীপের মতই সকলকে আলো দেখাবে।

কিন্তু আজ এমন কী হলো যে সেই ছেলের জন্যে ভবতোষ একেবারে এমন করে মুষড়ে পড়েছে! জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে তাই আগে বলো না—

বললে—আমি কী বলবো তাই-ই তো বুঝতে পারছি না। বাড়িতে মায়াও কাঁদছে—

মায়া মানে ভবতষের বউ। ভবতোষের বউও চাকরি করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে যে-টাকাগুলো পায় তাই দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল ভাবে গুছিয়ে সংসার করে।

তারপর একটি মাত্র সন্তান হওয়ার জন্যে খুব বেশি অসুবিধেও হয় না। মধ্যবিত্ত পরিবারের যা-যা দরকার তা মোটামুটি সমস্তই আছে। একটা মাঝারি দামের রেডিও সেট, দু'খানা মাঝারি সাইজের ঘর, তাদের একটাতে সোফা-সেট, আর একটাতে শোওয়ার খাট। ইনসিওরেন্স প্রিমায়াম বছরে দেড়-হাজার টাকা, আর বাড়িভাড়া সাড়ে তিনহাজার টাকা দিয়ে যে টাকা ক'টা হাতে থাকে, তা দিয়ে তারা তাদের একমাত্র ছেলেকে ভালো করে মানুষ করবার চেষ্টা করে আসছে—এই গুলোই আমি জানতাম। ভবতোষ, মায়া আর প্রদীপ সম্বন্ধে এ-ছাড়া আরও অনেক কিছুই জানতাম। সীমাবদ্ধ আয়, তাই হিসেব করে খরচপত্র চালাতে হতো তাদের। চাকর রাখার সামর্থ ছিল না কোনও দিন, কারণ টাকার প্রশ্ন ছাড়াও ছিল বিশ্বাসী লোক পাওয়ার প্রশ্ন। তাই নিজেরাই অফিস যাওয়ার পথে ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে আসতো আর অফিসের টিফিন টাইমে মায়া নিজে অফিস থেকে বেরিয়ে ছেলেকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আবার নিজের অফিসে ফিরে যেত। এমনিই চলছিল বরাবর। এমনি করেই ভবতোষের সংসার-যাত্রা গড়গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছিল।

তারপর এল আকাল!

ভবতোষ বললে—আকাল বলবো না তো কী বলবো তাই? আকালই তো। আগে মুদির দোকান থেকে মাসকাবারি কেনাকাটির ব্যবস্থা ছিল। মাসের মধ্যে একটাদিন দোকানে গিয়ে সব কিছু কিনে নিয়ে এসে ঘরে রেখে দিতুম। আর সপ্তাহে-সপ্তাহে রেশনের দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নিলেই চলেতো। কিন্তু এখন কি আর তা চলে?

বললাম—সে তো চলেই না, এখন তো কোনও জিনিসই পাবে না ঠিক মতন—

ভবতোষ বললে—হ্যাঁ ভাই, পাওয়া যায় না বলেই তো এই বিপদে পড়লাম। নইলে এতদিন তো বেশ চলছিল। তুমি তো জানো আমরা বরাবর একটা ছেলেই চেয়েছিলাম। বিয়ে করবার পরই মায়া আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে একটা ছেলের বেশি আমরা চাইবো না। তবে প্রথমে যদি আমাদের মেয়ে হয় তো না হয় তাহলে বড় জোর আর একটা ছেলে, কিন্তু তার বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু ভাগ্য আমাদের ভালো তাই প্রথমেই ছেলে হলো। সেই ছেলেই হলো আমাদের প্রদীপ। আমরা জানতুম একটা সন্তানকে ভালো করে মানুষ করতে গেলে মাসে আড়াইশো টাকা করে আমাদের খরচ করতে হবে। আমাদের দুজনের মাইনেতে, ফ্ল্যাট-ভাড়া দিয়ে ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম চুকিয়ে আড়াইশো টাকার বেশি খরচ করার সাধ্যিও আমাদের নেই। তাই একটা ছেলে নিয়েই আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলাম। গোল বাধলো দেশের এই আকাল। আর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত লোকদেরই হলো সব চেয়ে বিপদ—

ভবতোষ কে সমর্থন করে বললাম— এ তো আমরা সবাই-ই টের পাচ্ছি। তাতে তুমি তো আর একলা ভুগছো না আমরা সবাই ভুক্তভোগী—

—না। ভবতোষ বললে—না ভাই, তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না। আশেপাশের বাড়িতে সকলেরই তো পাঁচ-ছ'টা করে ছেলে মেয়ে। তাদের কারো অসুবিধে নেই। যারা বড়লোক, তাদের তো যত বেশি ছেলে-মেয়ে থাকে ততই সুবিধে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? তাদের সুবিধে কীসের?

ভবতোষ বললে–সুবিধে ইনকাম ট্যাক্সের দিক দিয়ে। তারা ছেলে-মেয়েদের নামে নামে সম্পত্তি আলাদা করতে পারে। ওয়েলথ-ট্যাক্স থেকে বাঁচে। আমাদের বেলাতেই যত অসুবিধের সৃষ্টি করেছে গভর্মেণ্ট—

বলতে-বলতে ভবতোষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার জন্যে চা বলে দিয়েছিলাম। চা আসতেই বললাম—নাও, চা খাও, তুমি বড় হাঁপাচ্ছো, একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও—

ভবতোষ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—আজকে এই প্রথম চা খাচ্ছি। সকাল থেকে চা নয়, কিছু নয়, আমাদের দুজনের খাওয়াও ঘুচে গেছে। আর অফিসের কথা তো বলে লাভ নেই। আমাদের দুজনেরই অফিস যাওয়া হলো না আজকে—

—কেন ?

ভবতোষ বললে—প্রদীপ যে-কাণ্ড করলে এর পরে অফিসে যাওয়া যায় ? তুমি বলছো কী ? এর পরে যে লজ্জায় আমাদের মরে যেতে ইচ্ছে করছে—

তবু আমি ভবতোষের কথার কিছু মানে বুঝতে পারলাম না।

বললাম—কী হয়েছে খুলে বলো না—

ভবতোষ বললে—সেই কথাই তো বলতে এসেছি। আমাদের কষ্টের কথা তোমাকে বলবো না তার আর কাকে বলবো ? কে বুঝবে এই কষ্ট ? আর তা ছাড়া এ এমন কষ্ট যা মুখ ফুটে কাউকে বলাও যাবে না, খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে লেখাও যাবে না।

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—একমাস ধরেই ভাই প্রদীপের মেজাজ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু আজ একেবার বার্স্ট করেছে সে। তুমি তো জানো সে কত ভালো ছেলে, তুমি তো জানো সে প্রত্যেকবার স্কুলে ফার্স্ট হয়, সে কোনও পার্টির মেম্বার নয়—না রাইট, না লেফ্‌ট। কোন বদ নেশা নেই তার। সে সিনেমা দেখে না। বিশেষ করে যে-সব ছবি তার ক্লাসের ছেলেরা দেখতে ভালবাসে সে সেব ঘেন্না করে। তারপর পৈতে হবার পর থেকে সে নিয়ম করে গায়ত্রী জপ করে। প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে সে প্রথমেই পরমহংস দেবের ছবিকে প্রণাম করে তবে পড়তে বসে। তারপর বিছানায় শুতে যাবার আগে একবার পরমহংস দেবের ছবিকে প্রণাম করে তবে শুতে যায়। আর আজকে সেই ছেলেই আমাকে যাচ্ছেতাই করে কথা শুনিয়ে দিলে।

—তোমায় কথা শোনালে ? প্রদীপ ?

আমার যেন ভবতোষের কথাগুলো বিশ্বাস হলো না।

ভবতোষ বললে—হ্যাঁ ভাই, শুধু আমাকে নয় মায়াকেও দুকথা শুনিয়ে দিলে সে।

—কী কথা শোনালে প্রদীপ ? কী বললে ?

ভবতোস বললে—তবে শোন। ক'মাস থেকেই তার মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। রেশনের দোকানে সে-ই রেশন আনতে যেতো। কিন্তু যেদিনই যায় শোনে চিনি নেই, কিংবা গম নেই, কিংবা বলেছে পরে দেবে, ডিউ স্লিপ দিয়েছে। তারপর দুধ। তুমি জানো ভাই আজকাল দুধের দোকানের কাণ্ড। গভর্ণমেন্টের দুধ নেবার পর থেকেই প্রায়ই ঠিক সময়ে দুধ আসে না। একবার যায়, গিয়ে ফিরে আসে। বলে দুধের গাড়ি আসেনি। পরে যেতে বলেছে। কোন দিন একবার গিয়ে দুধ পাবে না। তারপর আছে পাঁউরুটি। তারও কার্ড করতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে শোনা গেল, একঘণ্টা পরে আসতে, কারণ পাঁউরুটির গাড়ি এখনও আসেনি। আমি সকাল আটটার সময় অফিসে বেরোই, আর মায়া অফিসে যায় সাড় ন'টা। প্রদীপও সেই সময়ে মায়ার সঙ্গে বেরোয়। কিন্তু সকাল থেকে দুধ, পাঁউরুটি, রেশন আনতেই যদি চার ঘণ্টা লাগে তো কখন তা রান্না হবে আর কখনই বা খাওয়া হবে। তা আজ কী হলো জানো ? আজ আমি গিয়েছি পাঁউরুটির দোকানে আর প্রদীপ গেছে রেশনের দোকানে। ভোরবেলাই সেখানে লাইন পড়ে। প্রদীপকে রেশনের দোকানে পাঠিয়েছি আমি, যাতে সে রেশন নিয়ে এলেই মায়া ভাত চড়াতে পারে। আমি পাঁউরুটি নিয়ে এসে দেখি মায়া উনুনে ডাল চাপিয়েছে, কিন্তু প্রদীপের দেখা নেই। আমরা প্রদীপের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। ভাবলুম এই আসে এই আসে। এমন সময় লোড-শেডিং। কলে জল এল না। বাথরুম

শুকনো। চান করবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। কি করি ভাবছি। মায়া বললে একবার রেশনের দোকানে গিয়ে দেখে আসতে। কিন্তু ভাবলুম আর একটু দেখি। ঘড়িতে ন'টা বাজলো, সাড়ে ন'টাও বাজে বাজে। মনে হলো কোনও বিপদ-আপদ হলো নাকি। কিন্তু ভাবলুম আজকাল তো এ-রকম হামেশাই হচ্ছে। হয়তো রেশনের দোকানে লম্বা কিউ পড়েছে। না-হয় অফিসে যেতে দেরি হবে, কী আর করা যাবে। আর তা ছাড়া প্রদীপের সামনে একজামিনেশন আসছে, তারও মাথায় কত ভাবনা। সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়. সে যেমন আমাদের বাপ-মায়ের গর্ব স্কুলেরও তেমনি গর্ব। আমদের যা মাইনে তাতে তো আর হোল-টাইমের চাকর রাখাও যায় না। আর টাকা দিলেও যে সব সময়ে বিশ্বাসী লোক পাওয়াও যায় না। আর যে টাকাটা চাকরের মাইনেতে খরচ করবো সেটা ছেলের ভবিষ্যতের জন্যে খরচ করলেই বরং উপকার হবে। কিন্তু ভাই ভাগ্যে যা আছে সে আর কে খণ্ডাবে। যখন এগারোটাও বাজতে চললো তখন অফিসে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি আমরা। আমি প্রদীপের খোঁজে বেরোতে যাচ্ছি, কারণ এত দেরি তো তার কখনও হয় না. ঠিক সেই সময়েই দেখি প্রদীপ ঘামতে-ঘামতে দুহাতে রেশনের ভারি থলি নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে থলি দুটো নিতে গেলাম। বললাম—এত দেরি যে? কী, হলো কী?

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ যেন বোমার মত ফেটে উঠলো। বললে—দেরি হবে না তো কী হবে? আমি কি মনে করো সেখানে গিয়ে খেলা করছিলাম?

মায়া বললে—তা তুমি রাগ করছো কেন খোকা?

প্রদীপ বললে—রাগ করবো না তো কী করবো? সরষের তেলের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়াতে দেরি হয়ে গেল। সরষের তেল না খেলে কী হয়? সরষের তেল না হলে কি তুমি রাঁধতে পারো না?

মায়া বললে—সরষের তেল যেখান-সেখান থেকে কেনা যায় না সব তেলেই যে ভেজাল। সেই জন্যেই তো তেলের মিল্ থেকে তেল আনতে বলেছিলাম। তা তেলের লাইনে যখন দেরি হলো তখন তেল না নিলেই পারতে?

প্রদীপ বললে—লাইনে একবার দাঁড়িয়ে মাঝখানে লাইনে ছেড়ে চলে আসবো?

আমি বললাম—তা তুমি যখন দেখলে তেলের লাইনটা বড়, তখন বুঝতেই পেরেছিলে তেল পেতে দেরি হবে, তখন আর সে লাইনে দাঁড়ালে কেন?

প্রদীপ বললে—বা. তুমি তো আমারই দোষ দেখলে! সেদিন তেল আনি নি বলে তুমিই তো আমার ওপর রাগ করেছিলে।

মায়া বললে—সেদিনের কথা আলাদা. সেদিন তো আর রেশন আনবার তারিখ ছিল না। আজ সে চাল একেবারে ফুরিয়ে গেছে তুমি জানতে। আজ তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে রেশন আনলে তবে ভাত চড়াতে পারবো উনুনে।

প্রদীপ বললে—তা আমিই বা কী করে জানবো রেশন নিতে আমার এত দেরি হবে।

আমি বললাম—তোমার একটু বুদ্ধি খরচ করা উচিত ছিল। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লেখাপড়া করছো? এই জন্যে তোমার জন্যে এত টাকা খরচ করছি?

হঠাৎ যেন প্রদীপ রেগে লাল হয়ে উঠলো। বললে—আমি আর তাহলে কিছুই আনতে পারবো না—

মায়ারও বোধহয় রাগ হয়ে গিয়েছিল। বলে উঠলো—আনতে পারবে না মানে? তুমি রেশন আনতে পারবে না আমি মেয়েমানুষ হয়ে রেশন আনবো আর তুমি বসে বসে খাবে আর লেখাপড়া করবে? তাহলে ছেলে হয়ে বাপ-মায়ের কী উপকারটা তুমি করলে?

—উপকার? আমি আর তোমাদের কোনও উপকার করতে পারবো না, যাও—বলে রেশনের টাকার বাকি রেজকীগুলো ঘরের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মায়া আরও রেগে গেল। বললে—কী, এত বড় কথা তোমার? তুমি পয়সা ছুঁড়ে ফেললে?

প্রদীপ বললে—হ্যাঁ ছুঁড়ে ফেলে দেবো, হাজার বার ছুঁড়ে ফেলে দেবো—

বলতেই মায়া হঠাৎ সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রদীপের কান ধরেছে। বললে-খবরদার বলছি, ক্ষমা চাও এক্ষুণি, ক্ষমা চাও আমার কাছে—-বলো যা বলেছ তা আর কখনও বলবে না—আমি মায়াকে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগে যা হবার তা হয়ে গেল। প্রদীপ হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠলো। বললে, এখন আমারই যত দোষ হলো আর তোমাদের কোন দোষ নেই? কেন আমি এ-বাড়িতে এক ছেলে হয়ে জন্মালুম? কেন তোমরা নিরোধ ব্যবহার করলে? আমি কিছু জানি না বলতে চাও? মনে করেছো ছেলেমানুষ বলে আমার কিছু বুদ্ধি নেই? আমি বোকা?

বলে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো। সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে আমার শোবার ঘরের আলমারিটা খুলে ফেললে। তারপর ভেতরের ড্রয়ার খুলে নিরোধের একটা প্যাকেট ছিল, সেটা টেনে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ঠিক তেমনি করে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চলে গিয়ে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে দিলে আর বলতে লাগলো—কেন আমি এ-বাড়িতে এক ছেলে হয়ে জন্মালুম? কেন তোমরা নিরোধ ব্যবহার করলে? কেন? কেন? কেন?

এর পরে ভাই আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। মায়া ছেলের কথা শুনে সেই যে নিজের ঘরে গিয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লো আর উঠলো না। আমার মুখ দিয়ে এর পর আর কোনও কথা বেরোল না। রান্না-খাওয়া সব বন্ধ, যেখানকার রেশন সেখানেই পড়ে রইলো, আমি ভাবতে লাগলুম এ কী হলো? এ আমি কী করলুম? এর পর প্রদীপের কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে? মায়াই বা তাকে খোকা বলে ডাকবে কী করে? আর খোকাই বা আমাদের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলবে কী করে? এর জন্যে কে দায়ী? আমি, মায়া, না আমাদের এই সমাজ, না এই ঘুষখোর আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের দল? যারা আমাদের সংসার এই ভাবে ভেঙে-চুরে তছ-নছ করে দিলে? বাপ-মা-ছেলে সকলের সম্পর্ক বিষিয়ে দিলে?

সাত

এ গল্পটা কোথা থেকে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি না। পুলিশের থানা থেকে, না শশীমুখী দেবীর বাড়ি থেকে, না ইন্দ্রাবতীর জঙ্গল থেকে। নাকি তারক যেদিন লোকনাথের দলে যোগ দিলে সেইদিন থেকে।

লোকনাথের দল বললে ঠিক বলা হবে না। কারণ লোকনাথের কোনও দল ছিল না। লোকনাথ একলাই ছিল একটা রীতিমত দলের মত। সে ছিল নিজের তার লীডার। তারক ছিল শুধু তার বন্ধু। দু'জনের বড় অদ্ভুত উপায়ে পরিচয় হয়েছিল।

লোকনাথ বলতো—সমস্ত বড় লোকরাই পাজি। তাদের শায়েস্তা করতে হবে।

তারক বলতো--কী করে শায়েস্তা করবি?

লোকনাথ বলতো—যেমন করে শিকারীরা বাঘকে শায়েস্তা করে, ঠিক তেমনি করে।

তারক বলতো—কিন্তু তোর কি রিভলবার কি পিস্তল কিছু আছে?

লোকনাথ বলতো—আছে।

তারক বলতো—তাহলে দেখা আমাকে।

লোকনাথ বলতো—একদিন দেখাবো।

তারক জীবনে কোনও দিন পিস্তল বা রিভলভার দেখেনি। বরাবর বিধবা মা'র কাছে আদরে মানুষ হয়েছে, আর লেখা-পড়া করেছে, তারকও তেমনি করেই লেখা-পড়া করেছে। ছেলের বয়েস হলে কি তখন শাসন করা চলে? শশীমুখী দেবী বলতেন—কী রে, সারাদিন কোথায় থাকিস?

তারক তখন রায়পুরে হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়তো আর গরমের ছুটির সময়ে মাঝে-মাঝে বাড়িতে আসতো। তখন মা শশীমুখী দেবী অনেক দিন পরে ছেলেকে দেখে একটু ভালো রান্না-বান্না করে তাকে খাওয়াতে চাইতেন। কিন্তু খাওয়াবেন কাকে? কোথায় যে সে সারাদিন থাকে তার পাত্তা নেই।

মা বলতো—সকালবেলা যে বাড়ি এলি না--

তারক বলতো—সময় পেলুম না মা!

—সময় পেলিনা তা আমাকে বলে গেলেই পারতিস।

—বলবার সময় পেলে তবে তো বলবো!

মা বলতো—এ-রকম করে না খেয়ে থাকলে যে শরীর খারাপ হবে, অসুখ করবে! অসুখ হলে তখন কে দেখবে?

তারকের বাবা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল ওই এক ছেলেকে রেখে। টাকা ছিল। টাকা ছিল বলেই শশীমুখী দেবীর কোনও ভাবনা ছিল না। আর বাড়িটাও ছিল বিরাট। অনেক সাধ করে তারকের বাবা শিবনাথ ঝা এই বাড়িটা করেছিলেন বাগান-বাড়ির প্যাটার্ণে। বাগান-বাড়িই বটে। রায়পুর শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল ভেতরে। সব রকম গাছ ছিল তাঁর বাগানে। শিবনাথ ঝা জী'র জমিদারি পৈত্রিক। পৈত্রিক সম্পত্তিই ভেঙে

ভেঙে খেয়ে গেছেন। আইন পাশ করেও বেশিদিন প্র্যাকটিস করেন নি। একটা তো মাত্র ছেলে। একটা ছেলের জন্যে সে-সম্পত্তি যথেষ্ট। তারপর তাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিয়ে যাবেন। সে ডাক্তারী পড়বে কিম্বা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে। যা কিছু তার খুশি। শশীমুখী জিজ্ঞেস করতেন—বড় হয়ে খোকা কি চাকরি করবে?

শিবনাথ ঝা বলতেন—চাকরি করবে কেন? ডাক্তারি পাশ করে প্র্যাকটিস করবে, আর ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করলে ব্যবসা করবে। লোহার কল-কব্জা বানাবে।

শশীমুখী স্বামীর কথা শুনে খুশি হতেন। একটি মাত্র ছেলে। সে চাকরি নিয়ে দূরে চলে গেলে বাবা-মা বাড়িতে থাকবে কা'কে নিয়ে? কার জন্যে সংসার করবে?

শিবনাথ ঝা'জী ছেলে বাড়িতে এলেই জিজ্ঞেস করতেন—কেমন পড়াশোনা চলছে?

তারক বলতো—ভালো?

—ফার্স্ট-টার্স্ট হতে পারবে তো?

তারক মাথা নিচু করে বলতো—চেষ্টা তো করছি—

—হ্যাঁ চেষ্টা করো। খুব মন দিয়ে চেষ্টা করো। ফার্স্ট হওয়া চাই। তোমার জন্যেই আমাদের দু'জনের যত ভাবনা। তোমাকে নিয়েই আমাদের দু'জনের যত স্বপ্ন।

শিবনাথ ঝা'জী যা বলতেন তা সত্যিই তাই। একটি মাত্র ছেলে, সে যতক্ষণ স্কুলে থাকতো ততক্ষণই তার পথ চেয়ে বসে থাকতো বাবা-মা। বাগানের কাজ করবার লোক আছে। বাড়ির ঘর-দোর ঝাড়া-মোছার কাজ আছে। সব কাজ করবার লোকজন আছে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে তার সুদ আছে। কোনও কিছুর জন্যই ভাবনা করবার দরকার ছিল না। শুধু একটা ভাবনাই ছিল ওই খোকার জন্যে। সে যেন বেঁচে থাকে ঠাকুর, সে যেন বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে। সে ছাড়া আর কী চাই তাদের জীবনে?

তাই ভাবছিলাম তারকের পেছনে যখন এত ইতিহাস তখন কোথা থেকে গল্পটা আরম্ভ করবো তাই ভাবছি। পুলিশের থানা থেকে আরম্ভ করবো, না শশীমুখী দেবীর বাড়ি থেকে না ইন্দ্রাবতীর জঙ্গল থেকে।

বড় শক্ত প্রশ্ন। কারণ এইটুকু মধ্যে যদি সবটা বলতে যাই তো এটা একটা ছোটখাটো উপন্যাস হয়ে যাবে।

অতখানি জায়গা সম্পাদক আমাকে দেবেন না। তাই ছোট করেই লিখি।

এ গল্পের যবনিকা যখন উঠলো তখন ঝা-জীর বাড়ির আর বাগানের সে-জৌলুস নেই। জৌলুস না থাকার কারণ শিবনাথ ঝা-জী মারা গেছেন। শশীমুখী দেবী বিধবা। তাঁরও তখন অনেক বয়স হয়েছে মাথার চুল কিছু উঠে গেছে। বাকি চুল যা আছে, তাও পেকে গেছে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখে চশমা উঠেছে। বাড়ির বাগানের গাছগুলো দেখা-শোনার অভাবে সব জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

তিনি একলা বাড়ির সদর দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিলেন। তারপর গায়ে চাদরটা ভালো করে ঢেকে বাড়ি থেকে বেরোলেন।

বিকেল হয়ে গেছে। আর একটু পরেই সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। পুলিশের থানাটা মাইল দুয়েক দূরে। শশীমুখী দেবী মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন।

এমন যে হবে তা তিনি বহু বছর আগেই অনুমান করেছিলেন। তাঁর অনুমানই ঠিক হয়েছে। তিনি যেমন প্ল্যান করেছিলেন ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে।

অথচ সেদিন, সেই কর্তা শিবনাথ ঝা-জী যখন মারা গিয়েছিলেন তখন আকুল হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন। শশীমুখী দেবী বলেছিলেন—তুমি কিছু বলবে?

কর্তা মাথা নেড়েছিলেন। অর্থাৎ—না।

—ওষুধ খাবে?

—না। ওষুধ খেলেও আর কোনও কাজ হবে না। তোমার জন্যেই ভাবনা হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—খোকা বাড়ি ফিরেছে ?

শশীমুখী দেবী কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। ছেলে যে রোজ নিয়ম করে বাড়ি ফেরে না, সেটা বললে কর্তা মনে কষ্ট পাবেন।

কর্তা শিবনাথ ঝা-জী বললেন—তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ ?

শশীমুখী দেবী চুপ করে রইলেন।

বললেন—তুমি চুপ করো, বেশী কথা বলতে ডাক্তার বারণ করেছেন।

শিবনাথ ঝা-জী বললেন—খোকার কথা ভেবে-ভেবে আমি যে মরেও শান্তি পাবো না। সে কেন এমন হয়ে গেল ? কেন সে এমন করে রাতের পর রাত বাড়ি আসে না, তুমিই তাকে আদর দিয়ে এমন করেছ। নইলে আগে তো এমন ছিল না সে !

শশীমুখী দেবী বললেন—তুমি অত চেঁচিও না গো, চুপ করো চুপ করো।

শিবনাথ ঝা-জী বললেন—চিরকালের মতোই আমি এবার চুপ করছি। তবে যাবার আগে এও বলে যাচ্ছি তোমার ছেলে মানুষ হয়নি, জানোয়ার হয়েছে, জানোয়ার—

—তুমি চুপ করবে ?

তা সত্যিই শিবনাথ ঝা-জী চিরকালের মতই চুপ করে গেলেন। শশীমুখী দেবীর বুক ফেটে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইলো, কিন্তু অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সংযত করে রাখলেন। তারপর বাড়ির লোকজনকে দিয়ে পাড়ার লোকজনকে খবরটা দিলেন।

সেই রাত্রেই শিবনাথ ঝা-জীর দাহসংকার হয়ে গেল। তারপর যথারীতি শ্রাদ্ধও শেষ হয়ে গেল। শ্রাদ্ধের অনেক দিন পর তারক এলো। তখন মাঝ-রাত।

ভেতর থেকে শশীমুখী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—কে ?

বাইরে থেকে খোকার গলার শব্দ এল—আমি তারক।

শশীমুখী দেবী নিঃশব্দে দরজা খুলে দিলেন।

বললেন—এতদিনে তোর বাড়ি আসবার সময় হলো ?

তারক কোনও কথা বললে না। আস্তে-আস্তে ভেতরের ঘরে ঢুকতে গেল।

মা জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, এই রকম করে আমাদের ভুলে যেতে হয় ?

—কে বললে আমি তোমাদের ভুলে গেছি ?

মা বললেন—ভুলেই যদি না যাবি তো তোর বাবা এমন করে মারা গেলেন কেন ? যাবার সময় একবার তুই এসে কাছে দাঁড়ালিও না ? তোর বাপ কী এমন দোষ করেছিলেন যে শেষকালে একফোঁটা জলও পেলো না ? এই কি ছেলের মত কাজ ?

তারক খানিক চুপ করে থেকে বললে—আমি জানতুম না মা। কবে মারা গেলেন তিনি ? কী হয়েছিল তাঁর ?

মা বললেন—এখন আর সে-সব জিজ্ঞেস করে কী হবে ?

রাস্তায় চলতে চলতে পুরোন সব কথা মনে পড়বে তাঁর। কত বছর আগেকার কথা সে-সব ! থানার দারোগা সাহেবকে গিয়ে সবই বলতে হবে। সবিস্তারেই বলতে হবে। একেবারে গল্পের গোড়া থেকে।

শশীমুখী দেবী রাস্তার ধার দিয়ে চলতে লাগলেন। দু'মাইল রাস্তা। আর একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। ইন্দ্রাবতীর জঙ্গলের ধারে তখন পথ চলতে অসুবিধে হবে।

শশীমুখী দেবী জোরে-জোরে পা বাড়ালেন।

কিন্তু এমন উল্টো-পাল্টা করেই বা গল্পটা বলছি কেন। একেবারে গোড়া থেকে বললেই তো হয়। তবে গোড়া কোনটা সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। থানার দারোগা সাহেবের কাছে গিয়ে যখন শশীমুখী দেবী এজাহার দিলেন সেইটেই কি গোড়া ?

কিন্তু কী এজাহার দেবেন শশীমুখী ?

দারোগা সাহেব হয়ত তাঁর কথা শুনে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আর বিশ্বাস

করবেই বা কী করে? শশীমুখী দেবী কি কখনও মানুষ খুন করতে পারেন? সবাই জানে শশীমুখী দেবীকে। সেই যখন শিবানাথ ঝা-জী বেঁচে ছিলেন তখন থেকেই জানে। সে কতকালের আগের কথা। তখন বাড়িটার শ্রী ছিল, বাগানের গাছের তদ্বির-তদারক হতো। শিবনাথ ঝা-জী নিজে সারাদিন বাগানের পেছনে লেগে থাকতেন। তারপর একদিন হঠাৎ তিনি মারাও গেলেন।

কিন্তু তার পর থেকেই তার ছেলেটা কেমন বিগড়ে গেল। বাপ বেঁচে থাকতেই বিগড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু বাপ মারা যাবার পর থেকে ছেলে যেন আরো বিগড়ে গেল। কোথায় সে সারাদিন থাকে, কোথায় দিন-রাত কাটায়, জানতে পারা যায় না। অনেক দিন একসঙ্গে বাইরে থাকে। তারপর মাসখানেক পর হয়ত একদিন হাজির।

একদিন ছেলের জামার পকেটে হাত দিয়ে কী যেন একটা শক্ত জিনিস পেলে মা।

সেটা বার করে দেখলে সেটা একটা পিস্তল।

পিস্তল। মা চমকে উঠলো। ছেলে তখন ঘুমোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠতেই মা জিজ্ঞেস করলে—তোর পকেটে ওটা কী রে? পিস্তল এল কোত্থেকে রে? পিস্তল কী হবে?

ছেলে রেগে গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দেখল জামার পকেটটা। তারপর সেটা পকেটের ভেতরে পুরে রেখে জামা আলমারির মধ্যে রেখে দিয়ে সেটাতে চাবি লাগিয়ে দিলে। বললে—তুমি সব জিনিসে হাত দাও কেন? তুমি আমার কোনও জিনিসে হাত দেবে না এই বলে রাখছি—

বাড়ি থেকে পুলিশের থানাটা অনেক দূর। শশীমুখী দেবী হাঁটতে-হাঁটতে চলতে লাগলো সেই রাস্তা ধরে। আর সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করতে লাগলো।

একদিন রাত্তিরের ঘটনা মনে পড়লো। তখন অনেক বছর কেটে গেছে। একদিন মাঝরাতে কে এসে তারকের নাম ধরে ডাকতে লাগলো—তারক, এই তারক—

মা'র মন। ঘুম ভেঙ্গে গেছে সেই আওয়াজে।

—কে

—আমি লোকনাথ।

শশীমুখী তাড়াতাড়ি ছেলের ঘরে গিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

—তোকে কে ডাকছে দ্যাখ।

ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে তারক বললে- ওই লোকনাথ এসেছে. আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, আমার আসতে দেরি হবে, আমি চলি—

বললে—দাঁড়া রে, আমি যাচ্ছি—

ছেলে জামা-কাপড় বদলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিল রে?

তারক বললে—একটু বাইরে যাচ্ছি।

—কবে ফিরবি? কখন ফিরবি?

—তা বলতে পারছি না।

বলে ছেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারপর কতদিন কতমাস পরে একদিন ছেলে ফিরলো। রোজই ছেলের আসার পথের দিকে চেয়ে মা বসে থাকতো।

গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে যখন বর্ষাকাল এল তখনও ছেলে ফিরলো না। তারপর বর্ষা কেটে গিয়ে আবার একদিন শীতকাল এল, তখন একদিন রাত দুপুরে ফিরে এল ছেলে!

— মা-মা-মা—

মা ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠেছে। বাড়ির সদর দরজা খুলে দিয়ে দেখে সত্যিই

ছেলে ফিরে এসেছে। মা বললে—কী রে, কোথায় ছিলে এতদিন? একটা খবরও তো দিতে হয় আমাকে। আমি যে বড় ভাবছিলাম তোর জন্যে!

ছেলের তখন ও-কথার উত্তর দেওয়ার সময় নেই। ছেলে তখন কী একটা বয়ে নিয়ে এসেছে হাতে করে। মা জিজ্ঞেস করলে—হাতে তোর কী রে ওটা? ওতে কী আছে?

—তা তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি ঘুমোতে যাও তোমার ঘরে।

বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

মা'র মনে তখন থেকেই সন্দেহ হলো। কিন্তু মুখে কিছু বললে না। বিছানায় শুতে গিয়েও ঘুমোতে পারলে না। তারপর সকাল হলো। তখনও ছেলে ঘুমিয়ে আছে। তারপর অনেক বেলা করে উঠে বললে—মা, খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও—

খাবার দিলে মা। ছেলে মা'কে দেখুক আর না দেখুক মা তো ছেলেকে অবহেলা করতে পারে না। কোথা থেকে সে সংসার চলে, কে বাজার করে, কোথা থেকে টাকা আসে সে-সব কোনও খবরই ছেলের জানবার দরকার হয় না। যখন যা চাইবে তা শুধু হাতের কাছে গেলেই হলো। শিবনাথ ঝা মারা যাবার আগে একেবারে অনাথ করে যায় নি বউকে আর ছেলেকে। সেই টাকাতেই তখন সংসার চলছিল। কিন্তু তাও এমন কিছু বেশি টাকা রেখে যেতে পারেনি কর্তা। কিছু ব্যাঙ্কের সুদ ছাড়া আর কোনও রকমের আয় ছিল না। সংসার চালাতে খুবই টানাটানি করতে হতো শশীমুখী দেবীকে।

আর মাত্র একটা তো ছেলে। সে বড় হয়ে চাকরি-বাকরি কিছু করবে। এই ভরসাতেই তিনি যাবার সময় নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

কিন্তু পরে তারক যে এমন নিষ্কর্মা হয়ে যাবে তা কে জানতো!

তা সে হোক, সেই যে সেদিন তারক অনেক রাত্রে বাড়ি এল তার পর থেকে আর কোনওদিন সে বাড়ি থেকে বেরোল না। সারা দিন ঘরের মধ্যে থেকে যে কী সে করে তাও মা জানতে পারে না।

একদিন মা জিজ্ঞেস করলে—কী রে সারাদিন ঘরে বসে-বসে কী করিস তুই?

তারক বললে—কিছু না—

—তা তোর বন্ধু তো আর তোকে ডাকতে আসে না।

—সে ডাকতে আসে না কেন তা আমি জানবো কী করে?

মা ভাবলে হয়ত দুই বন্ধুতে কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে এবার তাহলে হয়ত তারক সংসারের কাজ কর্ম দেখবে!

কিন্তু না, ছেলে কাজও করে না, আবার ঘরের বাইরেও বেরোয় না। রাতারাতি যেন সে একেবারে আমূল বদলে গিয়েছে। সে কোনও কাজ করে না। শুধু ঘুমোয় আর খায়। ক্ষিদে পেলেই মা'র কাছে খেতে চায়।

কিন্তু না, তার চেয়ে নাটকীয় ভাবে গল্প আরম্ভ করা ভালো। একেবারে খুন দিয়ে আরম্ভ। খুনের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। সবাই রোমাঞ্চ চায়। রোমাঞ্চ দিয়ে গল্প আরম্ভ করলে পাঠক গল্প পড়তে আরম্ভ করলে তা শেষ না করে ছাড়তে পারে না।

মনে হচ্ছে এ-গল্প সেই খুন দিয়েই আরম্ভ করি।

একদিন হঠাৎ শশীমুখী দেবী সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অবাক। একেবারে মাথায় হাত দিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার এল। এসে তারককে পরীক্ষা করে বললে—এ তো খুন হয়েছে, কেউ একে মার্ডার করে গেছে—

ডাক্তার গিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করে দিলে। পুলিশ এল খবর পেয়েই। এসে তারকের লাশ পরীক্ষা করলে।

শশীমুখীকে জিজ্ঞেস করলে—কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?

—হ্য।

—কে সে? তার নাম কী?

—নাম জানি না। তবে একজন বন্ধু হল ওর, সে মাঝে-মাঝে আসতো। তবে গত কয়েক মাস আর সে আসতো না। খোকা একলা-একলাই বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটাতো, কারোর সঙ্গে মিলতো না। ওর বন্ধু ডাকতে এলোও বেরোত না।

—তার ঠিকানা জানেন?

—না।

—আপনার ছেলের আর কোনও বন্ধু ছিল, না শুধু ওই একজন?

পুলিশ আরো অনেক প্রশ্ন করেও কিছু কূল-কিনারা পেলে না। তারপর যথারীতি তারককে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হলো।

তারপর অনেক দিন অনেক মাস কেটে গেল। শশীমুখী দেবীর কী যেন একটা সন্দেহ হলো। বহুদিন আগে যেদিন মাঝ রাত্রে একটা ভারী বোঝা নিয়ে বাড়ি এসেছিল সেটা কী। তাতে কী জিনিস ছিল?

সেদিন আলমারিটা খুলতেই দেখা গেল সেই ভারি প্যাকেটটা তখনও তেমনিই রয়েছে। প্যাকেটটা খুলে দেখতেই অবাক হয়ে গেল শশীমুখী দেবী। দেখলে তার ভিতরে শুধু সোনার হার জড়োয়ার গয়না। কত লাখ টাকা দাম হবে তার? বিশ পঁচিশ লাখ টাকার হবেই।

এত গয়না? এত লাখ টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে পেল তারক?

তবে কি তারক ডাকাতি করতো?

শশীমুখী দেবীর মনে পড়লো আট-নয় মাস আগে একজন বড় লোকের বাড়িতে ডাকাতি হবার ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়েছিল। তবে কি তারক আর তার বন্ধুই সেই ডাকাত? কে জানে?

গয়নাগুলো যেমন ছিল আবার তেমনিই রেখে দিলে শশীমুখী দেবী। আবার স্টীলের আলমারিটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু হঠাৎ শশীমুখী দেবীর মাথায় এক বুদ্ধি এল। এর জন্যে দায়ী কে? ও নিজে না ওর সেই বন্ধু। সে তো জানে যে গয়নাগুলো তারকের কাছেই আছে।

একটা বুদ্ধি গজালো শশীমুখী দেবীর মাথায়। একদিন খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন বেরোল শশীমুখী দেবীর নামে। শশীমুখী দেবী বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন।

বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে এল। জি[illegible]স করলে—বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, তারক যখন মারা গেছে তখন এ-বাড়ি রেখে আমি কী আর করবো। কতদিনই বা বাঁচবো আমি। তার আগেই বাড়িটা বেচে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে সুদে আমি একটা পেট চালাবো—

সকলকেই ওই একই কথা বলতে লাগলো শশীমুখী দেবী। কিন্তু অত টাকা দিয়ে ওই পুরোন বাড়ি কিনবে কে।

যে আসে সেই-ই ফিরে যায়।

সবাই-ই বলে এই ভাঙা বাড়ি—দু'লাখ টাকা?

শশীমুখী দেবী কিন্তু তার চেয়ে এক পয়সাও দাম কমাতে রাজি হয় না। বলে—আমার ওই এক দাম। ওই দামের আর কোনও নড়চড় হবে না।

কিন্তু না, অনেক দিন পরে একজন খরিদ্দার এল। বয়েস বেশি নয় প্রায় তারকের বয়েসী। জিজ্ঞেস করলে—কত দাম?

শশীমুখী দেবী বললে—দু'লক্ষ টাকা।

আর দর-দস্তুর নয়, এক কথাতেই রাজি! বললে—তাই-ই দেব আমি, শুধু ঘরগুলোর ভেতরটা একবার দেখবো।

শশীমুখী দেবী বললে—তা দেখ না বাবা, যত বার ইচ্ছে দেখ, তুমি টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, হাজার বার যাচাই করে কিনবে।

শশীমুখী দেবী ছেলেটিকে সব ঘরগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাতে লাগলো।

—এই দেখ, এই হচ্ছে সেই ঘর যাতে আমার তারক থাকতো।

সেই ঘরে ছিল তারকের বিছানা, সেটাতে সে শুতো। আর ছিল সেই স্টীলের আলমারিটা। যার ভেতরে ছিল সেই বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার গয়না। সেই আলমারিটার দিকেই ছেলেটা বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে।

জিজ্ঞেস করলে—এ সবই আপনার ছেলের?

শশীমুখী দেবী বললে—হ্যাঁ। ছেলে যেমন অবস্থায় মারা গেছে, তেমনিই আছে।

ছেলেটি বললে—ঠিক আছে, আমি বাড়িটা কিনবো, বাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে। ওই দু'লাখ টাকাই দাম দেব!

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু একটা শর্ত আছে মাসিমা, বাড়িটার সঙ্গে আমাকে এই আলমারিটাও দিতে হবে। এ আলমারিতে কী আছে আপনি দেখেছেন।

—না বাবা, সে-ই ছেলেই যখন মারা গেছে তখন তার জিনিস দেখে আমি আর কী করবো। সে বেঁচে থাকতে যেমন ছিল তেমনিই ওটা। আমি ওটা আর খুলেও দেখিনি। তার জিনিস-পত্র জামা কাপড় এই-সবই ওটাতে আছে, আর কিছু নেই—

তারপর একটু থেমে শশীমুখী বললে—যা'হোক, তুমি একটু বোস এখানে তোমার জন্যে এক কাপ কফি করে নিয়ে আসি, এক মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আসছি—

তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই কফি এল। ছেলেটি কফির কাপে চুমুক দিলে।

কিন্তু আশ্চর্য, কফিতে চুমুক দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য হয়ে চেয়ার থেকে লে মাটিতে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

থানার পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

শশীমুখী দেবী বললে—তারপর আর কী, তারপর শয়তানটা মরে গেল।

থানার অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—কেন, কেন তাকে আপনি খুন করতে গেলেন? কফি খেয়ে মারা গেল কেন সে?

শশীমুখী দেবী বললে—কফিতে যে আমি 'ফলিডল' মিশিয়ে দিয়েছিলুম। আমি জানতুম বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার গয়নার লোভ তারকের বন্ধু কিছুতেই সামলাতে পারবে না। আমি যদি আমার বাড়ির দাম হিসেবে তিন লাখ টাকাও চাইতুম তাও সে দিত। সেই টাকার লোভেই তো সে আমার ছেলেকে খুন করে ছিল। আমার ছেলের মুখে তার নাম আমি অনেকবার শুনেছি।

তারপর একটু থেমে শশীমুখী দেবী পুলিশের অফিসারকে বললে—এখন সব ঘটনা আপনাকে বললুম। সব শুনে এখন আপনি যদি আমাকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করেন তো করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই।

*

আট

স্বর্গের অন্তঃপুরে বসে হর-পার্ব্বতীব কথা বলছিলেন। পার্বতী বললেন—প্রভু, চারদিকে এত অনাচার, এত অবিচার, এত ব্যাভিচার চলছে, আর আপনি চুপ হয়ে বসে আছেন কী করে ?

শিব কোন উত্তর দিলেন না এ কথার। যেমন বসে-বসে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখছিলেন, তেমনি একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। নিচে পৃথিবীতে তখন অত্যাচার, হাহাকার, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সব কিছু ঘটে চলেছে একেব পব এক। জন্ম আর মৃত্যু, যৌবন আর জরা একের পর এক তাদেব নিজের নিজের কাজ করে চলেছে।

পার্বতী বললো—আপনি তো আগে এমন ছিলেন না প্রভু। আগে তো দুষ্টের দমন আব শিষ্টের পালন করবাব জন্যে যুগে-যুগে ধরায় অবতীর্ণ হতেন। এখন এমন হলেন কি জন্যে ? শিব সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—পার্বতী, ওই দেখো, ওই দেখো—

পার্বতী চেয়ে দেখলেন অদ্ভুত ঘটনা তো নয় তেমন কিছু। বললেন—ওই পাখিটা তো গাছে বসে সুব কবে গান গাইছে—

শিব বললেন—দেখো না পার্বতী, তারপব কী ঘটবে—

পার্বতী চুপ করে বসে-বসে দেখতে লাগলেন। পাখিটা গাছের ডালে বসে তখনও একমনে গান গাইছিল। নিচের অরণ্য, মাথাব উপর শবতের পরিষ্কার নীল আকাশ। কোথাও কোন অনাচার, হাহাকার-ব্যাভিচাব কিছু নেই। পাখিটার মনের আনন্দ যেন সারা ত্রিভূবনে ছড়িয়ে গেছে। পার্বতী তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। হঠাৎ পার্বতী দেখলেন, নিচেব অবণ্যে একজন ব্যাধ পাখিটাকে লক্ষ্য করে তীব ছুঁড়ছে—

পার্বতী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বললেন—প্রভু, পাখিটাকে বাঁচান আপনি—ও কোনো অপরাধ করেনি! ওকে আপনি খুন করতে দেবেন না—

শিব হাসলেন। বললেন—পার্বতী তুমি দেখো না তারপর কী হয়—

পার্বতী তখনও কিছুই টের পাননি। অথচ তার মাথার উপব বাজপাখি তাকে হত্যা করতে উদ্যত। আর তাব পায়ের তলায় এক ব্যাধ তাকে তীব মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। হঠাৎ পার্বতী দেখলেন ঘন অরণ্যের মধ্যে থেকে একটা কালসাপ সেই ব্যাধের দিকে এগিয়ে আসছে।—ওটা কী প্রভু ?

শিব বললেন—দেখো না পার্বতী, কী হয়—

মাথার উপরের বাজপাখিটা তখন আরো নিচে নেমে এসেছে, ব্যাধও তখন লক্ষ্য স্থির রেখে পাখিটাব দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। ঠিক সেই সময় কালসাপটা ব্যাধকে চরম দংশন করেছে। দংশনের জ্বালায় অস্থির হয়ে ব্যাধ কালসাপটাকে আক্রমণ করত গিয়ে হাতের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো। সে তীর গিয়ে লাগলো আকাশের বাজপাখিটার গায়ে, বাজপাখিটা অতর্কিত আঘাত পেয়ে ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে পড়লো। আর ব্যাধ ? বিষের ক্রিয়ায় সেও তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু

গাছের ডালের পাখিটার তখন কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। সে তখনো গান গেয়ে চলেছে। সে জানতেও পারলো না যে, তাকে ঘিরে এত বড়ো দুর্ঘটনা আকাশে মাটিতে হয়ে গেল। জানতেও পারলো না যে, এক মুহূর্তের জন্যে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলো।

—দেখলে তো পার্বতী?

পার্বতী বললেন—ওই কালসাপটিই পাখিটাকে রক্ষা করলো প্রভু—

শিব বললেন—আমিই ওই কালসাপ পার্বতী। আমি নিজেই কালসাপ হয়ে ওই নির্দোষ পাখিটাকে বাঁচিয়ে দিলাম।

পার্বতী বললেন—তাহলে এমন করে পৃথিবীর নরনারীকে এখন কেন বাঁচাচ্ছেন না প্রভু, পৃথিবীর চারদিকে যে বড়ো হাহাকার চলছে।

শিব বললেন—হাহাকার তো চলবেই, যেদিন থেকে আমার উপর মানুষ আস্থা হারিয়েছে, সেইদিন থেকেই পৃথিবীতে অশান্তি বেড়েছে পার্বতী। আমি কি করবো। আবার যদি কোনো দিন আমার উপর ওদের আস্থা ফিরে আসে, সেদিন এমনি করেই তাদের বাঁচাবো, যেমন করে আজ এই পাখিটাকে বাঁচালাম।

নয়

সে বোধহয় আজ থেকে আঠারো-উনিশ বছর আগেকার কথা। আমরা চলেছি দিল্লি থেকে বোম্বাই। দলে আমরা সবাই মিলে বোধহয় উনিশ-কুড়ি জন মানুষ হবো। ভোরের এয়ারবাসে চড়েছি। বোম্বাইতে পৌঁছোতে বেলা দশটা-সাড়ে দশটা হয়ে যাবে। সেখানে ব্রেকফাস্ট খেতে হবে। তারপর বোম্বাই থেকে জাম্বো জেট ধরে একেবারে সোজা 'মরিশাস'। সেখানে হবে "বিশ্ব-হিন্দী সম্মেলন"। তাতেই অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

প্লেনের ভেতরে চারদিকে চেয়ে দেখলাম আমার চারপাশে যাদের দেখছি কেউ বাঙালী নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম আমিই। কেবল আমার পাশে একজন ছেলেকে দেখলাম তার বয়েস অত্যন্ত কম। তাকেও কি আমাদের মত ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট 'মরিশাসে' পাঠাচ্ছে?

খুবই কৌতূহল হল। তাই নিজে থেকেই তার সঙ্গে আলাপ করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনিও কি মরিশাসে যাচ্ছেন?

ছেলেটি বললে—না, আমি কুয়েত্ থেকে এসেছি। আমি সেখানে চাকরি করি। ইণ্ডিয়ায় এসেছি অফিসের কাজে। সারা ইণ্ডিয়া ঘুরতে হবে। এখন যাচ্ছি বোম্বাইতে। সেখানে 'তাজ হোটেলে' তিন দিন থাকব। তার পরে যাব 'সাউথ ইণ্ডিয়াতে'। সেখানেও আমার অফিসের কাজ আছে।

ইতিমধ্যে তার অনুরোধে এয়ার-হোস্টেস এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। ছেলেটি তার হ্যাণ্ড-ব্যাগ থকে একটা চ্যাপটা হুইস্কির বোতল বার করে জলের সঙ্গে তা মিশিয়ে নিয়ে চোঁ-চোঁ করে খেতে লাগল। একবার নয় বার-বার—

আমি অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। এইটুকু বয়সে এত মদ খাওয়া? তাহলে বড় হয়ে কী করবে? এ তো মরবার রাস্তা পরিষ্কার করা। ভাবছিলাম কিছু কথা তাকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু তার আগেই সে জিজ্ঞেস করে বসল—আমি খাব কিনা!

আমি বিনীতভাবে তার অনুরোধ অস্বীকার করে বললাম—শুনেছি আপনাদের দেশে নাকি মদ খাওয়া বেআইনী?

ছেলেটি বললে—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু লুকিয়ে-চুরিয়ে সেখানে সবাই-ই খায়। তা ছাড়া, আর কী করব বলুন? আমি এখনও বিয়েই করিনি, মদ না খেলে সময় কাটাব কী করে?

কথাটা অস্বীকার করবার মত নয়। বললাম—বিয়ে যদি না করে থাকেন তো বই পড়েন না কেন? বই পড়েই তো সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ছেলেটি বললে—বই পড়তে আমার একেবারে ভালো লাগে না। তার চেয়ে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতে আমার খুব ভাল লাগে। এই তো আজ বোম্বাই যাচ্ছি। গিয়ে সেখানকার 'তাজ' হোটেলে উঠব, সেখানে তিন দিন মেয়েমানুষ ভাড়া করে এনে খুব ফূর্তি করব, আর হুইস্কি ওড়াব—

আমার জীবনে এই প্রথমে আমি এই ধরনের স্বীকারোক্তি শুনলাম।

—আর তা ছাড়া.......

জিজ্ঞেস করলাম—তা ছাড়া কী?

ছেলেটি বললে—তা ছাড়া অত টাকা নিয়ে করবই বা কী? আমি তো দিনে মাইনেই পাই সতেরো শ' টাকা। মাসে একান্ন হাজার টাকা—

মনে আছে তার কথা শুনে আমার 'হার্ট-স্ট্রোক' হবার অবস্থা হয়েছিল। কেন যে তা হয়নি তা আজও আমার অজ্ঞাত।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কোন্ দেশের লোক? ইণ্ডিয়া না আমেরিকা?

ছেলেটি বললে—আমার জন্ম আসাম-এর শিলঙে। সেখানে আমি জন্মেছি। পনেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমি বোম্বাইতে আসি। সেখানে আমি একটা ইরানি হোটেলে পাঁচ টাকা মাইনে আর দুবেলা থাকা-খাওয়া চাকরি করতুম। আমার এক বন্ধু হোটেল ছেড়ে দিয়ে কুয়েত চলে যায়। সেখান থেকে সে চিঠি লেখে আমাকে যেতে।

আমি তার কথাগুলো খুব আগ্রহ ভরে শুনছিলাম। বললাম—তারপর?

—তারপর একদিন একটা জাহাজে বিনা-টিকিটে উঠে পড়লাম। আর তারপর কুয়েতের কাছাকাছি এলেই জাহাজ থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে-কাটতে কুয়েতে গিয়ে পৌঁছুলাম। আমার বন্ধুই এই সহজ রাস্তাটা চিঠিতে বাতলে দিয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর প্রথম-প্রথম সেখানে হোটেলেই কাজ পেয়ে গেলাম। আমার বন্ধুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে আমার উন্নতি হতে-হতে শেষকালে একটা ফ্যাক্টরিতে ফীটারে কাজ করতে-করতে একেবারে ইন্সপেক্টার হয়ে গেলাম। আর এখনও তাই-ই আমার চাকরি। আমি এখন তাই দিনে সতেরো শ' টাকা মাইনে পাই—

কথা বলতে বলতে কখন সময় কেটে যাচ্ছিল তা টের পাইনি। হঠাৎ লাউড-স্পিকারে শুনতে পেলাম আমাদের বোম্বাই পৌঁছনোর ঘোষণা। তখন আমরা আবার যার-যার নিজের-নিজের জগতে ফিরে এলাম। আর তখন আমি সেই ছেলেটার কথাগুলো একেবারে ভুলে গেলাম।

কিন্তু এতদিন এত বছর পরে যখন হঠাৎ খবরের কাগজে পড়লাম যে ইরাকের সাদ্দাম হুসেন কুয়েত আক্রমণ করেছে, আর কুয়েত থেকে সব ইণ্ডিয়ানরা উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে আসছে, আর সেখানকার বিদেশীরা খেতে না পেয়ে যে-যেদিকে পারছে পালাবার চেষ্টা করছে, তখন হঠাৎ আমার সেই কুয়েতের দিনে সতেরো শ' টাকা মাইনে পাওয়া ইণ্ডিয়ান ছেলেটির কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, এখন তার দশা কী হবে?

কিন্তু ভাবলাম তার কথা ভেবে কী-ই বা হবে! পৃথিবী এতকাল যেমন চলছে তেমন করেই তো চলবে। সে তো কারো ইঙ্গিতে কারো শাসনে মাথা নোয়াবে না, উল্টো পথও ধরবে না। আগে পূব দিকে যেমন সূর্য উঠত আর পশ্চিম দিকে অস্ত যেত, তেমনি করেই বরাবর উদয়-অস্ত হবে। কেউ তা আটকাতেও পারবে না। কেউ তা রোধ করতেও পারবে না।

মনে আছে সেদিনও একটা ঘটনায় আমি ঠিক এমনি করেই চমকে উঠেছিলাম।

তার নাম সুব্রত। সুব্রত সরকার। সুব্রতরা আগে কলকাতার বাইরে চক্রধরপুরে থাকত। রেলের চাকরি করত সুব্রত'র বাবা। চাকরিতে বদলি হয়ে কলকাতায় এল সুব্রতরা আর আমাদের পাড়াতেই একটা সস্তা বাড়ি ভাড়া নিলে। ঠিক বাড়ি নয়, একটা বাড়ির পেছন দিকের দেড়খানা ঘর। সে-বাড়িতে আলো ঢোকে না, হাওয়া ঢোকে না। বাড়ির সামনের দিকে রাস্তায় আসতে গেলে সরু এক হাত চওড়া রাস্তা পেরিয়ে আসতে হয়। সেই গলিটাও আবার তেমন সরল সোজা নয়।

প্রথম দিকে আমরা অত খেয়াল করিনি। শুধু আমরাই নয়, কেউই খেয়াল করিনি।

আর তা ছাড়া, খেয়াল করবার মত সময়ই বা তখন কার আছে অত।

তারা আসবার পর হঠাৎ প্রথম পরিচয় হল সুব্রতর সঙ্গে। সে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল। একেবারে আনকোরা নতুন মুখ। আগে কখনও দেখিনি তাকে।

জিজ্ঞেস করলাম—তুই নতুন ভর্তি হলি বুঝি?

সে বললে—হ্যাঁ—

জিজ্ঞেস করলাম—আগে কোথায় পড়তিস?

সে বললে—চক্রধরপুরে।

চক্রধরপুর যে কোথায় তা তখন আমি জানতাম না। জিজ্ঞেস করলাম—সেখান থেকে চলে এলি কেন?

সে বললে—সেখান থেকে যে আমার বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে এল—

—তোর নাম কী ভাই?

সে বললে—সুব্রত সরকার।

জিজ্ঞেস করলাম—কলকাতায় কোথায় উঠেছিস?

সুব্রত বললে—চালতাবাগান লেনে—

রাস্তাটার নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। তাহলেতো আমাদেরই রাস্তায়। কিন্তু ঠিক কার বাড়িতে তা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—ও রাস্তায় তো আমিও থাকি। কত নম্বর বাড়ি?

সুব্রত বললে—পনেরো নম্বর।

আমাদের বাড়ির নম্বর আঠারো। তাহলে ঠিক আমাদের দু'খানা বাড়ির পরেই।

আমার সমস্ত মন পড়ে গেল পনেরো নম্বরে যে ভদ্রলোক থাকেন তাঁর নাম কালীধনবাবু। কালীধন মুখোপাধ্যায়। তাঁরা খুব বড়লোক। বিরাট সে বাড়িটা। তাঁদের বাড়িতে ঘর-ভাড়া দিয়েছেন নাকি।

—তাঁরা ঘর-ভাড়া দিয়েছেন? তাঁরা তো খুব বড়লোক।

সুব্রত বললে—হ্যাঁ আমরা বেশি দিন থাকবো না ওখানে। বছর দু'এরকের মধ্যেই আমরা কলকাতায় বাড়ি করে উঠে যাব।

আমি তো অবাক। নিজেরা বাড়ি করবো। তাহলে সুব্রতর বাবা কি খুব বড়লোক। কত টাকা মাইনে পায় সুব্রতর বাবা? কলকাতায় বাড়ি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

বললাম—একদিন তোদের বাড়ি যাব ভাই। তোদের বাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছে একেবারে পাশেই।

সুব্রত বললে--আজই চল না।

সুব্রতর সঙ্গে একদিনেই খুব ভাব হয়ে গেল। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনি মিষ্টি তার কথা। স্কুলের ছুটির পর একই সঙ্গে বেং নাম। চালতাবাগান লেন স্কুল থেকে বেশি দূরে নয়। পাশাপাশি হাঁটিতে-হাঁটিতে চলেছি। সুব্রত চক্রধরপুরের গল্প করছিল। সেখানেও তার বন্ধু-বান্ধব কত ছিল। এখন কলকাতায় আসতে তারা বাধ্য হল বলেই এসেছে। নইলে আসত না।

বললাম—কালীধনবাবু ঘর ভাড়া দেবার লোক নন। ওরা তো সাতপুরুষের বড়লোক। সুব্রত বললে—তা জানি। ওঁরা আমাদের ঘর ভাড়া দিতেন না। কিন্তু বেশি দিন আমরা থাকব না বলেই ভাড়া দিতে রাজি হয়েছেন। আমার বাবা কথা দিয়েছেন যে দু'এক বছরের মধ্যেই একটা বাড়ি করে উঠে যাবেন। আগে ওই দিকে ওঁদের চাকর-বাকররা থাকত। আমাদের থাকবার জন্যে ঘর দুটো খালি করে দিয়েছেন।

একটা বাড়ির সামনে আসতেই সুব্রত বললে—এইটে আমাদের বাড়ি—

কালীধনবাবুদের বাড়ি তো আমার আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের পেছন

দিকের ঘর যে ভাড়া দেবেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—কত ভাড়া?

সুব্রত বললে—একশো টাকা—

তখন একশো টাকার দাম অনেক বেশি ছিল। একশো টাকা ভাড়া শুনলে তখন লোকে চমকে উঠত। সেই যুগে সুব্রতরা একশো টাকা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে শুনলে যে-কোনও লোকই অবাক হয়ে যেত।

সুব্রত আমাকে বললে—তবে আমরাই বেশি দিন এ-বাড়িতে থাকব না—

আমি বললাম—কেন?

সুব্রত বললে—আমরা নিজেরাই কলকাতায় একটা বাড়ি করব—

—তোদের নিজেদের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

আমি আরো চমকে উঠলাম। আমি ভেবেছিলাম সুব্রতরা গরিব লোক তাই তারা এই চালতাবাগান লেনে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু তাদের তাহলে কলকাতায় বাড়ি করবার মতন টাকা আছে?

যা হোক, সে কালীধনবাবুদের বাড়িতে ঢুকে গেল।

তারপর কয়েক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হল। যত দিন যয় ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়। বিশেষ করে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলে আমার তরফ থেকে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল।

একদিন সুব্রতকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—এটা কি তোদের নিজেদের বাড়ি?।

বললাম—না, ভাড়াটে আমরা—

—কত টাকা ভাড়া?

বললাম—তিরিশ টাকা।

সুব্রতর মুখের চেহারা দেখে মনে হল সে যেন আমাকে অনুকম্পার চোখে দেখলে।

তাই সাফাই গাইবার ভঙ্গিতে বললাম—আমরা পুরনো ভাড়াটে কিনা, তাই.....

সুব্রত বললে—আমরা দেড়খানা ঘরের জন্যে দিই একশো টাকা—

—দেড়খানা ঘরো তোদের চলে? তোরা ক'জন লোক?

সুব্রত বললে—আমরা দুই বোন আমি আর আমার বাবা-মা—মোট পাঁচজন—

আমরা পাঁচজন মেম্বার, চারখানা ঘরেও কুলোয় না। আর দেড়খানা ঘরে সুব্রতরা কী করে চালায় তা ভেবে কোনও কূল-কিনারা পেলাম না।

সুব্রত আমার মুখ দেখে আমার দুশ্চিন্তার কথাটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারলে।

তাই সুব্রত বলে উঠল—বাবা বলেছে আমাদের নতুন বাড়িতে একতলা-দোতলা মিলিয়ে দশখানা ঘর থাকবে। তার কমে চলবে না। কারণ ততদিনে আমার বড় দাদাও ইণ্ডিয়ায় এসে হাজির হবে।

—তোর আবার বড় দাদা আছে নাকি?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ—আমার বোনদের চেয়েও বড়। সে-ই বাবার সব চেয়ে প্রথম ছেলে। বড়দার মত ব্রেণ আমরা কেউ-ই পাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোর বড়দা কোথায় আছে।

সুব্রতর চোখে মুখে একটা অহঙ্কারে ছাপ পড়ল। বললে—আমেরিকায়।

—আমেরিকা?

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সুব্রতর জবাব শুনে। সেই বয়সেই আমরা জেনেছিলাম যে আমেরিকা বড়লোকের দেশ। আর শুধু আমরাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর

লোকরাই তা জেনে গিয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের পর নাকি আমেরিকা আরো বড়লোক হয়েছে। কথাটা শুনেই আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না।

মা'কে গিয়ে ডেকে আনলাম বাইরের ঘরে। মাকে বললাম—মা, এই দেখ এই ছেলেটার নাম সুব্রত। সুব্রত সরকার। এর বড় ভাই আমেরিকায় আছে।

মাও আমার মত চমকে উঠেছে খবরটা শুনে। মা বললে—তাই নাকি? তোমার নিজের দাদা?

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে—হ্যাঁ—

তারপর মা আমাকে বললে—তোর বাবাকে ডেকে আনতো, যা—

আমি দৌড়ে বাইরে গিয়ে বাবাকে ডেকে আনলাম। বললাম—এর নাম সুব্রত। এ আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। নতুন ভর্তি হয়েছে—

বাবা প্রথমে বুঝতে পারলেন না কেন আমি আমার নতুন বন্ধুকে দেখাচ্ছি। তাকে দেখে বাবার কী লাভ! আমার ক্লাসের তো আরো অনেক ছেলেই আমাদের বাড়ি আসে, তাদের সঙ্গে তো কই কখনও আমি বাবার পরিচয় করিয়ে দিই না।

মা বললে—তুমি জানো, এর বড় ভাই আমেরিকায় থাকে—

কথাটা শুনতেই বাবার মুখের ছবিটা যেন একেবারে বদলে গেল। বাবা তখন যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন। বললেন—

কিন্তু যা বলতে চাইছিলেন তা যেন আর বলতে পারলেন না। সুব্রতর দিকে এতক্ষণে ভালো করে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নজর দিলেন। তাঁর মুখ-চোখ আলোয় ঝকমক করে উঠল। আমেরিকার নামটা শুনেই তিনি আমার মতন যেন আমূল বদলে গেলেন। শুধু আমার মতন নয়। একটু আগে মা'র ও চেহারা যেন এমনি আমূল বদলে গিয়েছিল।

ততক্ষণে মা কখন যে ভেতরে চলে গিয়েছিল তা দেখতে পাইনি। দেখি মা বাড়ির চাকরকে দিয়ে দোকান থেকে চারটে রসগোল্লা আনিয়ে একটা ডিশ-এ সাজিয়ে সুব্রতকে বললে—খাও বাবা, এটকু খেয়ে নাও—

হঠাৎ মা'র এই আচরণ দেখে আমিও একটু খুশি হলাম। সুব্রতর আগে আরো অনেক ক্লাসের বন্ধুদের বাড়িতে এনেছি। কিন্তু তারা তো কেউ এমন ব্যবহার পায়নি বাবা-মা'র কাছে! এর একমাত্র কারণ কি তাহলে আমেরিকা!

তখন সুব্রত রসগোল্লা খেতে আরম্ভ করেছে। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের দাদা কী করতে গেছে আমেরিকায়?

সুব্রত বললে—পড়তে গেছে?

—কী পড়তে গেছে?

সুব্রত বললে—বড়দা এখান থেকে বি এস সি পাশ করেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিল—

—দাদাকে আমেরিকায় পাঠাতে কে খরচ দিলে? তোমার বাবা?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ—তাও বাবা—

—কত খরচ পড়ল?

সুব্রত বললে—তা জানি না।

বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—এখনও টাকা পাঠাতে হয়?

সুব্রত বললে—না, এখন আর টাকা পাঠাতে হয় না। আগে নাকি পাঠাতে হত, কত টাকা আগে পাঠানো হত তা বাবা বলেনি। দাদা নাকি এখন নিজেই অনেক টাকা উপায় করছে—

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার দাদা সেখানে ব্যবসা করছে, না চাকরি করছে?

সুব্রত বললে—চাকরি নয়, ব্যবসা!

—কীসের ব্যবসা ?

সুব্রত বললে—তা ঠিক জানি না। শুনেছি অনেক টাকা উপায় করছে। বাবাকে আর টাকা পাঠাতে বারণ করে দিয়েছে—। বাবা বলেছেন দাদা টাকা পাঠালে আমরা কলকাতায় জমি কিনে বড় একটা বাড়ি তৈরি করব। আমার দুই দিদি আছে, তখন তাদেরও বিয়ে দেওয়া হবে।

—তুমি সবচেয়ে ছোট ?

—হ্যাঁ।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবা আবার এখান থেকেও তো বদলি হয়ে যাবেন ?

—হ্যাঁ, বাবা যেখানে বদলি হয়ে যাবেন, আমাদেরও সেখানে যেতে হবে। এ-ইস্কুল ছেড়ে তখন আবার আমাকেও সেখানকার ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে হবে। ছোটবেলা থেকে আমরা অনেকবার ইস্কুল বদল করেছি। এবার যদি বাবা কোথাও বদলি হয়ে যান তখন আমাদেরও ইস্কুল বদলাতে হবে—

—তোমার বাবার নাম কী ?

সুব্রত বললে—সতীনাথ সরকার। আর আমার বড়দার নাম সুকান্ত।

বাবা বললেন—আমি একদিন যাব তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে।

খবরটা জানাজানি হওয়ার পর সতীনাথ সরকার পাড়ার মধ্যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আমাদের স্কুলেও সুব্রতর দাদার আমেরিকায় যাওয়ার খবরটা ছড়িয়ে যাবার পর সেও রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল।

আমাদের স্কুলের হেড-মাস্টারমশাই একদিন সুব্রতকে ডেকে পাঠালেন।

সুব্রত তাঁর ঘরে গিয়েই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হেড-মাস্টারমশাই প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বড় ভাই আমেরিকায় থাকে ?

সুব্রত সবিনয়ে বললে—হ্যাঁ, স্যার—

হেডমাস্টারমশাই বললেন—ভেরি গুড্,—আমি যা শুনেছি তা তাহলে সত্যি— ?

এর পরে আর কোনও কথা হল না। সুব্রত হেডমাস্টারমশাই-এর ঘর থেকে চলে এলে আমরা তার কাছ থেকে সাগ্রহে সব শুনলাম। আর সুব্রত গর্বে আমরাও গর্বিত হয়ে উঠলাম। আমাদের সকলেরই মহাসৌভাগ্য যে এমন একজন ছেলে আমাদের সহপাঠী যার বড় ভাই আমেরিকায় গিয়ে ব্যবসা করে লাখ-লাখ টাকা উপায় করছে।

সত্যি-সত্যিই শেষকালে একদিন বাবা আমাকে নিয়ে সুব্রতদের বাড়ি গেলেন।

বাবাকে দেখে বাড়িওয়ালা কালীধনবাবুও বেরিয়ে এলেন—বললেন—কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সতীশবাবু ?

সঙ্গে আমিও ছিলাম। বাবা বললেন—এই আমার ছোটছেলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড সুব্রত সরকার। আপনার বাড়ির পেছনে যারা ভাড়া থাকে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁর নাম সতীনাথ সরকার—

কালীধনবাবু বললেন—তাই নাকি ? তা হঠাৎ যে ?

—না আপনি জানেন না ?

—কী জানবো ?

—সতীনাথবাবুর বড় ছেলে সুকান্ত সরকার আমেরিকায় আছে, তা জানেন ?

কালীধনবাবু খবরটা জানতেন না। বললেন—সে কী ? কই, আমি তো শুনিনি—তা হলে আমিও যাচ্ছি ! চলুন—

বলে তিনিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কালীধনবাবুর বাড়ির গা দিয়ে এক ফুট চওড়া রাস্তা। রাস্তাতে চলার খুব অসুবিধে। তাও আবার

এবড়ো-খেবড়ো। অনভ্যস্ত লোক চলতে গিয়ে গড়ে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই।

আমিই এগিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম—সুব্রত, দরজা খোল্, বাবা এসেছেন—

সুব্রত ডাক শুনতে পেয়েই দৌড়ে বাড়ির বাইরে এল। আমাদের সকলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। কালীধনবাবু বললেন—তোমার বাবা কোথায়? বাড়িতে আছেন?

সুব্রত বললে—বাবা তো এখনও আপিস থেকে আসেননি।

—এখনও আসেন নি?

সুব্রত বললে—বাবা এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা ভেতরে এসে বসুন না—

বাবা বললেন—এখুনি এসে পড়বেন?

—হ্যাঁ, এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা ভেতরে এসে একটু বসুন না—বলে সুব্রত আমাদের সকলকে ভেতরে আসবার জন্যে বার-বার পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

বাবা বললেন—না-না, আমরা বরং পরে আসব। এখন থাক—

সুব্রত তবু বলতে লাগল—না-না, এত কষ্ট করে এসেছেন আর চলে যাবেন।

আমরা সবাই আসছিলুম, কিন্তু হঠাৎ দেখি উল্টোদিক থেকে আমাদের দিকে কে যেন আসছেন।

সুব্রত বললে—ওই তো বাবা এসে গেছেন—

বলে তার বাবাকে লক্ষ্য করে বললে—এই দেখ বাবা বন্ধু তার বাবাকে নিয়ে এসেছে!

প্রথমে একটু চমকে উঠলেন সতীনাথবাবু। তাঁরপর কাছে এসে বাড়ির মালিককে চিনতে পেরে বললেন—এ কী, কালীধনবাবু, আপনি?

সুব্রত বললে—এই আমার বাবা, আমরা থাকি পনেরো নম্বরে, আর আমার বন্ধুর বাবা তাথেন আঠারো নম্বরে। একেবারে খুব কাছাকাছি—

সতীনাথবাবু বললেন—তা চলে যাচ্ছেন কেন? ভেতরে এসে বসুন না একটু। আমার অফিস থেকে ফিরতে আজ একটু দেরি হয়ে গেল, আসুন-আসুন—আমরা বাড়িতে আপনাদের পায়ের ধুলো যদি পড়ল তো একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে—'না' বললে ছাড়ব না—

মাত্র দেড়খানা ঘর। তা সুব্রতর মুখ থেকেই আগেই শোনা ছিল। কিন্তু সুব্রতর বাবার তাতে কোনও লজ্জা নেই। তিনি এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে সবাইকেই ডাকতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—আসুন-আসুন—

ছোট একখানা ঘর। তার সবটাই প্রায় একটা বড় তক্তপোশ ভর্তি। সতীনাথবাবু বিছানাটা ভালো করে ঝেড়েঝুড়ে সকলকে বসতে দিলেন। তাতেও সকলের কুলোল না। সুব্রতকে তিনি টাকা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিচেয় মেঝের ওপর একটা মাদুর পেতে তিনি তার ওপর বসলেন। আর আধখানা ঘরে বোধহয় সুব্রতর দুই বোন আর তার মা আড়ালে সংসাররে কাজ করছিল। প্রথমে আমার বাবাই বললেন—আপনি ভাগ্যবান পিতা মশাই, আপনার বড় ছেলে আমেরিকায় আছে শুনলাম....

সতীনাথবাবু বললেন—সবই ভগবানের ইচ্ছে, আমি নিমিত্ত মাত্র....

ততক্ষণে দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে এল সুব্রত। তিনটে ডিশ্-এ সাজিয়েএ দিলেন সতীনাথবাবু।

কালীধনবাবু বললেন—আপনার ছেলে যে আমেরিকায় আছে, তা তো কই আমাকে বলেননি আপনি। ইনি না বললে আমি তো জানতেই পারতাম না। এই ছোট দেড় খানা ঘরে আপনার কষ্ট হচ্ছে না সতীনাথবাবু?

সুব্রতবার বাবা বললেন—না, কষ্ট আর কী? আপনার আশ্রয়ে আছি, আপনি দয়া

করেছেন বলে তবু কলকাতায় থাকতে পেলুম। নইলে কী হতো ভাবুন একবার—

বাবা বললেন—আমার ছেলে বলছিল আপনি নাকি কলকাতায় জমি কিনে বাড়ি করবেন।

সতীনাথবাবু বললেন—আমার ছেলে আগে দেশে ফিরুক, তখন দেখা যাবে। সবই ভগবানের ইচ্ছে......

কালীধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আমেরিকাতে আপনার ছেলে কী করে? চাকরি?

সতীনাথ বললেন—সুকান্ত লিখেছে ব্যবসা করে—

কালীধনবাবু বললেন—চাকরিতে বেশি টাকা নেই, ব্যবসাতেই টাকা বেশি—ব্যবসা করাই ভালো। আমার বাবা ব্যবসা করেছিলেন বলেই এত বড় বাড়ি করে রেখে যেতে পেরেছেন—

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—ব্যবসা বুদ্ধি তো সকলের থাকে না। আপনার ছেলে যে চাকরি না করে ব্যবসার লাইন ধরেছে, এটা খুব বুদ্ধির কাজ করেছে। আপনার ছেলে বাঙালিদের গর্ব। আমরা বাঙালিরা চাকরি করেই জীবন নষ্ট করলাম।

তারপর আরো কিছুক্ষণ কথা হল। আর তারপর আমরা উঠলাম।

সুব্রত বললে—কাল ইস্কুলে দেখা হবে তোর সঙ্গে—

মনে আছে সেই বছরেই ফাইন্যাল পরীক্ষায় সুব্রত ফার্স্ট হয়। সুব্রত আমাদের সকলকে হারিয়ে দেওয়াতে আমরা কেউই অবাক হলাম না। বাবা গরিব মানুষ হলে কী হবে, যার বড় ভাই আমেরিকায় গিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছে, তার প্রভাব তো ছোট ভাই-এর ওপর পড়বেই। আমাদর মাস্টারমশাইরাও তাই অবাক হননি।

ছেলেরা সবাই মিলে বললে—সুব্রত, আমাদের ভাই একদিন খাওয়া—

কিন্তু প্রশ্ন হল কোথায় সে খাওয়াবে? তাদের ঘর তো ছোট। সেখানে তো ছত্রিশ জন ছেলেকে বসতে দেওয়ারও জায়গা নেই।

সুব্রত বললে—তার চেয়ে আমার বড়দা আমেরিকা থেকে ফিরুক তখন একদিন তোদের খাওয়াব।

আমরা বললাম—দূর তোর দাদা কবে ফিরবে তার কি ঠিক আছে! ফিরতে অনেক দিন লাগবে....

—না রে, সেখান থেকে বড়দার চিঠি এসেছে, এবার আসবেই—

বন্ধুরা বললে—সেই চিঠিটা তাহলে আমাদের দেখা—

সুব্রত বললে—চিঠিটা এখন আমার কাছে নেই, কালকে এনে দেখাবো—

সত্যিই সুব্রত পরের দিন তার বড়দারই চিঠি এনে আমাদের দেখাল—

আমরা সবাই সেই চিঠির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, সত্যিই খামের ওপর আমেরিকার ছাপ পড়েছে। আমরা দেখলাম খামের পেছন দিকে ইংরিজিতে লেখা রয়েছে—

৯৬ West Second Street

Mansfield Street

OH 88৯০২, U. S. A.

তার ওপরে নিজের নাম লেখা আছেঃ

Sukanta Sarkar.

আর সামনের দিকে সুকান্তের বাবার নাম ঠিকানা লেখা।

ভেতরে লেখা আছেঃ

"পূজনীয় বাবা,

আপনারা সবাই কেমন আছেন। আমার ব্যবসা নিয়ে আমি খুবই বিব্রত। সকাল

থেকে অনেক রাত পর্যন্ত খাটছি। এখানে সবাই আমাকে খুব ভালবাসে তাই আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এমন চমৎকার দেশ আমি আর দেখিনি। এখানে আরো অনেক বাঙালি আছে। তারাও আমাকে খুব সাহায্য করে এবং সবাই আমার সহযোগিতা করে। এখন এখানে রাত বারোটা। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। আমি এখন খুবই ক্লান্ত। তাই এবার বেশি বড় চিঠি লিখতে পারছি না। আপনারা আমার সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার চিঠি দেব। আপনি আর মা আমার প্রণাম নেবেন। সুব্রত, দোলা, মালাকে আমার ভালবাসা জানাবেন। ইতি প্রণতঃ সুকান্ত সরকার....."

চিঠিটা পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—দোলা আর মালা মানে কী রে?

সুব্রত বললে—আমার দুই দিদির নাম—

এর পর থেকে স্কুলের হেড মাস্টার, অনেক মাস্টার মশাই আর ছাত্রদের সকলেরই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল সুব্রত। তখনই স্কুলে পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে সুব্রত সরকার সকলের কাছেই ভালবাসা এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঈর্ষার পাত্রও হয়ে উঠল। পরের বছরও সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। তার পরের বারও তাই। তর পরের বারও তাই। সেই সময়ে একদিন সুব্রত বললে তার বাবা আবার বদলি হয়ে যাচ্ছেন 'ওয়ালটেয়ারে'।

খবরটা শুনে আমরা সবাই খুব দুঃখ পেলাম। আমাদের সকলের চোখ দিয়েই তখন জল পড়তে লাগল। তারপর একদিন তারা চলে গেল চালতাবাগান ছেড়ে। তারপর তার খবর আর কিছুই জানি না। সেও আর কোনও চিঠি দেয়নি তারপর।

হঠাৎ মাইক্রোফনে আওয়াজ হলো আমরা বোম্বাই-এর 'স্যান্টা ক্রুজ' এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। আমাদের কোমরের বেল্ট্ বেঁধে নেবার অনুরোধ। এক সময়ে মাটিতে নামল আমাদের জাম্বো জেট্।

সেই কুয়েতের কুড়ি বছর বয়েসের ছেলেটাও নামল আমদের সঙ্গে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে নজর পড়ল সেই ছেলেটার দিকে। চেয়ে দেখি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কয়েকটা উঠতি বয়েসের মেয়ে। বুঝলাম সবাই ছেলেটির জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। দিনে সতের'শ টাকা উপায় করা ছেলেটার জন্যে তাদের আকর্ষণ থাকাটা তো স্বাভাবিক।

আমরা সবাই তখন ভিড়ের মধ্যে নিজের-নিজের সুট্‌কেসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দিকে তাকিয়েও যেন আর আমাকে চিনতে পারলে না। এইরকম তার হাবভাব।

আমরা এক সময়ে আবার যখন 'মরিশাসে' যাবার জন্যে আর একটা 'জাম্বো জেট্'-এ চড়ে বসেছি তখনও সেই কুয়েতের ছেলেটার কথা মনে পড়ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ছিল সেই বহুকাল আগের দেখা সুব্রতর কথা।

সত্যি কোথায় গেল সেই সুব্রত সরকার। সেই যে তারা বাবা কলকাতা থেকে বদলি হয়ে 'ওয়াল্‌টেয়ারে' চলে গেল তারপর থেকে আর তার কোনও খোঁজ নেই। জানা হয়নি তারা ওয়াল্‌টেয়ার গিয়ে কেমন আছে। জানা হয়নি কলকাতায় তাদের বাড়ি ফরবার কী হল। জানা হয়নি তার দুই বোনের বিয়ে হয়েছে কিনা। কিংবা তার বড়দা সুকান্ত সরকার ইণ্ডিয়ায় ফিরে এল কি না।

এর পর মরিশাসে পৌঁছে আবার সব কিছু ভুলে গেলাম। সুব্রতর কথা ভুলে গেলাম, কুয়েতের সেই কুড়ি বছর বয়সের ছেলেটার কথাও ভুলে গেলাম। নতুন দেশে গিয়ে যা হয় তাই হল। ইণ্ডিয়ায় ভাদ্রমাসের তখন ভ্যাপসা পচা গরম, ওখানে তখন প্রচণ্ড শীত আর তেমনি ঠাণ্ডা হাওয়া।

আমাদের দলে যারা গিয়েছিল তারা আমি ছাড়া কেউ বাঙালি নয়। বাঙলা কথা বলতে পারার মত একজন সঙ্গী নেই আমার।

আছি 'বেলভিউ' হোটেলের একটা ঘরে। অন্য সবাই যখন কন্ফারেন্সে নিয়ে ব্যস্ত,

বক্তৃতা দেবার জন্য ব্যস্ত, আমি তখন দেশটা দেখবার জন্যে সমস্ত দেশটা ঘুরে বেড়াই একলা-একলা। দেশটা চওড়ায় উনত্রিশ মাইল আর লম্বায় মাত্র তিরিশ মাইল। আয়তনটা প্রায় কলকাতার মতন। দেখে আনন্দ পেলাম 'রামকৃষ্ণ মিশনের' আশ্রম আর শহরের মধ্যেখানে বিরাট প্রাসাদ। তার নাম "গান্ধী স্মৃতি সংঘ"।

কিন্তু এসব কথা কেন লিখছি? এই গল্পতে তো এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এসব কথা না বললে তো সুব্রত সরকারের কথা প্রাসঙ্গিক হবে না। ফিরে আসবার আগের দিন সকালবেলা হঠাৎ আমার ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

আমি তো চমকে উঠেছি। কে এখানে আমায় টেলিফোন করবে?

আমি টেলিফোনের রিসিভারটা ধরতেই ওদিক থেকে খাঁটি বাঙ্লায় প্রশ্ন হল আমি কি......?

আমি বললাম—হ্যাঁ আমিই কথা বলছি।

আবার প্রশ্ন—আমার পরিচয় আমি এখানকার একজন বাঙালি, এখানকার ফরেস্ট অফিসার দিলীপকুমার গাঙ্গুলী। আপনি কি এখন ঘরে থাকবেন?

বললাম—হ্যাঁ—

দিলীপবাবু বললেন—আমি এখুনি আপনার হোটেলে যাচ্ছি। একটু অপেক্ষা করবেন—।

আমি তো বেঁচে গেলাম। অনেক দিন পরে বাঙলা শব্দ শুনে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তার ঠিক পনেরো মিনিট পরেই দিলীপবাবু আমার হোটেলে এসে হাজির। বললেন—চলুন আমার বাড়িতে—

আমি অবাক। বললাম—কেন? কী ব্যাপার?

দিলীপবাবু বলবেন—রোজই তো হোটেলে খাচ্ছেন, আজকে আমি আপনাকে বাঙালি খানা খাওয়াব। মাছের ঝোল ভাত খাবেন নিশ্চয়ই—

এ একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বললাম—আপনাকে বোধহয় ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন। এত দিন এখানে আছি, কিন্তু একজন বাঙালিকেও দেখতে পাইনি—

সত্যিই তিনি তখনই আমাকে নিজে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। যেতে-যেতে অনেক কথা হল। কলকাতার রাস্তা-ঘাটের কথা হল। চারদিকে বন-জঙ্গলের কথা হল। এত জঙ্গল এখানে, অথচ একটা সাপও নাকি নেই বনের ভেতরে। কারণ, গভর্ণমেন্ট বাইরে থেকে অসংখ্য বেজি আমদানি করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে, আর সাপ দেখলেই বেজিগুলো সাপদের মেরে ফেলে।

ততক্ষণে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছি। দিলীপবাবুর স্ত্রী এসে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর গল্প করতে-করতে এক সময়ে খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। খেতে খেতে আমি দিলীপবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি মরিশাসে এলেন কী করে?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—আমি নিজে থেকে তো আসিনি, আমাকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট পাঠিয়েছে। আমি মরিশাসে চাকরি করছি বটে কিন্তু আমার মাইনে দেয় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট। গোড়ায় যখন এখানে এলুম তখন আমাকে বলা হয়েছিল আমাকে এখানে দু'বছরের জন্যে থাকতে হবে। কিন্তু এখন প্রায় আট বছর হয়ে গেল এখানেই আছি। এখানকার কর্তা রামগুলমজী আমাকে ছাড়তে চাইছেন না। কেবল দু' বছর করে কনট্রাক্টরি নিউ করা হচ্ছে। এখন তিনি বলছেন এখানে পার্মানেন্টলি থেকে যান, আপনার মাইনে বাড়িয়ে দেব।

—আপনি কি এখানেই থাকবেন নাকি?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—আমার থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট আমার লেখা-পড়ার জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছে, আর আমি কি না ইণ্ডিয়ার কোনও উপকার করতে পারছি না! কথাটা ভাবতেই মনে বড় কষ্ট হয়—

বললাম—কিন্তু এখন তো সবাই তাইই করছে। ইণ্ডিয়ার কত ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, টেকনিসিয়ান ইণ্ডিয়ার টাকায় লেখাপড়া শিখে বেশি টাকা রোজগারের লোভে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, আরব কানট্রিতে চলে যাচ্ছে—

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—ওটা আমার ভালো লাগে না। আমি যদি এখনই চাই তো ইণ্ডিয়ার বাইরে যে-কোনও জায়গায় গিয়ে মাসে পঁচিশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমার নিজের মা যদি গরিব হয় তো সেই মাকে কি আমি গরিব বলে ত্যাগ করব? আমি ইণ্ডিয়ার সেবা করতে চাই, কিন্তু তা করতে পারছি না বলে খুব খারাপ লাগছে—

বললাম—কিন্তু আজকাল তো অনেকে আমেরিকায় গিয়ে নিজেদের বুড়ো বাবা-মা'কেও সেখানে নিয়ে যাচ্ছে—

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—তার কারণ আলাদা—

—আলাদা কেন?

—তার কারণ সেখানে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না তো, তাই বাপ-মা'কে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনার কাজগুলো করিয়ে নেয়—

গাঙ্গুলীবাবু একটু থেমে আবার ব ললেন—আর একটা মজার কথা শুনবেন, একবার একজন বাঙালি ছেলেকে এখানে পুলিশ ধরে ফেলেছিল—

—কেন?

—ছেলেটা ছেঁড়া শার্ট-প্যাণ্ট্ পরে এখানে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল। এখানে রাস্তায় ভিক্ষে চাওয়া অপরাধ, তা জানেন তো! এখানে কি এতদিন কাউকে ভিক্ষে করতে দেখেছেন? দেখেননি। কিন্তু বাঙালি বলে পুলিশ আমাকে টেলিফোন করাতে আমি থানায় গেলাম। গিয়ে দেখি সেই বাঙালি ছেলেটা হাউ-মাউ করে কাঁদছে। আমি তাকে অনেক রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, সে ছোটবেলায় কলেজ থকে পাশ করেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে টাকা উপায়ের অন্য কোনও পথ না পেয়ে একটা সিগ্রেটের দোকান করেছিল। কিন্তু তার সব লোকসান হওয়ার সে বাড়ি ছাড়া হয়ে একদিন বিনা পাসপোর্টে একটা জাহাজে উঠে পড়ে। তারপর হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে তারা তাকে এখানে নামিয়ে দেয়, এই মরিশাসে।

—তারপর?

—তারপর এখানকার পুলিশ তাকে ধরে থানায় আটকে রাখে। তারপর যখন জানতে পারে যে সে বাঙালি, তখন আমাকে খবর দেয়। আমি থানায় গিয়ে সব শুনে তাকে ছাড়িয়ে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখি। তার কাছে সবই শুনেছিলাম। তার মুখ থেকেই শুনেছিলাম যে, কলকাতার লোক। তার বাবার নাম সতীনাথ সরকার। রেলওয়েতে নাকি চাকরি করেন তিনি। কলকাতায় তার বাবা আছেন, মা আছেন.....আর আছে তার দুই বোন। দোলা আর মালা, আর আছে এক ভাই। তার নাম সুকান্ত সরকার।.......

বলে দিলীপবাবু থামলেন। আমি তখন হতভম্ব। তখন আমার মুখ দিয়ে আর কিছুক্ষণ কথা বেরোচ্ছে না—

—তারপর?

—তারপর আর বেশিদিন সে বাঁচল না। দু'দিন পরেই সে আমার বাড়িতে মারা গেল

বললাম—তার ছোট ভাই-এর নামটা কী বললেন?

দিলীপবাবু বললেন—সুব্রত সরকার!

*

দশ

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য হবার মত ঘটনাই বটে!

কিন্তু গল্পটা বলবার আগে একটু ভূমিকা করে নিই। ঠাকুরঘরে গিয়ে পূজো করতে বসবার আগে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হয়। তাতে একটা উপকার হয় এই যে, মনটাকে দেবতার দিকে একাগ্র করতে সাহায্য করে।

মন বড় চঞ্চল পদার্থ। কিছুতেই একাগ্র হতে চায় না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হতে সে ভালবাসে। এই মনটাকে নিয়েই মানুষের যত জ্বালা। শরীরটাকে ওষুধ খেয়ে বাগে আনা সহজ, কিন্তু মানুষের মন বড় বেয়াড়া জিনিস। সে কিছুতেই বশ মানে না। তাই সেই মনকে বশে আনবার জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে এত অনুশাসনের বিধি-নিষেধ, এত নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি, এত জপ-তপ-ধ্যানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া।

গল্পের বেলাতেও ঠিক তাই।

পাঠক-পাঠিকাদের মন আজকাল বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার নানা জটিলতায় ভারাক্রান্ত। অর্থ-উপার্জনের নানা ফন্দি-ফিকিরের ধান্ধায় মানুষের মন বড় বিপর্যস্ত। ভোর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মানুষ শুধু সংসার পরিচালনার সমস্যার ভারে জর্জরিত। সেই মানুষের মনকে আমি গল্প শুনিয়ে আকৃষ্ট করবো, এ-বড়ো সোজা কাজ নয়।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে গল্প শোনানোর কাজটা এত শক্ত ছিল না। তখন মানুষের অবসর ছিল, তখন সরল ছিল জীবন-যাপন। লোকসংখ্যা ছিল কম। হেলেদুলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মানুষ মহা আরামে দিন কাটাতো। তারপর মানুষের সংখ্যা বাড়লো, দিন-কাল বদলালো। যন্ত্রের আবির্ভাব হলো, আর তার ফলে আরামের উপকরণও দিন-দিন বাড়তে লাগলো। সেই আরাম পেতে গেলে টাকার প্রয়োজনও অনিবার্য হয়ে উঠলো। তখন সবাই টাকা-উপার্জনের ধান্ধাতেই মেতে উঠলো। সেই টাকা উপায়ের জন্যে মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো যে গল্প-উপন্যাস পড়বার আর তার সময় রইল না। তখনই মুশকিল হলো গল্প-উপন্যাস লেখকদের।

তারা তখন ভাবতে লাগলো কেমন করে এই ব্যস্ত মানুষকে কাবু করা যায়। ভাবতে লাগলো কেমন করে গল্পের আফিম খাইয়ে পাঠক-পাঠিকাদের গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত পড়িয়ে নেওয়া যায়। তখন কোনও-কোনও লেখক গল্পের মধ্যে অশ্লীলতা ঢুকিয়ে দিলে যাতে মানুষ সুড়সুড়ি পায়, কেউ-কেউ বা রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টায় দিন-রাত পরিশ্রম করতে লাগলো।

কিন্তু পরিণামে দেখা গেল কিছুতেই কিছু কাজ হলো না। দেখা গেল মানুষ গল্পই চায়। এবং এমন গল্প চায় যাতে হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তির সমন্বয় ঘটে। আবার সে এমন গল্প হওয়া চাই যাতে মানুষের কল্যাণের কথা আছে, মানুষের প্রতি ভালবাসা আছে, মানুষের অপমানিত আত্মার শান্তি কামনা আছে। আর তখনই সেই গল্প মহৎ-সৃষ্টি বলে কীর্তিত হয়। এই মহৎ-সৃষ্টির পাঠকের কোনও বয়েস নেই, সেই

পাঠকদের কোনও যুগ নেই, সেই পাঠক-পাঠিকার কোনও সীমা-সংখ্যা বা ভাষা-ভেদও নেই।

আজকে এত কথা যে বলছি তার একটা কারণও আছে।

কারণটা হলো এই যে আমার কাছে প্রতিদিন ডাক পিওন মারফত কিছু-কিছু চিঠির সঙ্গে কিছু-কিছু গল্পও আসে। অখ্যাত-অবজ্ঞাত লেখকরা আমার কাছে গল্প পাঠান আমার মতামত জানবার জন্যে। অথচ তাঁরা হয়ত কেউই জানেন না যে আমি একজন নির্দল লেখক। আমার যে কেবল দল নেই তাই-ই নয়, আমি আবার একজন স্বাধীন সবসময়ের লেখক। চাকরি করা আংশিক সময়ের লেখক আমি নই। তার ওপর আমি কোনও পত্রিকার সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট তাও নয়। লেখা আমার শুধু একটা যে নেশা মাত্র তা নয়, এটা আমার কালক্রমে একটা পেশাতেও দাঁড়িয়ে গেছে। আর তার ফলে আমি প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিক-সমাজ থেকেও প্রায় বিতাড়িত।

এ হেন লেখকের কাছে কেন যে লেখকরা তাঁদের রচনা পাঠিয়ে মতামত চান, তা আমি বুঝতে পারি না। আর শুধু যে বাঙালী পাঠকরাই পাঠান তা নয়, অন্য ভাষা-ভাষীরাও মনে করেন আমি বোধহয় তাঁদের ভাষারই লেখক।

আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি যে চিঠি লেখার ব্যাপারে আমি একজন অলস ব্যক্তি। কিন্তু পড়ার ব্যাপারে আমার কোনও আলস্য নেই। যত চিঠি আমার কাছে আসে, যত গল্প আসে, সবগুলোই আমি মনযোগ সহকারে পড়ি। তবে বলতে দ্বিধা নেই চিঠিগুলো পড়ে যত আনন্দ বা উৎসাহ পাই, গল্পগুলো পড়ে তত আনন্দ বা উৎসাহ পাই না। সাধারণতঃ গল্পগুলো পড়ে পাশে রাখা ফাইলের মধ্যে গুঁজে দিই। উদ্দেশ্য থাকে যে পরে কোনও দিন তার জবাব দেব। কিন্তু সে আর কোনও দিনই হয়ে ওঠে না। তাতে লেখকরা আমার ওপর অখুশী হন এবং সময়মত পত্র চিঠির জবাব দিতে না পারার জন্যে আমিও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকি।

কিন্তু এবার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো।

একটা দামী লম্বা খামের মধ্যে দামী কাগজের ওপর লেখা একটি গল্প এসে হাজির হলো আমার কাছে। ভেবেছিলাম, অন্যান্য গল্পের মতই এটাকে পড়েও আমার পাশে রাখা ফাইলের মধ্যে গুঁজে দেব। এবং তারপর সময়মত যা-হোক একটা জবাব দেব।

কিন্তু তা হলো না। আমি গল্পটা পড়ে চমকে উঠলাম। গল্প লেখিকার নাম সুলেখা রায়। কোনও কালে সুলেখা রায় নামে কোনও লেখিকার নাম শুনেছি বা কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। অথচ পাকা হাতের লেখা। অনেক পড়া অনেক দেখা আর অনেক জানা না থাকলে এবং সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান না হলে কারো পক্ষে এমন গল্প লেখা তো সম্ভব হয় না। লেখা তো অনেকেই লেখে এবং লেখা তো অনেক কাগজেই ভূরি-ভূরি ছাপা হয়। কিন্তু সব লেখাই তো লেখা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জগৎকে জানতে সাহায্য করে কিন্তু নিজেকে জানা? সাহিত্যে আমরা নিজেকে জানি বলেই তা সাহিত্যের এত কদর। তাই যেখানেই কোনও প্রকৃত সাহিত্যের চিহ্ন পেয়েছি সেখানেই সেই লেখকের উদ্দেশ্যে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি।

এ আমার চিরকালের স্বভাব। আর কিছু করতে না পারি যে-পত্রিকায় সেই সাহিত্যের নিদর্শন পাই সেই পত্রিকার সম্পাদকের মারফত লেখক বা লেখিকাকে আমার সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানাই।

তাই এবার সুলেখা রায়ের গল্পটি পড়ে লেখিকাকে পত্র মারফত আমার সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদ জানিয়ে আমি আমার পবিত্র কর্তব্য পালন করে তৃপ্তি পেলাম।

ব্যাপারটা এখানেই সমাপ্ত হলে খুশী হতাম। কিন্তু সেই পত্রের যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে তা আমি কল্পনা করতেও পারিনি। ব্যাপারটা সবিস্তারে বলি।

এই সুলেখা রায়ের গল্প সম্বন্ধে তাকে আমার চিঠির লেখার দিন তিন-চার পরেই

একদিন সকালবেলা দু'জন ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। দেখে মনে হলো দু'জনেই বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ। অন্ততঃ তাদের সাজ-পোশাক, চাল-চলন দেখে তাই-ই মনে হলো।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে আর মহিলাটির বয়সে সেই অনুপাতে পঁচিশ-ত্রিশ।

ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—ইনি আমার স্ত্রী সুলেখা রায়, যাঁর গল্প পড়ে আপনার ভালো লেগেছিল, আর আপনি চিঠি লিখে যাঁকে তা জানিয়েছিলেন। আর আমার নাম হলো সুবিমল রায়।

আমি দু'জনকেই যথারীতি অভ্যর্থনা করে বসালাম। দু'জনেই পাশাপাশি সোফায় বসলেন। আমি সুবিমল রায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী করেন?

সুবিমল রায় বললেন—আপনি রায়-বাহাদুর ভূধরনাথ রায়ের নাম শুনেছেন তো? বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ-গর্ভণমেন্টকে এক লাখ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। তার জন্যে ইংরেজরা তাঁকে রায়-বাহাদুর টাইটেল দিয়েছিলেন। তাঁর বিজনেস ছিল পেপার বোর্ডের। তিনিই ছিলেন 'দি পেপার বোর্ড ম্যানুফ্যাক্চারার্স লিমিটেডে'র ফাউণ্ডার। এখন আমি সেই কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

দু'জনের চেহারা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে যা মনে হয়েছিল তাঁদের পরিচয় পেয়ে তা সমর্থিত হলো। সব শুনে বললাম—আপনি আপনার স্ত্রীকে লেখার ব্যাপারে একটু উৎসাহ দেবেন, উৎসাহ পেলে আপনার স্ত্রী ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত লেখিকা হয়ে উঠেতে পারবেন।

তারপর সুলেখা রায়ের দিকে চেয়ে বললাম—আপনার নাম কোনও পত্র-পত্রিকায় কখনও ছাপা হতে দেখিনি। জানি না আপনার কোনও গল্প আগে কোথাও ছাপা হয়েছে কিনা। কিন্তু যদি কখনও ছাপা হয় তাহলে আপনার খুব নাম হবে—

সুলেখা রায় এতক্ষণে কথা বললে।

বললে—আমি তো সব পত্রিকাতেই লেখা পাঠাই, কিন্তু কেউই আমার লেখা ছাপতে চায় না। যত জায়গায় পাঠিয়েছি তারা সবাই ফেরত দিয়েছে—

জিজ্ঞেস করলাম—তারা কী জবাব দেয়?

সুলেখা রায় বললে—অনেকে তো জবাবই দেয় না। আর যদি কখনও কেউ জবাবও দেয় তো ছাপানো একটা চিরকুট সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। সেই চিরকুটে লেখা থাকে তাদের স্থানাভাব—

আমি সুলেখা রায়ের কথা শুনে বললাম—আপনি নিজে কখনও কোনও সম্পাদকের সঙ্গে নিজের গল্প নিয়ে দেখা করেছেন?

সুলেখা রায় বলল—না, আমি এদের বাড়ির বউ হয়ে কী করে সম্পাদকদের অফিসে যাই বলুন, উনি মাঝে-মাঝে গেছেন!

আমি সুলেখা রায়ের স্বামীর দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি গেছেন?

সুবিমল রায় বললেন—যখন অনেকদিন অপেক্ষা করেও কোনও উত্তর আসে না তখন বাধ্য হয়ে সুলেখার কথায় সম্পাদকের অফিসে আমাকে যেতে হয়—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি গেলে তারা কী বলে?

সুবিমল রায় বললেন সম্পাদকদের অফিসে গিয়ে দেখি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশ গোল হয়ে বসে সবাই গল্প করেছে চা খাচ্ছে। আমি অপরাধীর মত তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই, তারা আমাকে দেখে বিরক্ত হয়। আমি গিয়ে তাদের কাজের ক্ষতি করেছি এমনি তাদের

মুখের ভাব। আমি যখন সুলেখার গল্পটার কত্তা জিজ্ঞেস করি তখন তারা বলে লেখাটা তখনও পড়া হয়নি, পড়া হবার পর যথাসময়ে জানাবে, তাগাদা করতে হবে না।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

সুবিমল রায় বললেন—তারপর ছ'মাস কি এক বছর পরে হয়ত কোনওটা ফেরত এল, কোনওটা বা আর ফিরেই এল না—এইরকম—

বললাম—আজকাল এই রকমই হয়েছে। লেখার লাইনে এত ভিড় হয়েছে যে সকলকে খুশী করা সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না—

সুলেখা রায় বললে—কিন্তু যে-সব লেখা পত্রিকায় ছাপা হয় দেখেছি তার তুলনায় তো আমার লেখা অনেক ভালো—তবু কেন ছাপায় না ?

সুবিমল রায় বললেন—জানেন, সব পত্রিকারই একটা করে দল আছে, যারা সেই দলে গিয়ে ভিড়তে পারে, তাদের লেখাই শুধু ছাপা হয়।

আমি সব শুনলাম। তারপর বললাম—এ ব্যাপারে আমি আর কী করতে পারি বলুন, তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি যদি কোনও পত্রিকার সম্পাদক হতুম তো আমি এই গল্প ছাপতুম। আমার খুব বিশ্বাস একবার কোনও বিখ্যাত পত্রিকায় ছাপা হলে আপনার খুব নাম হতো—

সুলেখা রায় বললেন—তা আপনি একবার কাউকে বলে দিন না। আপনার সঙ্গে তো সব পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে জানা-শোনা আছে, সব পত্রিকাতেই আপনার লেখা বেরোয়, আপনি বললে কেউ আপত্তি করবে না—

সুবিমল রায়ও স্ত্রীর কথা খেই ধরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড্ করে দেন তাহলে যে কোন পত্রিকা ছেপে দেবে। আপনার কথার অনেক দাম।

আমি বললাম—দেখুন, আপনারা ঠিক বুঝবেন না। আমি সব পত্রিকায় লিখি বটে কিন্তু সে তাদের তাগিদে। আমি তো কোথাওই লিখতে চাই না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমি কিছু ছাপতে বললেই তারা ছাপবে। সম্পাদকদের নিজেদেরও তো বিদ্যে-বুদ্ধি আছে। তাদের বিদ্যে-বুদ্ধির ওপর হস্তক্ষেপ করলে কি তারাই তা সহ্য করবে ? আমি কে বলুন না ? আর আমার মতামতের দামই বা কী ? ঘটনাচক্রে আমার নাম হয়ে গেছে তাই আমার লেখা তারা ছাপায়। আবার ঘটনাচক্রে যদি কখনও আপনার স্ত্রীর নাম হয়ে যায় তখন তারা আপনার স্ত্রীর কাছেও লেখার জন্যে ধর্ণা দেবে ! এই-ই জগতের নিয়ম !

—কিন্তু ঘটনাচক্রে কেমন করে সুলেখার নাম হবে বলুন ? যে-রকম দিনকাল পড়েছে তাতে কি জানা-শোনা না থাকলে কিছু হয় কারো ? হাসপাতালে জানা-শোনা না থাকলে কি কেউ বেড্ পায় ? ক্যালকাটা কর্পোরেশনে জানা-শোনা না থাকলে কি কোনও কাজ উদ্ধার হয় ? জানা-শোনা না থাকলে কি রেলের সামান্য একটা টিকিটও পাওয়া যায় ? এখন কি আপনাদের সেই আগেকার যুগ আছে ?

তারপর একটু থেমে বললেন—আর তাছাড়া আপনি কি চান না যে একজন নতুন লেখিকার সৃষ্টি হোক ? নতুন কোন প্রতিভার জন্ম হোক ? আপনি যখন নিজেই বলেছেন যে সুলেখার লেখা অপূর্ব—

এর জবাবে আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম।

আমার নিজেরও কেমন যেন মনে হলো সত্যিই তো ! আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে তো একটা অখ্যাত প্রতিভাকে লোক-চক্ষে তুলে ধরতে পারি। এই বয়সে সেইটেই তো আমার পবিত্র দায়িত্ব হওয়া উচিত !

কিন্তু আবার ভাবলাম কে আমার অনুরোধ রাখবে। এই ভিড়ের যুগে কে কিংবা কোন্ সম্পাদক অখ্যাতা-অবজ্ঞাতা একজন প্রতিভাময়ী লেখিকার জন্যে তার পত্রিকায় একটু স্থান করে দেবে ? তাতে তার কী স্বার্থ ? ভীড়ের যুগ ছাড়াও এটা আবার পার্টিরও যুগ

তো বটে! কে আমার দলে আর কে আমার দলে নয়, এই বিচার করেই আজকাল সম্মান-খাতির-পুরস্কারের ভাগ বন্টন হয়। হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ আর নয় তো দলগত স্বার্থ, এর মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূ। সে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কী করে কোনও পত্রিকার দলভুক্ত হয়! তাকে দলভুক্ত করতে পারলে কোন্ সম্পাদকের কোন্ স্বার্থ চরিতার্থ হবে? সে কি গৃহস্থ-বধূ হয়ে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিতে পারবে? সম্পাদককে ঘুষ দিতে পারবে? আর এই ঘুষের যুগে ঘুষ না দিলে লেখক-লেখিকা হওয়া তো দূরের কথা, জীবনে কোনও-কিছুই কি কেউ হতে পারবে? ঘুষ ছাড়া কি কিছু হওয়া বা হতে পারা সম্ভব এ-যুগে?

বললাম—ঠিক আছে, আপনারা গল্পটা রেখে যান, ভেবে দেখি আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি। তবে আমি কোনও কথা দিতে পারছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আমার কাছে যখন কোনও সম্পাদক আসবেন আমি আপনার গল্পটা ছাপিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো। এর বেশী আমি আর কিছু করতে পারবো না আপনার জন্যে—

এতেই তাঁরা খুশী! সুবিমল রায় বললেন—এর বেশী আমরা আর কিছুই চাইও না আপনার কাছ থেকে। এইটুকু করলেই আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো—

তাঁরা নমস্কার করে চলে গেলেন। আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু তখনও জানি না আমার জন্যে কী মর্মান্তিক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

তাঁরা চলে যাবার পরেই আমি যথারীতি নিজের কাজে মন দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো যে-সোফাটাতে সুবিমল রায় বসে ছিলেন তার ওপর একটা দামী ফাউন্টেন পেন পড়ে আছে!

আমি তো অবাক্! হঠাৎ ও-সোফার ওপরে ফাউন্টেন্ পেন কোথা থেকে এল? আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম ও জায়গায় আগে আর কে বসেছিল। কিন্তু সকাল থেকে এক ওই সুলেখা রায়ের স্বামী ছাড়া আর কেউ তো বসেনি। তাহলে কি সুলেখা রায়ের স্বামীরই কলম ওটা?

ভাবলাম তা ছাড়া আর কার কলমই বা হবে! আর তো কেউ ওখানে বসেনি আজ!

তাহলে তো সুবিমল রায়ের খুব অসুবিধে হবে! "দি পেপার বোর্ড ম্যানুফ্যাকচারর্স লিমিটেডের" ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কলম না হলে তো এক মুহূর্তও চলবে না।

তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখতে বসলাম সুবিমল রায়কে। একটা পোস্টকার্ড লিখে আমার জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে তিনি কলম ফেলে গেছেন আমার বাড়িতে। পোস্টকার্ডটা লিখতে যাবো এমন সময় হঠাৎ সেই সুবিমল রায় আবার আমার ঘরে ঢুকলেন।

আমি তাঁকে দেখে অবাক্। বললাম—আপনি ফিরে এসেছেন ভালোই হয়েছে। এই দেখুন এখুনি আপনাকে একটা পোষ্টকার্ড লিখতে যাচ্ছিলাম। আপনি চলে যাবার পর আমার হঠাৎ নজরে পড়লো আপনি কলমটা ওখানে ভুলে ফেলে গেছেন—

সুলেখা রায়ের স্বামী আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

বললেন—না, আমি কলমটা ভুলে ফেলে রেখে যাইনি—

বলে কলমটা নিজের পকেটে তুলে নিলেন।

আমি আরো অবাক। বললাম—তার মানে?

সুবিমল রায় বললেন—আসলে আমি ইচ্ছে করেই ওটা ফেলে রেখে গিয়েছিলাম।

কারণ আপনার সঙ্গে আমার নিরিবিলিতে একটা কথা বলবার ছিল যেটা আমার স্ত্রীর সামনে বলতে পারতুম না—

আমি সুবিমল রায়ের কথার কিছুই মানে করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—কী কথা?

—কথাটা হলো এই যে আপনি আমার স্ত্রীর গল্পটা ছাপিয়ে দেবার জন্যে কোনও চেষ্টা করবেন না।

আমি বললাম—সে কী? আপনিই তো এতক্ষণ গল্পটা ছাপিয়ে দেবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছিলেন!

সুবিমল রায় বললেন—তা করছিলুম বটে কিন্তু তখন আমার স্ত্রী সামনে বসে ছিল বলে! এখন তো আর আমার স্ত্রী এখানে নেই তাই আমার মনের কথাটা আপনাকে বলছি। আমার ইচ্ছে নয় যে ওর গল্প কোনও কাগজে ছাপা হোক।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন। জিজ্ঞেস করলাম—সত্যিই আপনি চান না যে আপনার স্ত্রীর লেখা গল্প কোথাও ছাপা হোক?

সুবিমল রায় তেমনি ভাবেই বললেন—না।

—কেন?

সুবিমল রায় বলতে লাগলেন—দেখুন, আমি আপনাকে ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমি জানি আমার স্ত্রী খুব ভালো লেখেন। আমি নিজে ওর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলাম। কোনটা সাহিত্য আর কোনটা সাহিত্য নয় তা আমিও বুঝতে পারি। ওর লেখা পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আমি যদি চাইতুম যে আমার স্ত্রীর লেখা কোনও পত্রিকায় ছাপা হোক তাহলে কি ভাবছেন তা আমি ছাপতে পারতুম না? পারতুম! আর তা যদি না-ও পারতুম তো আমি নিজেই একটা পত্রিকা বার করতাম, করে সেই পত্রিকায় আমার স্ত্রীর লেখা ছাপতুম। আসলে আমি চাই না যে আমার স্ত্রী লেখিকা হোক। নইলে আমি আপনাকে এত কথা বলছি? যে-কোনও পত্রিকাতেই আমার স্ত্রী লেখা পাঠায়, সেখানে গিয়েই সম্পাদককে গিয়ে আমাকে ধরতে হয়ে যেন তারা আমার স্ত্রীর লেখা না ছাপায়! আমার নিজের অফিসের অনেক কাজ-কর্ম আছে, অফিসের কাজে আমাকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়, সেই সব কাজ ফেলে পত্রিকার অফিস-অফিসে গিয়ে সেই লেখা না ছাপানোর তাগিদ দেওয়া কী ঝঞ্ঝাট বলুন তো? এ-কাজ কী আমার পোষায়?

বললাম—ঝঞ্ঝাট যদি মনে করেন তাহলে করেন কেন?

—করি প্রাণের দায়।

আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—প্রাণের দায় বলছেন কেন?

সুবিমল রায় বলতে লাগলেন—প্রাণের দায় নয়? আপনি বলছেন কী? ধরুন যদি কোনদিন আমার স্ত্রী বিখ্যাত লেখিকা হয়ে ওঠেন, তাহলে আমার দুর্দশার কথাটা একবার কল্পনা করুন তো? কল্পনা করুন তো লোকে আমার সম্বন্ধে কী ভাববে? তখন আমার কী পরিচয় হবে? তখন আমার একমাত্র পরিচয় হবে আমি কে? না, আমি লেখিকা সুলেখা রায়ের স্বামী! তার চেয়ে আমি 'দি পেপার বোর্ড ম্যানুফ্যাকচারর্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সে পরিচয় অনেক ভালো। এমন কি কেউ যদি আমাকে রায়বাহাদুর ভূধরনাথ রায়ের নাতি বলে পরিচয় দেয় সেও হাজার গুণে ভালো। কিন্তু স্ত্রীর পরিচয়ে স্বামীর পরিচয়—সে বড় লজ্জার কথা মশাই! যদি কোনওদিন তা-ই

হয় তো তার আগে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো, এই আমি বলে রাখলুম—

আমার মুখ দিয়ে তখন আর কোনও কথা বেরোচ্ছে না। সুবিমল রায় হঠাৎ বললেন—আমি তাহলে এখন চলি, আমার স্ত্রীকে রাস্তায় গাড়িতে বসিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি, বলেছি আমার কলমটা ফেলে এসেছি, সেটা নিয়ে আসছি—

বলে সেই গল্পটা ফেলে রেখে তিনি চলে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম—এটা কী করবো ?

সুবিমলম রায় দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন—দিন পনেরো পরে ওটা ডাকে ফেরত দিয়ে লিখে দেবেন যে আপনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন ছাপতে দিতে, কিন্তু কেউ ছাপতে রাজী হয়নি। ব্যাস, তাহলেই ল্যাটা চুকে যাবে—

বলে তিনি চলে গেলেন। আর আমি হতবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ সেখানেই বসে রইলাম। ভাবলাম এই সালে এই আন্তর্জাতিক নারী বর্ষেও কিনা এই রকম ঘটনা ঘটতে হয়!

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য হবার মত ঘটনাই বটে!

এগারো

সংসারের চারিদিকে কতো যে মিথ্যে কথা লেখা আছে, তার ঠিক নেই। যেখানে 'সত্যমেব জয়তে' কথাটা বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা থাকে, সেখানে মিথ্যে নিয়েই সবচেয়ে বেশি কারবার চলে। অথচ এ নিয়ে কেউ কিছু প্রতিবাদ করে না, এ নিয়ে কোনও আলোচনাও হয় না কোথাও। এই রকম একটা ঘটনার কথা বলি।

কথাগুলো বলছিলেন হাইকোর্টের জর্জ ভক্তিভূষণবাবু। পুরো নাম ভক্তিভূষণ সরকার। এককালে কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানিত জর্জ তিনি। তখন অনেক বয়েস হয়েছে। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি তাঁর খাটের ওপর শুয়েছিলেন। টেবিলের ওপরে অনেক ওষুধের শিশি।

তিনি তখন ওপরের কথাগুলো বলছিলেন। বলছিলেন—সংসারের চারদিকে কতো যে মিথ্যে কথা লেখা আছে তার ঠিক নেই। আমি তো হাইকোর্টের একজন জজ ছিলাম। আমার এজলাসে মাথার দিকে দেওয়ালের ওপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা থাকতো 'সত্যমেব জয়তে'। অথচ আমি জানি সেই ঘরের মধ্যেই মিথ্যে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কারবার চলতো। সত্যিকে মিথ্যে বলে চালানো হতো আর মিথ্যেকেও সত্যি বলে চালানো হতো। অথচ আমি সমস্ত জেনে-শুনেই সাক্ষ্য না পেয়ে মিথ্যেকে সত্যি বলে রায় দিতুম। এই-ই আমার দুঃখ। এই জন্যেই তো এই বুড়ো বয়েসে তোমার সঙ্গে এত কথা বলছি—

বলে তিনি থামলেন। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—তুমি গল্প লেখ বিমল, সেই জন্যেই তোমাকে আজ একটা গল্প বলছি।

তখন বোধহয় ১৯৪৭ সাল। আমি তখন সবে মাত্র জজ হয়েছি।

একদিন বাড়িতে এসে এক ভদ্রলোক একটা অনুরোধ করলেন। অনুরোধটা কী?

অনুরোধটা হচ্ছে আমি একটা 'সদন' উদ্বোধন করবো।

জিজ্ঞেস করলাম—কীসের 'সদন'?

ভদ্রলোক বললেন—আমি আমাদের গ্রামের রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটা বাড়ি তৈরী করেছি। বাড়িটার নাম দিয়েছি আমার স্বর্গতঃ বাবার নামে—'নিবারণ আশ্রয় সদন'। আমার বাবার নাম নিবারণচন্দ্র বিশ্বাস। তাঁরই নামে উৎসর্গ করেছি বাড়িটা। আপনাকে সেখানে গিয়ে সেইটে উদ্বোধন করতে হবে—

আমি তো অনুরোধ শুনে হতবাক। বললাম—আমি তো ও-সব কাজ সাধারণতঃ করি না—।

ভদ্রলোক বললেন—সেই জন্যেই তো আপনাকে দিয়ে 'নিবারণ আশ্রয় সদন'টা উদ্বোধন করাতে চাই। আমাদের গ্রামের সকলের ইচ্ছে তাই—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের গ্রামটা কোথায়?

—সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন—বেতোড় রেল-স্টেশনে নেমে পাঁচ ক্রোশ ভেতরে। আর আমার বাবার বড়ো ইচ্ছে ছিল ওই স্টেশনের কাছাকাছি এমন একটা বাড়ি তৈরি করা যাতে মানুষ-জন একদিন বা দু'তিন দিন থাকতে পারে। তারা বিনা-পয়সায় সেখানে থাকতে পারে। তার জন্যে কোনও টাকা নেওয়া হবে না তাদের কাছ থেকে। বাবা অনেক দিন হলো মারা গেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারিনি আমরা তখন। কিন্তু এখন আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আরব দেশে চাকরি নিয়ে গেছে। সে অনেক টাকা উপায় করে সেখানে। তার টাকাতেই এটা করা সম্ভব হয়েছে। সে সেখানে মাসে ত্রিংশ হাজার টাকার মতোন মাইনে পায়। সে-ই বাবার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করার দায়িত্ব নিয়ে এতদিনে সফল হয়েছে। আমাদের সজনেখালির সমস্ত মানুষের ইচ্ছে যে আপনিই সেই 'নিবারণ আশ্রয় সদন' এর বাড়িটা উদ্বোধন করুন।

জিজ্ঞেস করলাম—বেতোড় স্টেশন এখান থেকে কতদূর?

ভদ্রলোক বললেন—বাহান্ন মাইল।

—ফাংশানটা কোথায় হবে?

—বেতোড় স্টেশনের কাছেই—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কখন উৎসবটা হবে।

ভদ্রলোক বললেন—বিকেল চারটের সময়ে—

তারপর অনেক কথা হলো। জানলাম ভদ্রলোকের নাম দিবানাথ বিশ্বাস। তিনি হলেন নিবারণচন্দ্র বিশ্বাসের বড়ো সন্তান।

যখন সমস্ত ঘটনাটা শুনলাম তখন 'নিবারণ আশ্রয় সদন'টা উদ্বোধন করতে রাজি হলাম। ভাবলাম—যাই-না উদ্বোধন করতে। এতে আমার কী-ই বা এমন কষ্ট হবে! হাইকোর্টে ছুটির দিন সেটা। আমার সামান্য উপস্থিতিতে যদি ওঁরা খুশী হন তাহলে আমার কি-ই ক্ষতি?'

কথা রইল দিবানাথবাবু ওই নির্দিষ্ট দিনে আমাকে নিতে আসবেন। আর তার আগে সেই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে ছাপানো কার্ড দিয়ে যাবেন।

এবং পরে একদিন এসে আমাকে সেই ছাপানো কার্ডও দিয়ে গেলেন।

দেখলাম, তাতে লেখা আছে বেতোড় স্টেশনের নিকট নিবারণচন্দ্র বিশ্বাসের স্মৃতি-রক্ষার্থে 'নিবারণ আশ্রয় সদন' ভবন উদ্বোধন করবেন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভক্তিভূষণ সরকার। তার পরের লাইনে উদ্বোধনের সময় এবং তারিখ লেখা আছে

এই পর্যন্ত বলে ভক্তিভূষণবাবু থামলেন। বুঝতে পারলাম কথা বলতে-বলতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বললাম—আপনার যদি কথা বলতে কষ্ট হয় তো আজ থাক পরে আমি আর একদিন আসবো, তখন বলবেন।

ভক্তিভূষণ বললেন—না আজকেই বলে যাই। আর কতোদিনই বা বাঁচবো। একদিন এ-গল্প তুমি আবার অন্য লোককে বলো। বোলো যে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো যখন 'সত্যমেব জয়তে' লেখার নিচেয় বসে কাটিয়েছি, তখন কেবল নিরুপায় হয়ে কেমন করে মিথ্যের বেসাতি নিয়ে কাজ করে গিয়েছি—

এর জবাবে আমি আর কি-ই বলবো! বললাম—তাহলে বলুন?

ভক্তিভূষণবাবু আবার বলতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ভক্তিভূষণবাবুকে দিবানাথবাবু গাড়ি নিয়ে বেতোড়ে যাওয়ার জন্যে হাজির হলেন। গাড়িতে বসে-বসেই দিবানাথবাবু তাঁর বাবা নিবারণবাবুর অতীত জীবনের কথা বলতে লাগলেন। নিবারণবাবু ছিলেন অত্যন্ত গরীব লোক। সেই বেতোড় স্টেশন থেকে প্রতিদিন ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে কলকাতার এক বেসরকারী অফিসে কেরানীগিরি

করতে আসতেন। তখন সস্তা-গণ্ডার দিন। সংসারে অনেক পোষ্য। মাসিক আড়াইশো টাকায় কোনওরকমে পোষ্যদের প্রতিপালন করতো হতো বলে কলকাতায় আলাদা বাসা ভাড়া করতে পারেননি। সারাদিন অফিসে চাকরি করতেন। আর সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে বেতোড়ে ফিরে এসে ছ' ক্রোশ রাস্তা সাইকেলে করে এসে পৌঁছতেন সজনেখালিতে।

এই রকম প্রতিদিন। সাইকেলটা চাবি-তালা বন্ধ করে স্টেশনে গচ্ছিত রেখে দিয়ে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় যেতেন অফিসে করতে আর সন্ধ্যেবেলা আবার সাইকেলটা নিয়ে সজনেখালিতে এসে নিজের বাড়িতে ফিরতেন। এইরকম বরাবর করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ চাকরি থেকে রিটায়ার করাবার আগের দিন পর্যন্ত।

কিন্তু একদিন হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটলো।

তখন বর্ষাকাল। ক'দিন ধরে উপর্যুপরি বর্ষা চলেছে। গ্রামের সেই কাঁচা রাস্তায় হাঁটা-চলাও বিপজ্জনক। নিবারণবাবু ভিজে-ভিজে সেই রাস্তা দিয়েই সাইকেল চালিয়ে বেতোড় স্টেশনে পৌঁছেছেন, আর তারপর সেই রাস্তা দিয়েই আবার ভিজে ভিজে বেতোড় স্টেশন থেকে সজনেখালির বাড়িতে ফিরেছেন।

ক'দিন এইরকম করার পর একদিন যখন অফিস থেকে ফিরছেন তখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তাঁর মনে হলো তিনি নড়তে পারছেন না। বুঝলেন যে তাঁর বোধ হয় জ্বর হয়েছে। ওদিকে বৃষ্টিও থামবার নাম নেই। তিনি স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভাবলেন—এখন কি করবেন তিনি? কি করে এই বৃষ্টির মধ্যে ছ' ক্রোশ রাস্তা সাইকেল করে পাড়ি দেবেন?

স্টেশনের পাশেই ছিল একটা হোটেল।

হোটেল মানে কলকাতার হোটেলের মতো হোটেল নয়। দু'তিন কামরার একটা হোটেল। সে-হোটেল এমনিতেই খালি পড়ে থাকে। কোনও মেডিকেল ক্যানভাসার বা ওই রকম কোনও ব্যাপারীর যদি বিশেষ দরকার হতো তো ওইখানেই একদিন বা এক রাত্রির জন্যে উঠতো। হোটেলের ঘরভাড়াই পাঁচ টাকা। তার ওপরে আছে খাওয়া-থাকার চার্জ। হোটেলের নাম ছিল 'বিজয় হোটেল'।

তিনি যে 'বিজয় হোটেলে' রাত কাটাবেন সে-রকম টাকাও তাঁর পকেটে ছিল না তখন। সেই বৃষ্টির মধ্যে তিনি প্ল্যাটফরমের ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছেন যে কী করে এই দুর্যোগের মধ্যে ছ' ক্রোশ রাস্তা ঠেঙিয়ে সজনেখালিতে যাবেন। অথচ গায়ে তখন তাঁর জ্বর আর সঙ্গে-সঙ্গে খিধেয় তখন তাঁর পেটও চোঁ-চোঁ করছে।

আর কোনও উপায় না পেয়ে তিনি হোটেলে ঢুকলেন। হোটেলে ঢুকে তিনি ভাবলেন এক কাপ গরম চা খেলেই বোধহয় একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। এক কাপ চায়ের দাম তখন চার পয়সা।

চা খেলেন বটে, কিন্তু তবু তাঁর ক্লান্তি গেল না। একবার ভাবলেন রাতটা হোটেলে কাটালেই ভালো হতে। কারণ তিনি তখন যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছেন না। কিন্তু তিনি যে হোটেলে রাতটা ঘুমিয়ে কাটাবেন সে পয়সা তাঁর কোথায়?

তবু তিনি চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে গেলেন। তাঁকে সজনেখালি যেতেই হবে। তাঁর মনে হলো তিনি যতো দেরি করবেন ততোই বিপদ বাড়বে। বৃষ্টির জলে রাস্তা-ঘাট সব ডুবে যাবে। এই ভেবে তিনি সাইকেলে উঠতে গেলেন।

কিন্তু যেই উঠতে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কোনও রকমে তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। আবার তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেবারও উঠতে পারলেন না।

কিন্তু হঠাৎ অলৌকিক কে একজন তাঁকে ধরে তুলে দিলে। অন্ধকারে তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। লোকটা তাঁকে বললে—আপনার যে জ্বর হয়েছে দেখছি।

আপনি কোথায় যাবেন?

নিবারণবাবু কোনও রকমে বললেন—সন্তানেখালি—

লোকটা বললে—সে তো অনেক দূর। এখান থেকে ছ'ক্রোশ রাস্তা। এতক্ষণে পুকুর ছাপিয়ে রাস্তা জলে ডুবে গেছে। আজ রাত্তিরটায় এই বেতোড়ে থাকুন।

নিবারণবাবু বললেন—কোথায় থাকবো?

লোকটা বললে—কেন, এই 'বিজয় হোটেলে'—

নিবারণবাবু বললেন—আমার কাছে যে টাকা নেই। একদিন থাকতে গেলে পাঁচ টাকা লাগে! অত টাকা কোথায় পাবো? এখন যে মাসের শেষ........

লোকটা বললে—তাতে কি হয়েছে? টাকার কথা আপনি ভাববেন না—

বলে নিবারণবাবুকে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে 'বিজয় হোটেলে' ঢুকলো। তারপর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। শুইয়ে দিয়ে চাদর চাপিয়ে দিলে গায়ে।

বললে—আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার সাইকেলের জন্যে ভাববেন না, আমি এখ্খুনি ডাক্তার ডেকে আনছি—

বলে লোকটা চলে গেল। তখনও মাথাটা ভারি হয়ে রয়েছে। নিবারণবাবু একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

খানিক পরে লোকটা একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো। ডাক্তারবাবু তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—না, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

বলে একটা কাগজে ওষুধ লিখে দিলেন। লিখে দিয়ে চলে গেলেন। লোকটাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে লোকটা এসে বললে—ওষুধ নিয়ে এসেছি, আপনি খেয়ে নিন—

নিবারণবাবু তখন শিশুর মতো অসহায় হয়ে গেছেন। তিনি হাঁ করতেই লোকটা মুখের ভেতরে ফেলে দিলে। তারপর এক গেলাস জলও খাইয়ে দিলে।

সেই ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর কিছু মনে নেই।

পরের দিন যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো তখন আবার আগের রাত্রের সমস্ত ঘটনাগুলো আস্তে-আস্তে মনে পড়লো। তখন তিনি অনেক ঝরঝরে। তখন ওষুধ খাওয়ার ফলেই হোক, কিংবা আর যেকোনও কারণেই হোক, তাঁর মনে হলো তিনি অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বিছানা থেকে উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে হোটেলের মালিকের সামনে গেলেন। তাঁকে দেখেই মালিক বললেন কেমন আছেন?

নিবারণবাবু বললেন—ভালো—

তারপরেই বললেন—হোটেলের ভাড়াটা তো এখন নেই আমার কাছে, কালকে টাকাটা দিলে চলবে?

মালিক ভদ্রলোক বললেন—আপনার হোটেল ভাড়ার পাঁচ টাকা পেয়ে গিয়েছি—

—টাকা পেয়ে গেছেন? কে দিলে টাকাটা?

ভদ্রলোক বললেন—যে লোকটা আপনাকে দেখবার জন্যে ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল, সে লোকটাই ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

—ডাক্তারবাবু? কোথায় ডাক্তারবাবু? নাম কি তাঁর? কোথায় থাকেন তিনি?

হোটেল মালিক বললেন—তা তো বলতে পারবো না! সেই লোকটাই আপনাকে দোকান থেকে ওষুধ কিনে এনে খাওয়ালে, তবে তো আপনি এখন ভালো হয়ে উঠলেন!

—সে লোকটা কে? তার নাম কি? কোথায় থাকে?

হোটেল মালিক বললেন—তা তো জানি না। তাকে আমি আগে কখনও দেখিনি।

নিবারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সে কি এই বেতোড়ের লোক, না অন্য বাইরের কোথাকার?

হোটেল মালিক বললে--তা জানলে তো বলবো আপনাকে!

—আর সেই ডাক্তারবাবু? তিনি কি এখানকার লোক, না বাইরের?

হোটেল মালিক বললেন—তাও বলতে পারবো না মশাই। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই-ই আপনাকে বললাম। আমি ঘর ভাড়া পেয়ে গিয়েছি, চা-এর দাম পেয়ে গিয়েছি, আমার আর কিছু পাওনা নেই। আপনি ভালো হয়ে উঠেছেন তাই-ই ভালো। আপনি এবার বাড়ি চলে যান—

নিরাবণবাবু আর কি করবেন। কেবল ভাবতে লাগলেন—কে তাঁর ঘর ভাড়া দিয়ে দিলে, কে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললে? কে তাঁর এত শুভাকাঙ্ক্ষী?

পরের দিন আর তিনি অফিস যাননি। বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা ভাবনায় সেদিন অস্থির হয়ে গিয়েছিল। কারণ এমন তো কখনও হয় না। প্রতিদিন যে মানুষটা এত কষ্ট সহ্য করে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে সংসার চালায় সে এমন করে হঠাৎ অসুখে পড়ে যাবে তা সেদিন কেউ-ই কল্পনা করেনি। তার পরের দিনই নিরাবণবাবু অফিসে মেডিক্যাল-লিভ এর জন্যে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

তারপর আবার যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো। বছরের পর বছর তিনি সজনেখালি গ্রাম থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে সংসার চালাতে লাগলেন আর ছেলে মেয়েদের মানুষ করবার আপ্রাণ চেষ্টায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন।

কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততোদিন তিনি সেই অদ্ভুত দুর্ঘটনার কথা মনে রেখেছিলেন। কেবল বলতেন সেদিন কে তাকে বাঁচালো, কে তাঁকে পুনর্জীবন দিলে, কে তাঁর হোটেল ভাড়া মেটালে, কে ডাক্তার ডেকে তাঁকে ওষুধ খাওয়ালে? কে সেই লোক, কী তার নাম? কোথায় সে থাকে?

অনেককেই তিনি এ-কথা জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। তারপর যখন ছেলেরা বড় হলো তিনি তাদের বলতেন ওরে, তোরা কেউ একজন আমার জীবনদাতার ঋণ শোধ করে দিস—

ছেলেরা জিজ্ঞেস করতো—কি করে ঋণ শোধ করবো? কোথায় তার দেখা পাবো?

ছেলেরাও বহুলোকের কাছে জিজ্ঞেস করেছে--কে সেদিন বাবাকে বাঁচিয়েছিলেন বলতে পারেন? সেই ডাক্তারবাবুরই বা নাম কি? কোথায় থাকেন তিনি?

সে-কথার জবাব কেউ-ই দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সমাধান হয়নি সে রহস্যের। দিবানাথ বিশ্বাসের কাছে সেই সব গল্প শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম এর পেছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

দিবানাথবাবু বলতে লাগলেন--তারপর বাবা সংসারের সব দায়িত্ব পালন করে একদিন চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাদের ডেকে একদিন বললেন--তোরা যদি পারিস তো একদিন ওই বেতোড়ে ইস্টিশানের কাছে একটা বড় বাড়ি করে দিস, যাতে আমার মতো কোনও লোক অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। ধর্মশালার মতো কিছু একটা করে দিস তোরা—

তারপরে কী সৌভাগ্য হলো কে জানে, আমার ছোট ভাই একদিন শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে চাকরি করতে করতে হঠাৎ আরব দেশে একটা চাকরি পেলে।

আরবে চাকরিতে তার মাইনে বাড়তে-বাড়তে একেবারে সে-দেশের চীফ্-ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেল। তখন মাইনে হলো তার মাসে তিরিশ হাজার টাকা।

বাবার জীবনের শেষ ইচ্ছেটার কথা আমরা সবাই-ই জানতাম। কিন্তু সেই শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবো কি করে তা আমরা জানতাম না।

শেষকালে আমার সেই ছোট ভাই সৌদি আরব থেকে চিঠি লিখলে যে সে বাবার

শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী টাকা পাঠাচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে যেন বাবার নামে বেতোড় স্টেশনের কাছে একটা বাড়ি তৈরি করে বাবার স্মৃতি অক্ষয় করবার ব্যবস্থা করা হয়। যেন নাম দেওয়া হয় 'নিবারণ আশ্রয় সদন'।

জিজ্ঞেস করলাম—মোট কত টাকা খরচ হলো বাড়িটা করতে?

দিবাকর বললে—প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছে সবসুদ্ধু। তার ওপর আমরা তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা ট্রাস্ট করে দিয়েছি। সেই টাকার সুদ থেকে 'নিবারণ আশ্রয় সদনে'র যাবতীয় খরচ-খরচা চলবে।

সকাল দশটার সময়ে বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম। রাস্তা ফাঁকা ছিল। যখন বেতোড়ে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন দুপুর একটা।

ওখানে পৌঁছিয়ে দেখি নানান জায়গা থেকে নানান লোক এসেছে সেই উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করতে। সব মিলিয়ে প্রায় শ তিনেক লোক হবে। তাদের অনেককে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, আবার এমন অনেক লোক এসেছে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। খবর পেয়ে অনাহূত এসেছে তারা।

নিবারণবাবুর ছেলেরা সকলের জন্যেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়ন করা হলো।

তারপর খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেল তিনটের সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হলো। দেখলাম বাড়িটা বিরাট। সাত লাখ টাকার তৈরি বাড়িটা। তখনকার দিনে সাত লাখ টাকার দাম ছিল অনেক। বাড়িটার সামনে শ্বেত পাথরের ওপরে কালো অক্ষরে লেখা আছে:

'নিবারণ আশ্রয় সদন
উদ্বোধকঃ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ সরকার।'

আর ঠিক তলায় ছোট ছোট অক্ষরে উদ্বোধনের সাল তারিখ লেখা আছে।

সভা বসলো ঠিক চারটের সময়ে। আমাকে উদ্বোধনের বিষয়ভুক্ত কিছু ভাষণও দিতে হলো। তারপর নিবারণচন্দ্র বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বললেন। নিবারণবাবুর ছেলেদের পিতৃভক্তি সম্বন্ধেও কেউ কেউ বললেন।

দিবাকরবাবু আমাকে হোটেল বিজয়ে'র মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্যবসায় লাভ না হওয়াতে হোটেল অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন বেতোড় ছেড়ে বর্ধমানে গিয়ে আবার 'হোটেল বিজয়' খুলে সেখানেই থাকেন। নিবারণবাবুর ছেলেদের নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনিও বেতোড়ে এসেছেন। নাম বিভাস দত্ত।

আমি বললাম—আপনার হোটেলেই তো নিবারণবাবু সেদিন রাত কাটিয়েছিলেন?

বিভাসবাবু বললেন—হ্যাঁ। সেদিন রাত্রে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমি তা জানতাম না। আবদুল মোমিনই তাকে আমার হোটেলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যায়।

আমার সঙ্গে 'হোটেল বিজয়ের' মালিক কথা বলছিলেন।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—ওই যে আবদুল মোমিন দাঁড়িয়ে আছে—

বলে তিনি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন—ও আবদুল, ও আবদুল—

আমি দেখলাম দূরে একজন লোক ডাক শুনে এদিকে তাকালো। তারপর বিভাসবাবুর ডাকে কাছে এলো।

দেখলাম লোকটার অনেক বয়েস। একমুখ পাকা দাড়ি। মাথার চুলও সব পাকা। ময়লা জামা-কাপড় লম্বায় খাটো। দেখে বোঝা যায় প্রায় আশি বছর বয়েস হবে।

বিভাসবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম আবদুল মোমিন না?

লোকটা বললে—হ্যাঁ হুজুর—

বিভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মনে আছে তুমি একদিন রাতে নিবারণবাবুকে আমার হোটেলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে? মনে পড়ে তোমার সে-কথা?

আবদুল বললে—হ্যাঁ হুজুর, মনে পড়ে।

—তুমি কি করো?

আবদুল বললে—তখন আমি রেলগাড়িতে চানাচুর ফেরি করে বেড়াতুম। এখন ছেলেরা কাম-কাজ করছে, তাই আমি আর কিছু করি না—

—তোমার বাড়ি কোথায়?

আবদুল বললে—গুস্‌করায়—

—তুমি এখানে বেতোড়ে এসেছ কেন?

—খবর পেলুম যে এখানে বাবুদের মিটিং হবে, খেতে পাওয়া যাবে। তাই এসেছি—

—তুমি নিবারণবাবুকে কি আগে চিনতে?

আবদুল বললে—হ্যাঁ বাবু, তিনিও ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন. আর আমিও চানাচুর ফিরি করতুম। তিনি অনেকবার আমার কাছে চানাচুর কিনেছেন। তাই মুখ চেনা ছিল আমার। আমি তাঁর নাম জানতুম না আর তিনিও আমার নাম জানতেন না—

বিভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী জন্যে নিবারণবাবুকে আমার হোটেলে ভর্তি করে দিলে? কি জন্যে হোটেল ভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা দিলে? আবার ডাক্তার ডেকে এনে ওষুধপত্র কিনে দিলে? কেন অতো কাণ্ড করলে? তোমার স্বার্থ কি ছিল?

আবদুল মোমিন বললে—আমার আবার কি স্বার্থ থাকতে পারে হুজুর। আমার কোনও স্বার্থই ছিল না।

—তাহলে নিবারণবাবুর জন্যে তুমি অতো টাকা খরচই বা করলে কেন. আর ডাক্তার ডেকে তাকে ওষুধ কিনে খাওয়াতে গেলে কেন?

আবদুল মোমিন বললে—হুজুর, আমি যে ট্রেনে আসছিলুম. সেটা একদিন হঠাৎ এই বেতোড়ে এসে থেমে গেল। আর চললো না। সামনের স্টেশনে নাকি একটা রেলগাড়ি লাইন থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি তখন চা খাওয়ার জন্যে প্ল্যাটফরমে নামলুম। চা খাওয়ার পর দেখলুম একজন ভদ্রলোক সাইকেল নিয়ে তাতে চড়বার চেষ্টা করছে। ওদিকে তখন অঝোরে বর্ষা চলছে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম—এই বৃষ্টির মধ্যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বললেন যে তিনি যাবেন সজনেখালিতে। আমি বললুম—সে তো এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরে। যাবেন কী করে? রাস্তাঘাট তো সমস্ত ডুবে গেছে—

তিনি বললেন-যেতেই হবে। এখানে আমার থাকবার মতো আশ্রয় নেই। আমার খুব জ্বর হয়েছে—

বললাম—তাহলে এখানকার 'হোটেল বিজয়'তে এক রাতের জন্যে থাকুন না—

তিনি বললেন—হোটেল থাকলে পাঁচ টাকা ঘর ভাড়া দিতে হবে। আমার কাছে একটা পয়সাও নেই—

তখন বললাম—আমার কাছে টাকা আছে. চলুন আমি আপনাকে ধরে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি—

বলে তাঁকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলুম। তারপরে গাড়িতে একজন ডাক্তারবাবু ছিলেন। তাঁকে গাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে নিবারণবাবুকে দেখালুম। ডাক্তারবাবুর কাছে ওষুধও ছিল, তাও খাইয়ে দিলুম। আর তারপর যখন গাড়ি ছাড়লো

তখন আবার গুসকরায় চলে গেলুম। তার পরের দিন বেতোড়ে এসে হুজুরের কাছে খবর নিয়ে জানলুম যে তিনি পরের দিন সকালবেলা ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

বিভাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর নিবারণবাবুর সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

আবদুল মোমিন বললে—দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা হয়নি।

—কেন, কথা হয়নি কেন?

আবদুল মোমিন বললে—কথা বলবার সময় কোথায় পাবো হুজুর? আমাকে তো চানাচুর বেচবার জন্যে চলন্ত গাড়ি থেকে নামা-ওঠা করতে হতো? যতোক্ষণ কথা বলবো ততোক্ষণ কয়েক প্যাকেট চানাচুর বেচলে দু'টো পয়সা হবে আমার—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর তাছাড়া, তখন তো আমার বয়েস হয়ে গিয়েছিল। আর ততোদিনে আমার ছেলেরাও বড় হয়ে উঠেছিল। তারাই তখন রোজগার করতে শুরু করেছে—তারা আমাকে কাজ করতে বারণ করে দিলে। তখন থেকে আমি ঘরে বসে থাকি। আজকে এই বাড়ি তৈরির খবর পেয়ে বর্ধমান থেকে এখানে এসেছি—

বিভাসবাবু বললেন—শুনলেন তো, এই গরীব লোকটা সেদিন নিবারণবাবুকে নিজের মেহনত করা টাকা খরচ করে না বাঁচালে, তার ছেলেরাও মানুষ হতো না, আর এই 'নিবারণ আশ্রয় সদন' তৈরির ব্যবস্থাও হতো না, আর আপনাকেও এত দূর থেকে কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে আসতে হতো না।

দিবাকরবাবুও এতক্ষণে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনছিলেন। সব শুনে আবদুল মোমিনকে বললেন—তাহলে তুমিই সেদিন আমার বাবাকে বাঁচিয়েছিলে?

আবুদল মোমিন বললে—আমি বাঁচাইনি হুজুর, খোদাতাল্লাহ্ বাঁচিয়েছে। আমি কে? আমি কেউ নই! খোদাতাল্লাহ্ই সব....

ভক্তিভূষণবাবু বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন, আর আমি শুনছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

ভক্তিভূষণবাবু বলতে লাগলেন—আমি আমার হাইকোর্টের জজীয়তি চাকরিতে অনেক ফরিয়াদী অনেক আসামীকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। অনেক নিরপরাধ লোকও আমার হাতে শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু তখন আমি ছিলুম নিরুপায়। তবে সেদিন সেই বেতোড়ে গিয়ে আমি আর জজ রইলুম না, আমি সেদিন আবার মানুষ হয়ে উঠলাম।

এখন যদি কখনও সেই বেতোড়ে যাও তো সেই 'নিবারণ আশ্রয় সদন' দেখতে পাবে। সেখানে এখনও যারা গিয়ে আশ্রয় নেয় তাদের কোনও ঘর ভাড়া দিতে হয় না। তিন দিন তারা বিনা ভাড়ায় খেতে পায়, থাকতে পায়, আর দেখতে পাবে বাড়িটার সামনের দিকে এক শ্বেত পাথরের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছেঃ

"নিবারণ আশ্রয় সদন
উদ্বোধক—হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি
শ্রীভক্তিভূষণ সরকার।"

আর দেখবে তার নিচে ছোট-ছোট অক্ষরে উদ্বোধনের সাল, তারিখ লেখা আছে।

কিন্তু আসলে ওটা মিথ্যে কথা। আমি তো ওটা উদ্বোধন করিনি।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? আপনিই তো ওটা উদ্বোধন করতে বেতোড়ে গিয়েছিলেন।

ভক্তিভূষণবাবু বললেন—গিয়েছিলাম বটে উদ্বোধন করতে। কিন্তু আসলে আমি উদ্বোধন করিনি। উদ্বোধন করেছিল সেই চানাচুর ফিরিওয়ালা আবদুল মোমিন।

—সে কি? কেন? শ্বেত পাথরের ওপর আপনার নাম উদ্বোধক হিসেবে রয়েছে,

আর উদ্বোধন করলে কিনা চানাচুর ফেরিওয়ালা আবদুল মোমিন?

ভক্তিভূষণ সরকার বললেন—এইটাই তো বর্তমান যুগের পাপ। আমি 'সত্যমেব জয়তে'র তলায় বসে চাকরি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আইনের বেড়াজালে আটকে গিয়ে পাপ করে গিয়েছি, আর জীবনের শেষে এসেও সেদিন আর একটা পাপের ভাগী হয়ে রইলাম। এই জীবনের ট্র্যাজেডি!

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? কেন এরকম হলো?

ভক্তিভূষণবাবু বলতে লাগলেন—সেদিন আবদুল মোমিনের কথা শুনে আমিই সেখানে উদ্বোধন করতে আপত্তি তুললাম। বললাম—নিবারণবাবুকে যিনি একদিন নিঃস্বার্থভাবে বাঁচিয়েছিলেন সেই আবদুল মোমিন সাহেব এখানেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তাঁকেই এই নিবারণবাবুর নামাঙ্কিত সদনের উদ্বোধক হওয়ার সম্মান দেওয়া উচিত। আমার কথাতে অনেকেই আপত্তি তুললেন। তাঁরা বললেন—আপনি হলেন হাইকোর্টের একজন মহামান্য বিচারপতি, আর ও হলো একজন গরীব চানাচুর ফিরিওয়ালা। ওর নাম কেন সদনের সঙ্গে জড়িত থাকবে! কিন্তু আমি কারো কথা শুনলাম না। আমিই জোর করে আবদুল মোমিনকে ডেকে তার হাতে কাঁচিটা দিলুম। বললাম—আপনিই সদনের দরজা লাল ফিতেটা কাটুন। আবদুল মোমিন প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হয়ে আপত্তি করতে গিয়েছিল, কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে সে শেষ পর্যন্ত কাঁচি দিয়ে লাল ফিতেটা কাটলো আর আমি দিবাকরবাবুকে বলে এলুম যে ওই শ্বেত পাথরের ওপর থেকে আমার নামটা কেটে ওই জায়গায় আবদুল মোমিনের নামটা বসিয়ে দেবেন।

কিন্তু আজ যদি কখনও ওই বেতোড়ে যাও তো দেখবে শ্বেত পাথরের ওপর এখনও আমার নামটাই জ্বল-জ্বল করছে, আবদুল মোমিনের নাম কোথাও নেই। আশ্চর্য, এমনই যুগ আমাদের যে মিথ্যেটা চিরকালের মতো সত্যি হয়ে রয়ে গেল, ওই 'সত্যমেব জয়তে'র মতন।

বারো

শেষ রাতের দিকে সদানন্দ রায়ের একটু তন্দ্রা এল।

শীতের রাত। কাশতে-কাশতে সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। শেষ রাত্রের চাঁদের আলো ফেটে পড়ছে পৃথিবীতে—সদানন্দ রায়ের দেউড়ীতে, অন্দর মহলের উঠোনে—আর তাঁর শোবার ঘরের মেঝেয়। তাঁর মনে হলো—পাশের হলঘর যেন অনেক নারী আর অনেক পুরুষের কণ্ঠে সচকিত হয়ে উঠেছে। সেই মাঝখানে ওস্তাদজীর সারেঙ্গী, ঢিমে আর মিঠে লয়ের তবলা, আর আসর জুড়ে নাচ। একটা মেয়ে নেচে-নেচে ক্লান্ত হয়, আর একটা আসে। অফুরন্ত নাচ—অফুরন্ত হাসি—সদানন্দ রায়ের বাগান বাড়ীতে ছিল জীবনের সম্পূর্ণ পূর্ণতা।

ঘুমের মধ্যেই সদানন্দ চীৎকার করে উঠলেন—কে—কে—কে—

তা'র মনে হলো যেন হঠাৎ যোগমায়া এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই আগেকার মতন প্রতিদিন সকালবেলায়—স্নান করে উঠে ভিজে চুলে। সারারাত্রি জেগে অত্যাচার করে সকালের দিকে ঘুমোতে সুরু করতেন সদানন্দ, তারপর ঘুম ভাঙতো দশটার সময়। যোগমায়া পাশে এসে ডাকতো না—শুধু পাশে এলেই সদানন্দ'র ঘুম ভেঙে যেতো। এক একদিন যোগমায়ার চোখ দিয়ে জল পড়তো—আড়ালে, গোপনে। পিতৃ-পুরুষের সমস্ত গৌরব, সম্মান, মর্যাদা, শিক্ষা সব তুমি নষ্ট করলে? চোখে বোধহয় তার ভাষা ছিল।

ওই যে ওই ছ'শো বাড়ী—ওগুলো এক-এক করে সদানন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যেন উই এর ঢিবি—দেখতে-দেখতে গাছপালা বন মাঠ সব ঢেকে ফেললে। উইয়ের ঢিবি না তো কী? সদানন্দ রায়ের বিরাট বাড়ীর পাশে ওগুলো তা উই ঢিবিই। হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করে। ওরা বলে পোর্টিকো, ওরা বলে গ্যারেজ, ওরা বলে ব্যালকনি—কনক্রীট আর জয়েন্ট, সিমেন্ট, লোহা। সামার-হাউস কিচেন গার্ডেন, বাবুর্চি, খানসামা আউটহাউস। সদানন্দ রায়ের আস্তাবল বাড়ীর সঙ্গেই তুলনা হয় না কি।

তিনশো বিঘে জমি। জমি নয়—জমিদারী।

কলকাতার উপকণ্ঠে এতখানি জমি। একতাল হীরে। ঘোড়ার গাড়ী টগবগ করে আসতো সকালবেলা। দু'পাশ থেকে দু'জন সহিস এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতো। তখন আস্তাবল বাড়ীর চারপাশে ছিল লিচুগাছের জঙ্গল। ঘোড়া দু'টোকে নিয়ে যেতো দলাইমলাই করতে—আর সদানন্দ রায় আসতেন এই হলঘরে। এই ঘরের দরজা দিয়ে তখন দিগন্তসীমা পর্যন্ত দেখা যেত চারদিকে। উত্তরে ছিল মস্ত দশ বিঘে আয়তনের এক ঝিল। আর চারদিকে ছিল বাগান—ফলের, ফুলের, পাতার, লতার আর পাখীর আর পাখীর গানের। তত পাখীও বোধহয় আজকাল নেই আর। ফুলের নেই সুবাস, ফলের নেই সেই স্বাদ। তখন এখানে সন্ধ্যার পর শেয়াল ডাকতো। কিন্তু সেদিন

আর নেই......

সেদিন বিকেল বেলা। বাইরে কেউ ডেকে উঠলো—সদানন্দ বাবু আছেন?

লোকটিকে একেবারে বৈঠকখানার ভেতরে ডেকে আনা হলো।

—কিছু জমি কিনতে চাই আমি। বসবাস করবো—

—কতখানি চাই?

—এই বিঘে খানেক—

—পাঁচশো করে কাঠা পড়বে—

তা'তেই রাজি। একখানা বাড়ী হলো। সন্ধ্যেবেলা একটা প্রতিবেশী পাওয়া গেল।

তারপর আর একদিন—হাজার করে কাঠা পড়বে—

তা'তেই রাজি! তারপর আর একদিন—দু'হাজার করে পড়বে—

লাফিয়ে পাঁচ হাজার, ছ হাজার, সাত হাজারে বাড়লো। আর একতিল জমি নেই। দেখতে-দেখতে বন বাগান হলো শহর—আর সঙ্গে-সঙ্গে এল পাওয়ার হাউস, ওয়াটার পাম্প্, মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট! চেহারা গেল বদলে! ব্যরিষ্টার সেন এল, এল নৃত্যকুশলী প্রমীলা মৈত্র, এল গভর্ণমেন্ট অফিসার প্রশান্ত মিত্তির—সিনেমা ষ্টার উৎপল দাশ—শেয়ার ব্রোকার পরিমল চ্যাটার্জি—ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুশীল সেন—ইংরেজীর প্রফেসর মিহির ভট্টাচায্—ইত্যাদি-ইত্যাদি! সকলকে রায়-জ্যাঠা চিনতে পারেন না! এ-যুগের ছেলেদের মুখ চিনে রাখা কত শক্ত! কত বিচিত্র পাঞ্জাবী, পায়জামা, সালোয়ার, সেরোয়ানী, সুট্ আর টুপী! তেজ যেন সব ফেটে পড়ছে! গাড়ী, বাড়ী টেলিফোন, ফ্যান, রেডিও, জর্জেট আর সিল্কের তেজ! দু'চোখ জ্বলে যায়!

—কে?

প্রদীপ্তকে রায়-জ্যাঠা চিনতে পারেন নি! দুপুর রোদে চোখে 'স্নানগ্লাস' লাগিয়ে গেলে চিনতে না পারারই কথা!

—আমি জ্যাঠামশাই—আমি প্রদীপ্ত নত হ'য়ে বললে।

—তা' এই রোদে ছাতা নাও নে কেন। ওই তোমাদের দোষ, আজকালকার ছেলেরা কী যে হয়েছে—শুক্‌নো একটু সহানুভূতি মেশানো উপদেশাত্মক হাসি হাসলেন। আজকালকার ছেলে বুক ফুলিয়ে চলে—কিছুকেই কেয়ার নেই! ওই বিশ থেকে বত্রিশ হবে—বত্রিশ থেকে বেয়াল্লিশ—বেয়াল্লিশ থেকে বাহান্ন—বাহান্ন থেকে বাষট্টি—তারপরই ব্যস!

সন্ধ্যাবেলা হলঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সদানন্দ রায়ের চোখ জ্বলে ওঠে! সমস্ত "ইন্দ্রানী পার্ক" এ যেন দাউ-দাউ করে' আগুন জ্বলছে! অর্থের আর ঐশ্বর্যের, যৌবনের আর জয়োল্লাসের আগুন। সদানন্দ রায়ের চোখে ধাঁধাঁ লাগে! ওই জমি, ওই ঐশ্বর্য তার গর্ব—ও তো সদানন্দ রায়েরই জন্যে! নিজেরই সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাড়ি উঠেছে তাঁরই জমির ওপর, আর তাঁর বুকখানা ফুলে উঠছে! একদিন তো সবাই তাঁরই বিজয় ঘোষণা করবে! বাছাই করা বড়লোক—আর বাছাই করা আধুনিক শিক্ষিত লোক দিয়ে গড়া তাঁর এই ইন্দ্রানী পার্ক।

কিন্তু তা-তো হয়নি। চারদিকে যখন দীপ জ্বলে উঠতে লাগলো, কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর ঘরে ঘনিয়ে উঠলো অন্ধকার! যোগমায়া আজ নেই! দুঃখের শেষ হয়েছে একদিন! একটার পর একটা ছেলে জন্মেছে আর মরেছে।

—খোকা আছিস্—খোকা'?

প্রতিধ্বনি ঘর থেকে ঘরে আঘাত করে ফিরলো। চামচিকে, পায়রা আজ সারা বাড়ীটায় অখণ্ড আধিপত্য চালিয়েছে! খোকাও কি মানুষ হলো! কোথায় যে থাকে সারাদিন—কী যে করে—কখন যে আসে—কখন যায় কে বলতে পারে।

ফাটা সিমেন্টের মেঝের ওপর কার যেন পায়ের শব্দ হলো! সদানন্দ রায় পেছনে ফিরলেন—বিশু—

বিশু সামনে এসে দাঁড়াল।

—ঝাঁট্ দিচ্ছিস? ভাল ক'রে ঝাঁট দে, বড্ড ধুলো হয় ঘরে—আর সরকারবাবুকে একবার ডাক তো—

সদানন্দ দম নিতে লাগলেন। এক সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারেন না, দম আটকে আসে। সামনের দেয়ালটা জল লেগে লেগে স্যাঁতসেঁতে দাগে ভরা—তারই পাশে একটা বিরাট ছবি। বহুকালের আগেকার অয়েল পেন্টিং। সোনালী ফ্রেম আর চেন দিয়ে ঝোলানো। সারা দেয়ালের গায়ে সারি-সারি ছবি টাঙান—নগ্ন নরনারীর বিচিত্র প্রদর্শনী। এইটিই ছিল নাচঘর। এখানে কারুরই আসবার অধিকার ছিল না। এমনকি যোগমায়া পর্যন্ত না! রাতের পর রাত কাটতো সদানন্দের এই নাচঘরে—আলমারীতে থাকতো সুরা—তার সামনে থাকতো নারী। কত বিচিত্র নারী—কত বিচিত্র সুরা—কত বিচিত্র ইতিহাস! সদানন্দ রায়ের হাসি আসে—হাসি আসে ওদের তেজ দেখে। কী নিয়ে তেজ করে! তার যা ছিল—ওদের তা' কারুরই নেই! এক পেগ হুইস্কী খেয়ে যারা তাল সামলাতে পারে না—তাদের আবার গর্ব!

—আমায় ডাকছিলেন আপনি—সরকার সন্ত্রস্তপদে এসে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁ বলছিলাম কি, সেই মাড়োয়ারী বাচ্চা আর এসেছিল?

—আজ্ঞে এখনও এসে বসে আছে?

—কি চায়?

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—বলে দাও—দেখা হবে না। আমার শরীর খারাপ, আর শোন—

সদানন্দ রায় একটু দ্বিধা করলেন। দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁরই জমিতে বাস করে তাঁকেই তারা উৎখাত করতে চায়! বললেন—তারা এসেছিল? সেই তারা?

ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট হলেও সরকার বুঝতে পারলে—আজ্ঞে এসেছিল—

—কে-কে—সদানন্দ রায় জিগ্যেস করলেন।

—ওরা সবাই। ব্যারিষ্টার সেন, প্রশান্ত মিত্তির, এখানকার সবাই এসেছিল। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। বললে, একটা হাই স্কুল করতে চায় এ-ব্যাপারে। আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—বললে পাঁচশো টাকা ভাড়া দেবে মাসে—

—থাম, থাম, শুনেছি—চীৎকার করে উঠলেন সদানন্দ। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়তে হবে তাঁর এই বাড়ী! ছোটলোকের স্পর্ধা আজ সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে।

সদানন্দ রায় বললেন—এদিকে এস সরে—ওই দেখ—

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে সদানন্দ বলতে লাগলেন—ওই আস্তাবল বাড়ী দেখছ—ওইখানে ছিল লিচুবন—তুমি দেখনি—তোমার বাবা সব জানতেন—আর ওই উত্তর কোণে ছিল দশ বিঘে একটা ঝিল—আর যত সব উইটিবির মত বাড়ী দেখছ—ওগুলো ছিল বাগান, একশো আট রকমের আমগাছ ছিল—পূব দিকে ছিল কমলা লেবুর বাগান—আর—আর—

সদানন্দ রায় হাঁফিয়ে উঠলেন। খানিকদম নিয়ে বললেন—আর আজ ওরা আমাকে এ-বাড়ী থেকে হটিয়ে দিতে চায়! আমার নিজের বাড়ীতেও আমার অধিকার নেই? তুমি কি বললে তাদের?

—বললাম, হুজুরের শরীর খারাপ, এখন দেখা হবে না!......

—এর পরে যেদিন আসবে, চৌধুরীকে ব'লে দিও যেন লাঠিপেটা ক'রে তাড়ায়।

জিগ্যেস করলে বলো আমার হুকুম!......

সরকার দাঁড়িয়েছিল। সদানন্দ বললেন—যাও—আর শোন, মাড়োয়ারী বাচ্ছাকে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো—বিকেল পাঁচটায়।

সরকার চলে গেল। একলা বসে-বসে সদানন্দ রায়ের মনে হলো—আর বোধ হয় তিনি নিজেকে রাখতে পারলেন না। বোধহয় সব যাবে। সুদে-আসলে দেনা যে তাঁর অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে! যাক্—কার তোয়াক্কা তিনি করেন? যোগমায়া মরে বেঁচেছে—আর খোকা? সে তো এ-বাড়ীর ছেলে নয়! হাই স্কুল করে কি হবে! মাড়োযারীরাই পারবে—ওরাই পারবে!

বিকেলবেলা সদানন্দ রায বসেছিলেন নাচঘরের ভেতর। সতর্কপদে খোকা এসে দাঁড়াল। সদানন্দ রায বুঝতে পারলেন। বললেন কি চাই? টাকা।

খোকা কোন কথা বললে না।

—তা আমি বুঝেছি—কিন্তু হাতে আমার টাকা নেই—

সদানন্দ রায়ের চোখের সামনে যোগমাযার ছবিটা ফুটে উঠেছে। তুমি তো জানো খোকা আমার কত সাধের ছেলে, কত সাধনা করে, কত তপস্যা করে ওকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু আমি কি করবো! তুমিই বা কি করতে? আমি আর কিছু রাখতে পারবো না যোগমায়া, সব যাবে! বোধহয় এককণা জমিও রাখতে পারলাম না। মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকুও বোধ হয় হারাতে হয় এবার। আমাদের বংশেব রক্তে যে ঘুণ ধরেছে!

সদানন্দ আবার বলতে লাগলেন—মানুষ তো তুমি হ'লে না খোকা, আমিও হইনি। এব জন্যে একদিন আমারই মতন তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে—কিন্তু আমি আর তোমাকে সাহায্য করতে পারলো না....

খোকা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিযে গেল। সদানন্দ তাকে আব ডাকলেন না। সামনের দিকে দেযালের গাযে বিরাট ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোন্ নিলেম থেকে কেনা বিলিতী ছবি একটা। একটা বিরাট গ্লোবের ওপর একটা লোক উঁচু দিকে চেয়ে দাঁড়িযে আছে। দু'টি পা তার লোহার চেন্ দিয়ে গ্লোবের সঙ্গে বাঁধা; গ্লোবে আগুন লেগেছে—দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে—আর মাথার ওপর শকুনিব দল তাকে ছেঁকে ধরেছে—তার সেই অসহায আর্ত কাতর অবস্থা দেখে সদানন্দ আজ কেমন আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন। ছবিটা অনেকবার দেখা—কিন্তু আজ যেন ওটাকে নতুন দৃষ্টি দিযে দেখলেন। দূরে বোধহয় সূর্য উঠছে—কে জানে কোন আশার বাণী ও বয়ে আনবে—কিন্তু পৃথিবীতে তার কোনও আশ্রয় নেই। অনেকবার দেখা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে চেয়ে সদানন্দ রায়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

সরকাব এসে জানালে—সেই মারোয়াড়ী এসেছে—

—এখানে নিয়ে এস—সদানন্দ রায় ইঙ্গিতে জানালেন।

খানিকক্ষণ পরেই মারোয়াড়ীটা এল। কাছে আসতেই সদানন্দ রায়ের সামনে ছাদ থেকে একটা টিকটিকি থপ করে মেঝেতে পড়েই কিলবিল করে দেযাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কী আশ্চর্য! সদানন্দ রায়ের সমস্ত শরীরটা শিরশিব করে উঠলো।

বললেন—আসুন শেঠ জি!

শেঠজি বিরাট ভুঁড়ি আর পাগড়ু নিয়ে সামনের স্প্রিংএর চেয়ারে স্থির হ'য়ে বসল।

সদানন্দ বললেন—কী চাই আপনার, গুছিয়ে বলুন তো—

শেঠজি বললে,—হুজুরের সরকারকে আমি সবই বলেছি—আমি আপনার এই তের বিঘে জমিটা কিনতে চাই—আপনি যা দাম চান দেব—হুজুরের কৃপায় আমি চারটে মিলের মালিক দু'টো জুট আর দুটো কাপড়ের মিল—এখন আপনার মেহেরবানি—

সদানন্দ রায় স্থির দৃষ্টিতে বাইরের জানালা দিয়ে দূর দিগন্তবলয়ের দিকে চেয়ে রইলেন—যেন বিনিদ্র শ্মশানপাল দয়ামায়ালেশহীন দৃষ্টিতে আপনার রাজ্য-সীমা নিরীক্ষণ করছেন। বহু দূরে রেল লাইনের ওপারে মন্দা তালগাছের বন, ফল হয় না, এক কাঁড়ি জটায় আচ্ছন্ন স্থির হয়ে আছে। তার পাশে গঙ্গার দু'ধার দিয়ে পিপুল আর পিটুলি গাছের ছাড়া ছাড়া সারি—প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছে অনাদিকাল ধরে। অবলোকিতেশ্বর বোধ রায় যেন তাদেরই একজন। তাদেরই মত অধিকারহীন—কিন্তু অভিযোগশূণ্য নয়!

সদানন্দ রায়ের গলা থর থর করে কাঁপতে লাগলো। বললেন—এ জমিটা আপনি কি কাজে লাগাতে চান?

শেঠজি বললে—আমি বাবুজি এখানে একটা ময়দার কল—আর ভেজিটেবিল ঘিয়ের কারখানা করবো মনে করেছি.......কাছাকাছি রেল লাইন আছে, গঙ্গা আছে—আমার ভারী সুবিধে হয়—

সদানন্দ রায় হঠাৎ একটা আচমকা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রাণী পার্কের লাল রাস্তা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে মোটরের আসা যাওয়া......কংক্রীটের ষ্ট্রীমলাইন, বাড়ীর ভেতর ষ্ট্রীমলাইন, মানুষের চলা-ফেরা আর সবার ওপর অর্থ আর স্বাচ্ছল্যের ঔজ্জ্বল্য......সদানন্দ রায়ের জরাজীর্ণ চোখ আর মনের ওপর কি অপরিসীম অত্যাচার!

দুটো চোখ শ্বাপদের মত তীক্ষ্ণ করে বললেন—এক কাজ করতে পারবেন শেঠজি? তাহলে খুব সস্তায় আমি সমস্ত জমিটা ছেড়ে দিতে পারি—পারবেন?

শেঠজি নিকটতর হয়ে বলল—ফরমাজ করুন হুজুর!

সদানন্দ রায় বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বলি—শেঠজি, এই যে জমিদারী দেখছেন—তিনশো বিঘের জমিদারী—এটা সাতশো লাটের একটা। হরিপালের মহারাজ গৌরীকান্তের নাম শুনেছেন—আমাদের আদি পূর্বপুরুষ গৌরীকান্ত, তাঁর শেষ বংশধর আমি আজ এই তেরো বিঘে জমির মালিক।..........আজ পৈত্রিক ভিটে বেচতে বসেছি—আমরা বাঙালী নই—কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ—বাঙলাদেশে এসে বাঙালী হয়ে গেছি......আমি সেই বংশের শেষ কলঙ্ক।

সদানন্দের গলাটা দম আটকে আড়ষ্ট হয়ে এল। খানিকক্ষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগলেন—চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো দুঃখে আর অপমানে আর আত্ম-অনুশোচনায়—

শেঠজী বললে—আমি সব শুনেছি আপনার সরকারবাবুর কাছে...

তারপর সদানন্দ রায় বলতে লাগলেন পূর্বপুরুষের ইতিহাস।

মহারাজ গৌরীকান্ত ছিলেন মেষপালক। গরু মোষ আর ভেড়া নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরতেন—আর আড় বাঁশী বাজাতেন। হিন্দুস্থানী ছেলে—পরণে নেংটি—খালি গা—খালি পা—বিদেশে এসেছিলেন ভাগ্য-পরীক্ষায়! তেষ্টা পেলে পুকুরের জল খেতেন—আর রোদবৃষ্টিতে গাছের তলায় আশ্রয় নিতেন! সাতশো বছর আগেকার কথা! চালের মণ ছিল চার আনা— কিন্তু সেই সস্তা ভাতের জন্যে দাসত্ব করতে কাজ করেন গয়লার। সন্ধ্যেবেলা গাছতলায় কাঠের আগুনে নিজের হাত পুড়িয়ে খাবার করে নিতে হোত নিজের হাতে—ব্রাহ্মণের ছেলে তো আর নিচু জাতের ছোঁয়া খেতে পারেন না—

তারপর একদিন কৃপা হলো দেবতার। এক অশ্বত্থ গাছতলায় শুয়ে আছেন—এমন সময় ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল—চোখ চেয়ে দেখলেন একটা দুধে গোখ্রো মাথার ওপর এক হাত উঁচু হয়ে ফণা তুলে দুলছে—আর মুখ দিয়ে ওই শব্দ বার করছে! কী আশ্চর্য! কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না তিনি—নিঃশব্দে বাঁশীটা তুলে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন—; তিনি বাজান্—আর সাপও তত দোলে—! কতক্ষন বাজালেন মনে

নেই—শেষে সেই পথ দিয়ে এক সন্ন্যাসী যাচ্ছিল—সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ—তিনি ওই দেখেই থমকে দাঁড়ালেন—তারপর মন্ত্রবলে সাপটাকে ধরতেই সাপটা কেঁচোর মতন নরম হয়ে গেল। সন্ন্যাসী সাপটাকে নিয়ে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তারপর সন্ন্যাসী গৌরীকান্তর কাছে এসে বললেন—তুই বেটা রাজা হবি—বলে তাঁর ঝুলি থেকে একটা শালগ্রাম শিলা বার করে বললেন—রত্ন রেখে দে—এর সেবা করিস—রাজা হবি।

গৌরীকান্ত রাজা হ'লেন—মহারাজা হলেন। যা'তে হাত দেন সোনা ফলে—লাটে ওঠা জমিদারী কেনেন—আর মাটির জমিদারী সোনা ফলায়। দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করলেন—মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন—বারো মাসে বিরাশি পার্বন—অতিথিশালা করলেন—অন্নসত্র করলেন—পুকুর করলেন—সেই বংশ বাড়তে বাড়তে এসে প্রথম হোঁচট্ খেল দু'শো বছর আগে—অন্নদাকান্তর সময়ে—প্রথম ইংরেজ আমলে—। অন্নদাকান্ত বাপের এক ছেলে—তিনি মদ ধরলেন—আর আনুষঙ্গিক সব কিছু! ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মিশে পুরো ম্লেচ্ছ হ'য়ে গেলেন—অতিথিশালায় অতিথি এসে ফিরে যায়—পুকুরে শ্যাওলা পড়ে মজে যায়—শালগ্রাম শিলার নিত্য পুজো হয় না—শহরে এসে বাগানবাড়ী করলেন—ইয়ারেব দল জুটলো—ইংরেজীনবীশ ম্যানেজার এল—গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বাড়ীতে ভিক্ষে করতে এলে তা'কে ধ'রে গোঁফ দাড়ী মাথা কামিয়ে দিয়ে গরুর মাংস জিভে ছুঁইয়ে দেন—তারপব চাকা আর ঘোরে না—জের চললো বহুদিন—তারপর জমি গেল—জমিদারী গেল—-থাকলো শুধু এই বাগানবাড়ীর তিনশো বিঘে জমি—সেই ভাঙনের শেষ ধাপে জন্ম হোল আমার— সেই মহারাজা গৌরীকান্তর বংশের ঘুণ ধরা রক্তে যেটুকু ঘুণ ধরতে বাকী ছিল—তা' সম্পূর্ণ করলুম আমি—সদানন্দ রায়—আজ তেবো বিঘে বাগানবাড়ীর মালিক—

শেঠজি বললে—বাবুজি আমি এখানে আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো—আবার এখানে সোনা ফলবে—আপনি দেখে নেবেন—

সদানন্দ কথা বলে হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন —ওই সামনে চেয়ে দেখুন ওই যে আস্তাবল বাড়ী দেখছেন—ওইখানে ছিল লিচু বন—সেসব কেউ দেখেনি—যারা দেখেছে তা'রা আজ কেউ বেঁচে নেই—আর ওই উত্তর কোণএ ছিল ঝিল্—দশ বিঘে একটা ঝিল—আব ওই যত উঁই ঢিবির মত বাড়ী দেখছেন—ওইখানে ছিল বাগান—একশো আট বকমের আমগাছ ছিল—পূব দিকে ছিল কমলালেবুর বাগান—আব—আব—

সদানন্দ রায়ের দেয়ালের দি:কে নজর পড়লো। যে টিক্‌টিকিটা খানিক আগেই তাঁর সামনে মেঝের ওপর থপ্ করে পড়ে গিয়েছিল সেটা এখন নিচু মুখো হয়ে তাঁর দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চেয়ে আছে......আব গলার নলিটা ধুক্ ধুক করে উঠছে পড়ছে......সদানন্দ রায় ভয়ে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

শেঠজি বললে—আপনি দেখে নেবেন বাবুজি—আমি সোনা ফলিয়ে দেব এখানে—ভেজিটেবল ঘি—আর ময়দার কল বসাবো—আমি বিলেত থেকে কেমিষ্ট আনবো—সমস্ত জমি আপনার সোনা দিয়ে মুড়ে দেব—আর আপনি যদি চান আমি আমার ব্যবসার মুনাফা দেব—

সদানন্দ রায় শেঠজির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ের ওপব এঁটে বসেচে—মিলের ফুলপাড় ধুতি ফুঁড়ে দেহের চর্বি বেকচ্ছে মাথাব হলদে পাগড়ীর পাকে পাকে মাথার কেশবিরলতা ঢেকে দিয়েছে। হঠাৎ তাঁর মনে হোল—এ যেন সদানন্দ রায়েব পরমাত্মীয়।

সদানন্দ বললেন—এক শর্তে আমি আপনাকে দিতে পারি জমিটা—এখানে আপনি কারখানা খুলুন—খুলে ধোঁয়া আর ধুলো বয়লার আর স্টীম্ রোগ আর জীবাণু—সীসে গলান বিষ আর কয়লা জ্বালান কালিতে ভরে তুলতে পারবেন? পারবেন—কল আর

কুলিতে ছেয়ে ফেলতে—সড়কে আর মহামারীতে ভরে ফেলতে? পারবেন—ওদের মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিতে—ওই বাড়ীগুলোকে করতে পারবেন ব্যারাক—কুলি আর মজুরের ব্যারাক—আলো আর আগুন দেখে পোকার মতন ছুটে আসবে আর মরবে! পারবেন—ওদের তেজ ভাঙতে! বড় তেজ ওদের! তেজে ওরা ফেটে পড়ছে—পারবেন—পারবেন?

সদানন্দ রায় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শেঠজির হাত দুটো চেপে ধরলেন।

শেঠজি বিস্মিত হয়ে সদানন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সদানন্দ আবার হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—এমন কারখানা করুন যেন মানুষ একবারে মেসিন হয়ে যায়। রোজ সকাল বেলায় কারখানায় আসবে আর সন্ধ্যের সময় কুঁজো হয়ে বাড়ী ফিরে যাবে—রক্তের লাল রং কালো করে দিতে পারবেন—মুখ দিয়ে বেরুবে সাদা ফেনা আর মাথা দিয়ে ঝরবে কালো ঘাম! অবসর থাকবে না ভাববার—হাসবার—গান গাইবার—আর তেজ দেখাবার—পারবেন—পারবেন?

শেঠজি এক মুহূর্তে সব বুঝে নিল। বললে—এ আর এমন শক্ত কথা কি?

সদানন্দ রায় কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললেন—আপনিও বিদেশী, আমিও বিদেশী—বাঙলাদেশ কারুরই ঘর নয়—আমার এ জমি আমি আপনাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলাম—আমি এর জন্যে এক পয়সা নেব না! এমনিই দিয়ে দিলাম—

শেঠজীর চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল!

—তবে একটা কথা, সদানন্দ বললেন—মহারাজ গৌরীকান্ত যে ভুল করেছিলেন, সে ভুল আর করবেন না শেঠজি—বাঙলা আপনারও ঘর নয়, আমারও ঘর নয়—এখানকার আয় করা টাকা—এখানে ব্যয় করবেন না—আর যেখানে ইচ্ছে খরচ করুন—

শেঠজি বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি—

পাশের ঘরে বিশুর পায়ের শব্দ হলো। সদানন্দ রায় বললেন—বিশু, সরকারবাবুকে একবার ডেকে দে তো এখানে—

তারপর শেঠজি, দিকে ফিরে বললেন—এখনি তা'হলে একটা দলিলের মুসাবিদ করে ফেলা যাক্—

শেঠজি বললে—কি দরকার বাবুজি, কালই আমি আমার এটর্ণী নিয়ে আসবো—পাকা কাজ হয়ে যাবে।

সদানন্দ রায় বললেন—সেই ভাল।

শেঠজি বিদায় নিলে। সদানন্দ রায় কেমন আচ্ছন্নের মত দেয়ালের দিকে চাইলেন। চাইতেই নজরে পড়লো সেই ছবিটা পৃথিবীতে আগুন লেগেছে—পা দুটো বাঁধা ওপরে মাংস-লোলুপ শকুনের দল তাকে ছিঁড়ে খাবে—কোথাও আশ্রয় নেই তার! দূরে সূর্য উঠবে, তারই লাল আভা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত, সদানন্দ রায় আতঙ্কে দু'চোখ মুদ্রিত করলেন।

রাত না পোহাতেই আসবে মাড়োয়াড়ীর লোকজন। কুলি, মিস্ত্রি, মজুর।

আজ রাতে কি আর ঘুম হয় সদানন্দর! আর কেউ জানে না। ইন্দ্রাণী পার্কের লোক জন কেউই তো জানে না। সরকারের হিসেব মিটিয়ে দিয়ে তাকে বিদেয় করা হয়েছে। এ বাড়ী আর তার নিজের বলা চলে না। এ ক'দিন বাস করতে দিয়েছে এই-ই যথেষ্ট! আজ অনেক অনেক দিন পর খোকা এসেছে বাড়ীতে! পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। সদানন্দ রায় বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দেশলাই দিয়ে মোমবাতিটা জ্বালালেন, রবারের চটিটা খাটের পাশেই ছিল—পায়ে গলালেন সেটা! নিজের বাড়ীর বহু পরিচিত আবেষ্টনী আজ তাঁর কাছে যেন নতুন ঠেকলো। ওইখানে পূবদেয়ালে টাঙান আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে যোগমায়া প্রসাধন করতো! পশ্চিম দেয়ালে ছিল সিংহবাহিনীর একটি পট!

প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে চুল আঁচড়ে কপালে সিঁদুরের ছোট একটি টিপ পরে গলায় আঁচল দিয়ে ঐ ছবিটাকে প্রণাম করত যোগমায়া।

সদানন্দ একদিন বলেছিলেন—কেন প্রণাম করো ওটাকে?

যোগমায়া বলেছিল—তোমার কল্যাণের জন্যে, খোকার কল্যাণের জন্যে—আমার আর কি আছে বল?

গৌরীবেড়ের ঘোষাল বাড়ী থেকে যোগমায়াকে বউ করে আনা হয়েছিল। মহারাণী বংশ ঘোষালদের! যে বংশের মেয়েরা কখনও অন্দরমহলের বাইরে পা বাড়ায়নি, সেই বংশের মেয়ে যোগমায়া! সংসারের নানা কর্তব্যের মধ্যে যোগমায়াকে যখনি দেখেছেন সদানন্দ তখনি তাঁর অনুশোচনায় বুক ভরে উঠেছে—তাই একদিন সদানন্দ তাঁর মুখ দেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন—ঐ নাচ ঘরের ভেতরেই তাঁর দিনরাত কাটতো! আজ যোগমায়ার কথা মনে পড়তেই সদানন্দ কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন।

এক একটা ঘর পার হয়ে আসেন আর ঘরগুলোর ভেতর চাপা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন ঘরের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়! সারি সারি ঘর পেরিয়ে এসে একটা ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন—এখান থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি তেতলার ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। আর তারই দক্ষিণ দিকে একটা ছোট দরজা। দরজাটা খুলতেই একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে একেবারে নীচে একতলায় গিয়ে মিশেছে। এক হাতে মোমবাতিটা নিয়ে ধীরে ধীরে সদানন্দ রায় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। ছোট একটা কুঠরী—ওপারে ফরাসদের ঘর—আর এপারে বিশুর শোবার ঘর—মাঝখানে এই চোর কুঠরী। ঘরের কোণে একটা লোহার ডবল পাতের সিন্দুক। সদানন্দ রায় কুলুঙ্গীতে মোমবাতিটা রেখে সিন্দুকের ডালা খুলতে লাগলেন।

জীবনে অনেক অপব্যয় করেছেন সদানন্দ কিন্তু যোগমায়ার গয়নাগুলো সব ওই সিন্দুকের মধ্যে রাখা আছে। যোগমায়ার একটা গয়নাতেও সদানন্দ রায় হাত দেননি। বাপের বাড়ী থেকে আনা বিশ ভরির নেকলেসটা এখনও আছে; জড়োয়ার চুড় আর মানতাসা, বিছে আর সিঁথি—আর মার দেওয়া হীরের কান—সব ওর মধ্যেই আছে। কাল সকাল হতেই তাকে এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে! পথে দাঁড়াতে হবে একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে! ইন্দ্রাণী পার্কের সব লোক বিস্ফারিত চোখে দেখবে তাঁর এই নিঃস্বতার দৃশ্য! মহারাজ গৌরীকান্তের বংশধর শেষ জমিকণাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবে!

তিনটে চাবি খোলার পর তবে বড় ডালাটা খুললো! খুলতেই চকচক করে উঠলো সোনা আর জড়োয়ার গয়নাগুলো! পাশের ডালাটাও খুলে ফেললেন সদানন্দ! সেখানে ছিল মোহর—নবাবী আমলের মোহর আর রূপোর টাকা! বহু পুরুষের সঞ্চিত সব ধন—আজ বহুদিন পরে রাত্রির অন্ধকারে মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে আবার ঝলমল করে উঠলো।

একবার মনে হোল থাক এসব! এদের বহুদিনের ঘুম আর ভাঙিয়ে নিজের কলঙ্ক বাড়াবেন না। কিন্তু কেন জানিনা তাঁর ভারি লোভ হল! ওরা যেন যাদু জানে। সেই মধ্য রাত্রির অন্ধকারে সদানন্দ রায়ের মনে হলো যেন বহু যুগ-যুগান্তের ঘুমন্ত অত্মারা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে! ওদের চাপা হাসির ঝিলিক যেন তাঁর সর্বাঙ্গে ঠিকরে পড়ছে! মনে হলো তাঁর স্পর্শ পেলেই আবার যেন সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে! অহল্যার মত পাষাণ হয়ে আছে শুধু তার স্পর্শের অপেক্ষায়।

হাত বাড়িয়ে সদানন্দ রায় সমস্ত স্পর্শ করলেন! ঠাণ্ডা মৃত প্রাণহীন ধাতু-মৃত মমির মত শুধু কঙ্কালের স্তূপ! মহেঞ্জোদড়োর অন্ধকার গুহায় যেন শত সহস্র বছরের

অনাবিষ্কৃত স্মৃতি চিহ্ন।

হঠাৎ একটা কঠিন শক্ত জিনিষের স্পর্শে সদানন্দ রায় চমকে উঠলেন। কী ওটা! দৃঢ় মুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে একটা ছোট খুঁটিকে যেমন করে আঁকড়ে ধরে নিমজ্জমান লোক। সেটাকে বার করে আনতেই ঝনঝন করে উঠলো সোনার গয়না আর মোহরগুলো। বহুদিনের বন্দুক—কাঠের বাঁট—অব্যবহারে ধুলো আর ময়লা জমে আছে গায়ে। পাশেই ছিল টোটার বাক্স। সদানন্দ রায় একবার পরীক্ষা করে দেখেন। বহু শিকারের সঙ্গী আজ আবার যেন নিভান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন হাত তুলে তাঁকে বরাভয় বাণী শোনাবে।

সিন্দুকের চাবি বন্ধ করতে ভুল হয়ে গেল। সদানন্দ সোজা বন্দুক নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে এলেন।

ওপরে উঠে দুটো টোটা পুরলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সারি সারি ঘর পার হয়ে সোজা চলে এলেন খোকার ঘরে। অন্নদাকান্তর সময় থেকে যে পতন শুরু হয়েছে।

খোকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, সদানন্দ রায় কান পেতে রইলেন। সমস্ত ইন্দ্রাণী পার্ক নিঃস্তব্ধ। হঠাৎ মুহূর্তগুলো যেন সশস্ত্র প্রহরীর মত নিথর নিশ্চল হয়ে গেল। সময়ের পাখা নিঃসীম আকাশের নীচে অচল হয়ে গেছে। প্রাণস্পন্দনের ক্ষীণতম শব্দ যেন তীক্ষ্ম অস্ত্রের মত সদানন্দর কানে এসে আঘাত করতে লাগলো। তিনি চোখ বুজলেন—তারপর ঝড়ের বেগে এল একরাশ ঢেউ—সমুদ্রের লোনা ঢেউ আর তার সঙ্গে পালকের মত সাদা ফেনা। তাঁর মনে হলো পৃথিবীতে এবার আর আগুন নয়—বন্যা। মৃত্যুর বন্যা! সেই বন্যার খরপ্রবাহে রায় বংশের সম্মানসম্ভ্রম সব একাকার হয়ে গেল। কিন্তু সেই নিনিরীক্ষ্য অন্ধকারে এখন তাঁর মনে হোল যেন কোথায় ভোঁ বেজে উঠেছে—ধোঁয়া আর ধুলো—বয়লার আর স্টীম—রোগ আর জীবাণু—সীসে গলানো বিষ আর কয়লা জ্বালানো কালি—কল আর কুলি—মড়ক আর মহামারী—

হঠাৎ দুবার দুম দুম দুটি শব্দে সমস্ত ইন্দ্রাণী পার্ক সচকিত হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে কুলি আর মজুর আর রাজমিস্ত্রি এসে ইন্দ্রাণী পার্ক এ সদানন্দ রায়ের বাড়ীতে হাজির, কিন্তু পুলিশ আর দারোগা তারও আগে সেখানে এসে হাজির হয়েছে।

তেরো

সকলের শেষে বদ্রীদাস আগরওয়ালার ডাক পড়লো। হাকিম সাহেব তাকেও ডেকে পাঠালেন। বদ্রীদাস আগরওয়ালা কারবারী লোক বাজারে পূর্ব কোণে বদ্রীদাসজীর কারবার। মস্ত বড় গুদাম। গুদামের ভেতরে টন-টন, ছোলা, তিসি, গম, চাল, সরষের বস্তা সাজানো। ওয়াগন থেকে রেলের সাইডিং-এ মাল আনলোড করে তার গুদামে এনে গাদা হয়। তারপর মাল গুণে হিসেব-নিকেশ করে গুদামে ঘরের দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে চাবিটা কোমরের ঘুঁনসিতে ঝুলিয়ে দেয। তখন হাসি বেরোয় বদ্রীদাস আগবওয়ালার মুখে। তারপর হাসি দেখে, কেউ কেউ অবাক হয়। বলে—কী শেঠজী হাসছেন কেন হঠাৎ।

বদ্রীদাসজী বলে—শালা ব্যাওসার বাবোটা বাজিয়ে গেল—।

কেন? বারোটা বাজলো কেন শেঠজী?

বদ্রীদাস আসলে প্রাণখোলা লোক। বলে—বারোটা বাজবে না তো কি ছ'টা বাজবে মশায়? শালা ট্যাকসো দিতে-দিতে জান নিকেল গেল, ব্যাওসা কী রকম চলবে? শালা বেলের বাবুরা ট্যাকসো নেবে গাড়ির গাড়োয়ান ট্যাকসো নেবে কুলিমজদুর ভি ট্যাকসো নেবে। এত টাকা নিলে বারোটা বাজবে না?

সত্যিই প্রাণখোলা মানুষ বদ্রীদাস আগরওয়ালা। মুখে কিছু আটকায় না বটে, কিন্তু কথাগুলো খাঁটি কথা শুনবেন—তা বটে, এই জেলায় আরো ব্যবসাদার আছে আরো কারবারী আছে। বদ্রীদাসজী তাদের মত নয়। বাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রুস্তমজীর পেট্রল ডিপো আছে বোস কোম্পানীর অয়েল মিল আছে মনোহব সিং-এর মোটর ওয়ার্কশপ আছে। হরেকরকমের কারবার ছড়ানো আছে সারা শহরে। কোটি-কোটি টাকার লেনদেন হয় বছরে। কিন্তু বদ্রীদাসজীর মত খাঁটি কথা বলে না কেউ। এক-একজন বছরে বছরে নতুন নতুন গাড়ি কিনছে আর পরের বছরেই গাড়ি বদলাচ্ছে। এক-একজনের নতুন-নতুন বাড়ি হচ্ছে—হাল ফ্যাশানের কনক্রীটের বাড়ি। ড্যাম্প-প্রুফ, আর্থকোয়েক-প্রুফ বাড়ি সব। বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাড়িটা তো এবার কণ্ডিশণ্ড করা হয়েছে [illegible] সম্প্রতি। প্রাণকৃষ্ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে ডিনার-সেট কিনে আনা হলো বরকে দেবার জন্যে। সেই প্রাণকৃষ্ণ বাবুই কথায়-কথায় বলেন—না মশাই এবার বিজনেস গুটিয়ে ফেলতে হবে—কিছু প্রফিট থাকে না আজকাল—হনুমান পোদ্দারজীব ছ' মাস ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বিকেলের দিকে হাই ওঠে, ঘি খেলে অম্বল হয়। শেষকালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলেন। আর সুইজারল্যাণ্ডে যখন একবার খরচপত্র কবে যাওয়া তখন কাছাকাছি দেশগুলোও দেখে আসতে হয়। সুতরাং লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম, বার্লিন, প্যারিস—কিছুই আর বাদ দিতে পারেন নি। এখন আবার দেশে ফিরে এসে সব খাচ্ছেন আর হজম করছেন। কিন্তু তাঁরও মুখ ভার। বলেন—না স্যার, গর্ভনমেণ্টের জ্বালায়

আর ব্যবসা করা দেখি হয়ে উঠবে না। আর রুস্তমজী? রুস্তমজী এই সেদিন পেট্রল ডিপোটা খুললেন পাঁচ বছরও হয়নি। এরই মধ্যে একটা ফরেষ্ট কিনে ফেলেছেন সি-পিতে। দরকার হলেই প্লেনে করে যান সেখানে আর পরদিনই ফিরে আসেন। বলেন—ট্যাক্স দিতে দিতেই গেলাম মশাই। এরা দেখছি আর ভদ্রলোকদের বিজনেস করতে দেবে না—এই যুদ্ধের আগেও এ শহরের চেহারা এমন ছিল না। বৃটিশ আমলে টাকায় আট সের দুধ বেচেছে গয়লারা। মাছ পাঁচসিকে সের। চালের দর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় চড়েছিল বটে কিন্তু আবার নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভোল পালটে গেল শহরের। মনোহর সিং এসে মোটর ওয়াকর্শপ খুলল। রুস্তমজী পেট্রোল ডিপো খুললো। বোস কোম্পানীর অয়েল মিল চালু হলো। হনুমান পোদ্দারজীর রাইস মিলও চালালো।

কিন্তু বদ্রীদাস সেই বদ্রীদাস আগরওয়ালাই রয়ে গেলো। বদ্রীদাসের সেই খাটো নুন-ময়লা ধুতি, সেই চুলভর্তি খালি গা সেই টিনের গুদাম ঘর। বদ্রীদাস সব দেখে চোখ মেলে আর বলে—শালা কত বাড়বি বাড, আমি সকলকে এক চোট দেখে নেব। শালা কারবারের বারোটাই বাজুক আর একটাই বাজুক আমি সকলকে দেখে নেব একচোট—বদ্রীদাসের ছোট কাঠের ক্যাশ বাক্সটা সামনে থাকে আর চাবির গোছাটা থাকে কোমরের ঘুনসিতে। আর কিছুর দরকার হয় না। বদ্রীদাসের মেয়ের ফ্রান্স থেকে ডিনার সেটও আনতে হয় না। বদ্রীদাস ঘি খেলেও হজম করতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতেও হয় না। অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ করে রিকসায় চড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে ডালরোটি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। তা এই বদ্রীদাসের একদিন ডাক পড়লো। ডাক পড়লো সকলের শেষে। হাকিম সাহেব বদ্রীদাসজীকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। হাকিম-সাহেবের বাংলোর সামনে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। সেদিন বদ্রীদাস গায়ে পিরান চড়িয়েছে, পায়ে চটি গলিয়েছে, ধুতিটা ঝুল করে পরেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে অনেকবার গণেশজীকে নমস্কার করেছে। —জয় বাবা গণেশজীউ, জয় বাবা সিদ্ধিনাথজীউ—তারপর যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই জিজ্ঞাসা করেছে —আচ্ছা, হাকিম-সাহেব আমাকে বোলিয়েছে কেন বলুন তো? কে জানে কেন ডেকেছে হাকিম-সাহেব। কেউই বলতে পারে নি। কার অতো মাথা ব্যথা। হাকিম-সাহেবের আর্দালীকেও জিজ্ঞেস করেছে—আচ্ছা ভাইয়া হাকিম-সাহেব আমাকে তলব দিয়েছে কেন? আর্দালী মুখ নিচু করে বলেছে চাঁদা—চাঁদা? বদ্রীদাস আগরওয়ালা ভয়ে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে শুনে। চাঁদা কিসের চাঁদা হে। জোর করে ভয় দেখিয়ে হাকিম-সাহেব ট্যাকসো আদায় করে নেবে নাকি। আবার বদ্রীদাস আর্দালীকে জিজ্ঞেস করলে—ট্যাকসো? আর্দালী বললে—না শেঠজী—চাঁদা তবু ভয় গেল না বদ্রীদাসজীর মন থেকে। যার নাম চাঁদা তাঁর নামই তো ট্যাকসো। ট্যাকসো দিতে দিতেই তো জান নিকলে গেল। রেলের বাবুদের ট্যাকসো, গাড়ির গাড়োয়ানদের ট্যাকসো, কুলি-মজুরদের ভি ট্যাকসো—ট্যাকসোর কি হিসেব-কিতাব? ইংরাজ জমানাতে ট্যাকসো ছিল, কিন্তু সে এমন নয়। আজকাল যে ট্যাকসো বেড়েছে—কথায়-কথায় ট্যাকসো উঠতে বসতে ট্যাকসো। খানিক পরেই ডাক পড়লো ভেতরে। বদ্রীদাসজী উঠলো। উঠে ইষ্ট দেবতাকে এক বার স্মরণ করে নিল উর্ধনেত্র হয়ে। তারপর বললে—চলিয়ে আর্দালী-সাহাব চলিয়ে। বিরাট বৈঠকখানা। হাকিম-সাহেবের খাস কামরা। প্রথমে ঘরে ঢুকে হাকিম-সাহেবকে দেখাই গেল না। এত বড় একটা টেবিল। টেবিলের এক কোণে বসেছিলেন তিনি। বললেন—এসো বদ্রীদাসজী, এই দিকে এসো —এতক্ষণে হাকিম-সাহেবের হদিস পেয়ে বদ্রীদাসজী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। বললে—গুডমর্ণিং স্যার! —এসো এসো এইখানে

বোস। বদ্রীদাসজী অতি সন্তর্পণে গিয়ে বসলো একটা ছোট চেয়ারে। হাকিম-সাহেব বললেন—ওটাতে কেন এদিকে এই গদি-আঁটা বড় চেয়ারটায় বোস না। বদ্রীদাসজী বিনয়ে নম্র হয়ে বললে আমি ছোট আদমী আমি এখানেই বসি হুজুর। —না না তুমি ছোট আদমী কে বললে? তুমি এত বড় একজন হোলসেল মার্চেন্ট এখানকার। বদ্রীদাস বললে—না হুজুর আমি তো হুজুরের কাছে ছোট বেওসাদার আছি।

আজকাল কত বড় বড় বেওসাদার এসেছে এখানে। হনুমান পোদ্দারজী আছেন রুস্তমজী আছেন মনোহর সিংজী আছেন বোস কোম্পানী আছে আমি তো তাদের কাছে কি হুজুর?

হাকিম সাহেব বললেন—তারা অবশ্য বড়ই কিন্তু তুমিও ছোট নও বদ্রীদাসজী। আমি শুনেছি সব—শুনেছি তোমার অনেক বড় কাববার। রাইসের হোলসেল মার্চেন্ট গম ডাল তিসি সরষে গ্রাউণ্ডনাটেরও হোলসেল মার্চেন্ট তুমি।

বদ্রীদাস বললে—হুজুর সব ঠিক বাত আছে।

হাকিম-সাহেব বললেন কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কথা বলতে ডেকেছি বদ্রীদাসজী। তুমি শুনেছো বোধ হয় এ বছরে রবীন্দ্রনাথ সেন্টিনারী হবে লোকাল কমিটি হয়েছে—শুনেছ তুমি নিশ্চয়ই?

বদ্রীদাস বুঝতে পারলে না ঠিক জিজ্ঞেস করলে —কী বললেন হুজুর?

হাকিম-সাহেব এবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বললেন—রবীন্দ্র সেন্টেনারী রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকি।

বদ্রীদাসজী তবু বুঝতে পারলে না। বললে ও কেয়া হ্যায় হুজুর?

হাকিম-সাহেব বললেন—তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোননি?

—উও কৌন থা হুজুর?

হাকিম-সাহেব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন তিনি এক জন মস্ত কবি ছিলেন। যেমন তুলসীদাসজী তেমনি—।

এতক্ষণে বুঝতে পারলে বদ্রীদাসজী বললে—সন্ত তুলসীদাস?

হাকিম-সাহেব বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছে তুমি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি মস্ত বড় একজন কবি। সারা পৃথিবীতে তাঁর সেন্টিনারি উৎসব হচ্ছে—জার্মানী রাশিয়া ইংল্যাণ্ড আমেরিকা—সব জায়গায়। দিল্লীতে হচ্ছে বোম্বাইতে হচ্ছে কোলকাতাতেও হচ্ছে আমাদের এই শহরেও আমরা করছি। আমার কাছে গভর্ণমেন্ট চিঠি লিখেছে এখানেও সেন্টিনারি করতে হবে।

বদ্রীদাস বললে—তা আমি কি করবো হুজুর, আমি তো লিখতে ভি জানি না পড়তে ভি জানি না।

হাকিম-সাহেব বললে—না তোমাকে লিখতে পড়তে কিছুই করতে হবে না, ওসব করবার অনেক লোক আছে—তোমায় শুধু চাঁদা দিতে হবে।

বদ্রীদাসজীর বুকে ছ্যাঁৎ করে যেন একটা আঘাত লাগলো। বললো- ট্যাকসো?

হাকিম-সাহেব এবার হাসলেন। বললেন—না না ট্যাক্স নয়—চাঁদা, ডোনেশন।

বদ্রীদাস বললো. ও তো একই বাত হলো হুজুর। বাংলায় যার নাম চাঁদা হিন্দীমে তারই নাম ট্যাকসো হুজুর, আমরা যারা বেওসা করি তারা ওকে ট্যাকসো বলি হুজুর।

আচ্ছা না হয় ট্যাকসোই হলো তোমার কথা রইলই এখন সেটা দিতে হবে তোমাকে। বদ্রীদাসজীর এ রকম অবস্থা সহ্য করার অভ্যেস আছে। এত বছর ধরে ট্যাকসো দিয়ে কারবার করে আসছে সবই তার জানা। কোথায় ওয়াগন পেতে গেলে কাকে ট্যাকসো দিতে হয়? কোথায় পারমিট পেতে গেলে কাকে ট্যাকসো দিতে হয়, কোথায় সেলস্ ট্যাকসো জমা দিতে গেলে কাকে ট্যাকসো দিতে হয় —সব নখদর্পণে। ট্যাকসো দিতে

দিতে বুড়ো হয় গেল বদ্রীদাস আগরওয়ালা। ইংরেজ রাজত্বেও ট্যাকসো দিয়েছে এখন স্বদেশী জমানাতেও ট্যাকসো দিতে হচ্ছে সুতরাং ট্যাকসো দিতে ভয় পাবার কথা নয় বদ্রীদাসজীর। বদ্রীদাসজী বললে—কত ট্যাকসো দিতে হবে হুজুর ?

হাকিম-সাহেব বললেন—জিনিসটা তোমায় বুঝিয়ে বলি বদ্রীদাসজী। তুমি বুদ্ধিমান কারবারী লোক, তুমি বুঝবে। আসলে গভর্ণমেণ্ট থেকে আমার ওপর হুকুম হয়েছে সেণ্টিনারি কবার। সেই উপলক্ষে এখানে একটা রবীন্দ্র-ভবন হবে। ভবনটা তৈরী করতে অনেক টাকা খরচ হবে। ইঁট দেবে এখানকার জমিদার চৌধুরীবাবু। চৌধুরীবাবুকে চেন তো ? এ বছরে যিনি পদ্মশ্রী হয়েছেন। বদ্রীদাসজী উত্তর দিলে না। চুপ করে শুধু শুনতে লাগলো। আর সিমেণ্ট সুরকী লোহা আর যত কাঠ লাগবে সব দেবে হনুমান পোদ্দারজী।

বদ্রীদাস বললে—আচ্ছা হুজুর হনুমান পোদ্দারজী এখনও পদ্মশ্রী হচ্ছেন না কেন ?

হাকিম-সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—আর জমিটা দিচ্ছে আমাদের বোস কোম্পানীর প্রাণকৃষ্ণ বসু দু বিঘে জমি—ওই যাঁর অয়েল মিল আছে—তা যাকগে এসব কথা। আমরা মোট মাট হিসেব করে দেখেছি—সব শুদ্ধ আমাদেব খরচ হবে এক লাখ টাকা—টোটাল এক লাখ টাকার বাজেট রাফলি—তা তুমি কত দিতে পারবে এখন বলো ? বদ্রীদাস কী বলবে ভেবে পেল না। হাকিম-সাহেব একটা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন—এই দেখ এই লিস্ট দেখ, আমি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি—পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে দিতে হবে।

বদ্রীদাসজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলে। বললে হুজুর আমি মরে যাবো হুজুর বে-ফিকির মরে যাবো।

হাকিম-সাহেব বললেন এটা তোমার বাড়াবাড়ি বদ্রীদাসজী। পাঁচ হাজার টাকা তোমার কিছু না—।

না হুজুর, আজকাল ট্যাকসো দিতে দিতে কারবারের বারোটা বেজে গেছে হুজুর। আমি মারা যাবো হুজুর বে-ফিকির মারা যাবো। কিছু কমতি করিয়ে দিন হুজুর।

—হাকিম-সাহেব গলবার পাত্র নন। বললেন—আমি তো তোমাকে কমতি করেই ধরেছি বদ্রীদাসজী, আর সকলের অনেক বেশি বেশি ধরেছি তোমার বেলায় কম করেই পাঁচ হাজার টাকা ধরেছি।

—পাঁচ হাজার রুপেয়া কেমন করে দেব হুজুর ? আমি বে-ফিকির মারা যাবো। আপনি তার চেয়ে আমার গলাটা কাটিয়ে লেন হুজুর।

হাকিম-সাহেব বললে—আঃ তুমি দেখছি হাসালে বদ্রীদাসজী ? লোকে শুনলে বলবে কী বলো তো। পাঁচ হাজার টাকা দিতে তুমি মরে যাবে, এ কেউ বিশ্বাস করবে ?

—না হুজুর আমার কথা বিশোয়াস করুন। আমি একদম মারা যাবো আমি বে-ফিকির মারা যাবো, আপনি বিশোয়াস করুন—।

হাকিম-সাহেব এবার আরো কাগজপত্র বার করলেন। বললেন তবে দেখ এই লিস্টটা পড়ে দেখ—বলে লিস্টটা বদ্রীদাসজীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

বদ্রীদাসজী বললে—এ দেখে আমি কী করবো হুজুর ? আমি কী লিখি পড়ি জানি ?

—তবে শোন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। বলে হাকিম-সাহেব লিস্টটা নিজেই পড়ে শোনাতে লাগলেন। বললেন—হনুমান পোদ্দার—দশ হাজার টাকা এবং ইঁট কাঠ সিমেণ্ট লোহা। সি পি রুস্তমজী—পনেরো হাজার টাকা। প্রাণকৃষ্ণ বসু—দশ হাজার। মনোহর সিং আট হাজার। জমিদার এন চৌধুরি পদ্মশ্রী পাঁচ হাজার। তারপর বদ্রীদাসজীর দিকে চেয়ে হাকিম-সাহেব বললেন—দেখলে তো বদ্রীদাসজী তোমার কত কম চাঁদা ধরেছি—বদ্রীদাস কিছু কথা বললে না। হাকিম-সাহেব আবার বলতে

লাগলেন—সকলের কত বেশী বেশী ধরেছি আর তোমার কত কম চাঁদা ধরেছি, দেখলে তো ?

বদ্রীদাসজী এবার মাথা তুললো। বললে—না হুজুর, আমি পাঁচ হাজার দেব না।

—কেন ? পাঁচ হাজার কি তোমার পক্ষে বেশী হলো ?

—আজ্ঞে না হুজুর তা নয় আমি বিশ হাজার দেব। আপনি লিকে লিন আমি কাল এসে আপনাকে বিশ হাজার টাকা ট্যাকসো দিয়ে যাবো। হাকিম-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন বদ্রীদাসজীর মুখের চেহারা দেখে। বদ্রীদাসের মুখের চেহারা বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। —আপনি লিখে লিন।

হাকিম-সাহেব বললেন—কেন বদ্রীদাসজী তোমাকে তো আমি বিশ হাজার দিতে বলিনি তুমি ওদের থেকে ছোট কারবারী তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশি দিতে হবে না। পাঁচ হাজার দিলেই আমাদের চলে যাবে।

বদ্রীদাস বললেন—না হুজুর আপনি লিখে লিন আমার নামে বিশ হাজার।

—কেন ?

বদ্রীদাসজী বললে—না হুজুর রাগের কথা বলিনি আমি বিশ হাজারই দেব। যত ট্যাকসো চাইবে সরকার তত দেব।

চাইবে।—কিন্তু তুমি ভুল করছো বদ্রীদাসজী, রবীন্দ্র সেন্টিনারি তো সরকারী ব্যাপার নয়। এ তো এখানকার কমিটির ব্যাপার। আমি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বলছি। বদ্রীদাসজী তবু নাছোড়বান্দা। বললে—রবীন্দ্রনাথের নাম আমি জানি না হুজুর রবীন্দ্রনাথের দোঁহাভি আমি পড়িনি আমি আপনাকে দিচ্ছি আপনি আমার সরকার—আপনি যত ট্যাকসো চাইবেন তত ট্যাকসো দেব। আপনি লিখে লিন—।

সেদিন গদীতে ফিরে এসে বদ্রীদাসজীর আর খাওয়া হলো না। বিশ্রাম হলো না। মুনিম মুহুরী যত কর্মচারী আছে সকলকে ডাকলো। চাল গম ডাল সরষে তিসি সব জিনিসের হিসেব হতে লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত খাতাপত্র নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো। গদীবাড়ির ভেতরে। বদ্রীদাসজী নিজে লেখাপড়া জানে না। কিন্তু লেখাপড়ার হিসেব পত্র করবার জন্য লোকজন আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মালের দর দস্তুর যাচাই হলো। কিছু মাল সরিয়ে রাখা হলো আলাদা করে কিছু মাল সামনে। সেদিন সমস্ত রাত ধরে সমস্ত গদী বাড়ি ওলোট-পালোট হয়ে গেল একেবারে বদ্রীদাসজী জিজ্ঞেস করলে বোস কোম্পানীর গদীর কী খবর মুনিম ?

মুনিম বললে—ওদের ভি মাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে হুজুর।

—আর হনুমান পোদ্দারজী ?

—ওদের ভী। তারপর রাত যখন দুটো তখন সবাই ছুটি পেলে। সেই রাত দুটোর সময় বদ্রীদাসজী গদী থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। পরের সপ্তাহে রাঢ়-সমাচার পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ-স্তম্ভে একটি খবর প্রকাশতি হলো। খবরটি এই ঃ সম্প্রতি এই জেলায় কয়েকটি গ্রামে বন্যার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত অর্থ কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। চাল, ডাল, তেল, সরিষা, গম, তিসি, চিনা-বাদাম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যাদির দর যে-হারে বাড়িয়াছে তাহাতে এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। জেলার হাকিম-সাহেব এই অগ্নি-মূল্য নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নিজে ইহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে আশ্বাস দেন।

*